সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ)

# প্রাচ্যের উপহার

তরজমায়
হাফেজ আবু তাহের মেছবাহ
মাওলানা ইসমাঈল ইউসুফ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.

(32) تحفۂ مشرق، تحفۂ کشمیر، تحفۂ دکن، حدیث پاکستان
از سید ابوالحسن علی ندویؒ
مترجم: مولانا ابوطاہر مصباحی، مولانا اسماعیل یوسف
ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

প্রাচ্যের উপহার
মূল ঃ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদ ঃ হাফেজ আবু তাহের মেছবাহ
মাওলানা ইসমাঈল ইউসুফ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ.

প্রকাশকালঃ
জুলাই, ২০১২ ঈসায়ী
আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; শাবান, ১৪৩৩ হিজরী

প্রকাশনায়ঃ
মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ 01822-806163; 01776-438110

মুদ্রণে ঃ মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ঃ সালসাবিল

ISBN: 984-622-031-0

মূল্য ঃ ৪০০.০০ (চারশত) টাকা মাত্র।

PRACHYER UPOHER: Written by Allama Sayeed Abul Hasan Ali Nadvi Rh. in Urdu and translated by Hafez Abu Taher Mesbah, Moulana Ismail Yousuf & Moulana Abu Sayeed Muhammad Omr Ali Rh. into Bengali and Published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka-1100.BANGLADESH. Price Tk: 400/- US $ 12 Cell Phone: 01822-806163; 01776-438110

মুসলিম হবার কারণে আল্লাহ্র যে সব বান্দাহ
দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে নিত্য জুলুমের শিকার হয়ে
মুক্তির দুঃসহ প্রহর গুণছে তাঁদের সবর
এখতিয়ারের তওফীক কামনায়

## আমাদের কথা

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলিম, ইতিহাসবেত্তা ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ইসলামী চেতনার উন্মেষে তাঁর লেখনী অনন্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতামালার সংকলন। সংকলিত এই গ্রন্থ তোহফায়ে মাশরিক, তোহফায়ে কাশ্মীর, তোহফায়ে দাকান ও হাদীসে পাকিস্তান-এর সমন্বয়ে 'প্রাচ্যের উপহার' নাম দিয়ে বাংলা তরজমা প্রকাশ করা হলো। মূল উর্দূ থেকে বাংলায় তরজমা করেছেন জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, হাফেজ আবু তাহের মেসবাহ ও মাওলানা ইসমাইল ইউসুফ।

এই বক্তৃতামালা গ্রন্থে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও ইসলামের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যা পাঠকমহলকে উপকৃত করবে বলে আমরা আশা করি।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর রিযামন্দী লাভ ও তাঁর শুকরগুজারী করার তওফীক দান করুন। সেই সাথে এই অমূল্য গ্রন্থের লেখকের জান্নাতী রূহের উদ্দেশ্যে পেশ করছি আমাদের হৃদয় নিংড়ানো সালাম, কামনা করছি তাঁর দারাজাতের বুলন্দী এবং অনুবাদকদেরকে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

–প্রকাশক

## কে কোন্ অংশ তরজমা করলেন


- বাংলার উপহার/হাফেজ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ ২৩–৫৯
- দাক্ষিণাত্যের উপহার/মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল ইউসুফ ৬১–১৪৭
- কাশ্মীরের উপহার/আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ১৪৯–২৩৩
- পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশে/
  হাফেজ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ ২৩৫–৪০৬

## অনুবাদকের আরয

আলহামদুলিল্লাহ!

অবশেষে তাঁরই অপার রহমত ও কুদরতে দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে প্রদত্ত সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ.)-র বক্তৃতামালা 'প্রাচ্যের উপহার' নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। অনুবাদ থেকে শুরু করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া অবধি এর প্রকাশে যে দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়েছে তা আর এক ইতিহাস। সে ইতিহাস লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে বলে আমরা তা থেকে বিরত হলাম। ধৈর্যের এই দীর্ঘ পরীক্ষায় উৎরে যাবার নিবিড় আনন্দে ও সাফল্যে ওদিকটি এখন আমরা পেছনে ফেলতে চাই, উপেক্ষা করতে চাই।

সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ.) আজ আর শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাসও। কেবল ভারতের জ্ঞানমার্গেই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-জগতেই তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশেষ। একই সঙ্গে রূহানী মার্গের শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ হিসাবেও তাঁর তুলনা কেবল তিনি নিজেই। কয়েকজন বাংলাদেশী ভক্তের অব্যাহত চেষ্টায় এই বুযুর্গ মনীষী ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে ১০ দিনের এক সংক্ষিপ্ত সফরে তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহ) ও তাঁর খলীফাবৃন্দের উর্বর কর্মক্ষেত্র এই বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। এ সময় তিনি বেশ কয়েকটি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠানে যে সব জ্ঞানগর্ভ, ঈমান-উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন তার ভেতর মাত্র কয়েকটি বক্তৃতা রেকর্ড করা সম্ভব হয়। আর রেকর্ডকৃত সেই বক্তৃতাসমূহ লক্ষ্ণৌস্থ বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারু'ল-'উলূম নদওয়াতু'ল-উলামার প্রকাশনা বিভাগ থেকে 'তোহফা-ই মাশরিক' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের যে ভাইদের উদ্দেশে এই অমূল্য বক্তৃতাগুলো তিনি প্রদান করেছিলেন সেগুলো যাতে লিখিত আকারে পেয়ে

তাঁরা উপকৃত হতে পারেন সেই উদ্দেশে তিনি উল্লিখিত পুস্তিকার কিছু কপি বাংলা ভাষায় তরজমা ও প্রকাশের জন্য বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। পুস্তিকাটি হাতে পেয়েই জনাব আবু তাহের মেছবাহ্ তাৎক্ষণিকভাবে এটি তরজমা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগে জমা দেন। পাঁচটি বক্তৃতার সংকলন এই অতি ক্ষুদ্র পাণ্ডুলিপিটি সংশ্লিষ্ট সাব-কমিটিতে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে কমিটি পাণ্ডুলিপিটির আকার-আয়তনদৃষ্টে জনাব নদভী (মা. জি. আ.)-র এ ধরনের আরও বক্তৃতার সংকলন থাকলে সেগুলো এক সঙ্গে বৃহদাকারে প্রকাশের পক্ষে অভিমত দেন। উক্ত অভিমতের আলোকে জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে মওলানা নদভীপ্রদত্ত বক্তৃতা সংকলন 'তোহফা-ই কাশ্মীর', জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল ইউসুফ দাক্ষিণাত্যে প্রদত্ত বক্তৃতা সংকলন 'তোহফা-ই দাকান' ও জনাব আবু তাহের মেছবাহ্ পাকিস্তানে প্রদত্ত বক্তৃতা সংকলন 'হাদীছে পাকিস্তান' নামক তিনটি পুস্তিকা দ্রুত তরজমাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেন। অতঃপর উক্ত বিভাগের তৎকালীন পরিচালক জনাব মওলানা ফরীদউদ্দীন মাসঊদ কর্তৃক তা সম্পাদিত হলে পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণের উদ্দেশে মিল্লাত প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস-এ দেওয়া হয়। উক্ত প্রেস ১১ ফর্মা মুদ্রণের পর অনিবার্য কারণে তাদের পক্ষে এ মুদ্রণ কাজ অব্যাহত রাখা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপিসহ মুদ্রিত ফর্মাগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফেরত দেন। অতঃপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস থেকে অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি ছাপার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এখন এটি প্রেসের লেটার কেস থেকে পাঠকের হাতে পৌঁছুবার সৌভাগ্য লাভ করছে। আল্লাহ্ চাহেত পাঠকের অন্তর-রাজ্যেও তা স্থান করে নিতে পারবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

উপমহাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম তিনটি দেশ॥বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের বিশাল অংশ জুড়ে মুসলিম উম্মার প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস। এই পঁয়ত্রিশ কোটি মুসলমানের

জীবনে যেমন অসংখ্য সমস্যা আছে, তেমনি আছে সুপ্ত শক্তি এবং অন্তহীন সম্ভাবনাও। মুসলিম জীবনের এই সব সমস্যা চিহ্নিত করে তার ভেতরকার সেই সুপ্ত শক্তি ও অন্তহীন সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে, সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিম উম্মার সামনে বিরাজিত হতাশার অন্ধকার আকাশে শুধু আশার সোনালী সূর্যেরই উদয় ঘটবে না, বিশ্ব নেতৃত্বের সুমহান দায়িত্বেও তাকে অধিষ্ঠিত করবে। সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ.) আল্লাহপ্রদত্ত অপরিমেয় জ্ঞান, মু'মিনের ফিরাসত, বহু বুযুর্গশ্রেষ্ঠ থেকে প্রাপ্ত সুহবতের ফয়েয ও 'এ যুগের ইবনে বতূতা' হিসেবে সফরলব্ধ ব্যাপক অভিজ্ঞতা থেকে তিল তিল করে যা সঞ্চয় করেছেন তাঁর আলোয় তিনি উপমহাদেশের মুসলিম জীবনের সমস্যাসমূহ যেমন সুনিপুণভাবে চিহ্নিত করেছেন. তেমনি তার ভেতরকার সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনার সন্ধানও উম্মার সামনে পেশ করেছেন, পেশ করেছেন উম্মার বর্তমান দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্মের নিখুঁত দিক-নির্দেশনাও। সেই দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে দুনিয়ার বুকে নিজেকে সে খিলাফত ও ইমামতের সুবর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে, নাকি লা'নত ও যিল্লতের গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করবে!সেই ফয়সালা উম্মার এই পঁয়ত্রিশ কোটি সদস্যকেই গ্রহণ করতে হবে। তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে জান্নাতু'লু-'ইল্লিয়্যীনের আ'লা মকামে সে নিজের অধিবাস গড়ে তুলতে চায়, নাকি জাহান্নামের নিম্নতম প্রদেশে তার অধিবাস বানাতে চায়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যাঁদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সর্বাধিক—দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের যাঁরা চালিকা শক্তি হিসাবে পরিচিত, সেই আলিম সমাজ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও শিক্ষকমহলের কথা এসব বক্তৃতামালায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে, এসেছে লেখক ও কবি-সাহিত্যিকদের কথাও, এসেছে আরও অনেকের কথাই। সকলে একক ও সম্মিলিতভাবে এ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলে গোটা বিশ্বের বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে মানবতা যখন পুঁজিবাদের পর সমাজবাদের নগ্ন ব্যর্থতাদৃষ্টে তৃতীয়

মতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুণছে, হতাশার কালো মেঘ কেটে আশার আলোকরেখা তখন ফুটবেই।

যে দরদ দিয়ে এ বক্তৃতাসমূহ প্রদান করা হয়েছিল তা এর প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট। তরজমায় আমরা সেই দরদী পরশ ধরে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। জানি না এতে আমরা কতটা সফল হয়েছি। যদি ততোধিক দরদভরা মন নিয়ে এগুলো পড়া হয় এবং কিছুটাও তা পাঠক মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। করুণাময় প্রভু-প্রতিপালকের মহান দরবারে আকুল মুনাজাত, তিনি যেন তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোনাহগার উম্মতকে জুলমত ঘেরা অকূল সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে মুক্তির রাজতোরণ হেরার অভিযাত্রী হবার তওফীক দেন।

পুস্তকটি বর্তমান পর্যায়ে টেনে আনতে যাঁরা বিভিন্ন প্রকার কায়িক ও মানসিক শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ পুস্তক প্রকাশের ভার নেওয়ায় তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে এ বইয়ের মূল স্রষ্টা জনাব সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী (মা. জি. আ.)-কে যিনি ইতিমধ্যেই জীবনের ৭৬টি বসন্ত পেরুতে চলেছেন, পাঠকের খিদমতে বিনীত আরয, তাঁরা যেন দু'আ করেন মুসলিম বিশ্বের এই জ্ঞানবৃদ্ধ বুযুর্গ দার্শনিককে আল্লাহ্ পাক যেন সুস্থ রাখেন এবং তাঁর হায়াত-দারায করেন যাতে করে আমরা তাঁর বিশাল মনীষা থেকে অকৃপণভাবে দান গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করতে পারি, করতে পারি অন্তহীন সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী।

—অনুবাদক এর

# সূচী

## বাংলার উপহার


বিষয় পৃষ্ঠা

* আমাদের কথা ৫
* অনুবাদকের আরয ৭
* পরিচিতি ১৭
* ১ম ভাষণ
  ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ২৩
* ২য় ভাষণ
  প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার বিজয় ৩০
* ৩য় ভাষণ
  বাংলা ভাষার নেতৃত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ৩৭
* ৪র্থ ভাষণ
  ইসলামের সাথেই এ দেশের ভাগ্য জড়িত ৪৪
* ৫ম ভাষণ
  বুদ্ধিবৃত্তিক স্বনির্ভরতা অর্জনে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ৫০


## দাক্ষিণাত্যের উপহার


* ১ম ভাষণ
  আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের সবচে' আবেদনশীল
  কার্যকারণ ও এর বিস্ময়কর ফলাফল ৬১
* ২য় ভাষণ
  মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৭২
* ৩য় ভাষণ
  আলিম সমাজের পদমর্যাদা ঃ ধৈর্য, অবিচলতা ও বাস্তবোপলব্ধির সমন্বয় ৮৮
* ৪র্থ ভাষণ
  অনৈসলামী প্রথা বর্জন অত্যাবশ্যকীয় ৯৯

বিষয় পৃষ্ঠা

* ৫ম ভাষণ

দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী ১২২

* ৬ষ্ঠ ভাষণ

জীবন ও চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন অপরিহার্য ১৩৪

## কাশ্মীরের উপহার

* ১ম ভাষণ

কাশ্মীর উপত্যকায় নির্ভেজাল তাওহীদের পয়লা
পয়গাম ও তার প্রথম পতাকাবাহী ১৪৯

* ২য় ভাষণ

জাতীয় জীবনে বুদ্ধিজীবীদের স্থান এবং তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৫৯

* ৩য় ভাষণ

দ্বীনের নবীসুলভ মেযাজ ও এর হেফাজতের প্রয়োজনীয়তা ১৭২

* ৪র্থ ভাষণ

ঈমান ও তার মূল্য ১৮৯

* ৫ম ভাষণ

দাওয়াত ও দাওয়াতের হিকমত ১৯৮

* ৬ষ্ঠ ভাষণ

আল্লাহর সাহায্যের পূর্বশর্ত ও ইসলামের সাহায্যের সোজা রাস্তা ২০৯

* ৭ম ভাষণ

ইলমের স্থান ও মর্যাদা এবং আলিমের দায়িত্ব ও মর্যাদা ২২৪

## পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশে

* ১ম ভাষণ

বিশ্ব মুসলিম কাফেলার মহান মুসাফির ২৩৬

* ২য় ভাষণ

জাতীয় ঐক্য ও দাবী ২৪৬

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| * ৩য় ভাষণ | |
| ইসলামী বিশ্বের অন্তর্বর্তীকাল | ২৬২ |
| * ৪র্থ ভাষণ | |
| আলিম ও সুধী সমাজের দায়িত্ব | ২৭৯ |
| * ৫ম ভাষণ | |
| আল্লাহ্‌র এ দুনিয়া বাণিজ্য মেলা নয় | ২৯০ |
| * ৬ষ্ঠ ভাষণ | |
| ইসলামী বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পন্থা | ৩০১ |
| * ৭ম ভাষণ | |
| ইসলামী বিশ্বে নৈতিক দ্বন্দ্বের কারণ ও প্রতিকার | ৩১৬ |
| * ৮ম ভাষণ | |
| উর্বর ভূমি, প্রতিভা-প্রসবিনী দেশ | ৩২৭ |
| * ৯ম ভাষণ | |
| ভালবাসি সেই তরুণদের দূর তারকালোকে যাদের দৃপ্ত পদচারণা | ৩৩৬ |
| * ১০ম ভাষণ | |
| নববী ইলমের তালিবগণের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতামালা | ৩৫১ |
| * ১১শ ভাষণ | |
| কুরআন অধ্যয়ন ও এর আদবসমূহ | ৩৬৪ |
| * ১২শ ভাষণ | |
| দ্বীনী 'ইলম-এর তালিব 'ইলম ও আলিমগণের জন্য তিনটি চিরন্তন শর্ত | ৩৭৬ |
| * ১৩শ ভাষণ | |
| এ দ্বীন চিরজীবন্ত, জীবন্তরাই এর ধারক ও বাহক | ৩৮৭ |
| * ১৪শ ভাষণ | |
| আকূড়া-খটকের শহীদদের খুনের বর্ণাঢ্য রূপ | ৩৯৭ |

# প্রাচ্যের উপহার

# পরিচিতি

[বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধসমূহ মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রদত্ত পাঁচটি ভাষণের সংকলন]

শেখ সাদী (র) বাগদাদ থেকে যখন 'সিরাজে' আসছিলেন তখন তাঁর মনে সাধ জাগল-সুহৃদদের কি উপহার নেয়া যেতে পারে? অনেক চিন্তার পর তিনি রচনা করলেন ফারসী সাহিত্যের অমর সম্পদ সুবিখ্যাত নীতিগ্রন্থ 'বোস্তা'। এতেই ছিল 'সিরাজ'বাসীদের জন্য বয়ে আনা শেখ সাদীর অনবদ্য উপহার। তিনি নিজেও তাঁর এক কবিতায় সে প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেনঃ

"মিসর থেকে লোকেরা উপহার হিসাবে বন্ধুদের জন্য 'মিসরী' বয়ে আনে। আমি হয়তো 'মিসরী' নিয়ে যেতে পারব না। কিন্তু ক্ষতি কি? মিসৃরীর চেয়েও মিষ্টি কিছু কথাতো উপহার নিয়ে যেতে পারি! আমার এ 'মিসরী' হয়ত রসনা তৃপ্তির কাজে আসবে না। কিন্তু বন্ধুরা তা লিখে রেখে পথ-নির্দেশনা তো গ্রহণ করতে পারবে।"

বলা বাহুল্য যে, সুহৃদ বন্ধু ও অনুরাগীদেরকে এরূপ ইল্‌মী ও একাডেমিক উপহার দেয়ার রীতি আমাদের আকাবির ও পূর্ববাসীদের মধ্যে বহু পূর্বে থেকেই চলে আসছে। বক্ষ্যমাণ বক্তৃতা সংকলনটি বাংলাদেশী মুসলমান ভাইদের জন্য মাওলানা নদভীর তেমনি এক হৃদয়নিংড়ানো উপহার।

এখানেই সংকলনটির তুহ্‌ফা- ই- মাশরিক বা প্রাচ্যের উপহার নামকরণের সার্থকতা।

স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মাওলানা নদ্‌ভী-র কাছে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণপত্র আসতে থাকে। কিন্তু আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনিবার্য কারণে মাওলানার পক্ষে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দু' তিন বছর পূর্বে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বিশিষ্ট উস্তাদ মাওলানা সুলতান যওক সাহেব ভারত সফরে এসে মাওলানাকে পুনরায় বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। ইত্যবসরে বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের তরফ থেকেও নতুন করে আমন্ত্রণ পত্র আসা শুরু হয়। অবশেষে নয়ই মার্চ ১৯৮৪-তে মাওলানা নদভী চারজন সফরসঙ্গীসহ বাংলাদেশ সফরে আগমন করেন।

বাংলাদেশী ভাইদের অব্যাহত অনুরোধ ও সাগ্রহ প্রতীক্ষা ছাড়াও দুটি প্রধান আকর্ষণ মাওলানার এ সফরের পেছনে সক্রিয় ছিল।

বাংলাদেশী পাঠকবর্গের জানা থাকবে, আজ থেকে প্রায় দেড় শ' বছর পূর্বে যুগ-সংস্কারক হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভীর বিশিষ্ট খলীফা ও পরম প্রিয়পাত্র মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। বস্তুত হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলভী (র)-এর উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনারূপে স্থান লাভ করেছে। বাংলাদেশে মুসলমানদের বর্তমান বিপুল জনসংখ্যা ও ধর্মীয় জাগরণের পেছনে সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলভী (র)-এর উপরিউক্ত এসব নজীরবিহীন ত্যাগ ও কুরবানীর অবদান অনস্বীকার্য।

সাইয়েদ সাহেবের সাথে খান্দানী সম্পর্কের কারণে মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সুদীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল তিনি স্বচক্ষে তাঁর পূর্বপুরুষদের জিহাদ ও কুরবানীর ফসল অবলোকন করে আসবেন এবং পূর্বপুরুষদের পবিত্র ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তিনি নিজেও সেখানকার মুসলমানদের সঠিক রাহ্‌নুমায়ী ও পথ-নির্দেশনার কিছুটা খিদমত আঞ্জাম দেবেন।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী খিদমতের পাশাপাশি ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কারমূলক আন্দোলনই হচ্ছে মাওলানার জীবনের মূল মিশন। ইসলামী উম্মাহ্‌র বিরাজমান অবস্থার পরিবর্তন ও দেশে দেশে ব্যাপক ইসলামী পুনর্জাগরণ হচ্ছে তাঁর দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন। তাই ইসলামী উম্মাহর কোন আশাব্যঞ্জক সংবাদে তাঁর দরদী মন যেমন আনন্দিত হয় তেমনি কোন নিরাশাব্যঞ্জক অবস্থা পরিলক্ষিত হলে গভীরভাবে তা আহতও হয়। মাওলানার নিকটজনেরা তাঁর দরদী মনের এ আকুতি সর্বদা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। মাওলানা তাঁর এ সংস্কারমূলক কর্মসূচীর অধীনে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব কয়টি দেশই বার বার সফর করেছেন। ইউরোপ- আমেরিকাসহ যে সমস্ত দেশে বিপুল সংখ্যক মুসলিম সংখ্যালঘু বাস করেন সে সব দেশেও তিনি ডাক আসা মাত্রই ছুটে গিয়েছেন। সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, ফলপ্রসূ ও ভারসাম্যপূর্ণ সুসমাজের পথ-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাওলানার প্রতিটি লেখাতেই সুগভীর জীবনবোধ, বাস্তববাদিতা, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস অধ্যয়নের সুস্পষ্ট ছাপ প্রত্যক্ষ হয়। মনে হবে, একজন মু'মিন তাঁর আল্লাহ্‌প্রদত্ত ঈমানী দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সব কিছু বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। তাই বুঝি ইসলামী বিশ্বের বর্তমান সমস্যাবলী ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও আশংকার চিত্র তাঁর লেখায় ও বক্তৃতায় এমন সজীব ও জীবন্ত হয়ে ওঠে!

ভাব ও তথ্যগত দিক থেকে তাঁর বক্তব্য নির্ভরযোগ্য ও সারগর্ভ হওয়ার দিকে মাওলানা তাঁর প্রতিটি লেখাতেই অত্যন্ত যত্নের সাথে লক্ষ্য রেখেছেন।

সর্বোপরি পাঠকবর্গ যেন তা থেকে যুগ-সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারেন এ দিকে থাকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তাই দেখা যায়, হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার পরও তাঁর সদাসক্রিয় লেখনী মক্কাভিমুখে তার গতিময় যাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। কখনো তা দিগভ্রান্ত হয়ে তুর্কিস্তানমুখী হয়নি। এছাড়া যুগোপযোগী রচনাশৈলী, সাহিত্যরস, ভাষা মাধুর্য ও সাবলীলতা ও সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গি তাঁর লেখার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য বক্তৃতা সংকলনটিও উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সংকলনে মোট পাঁচটি বক্তৃতা স্থান পেয়েছে। মাওলানার এসব বক্তৃতামালাও, যেমন আমি প্রথমেই বলে এসেছি, ইল্‌মী ও একাডেমিক, দাওয়াতী ও সংস্কারমুখী। প্রতিটি বক্তৃতায় বাংলাদেশের ইসলামী চরিত্র সংরক্ষণ ও ইসলামের সাথে তাঁর সম্পর্ক অটুট রাখার ওপর তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দীনের প্রতি বাংলাদেশী জনগণের সুগভীর গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এ গুণাবলী কাজে লাগিয়ে এ জাতি দ্বারা সেই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব যা কোন রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও পার্থিব শক্তি দ্বারা সম্ভব নয়।

সেই সাথে তিনি বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে দেশের আলিম সমাজকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অমুসলিম ও অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে তাঁর নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন এবং যথাসম্ভব অল্প সময়ে বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ইসলামী সাহিত্য তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন ।

বস্তুত পাকিস্তান আমলের গোড়া থেকেই ভাষা সমস্যা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যার রূপ ধারণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার এক জনসভায় জনাব জিন্নাহ ঘোষণা করে বসলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা। জনাব জিন্নাহ্‌র রাশভারী ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে এ ঘোষণার তাৎক্ষণিক কোন প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত না হলেও বাংলাদেশীরা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। একে তো মাতৃভাষার প্রশ্নে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতো বাংলাদেশীরাও বেশ অনুভূতিপ্রবণ। তদুপরি জনসংখ্যার দিক থেকেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী বাঙালীরাই ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত এবং প্রতিটি প্রদেশের নাম, ভাষা ও বৈশিষ্ট্য ছিল পৃথক। ভাষা আন্দোলন যখন দুর্বার গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করল তখন সে দেশের আলেম সমাজের একাংশ দুর্ভাগ্যজনকভাবে উর্দুর পক্ষে ওকালতি শুরু করল। ফলে গোটা জাতি থেকে তারা একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এমনিতেও বাংলা ভাষার সাথে বলতে গেলে আলেম সমাজের বিরাট এক অংশের কোন সম্পর্কই ছিল না। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আলেম সমাজকে এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, এমন কি তাদের দেশপ্রেমকেও সন্দেহের চোখে দেখা হতে থাকে।

অন্য দিকে এটাও এক বাস্তব সত্য, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান খুব বেশী নয়। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনৈসলামী ভাবধারার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রবাদ, উপমা-উৎপেক্ষা ও অলংকারে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ছাপ নেই। এই অবস্থা দুঃখজনক ও অশুভ ইঙ্গিতবাহী।

এজন্যই মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও আলেম সমাজকে বাংলা ভাষা উন্নয়নে অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব দানের প্রজ্ঞাময় পরামর্শ দিয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা প্রসংগে আরবী ও ফারসী ভাষার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ইসলামপূর্ব যুগে আরবী ভাষা ছিল একটি শিরকবাহী ভাষা, অথচ আজ ইসলামকে বাদ দিয়ে আরবী ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করার কোন উপায় নেই। তদ্রূপ ফারসী ভাষাকে মনে করা হয় মুসলমানদের ভাষা। কেননা আলেম ও ইসলামী চিন্তানায়কগণ ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। হিন্দুস্তানী আলেমগণও উর্দু ভাষাকে অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেননি। ফলে আজ একথা কেউ বলতে পারেন না, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলেম সমাজ দুর্বল।

বাংলা ভাষার সাথে বাংলাদেশী আলেমদের আচরণ অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষার উন্নয়নে ও বিশ্ব সাহিত্যের অংগনে তাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে অলেম সমাজেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত যেন ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা রেফারেন্সের মর্যাদা লাভ করতে পারেন। মাওলানা অত্যন্ত আবেগ ও দরদ নিয়ে বাংলাদেশী আলেমদের উদ্দেশে বিভিন্ন জায়গায় এ কথাগুলো বলেছেন। মাওলানা এ সফর কালে ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোমেনশাহী ও সিলেটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গিয়েছেন। ঢাকা অবস্থান কালে মুসলিম শাসনামলের ঐতিহ্যবাহী রাজধানী সোনারগাঁয়েও তিনি গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সফর কালে যাঁরা মাওলানার সব রকম সুযোগ-সুবিধার প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা সুলতান যওক সাহেব (উস্তাদ, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া), জনাব আবদুল ফায়েদ মুহম্মদ ইয়াহিয়া (তৎকালীন মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), হাজী বশীরুদ্দীন সাহেব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার মনে রাখার মত।

মাওলানা আবুল ইরফান নদভী

প্রধান, শরীয়া বিভাগ, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ

# বাংলার উপহার

# ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ

[১০ই মার্চ, ১৯৮৪ বাদ আসর জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণ। এ ভাষণের মাধ্যমেই মাওলানার বাংলাদেশের সফরসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।]

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

আমার প্রিয় বাংলাদেশী ভাই ও বন্ধুগণ! আপনারা আমার সালাম ও মুবারকবাদ গ্রহণ করুন। প্রথমেই আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিজের এই ত্রুটি ও অপরাধ স্বীকার করছি, উপমহাদেশীয় মুসলমানদের বৃহত্তম অংশের আবাসভূমি বাংলাদেশের আমার দ্বীনী ভাইদের খিদমতে আমি অনেক বিলম্বে জীবনের প্রায় সায়াহ্নে কালে হাজির হয়েছি। পবিত্র ঘরে ও এই মহান ইসলামী শিক্ষাঙ্গনের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে এই ত্রুটির জন্য আল্লাহর দরবারে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন! দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের এই সবুজ শ্যামল, শান্ত, স্নিগ্ধ মাটিতে যেখানে ইসলামী উম্মাহর নয় কোটি তাওহীদী সন্তানের অধিবাস, যাদের মুখে কালেমার সুমধুর গুঞ্জন আর বুকে ঈমানের দৃপ্ত সজীব স্পন্দন, যারা শুধু আল্লাহ্‌র সামনেই নত করে তাদের উন্নত শির এবং রাসূলের পবিত্র জীবনাদর্শেই যারা দেশ ও সমাজ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, সেখানে সেই ধর্মপ্রাণ দীনী ভাইদের খিদমতে অনেক আগেই আমার এসে হাযির হওয়া উচিত ছিল।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ! পবিত্র কুরআনে আল্লাহু পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ -

"যখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে তোমাদেরকে আমি আরো প্রাচুর্য দান করব। আর যদি কৃতঘ্ন হও তবে মনে রেখো, আমার শাস্তি ভীষণ কঠিন।"

[সূরা ইবরাহীম ঃ ৭]

বস্তুত সচরাচর এরূপ দেখা যায়, অন্য জাতির সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায়

জাঁকজমকপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক কোন উপকরণ দেখতে পেলে নিজেদের অজ্ঞাতে মানুষ সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এই সুযোগে শয়তানও তার কাঁধে ভর করে। বিভিন্ন উপায়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে থাকে, "আহা! আমাদের সমাজ ও জীবন ব্যবস্থায় যদি এ চিত্তাকর্ষক উপাদানগুলো সংযোজিত হতো!" দুনিয়ার কত জাতিই তো এমন রয়েছে যারা তাওহীদের সুনির্মল বিশ্বাস ও ইসলামের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত! কেউ মেতে আছে পালা-পার্বণ ও মেলা উৎসবে, কেউ বা প্রাণহীন মূর্তি পূজায়, আবার কেউ দেবতার ভোগে। অবাধ চিত্তবিনোদন ও উচ্ছৃঙ্খল রসরূপ উপভোগের রকমারি উপায়-উপকরণে তাদের উৎসব অনুষ্ঠানগুলো হয়ে ওঠে নরক গোলযার। এমন নাযুক মুহূর্তে অনেক তাওহীদবাদী জাতিরই পদস্খলন ঘটেছে, মুহূর্তের অসতর্কতায় শয়তানের কূট প্ররোচনার শিকার হয়েছে। ভাবে কিংবা বক্তব্যে তখন তারা এমনও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে শুরু করেছে, আহা! আমাদেরও যদিও এমন সুযোগ হতো!

দুনিয়ার অনেক জাতিই লা-শরীক আল্লাহকে অস্বীকার করে গায়রুল্লাহ্‌র আরাধনায় মত্ত হয়েছে। কেউ জাতীয়তাবাদকে, কেউ উগ্র স্বাদেশিকতাকে, কেউ ভাষা ও বর্ণবাদকে, কেউবা পূর্বপুরুষদের অতীত গৌরবকে গ্রহণ করেছে উপাস্য দেবতারূপে। কিন্তু ইসলামী উম্মাহকে আল্লাহ্‌ পাক এসব শয়তানী ধূম্রজাল থেকে মুক্ত রেখেছেন। আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ঃ যত মনোহর ও চিত্তাকর্ষকই হোক, তোমাদের দৃষ্টি যেন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি প্রলুব্ধ না হয়!

কিন্তু মানবেতিহাসের দুর্ভাগ্য, এ পিচ্ছিল পথে অনেক অসতর্ক জাতিরই পদস্খলন ঘটেছে। উপাদেয় খাদ্য দেখে অভুক্তের জিভে যেমন পানি আসে তেমনি ভিন্ন জাতির বাহ্যিক জৌলুসপূর্ণ ঐশ্বর্য দেখে তাদের জিভেও পানি এসে পড়েছে। মনে সুড়সুড়ি জেগেছে, এমন কি আল্লাহ্‌র প্রিয় ও নির্বাচিত জাতিরও পা ফসকে গেছে। বনী ইসরাঈলের কথাই ধরুন। এক শ্রেষ্ঠ নবীর সান্নিধ্যে ও সাহচর্য আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করেছিলেন। কিন্তু এতো বড় সৌভাগ্য তাদের শেষ রক্ষা করতে পারেনি। তাদের পা টলে গেল। মূর্তি পূজার বাহ্য আড়ম্বর দেখে তারাও প্রলুব্ধ হলো। তাদের মনে সুড়সুড়ি জাগল, "আহা! এমন কিছু আমরাও যদি করতে পারতাম।" সূরাতুল আ'রাফেও বনী ইসরাঈলের ঘটনা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ
أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا يَٰمُوسَى اجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ

اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ - اِنَّ هٰؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। পরে তারা মূর্তি পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বলে বসল, হে মূসা! ওদের যেমন দেবতা আছে, তেমনি আমাদের জন্যও একটি দেবতা বানিয়ে দাও। তিনি বললেন, তোমরা দেখছি মূর্খের দল! ওরা তো এক ধ্বংসকর কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং তারা যা করছে তা ভ্রান্ত ও অমূলক।" [সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৩৮-১৩৯]

অন্যত্র বনী ইসরাঈলীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يٰبَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

"হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের ওপর আমি যে অনুগ্রহ করছি তা স্মরণ করো। আর একথাও স্মরণ করো, বিশ্বে সবার ওপর তোমাদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

তাফসীর গবেষকদের মতে তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর ওপর বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষ মর্যাদা লাভের উৎস ছিল তাওহীদের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস; মূলত তাওহীদ ও একত্ববাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমসাময়িক জাতিবর্গের তুলনায় তারা অধিক আল্লাহভীরু ও একত্ববাদী ছিল। কিন্তু মিসর ভূমিতে বছরের পর বছর হযরত মূসা আলায়হিস সালামের তরবিয়ত ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের পরও তাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল তা আল- কুরআনের ভাষায় শুনুন ঃ

يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ -

"হে মূসা! ওদের যেমন দেবতা আছে তেমনি আমাদের জন্য একটি দেবতাও বানিয়ে দাও।"

সম্ভবত সেখানে মীনা বাজার বসেছিল, ভোজসভারও আয়োজন ছিল, আরো হয়তো ছিল নাচগান ও সঙ্গীতের উদ্দাম অনুষ্ঠান। এ ধরনের উৎসবপর্বে উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। ভিন্ন জাতির সে রঙ্গরস ও জৌলুসপূর্ণ নৃত্য-সঙ্গীতমুখর উৎসব দেখে মূসা আলায়হিস সালামের এতদিনের সযত্ন সাধনায় গড়া শিক্ষা ও আদর্শ তারা মুহূর্তেই বিস্মৃত হয়ে গেল। আল্লাহ্র

নবীর কাছে তারা আবদার জুড়ে দিল ঃ হে মূসা! ওদের যেমন দেবতা আছে তেমনি আমাদের জন্য একটি দেবতা এনে দাও যাকে আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাব, স্পর্শ করতে পারব এবং যার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে আমরা আত্মতৃপ্তি পাব।

এমন অদ্ভুত আবদার শুনে হযরত মূসা জ্বলে উঠলেন। বললেন ঃ মূর্খ, অপদার্থ ও কৃতঘ্নের দল! এতদিন ধরে তোমাদের তাওহীদের শিক্ষা দিলাম, শিরকের পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার করে আনলাম, আল্লাহ্‌র কাছে দরখাস্ত করে মান্না-সাল্‌ওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিলাম, অথচ আজ সেই তোমরাই আবদার জুড়ে দিয়েছ নাচ-গান ও রঙ্গ-তামাশার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য? "এরা তো ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে এবং এরা যা করছে তা নিছক ভ্রান্ত ও অমূলক।"

বস্তুত বনী ইসরাঈলীদের দুর্ভাগ্য ও অধঃপতনের ইতিহাস আমাদের জন্যে এক জ্বলন্ত শিক্ষা; এক চরম সতর্কবাণী। দীর্ঘ যুগ ধরে যে জাতি আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হযরত মূসার নবীসুলভ তরবিয়াত ও দীক্ষা লাভ করে পূর্ণ ও পরিণত হলো, নাযুক পরীক্ষার মুহূর্তে তাদেরও পা ফস্‌কে গেল। তারাও আবদার জুড়ে দিল মুশরিকদের পদাঙ্ক অনুসরণের ঃ এমনি এক স্থূল খোদা আমাদেরকে এনে দাও যাকে চোখে দেখে আমরা উপাসনা করতে পারি।

আরো সীমিত পর্যায়ে প্রায় একই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগে। হিজাযে একটি গাছ ছিল। সে গাছতলায় আরবের মুশরিকরা পশু বলি দিত এবং গোটা একটা দিন আনন্দে সেখানে কাটিয়ে দিত। 'সিহাহ সিত্তায়' বর্ণিত হয়েছে, হুনায়ন যুদ্ধে যাত্রা কালে একদল নওমুসলিম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আবেদন জানাল ঃ আমাদের জন্য এমন কোন একটি গাছতলা নির্দিষ্ট করে দিন যেখানে আমরা আনন্দ উৎসবের উদ্দেশে বাৎসরিক মেলায় সমবেত হতে পারি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ হযরত মূসাকে বনী ইসরাঈলীরা যা শুনিয়েছিল সেই একই কথা আমাকেও তোমরা শোনাচ্ছ!

اِجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ـ

"ওদের যেমন দেবতা আছে আমাদের জন্য তেমনি একটি দেবতা এনে দিন।" তোমরা কি সে জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাও?

[ইবনে হিশাম খ. ২, পৃঃ ৪৪২]

একবার এক জিহাদের সফরে জনৈক আনসার ও মুহাজিরের মধ্যে সামান্য বাক বিনিময় হয়ে গেল। তখন আনসারী সাহাবী বলে উঠলেন ঃ

يالللانصار ـ

কোথায় আনসার দল! ছুটে এসো, সাহায্য করো!

দেখাদেখি অপরজন মুহাজিরদের লক্ষ্য করে অনুরূপ ডাক দিলেন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের গোচরীভূত হলে তিনি উভয় জামা'আতকে লক্ষ্য করে বললেনঃ এ প্রথা পরিত্যাগ করো, এটা দুর্গন্ধময় নাপাক প্রথা।

ভাই ও বন্ধুগণ! এ কথা মনে রাখতে হবে, শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে ওঁৎ পেতে বসে আছে এবং মুহূর্তের জন্যে সে তার মিশন থেকে গাফিল হয় না। নিত্য-নতুন কৌশলে মানুষকে সে বিভ্রান্তির পথে প্ররোচিত করে। বার বার মুখোশ পালটায়। কে কোন্ কৌশলে প্রভাবিত হবে এবং কাকে কোন্ পন্থায় ইসলামের চির সরল পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে এসব তার নখদর্পণে। আলিম পরিবারে গিয়ে সে চুরির কথা বলবে না। কেননা এটা তার ভালো করেই জানা আছে, আলিম ও বুযুর্গের সন্তান চৌর্যবৃত্তির মতো হীন কাজে লিপ্ত হতে কিছুতেই প্রস্তুত হবে না। সেখানে সে ভিন্ন পথে এগুবে। তাদেরকে আত্মম্ভরী ও অহংকারী করে তুলবে। পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাঁথা নিয়ে বড়াই ও লড়াই করার তালিম দেবে। তদ্রূপ ব্যবসায়ী মহলে গিয়ে প্রথমে সে ওজনে ফাঁকি দেবার কিংবা অবৈধ পথে কালো টাকার পাহাড় গড়ে তোলার ফন্দি-ফিকির বাতলে দেবে। অনুরূপভাবে যে জাতিকে আল্লাহ্র দীন ও ঈমানের বিরাট দৌলত দান করেছেন; ইল্ম, আমল, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের নিয়ামত দান করেছেন তাদের কানে সে এ ধরনের মন্ত্র দেবে ঃ ইসলাম কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বিষয় নয়। মুসলমান তো সকলেই। ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা, বর্ণ কিংবা জাতীয়তাই হচ্ছে আমাদের বৈশিষ্ট্য, আমাদের গর্ব ও গৌরবের বিষয় এবং এগুলোই আমাদের আঁকড়ে ধরা উচিত। এটা হলো শয়তানের সেই মোক্ষম হাতিয়ার যা সে এমন সুবর্ণ মুহূর্তে সুকৌশলে প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু সকল শয়তানী প্ররোচনায় মুখেও তাওহীদের রজ্জুকেই মযবুতভাবে আপনাদের আঁকড়ে ধরতে হবে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا -

"তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকেই মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৩]

ইসলামী উম্মাহ্র মাঝে ফাটল ও বিভেদ সৃষ্টির অশুভ উদ্দেশ্য নিয়েই শয়তান জাতীয়তাবাদ, বস্তুবাদ, বর্ণবাদ ও ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতাসহ বিভিন্ন রকমের শয়তানী জাল বিছিয়ে দেয়। তাওহীদবাদী উম্মাহ সেই ইন্দ্রজালে এমনভাবে ফেঁসে যায় এবং আপাতমধুর স্লোগানে এতই মোহগ্রস্ত ও বিভোর হয়ে

পড়ে যে, তখন এক মুসলমান অন্য মুসলমানের খুন পিয়াসী হয়ে ওঠে। মুসলমানের হাতে মুসলমানের আবাদ ঘর বিরান হয়। মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়। অসহায় বৃদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে, নিষ্পাপ কচি শিশুর চাঁদমুখ নিষ্ঠুর পদাঘাতে থেঁতলে যায়, তবুও হায়েনার উন্মত্ত জিঘাংসা এতটুকু প্রশমিত হয় না।

বন্ধুগণ! এ শয়তানী জাল আমাদের ছিন্ন করতে হবে। ইসলামের ওপরই শুধু আমাদের গর্ব করা উচিত। ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সাথেই কেবল আমাদের ভালবাসা থাকা উচিত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ্ পাকের দরবারে এক হাবশী গোলামের মর্যাদা অভিজাত বংশীয় একজন সুখী-সুন্দর মানুষের চেয়ে অধিক হতে পারে। কেননা

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -

"তোমাদের মধ্যে যে অধিক মুত্তাকী, আল্লাহর দরবারে সেই অধিক সম্মানের অধিকারী।" আল্লাহর দরবারে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তাক্ওয়া ও ইবাদত এবং ইল্ম ও আমল।

لَافَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلٰى عَجَمِىٍّ وَلَا لِعَجَمِىٍّ عَلٰى عَرَبِىٍّ اِلَّا بِالتَّقْوٰى -

"অনারবের ওপর আরবের কিংবা আরবের ওপর অনারবের, তদ্রূপ কালোর ওপর সাদার কিংবা সাদার ওপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" ভাষা ও বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। তাক্ওয়ার ভিত্তিতেই কেবল আল্লাহ্র কাছে মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে। তুমি কোন্ ভাষায় কথা বলো কিংবা তোমার চামড়ার রং কালো না সাদা, আল্লাহ্ পাক তা দেখবেন না। তিনি শুধু দেখবেন তোমার ইল্ম ও আমল কতটুকু ইখলাসপূর্ণ। তোমার হৃদয় কতটুকু পবিত্র ও সহানুভূতিপ্রবণ। তোমার সালাত কতটুকু নিখুঁত, কতটুকু সুন্দর। ইসলামের প্রতি তোমার অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা কতখানি। এক কথায় আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদাও তত অধিক। ইসলামের সম্বন্ধই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সম্বন্ধ। এজন্যই আল্লাহ্ পাক আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا -

"শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রুরূপেই গণ্য করো।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَاتَرَوْنَهُمْ -

"তোমরা না দেখলেও শয়তান ও তার অনুচরেরা কিন্তু তোমাদেরকে ঠিকই দেখে।"

শয়তানের গতিবিধি খুবই সূক্ষ্ম ও রহস্যময়। কখনো সে মানুষের ওপর ভর করে আসে। কখনো শত্রুর বেশে আসে, আবার কখনো আসে বন্ধুর বেশে। সব ভাষাতেই তার সমান দখল এবং তার ভাষাশৈলীও আমাদের চেয়ে আকর্ষণীয়। বড় হৃদয়গ্রাহী পন্থায় সে তার বক্তব্য উপস্থাপন করে। অতএব, এমন খতরনাক শত্রুর ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকুন। ইসলামের রজ্জুকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন। ইসলামকে নিয়েই শুধু গর্ব করুন। ইসলামের জন্যই জীবন ধারণ করুন এবং প্রয়োজন হলে ইসলামের জন্যই জীবন উৎসর্গ করুন। ইসলামের জন্য শুধু আল্লাহ্‌র দেয়া এ প্রাণ উৎসর্গ করা যেতে পারে, কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর জন্য দিনে এক ফোঁটা রক্তও ব্যয় করার অধিকার কারুর নেই।

যে কোন শয়তানী স্লোগান হঠাৎ করে যতই ফেনায়িত হয়ে উঠুক তা ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ শুধু চিরস্থায়ী। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে [১৯৬৫-৬৬] আরব বিশ্বের গোটা দিগন্ত আঁধার করে জাহেলিয়াতের এক প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। তখন এমন এক ব্যক্তির আকস্মিক অভ্যুদয় ঘটেছিল যে, তার যাদুময়ী ব্যক্তিত্ব দ্বারা লক্ষ লক্ষ আরব তরুণকে মোহান্ধ করে ছেড়েছিল। কিন্তু অল্প ক'দিনের মধ্যেই বুদ্‌বুদের মতো সব কিছু মিলিয়ে গেল। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরই নামই কেবল সমুন্নত থাকল। বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববী ও কিতাবুল্লাহ্ তেমনি অম্লান থেকে গেল। মাঝখানে সে নিজে নিক্ষিপ্ত হলো ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। কেননা বাতিলের তেলেসমাতি খুবই ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামই শুধু কিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত থাকবে। সুতরাং হে বন্ধুগণ! ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর ওপর গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ইসলামের 'নারা' ছাড়া অন্য কোন স্লোগান যেন আপনাদের মন-মগজ আচ্ছন্ন করতে সক্ষম না হয়। কেবল কা'বাকেন্দ্রিকই যেন হয় আপনাদের জীবনের পরিক্রমা। ইসলামের প্রতি অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ হচ্ছে ইসলামের রজ্জুকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। আল্লাহ্‌র দরবারে আমি সকাতর প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাদের, আমাদের ও সকল মুসলমানের দিল ও ঈমানের হিফাযত করুন! আল্লাহুম্মা আমীন!

# প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার বিজয়

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সম্মানে প্রদত্ত ১৩ মার্চের ভোজসভার ভাষণ। উল্লেখ্য, উক্ত ভোজসভায় দেশের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিবর্গ , সাংবাদিক, লেখক, গবেষক ও চিন্তাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।]

হামদ ও সালাতের পর।

জনাব মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

আজকের ভোজসভা উপলক্ষে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিবর্গ, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও বিদগ্ধজনদের এই মহতী সমাবেশে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও অভিভূত। বস্তুতপক্ষে আমার জন্য এটাই উচিত ছিল, আমি নিজেই ঘরে ঘরে গিয়ে বন্ধুদের সাথে মিলিত হব এবং হৃদয়ের কিছু কথা তাঁদের খিদমতে হাদিয়ারূপে পেশ করব। কিন্তু এতো বড় শহরে এই সংক্ষিপ্ত সফরে একজন মুসাফিরের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। তাই আমি জনাব আবুল ফায়েদ মুহম্মদ ইয়াহিয়া সাহেবের শুকরিয়া আদায় করছি, ভোজসভা উপলক্ষে এমন সুবর্ণ সুযোগ তিনি আমাকে দান করেছেন। এছাড়া এক জায়গায় এক সাথে এত বিরাট সংখ্যক দ্বীনী ভাইদের সাথে একত্র হওয়ার সৌভাগ্যও হয়তো আমার হতো না।

আমি আপনাদের সামনে অসংকোচে স্বীকার করছি, এই মুহূর্তে বাংলা ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আমার অন্তরে অনুশোচনা হচ্ছে। আজ আপনাদের সাথে আপনাদের ভাষায় হৃদয়ের ভাব বিনিময় করতে পারলে আমার আনন্দের সীমা থাকত না। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহ্‌র দান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এই মহান দান ও ইহ্‌সানের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কোন মানবীয় দুর্বলতা হিসাবে নয়, বরং প্রশংসা ও গুণরূপেই মানব জাতির ভাষাগত বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ -

"আকাশ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা, বর্ণ ও বৈচিত্র্য তাঁরই নির্দশনসমূহের কয়েকটি। জ্ঞানীদের জন্য এতে চিন্তার খোরাক রয়েছে।"

[সূরা রূম ঃ ২২]

এটা কোন দোষের কথা নয়। কোন দুর্বলতা নয়। আর বাংলা ভাষাতো মুসলমানদেরই ভাষা। মুসলমানদের হাতেই এর জন্ম, প্রতিপালন ও সমৃদ্ধি। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন, আরবী বর্ণমালাই ছিল বাংলা ভাষার আদি বর্ণমালা। সর্বোপরি বাংলা ভাষা আজ জ্ঞান ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই বিরাট ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এই উপমহাদেশের একজন বাসিন্দা হিসাবে, সর্বোপরি একজন মুসলমান হিসাবে বাংলা ভাষার সাথে পরিচয় থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। আজ যদি বাংলা ভাষায় আমি আপনাদের সম্বোধন করতে পারতাম তাহলে সেটা আশ্চর্যের কোন বিষয় হতো না। কিন্তু এটা আমার দুর্বলতা, আমার ত্রুটি, আপনাদের সাথে আপনাদের প্রিয় ভাষায় আমি কথা বলতে সক্ষম নই। অবশ্য এর একটা যুক্তিসংগত বিকল্প পন্থা এই হতে পারত যে, আরবী ভাষায় আমি আমার বক্তব্য পেশ করতাম আর আপনারা তা বুঝে যেতেন। কেননা আরবী হচ্ছে ইসলামী উম্মাহ্র সরকারী ভাষা। ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে প্রিয় ও পরিচিত ভাষা।

প্রিয় সুধীবৃন্দ! পীর-আওলিয়া ও উলামা-মাশায়েখের এ পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করার সাথে সাথেই আমার অন্তর পুলকিত ও ভাবে তন্ময় হয়ে আছে। আমি মূলত ইতিহাসের ছাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস, এই ভূখণ্ডে ইসলামী উম্মাহর এই বিরাট জনসংখ্যার উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে নিস্বার্থ মানব প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ফসল। যদি রাজনৈতিক স্বার্থের আবর্জনামুক্ত ইখলাস, মুহব্বত ও আল্লাহর দাসত্ব ও মানব প্রেমের মতো মহান গুণাবলী না হতো তবে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহতে বিশ্বাসী একজন মুসলমানের অস্তিত্বও কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। একজন সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করাও আজ আমাদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হয়, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষগণ কত সহজেই না লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন! ঈমান ও ইখলাসের আলো জ্বেলে শতাব্দীর অন্ধকার মুহূর্তে দূর করে দিয়েছিলেন।

ভূস্বর্গরূপে পরিচিত গোটা কাশ্মীর ভূখণ্ডই হযরত আমীর-ই- কবীর সৈয়দ আলী হামদানীর প্রেম ও ভালোবাসার ফসল। আল্লাহর এই প্রেমিক বান্দা ইরান থেকে এলেন। কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আস্তানা গাড়লেন। আর দেখতে

দেখতেই ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরীর হৃদয় জয় করে নিলেন। অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত দলে দলে ছুটে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করে নিল। তাদের হৃদয়ে ঈমান ও ইখলাস এবং প্রেম ও পুণ্যের এক অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠল। এটা ছিল ইখলাস, আধ্যাত্মিকতা ও আবদিয়াত তথা আল্লাহ্র প্রতি দাসত্ববোধ ও মানব প্রেমেরই বিজয়।

আল্লাহর দাসত্ব ও মানব প্রেম যখন সম্মিলিত হয়, এই দুটি উচ্ছল নদীর স্রোতধারার যখন সংগম ঘটে, একজন মানুষ যখন আল্লাহর দাসত্ব ও মানব প্রেমের শীতল স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহন করে পূত পবিত্র হয়ে ওঠে তখন তার বিজয় ও অগ্রযাত্রা হয় অপ্রতিরোধ্য। ঈমানের নূরের রেখা তখন অন্ধকারের বুক চিরে মানুষের হৃদয় রাজ্যের পানে নিজেই নিজের পথ করে নেয়। আল্লাহ্র দাসত্ব ও মানব প্রেম এমনি এক মহাশক্তি যে, দেশের পর দেশ লুটিয়ে পড়ে তার পায়ে। পাষাণ হৃদয়ও মুহূর্তে বিগলিত হয়ে যায়। সেখান থেকেও তখন উৎসারিত হয় প্রেম ও বিশ্বাসের স্বচ্ছ সুনির্মল ঝরনাধারা। কেননা প্রেম এক মিলনাত্মক শক্তি। অতীতের মতো আজো পৃথিবীর যাবতীয় বিপদ ও সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইখলাস ও আধ্যাত্মিকতা এবং নিঃস্বার্থ মানব প্রেম ও মানব সেবা।

এই পূর্ববঙ্গেও অনেক ওলী-দরবেশ ও জীর্ণ বস্ত্রধারী আল্লাহ্র অনেক প্রেমিক পুরুষ এসেছিলেন। শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত আদম সন্তানদের ভালোবেসে তাঁরা বুকে তুলে নিয়েছিলেন। এদেশের স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা আদম সন্তানদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। একদল হলো মানুষ, আরেক দল হলো সেই সব হতভাগ্য আদম সন্তান যাদের সাথে যে কোন ধরনের পাশবিক আচরণই ছিল পুণ্যের কাজ। বস্তুত পশুর চেয়েও নীচে ছিল তাদের সামাজিক অবস্থান। কুকুরের স্পর্শে মানুষ অপবিত্র হতো না, কিন্তু অদৃশ্য আদম সন্তানদের ছায়া মাড়ালেও স্নান করে পবিত্র হতে হতো। সেই অধঃপতিত আদম সন্তানদের কাছে আল্লাহর প্রেমিক বান্দারা এসেছিলেন ইসলামের পয়গাম নিয়ে, তাওহীদের বাণী নিয়ে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের বার্তা বহন করে।

আরবদের মতো সাম্প্রদায়িক ও ভাষাগত উন্নাসিক জাতির দ্বিতীয় কোন নযীর মানব জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের এই জাতীয় উন্নাসিকতা এত প্রকট ছিল যে, অন্যান্য জাতিকে আজমী (বাকশক্তিহীন) নামে অভিহিত করত। আরবী ভাষার মোকাবেলায় পৃথিবীর অন্য কোন ভাষাকে তারা

সত্যের ভাষা চিরন্তন ও শাশ্বত। সব দেশে সব কালে তা একই রকম বোধগম্য; এমন কি এজন্য কোন দোভাষীরও প্রয়োজন হয় না। চোখের মমতাসিক্ত স্নিগ্ধ চাহনি, মুখের শুভ্র মধুর মৃদু হাসি ও হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত প্রেম ও ভালবাসার ঝর্ণাধারা পাষাণহৃদয় শত্রুকে, এমন কি বনের হিংস্র নেকড়েকেও বশীভূত করে ফেলতে পারে এক মুহূর্তে। প্রেম ও ভালোবাসার বিজয় এমনি অপ্রতিহত, অপ্রতিরোধ্য।

আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনারা শুধু ঢাকার নয়, গোটা বাংলাদেশের মেধা ও হৃৎপিণ্ড এই সভায় একত্র হয়েছেন। আপনাদের এ মোবারক সমাবেশ দেখে আমার অন্তরে এই আশার সঞ্চার হয়েছে, যে দেশে এতো বিপুল সংখ্যক ইসলামের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ রয়েছেন, যে দেশের মানুষের মনে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা এতো গভীর যে, এক পরদেশী ভাইয়ের হৃদয়ের ব্যথামিশ্রিত কথা শোনার জন্য নিজেদের সকল প্রকার ব্যস্ততা বিসর্জন দিয়ে ছুটে আসতে পারেন, ইসলামের সাথে সে দেশের হৃদয় ও আত্মার বন্ধন কখনও শিথিল হতে পারে না। মান ও পরিমাণ (Quality & Quantity) উভয় বিচারেই আজকের এ সভা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্‌ পাকের রহমতের ওপর ভরসা রেখে পরম নির্ভরতার সাথে আমি এ মজলিসে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, ইনশাআল্লাহ্‌! আপনাদের মতো নিবেদিতপ্রাণ বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ জনদের উপস্থিতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক কোনদিন শিথিল হবে না, দিন দিন তা বরং বৃদ্ধিই পাবে।

আমাকে আপনারা অত্যন্ত মূল্যবান উপহার দিয়েছেন, এক স্থানে একই সাথে বাংলাদেশের নির্বাচিত ব্যক্তিদের সম্বোধন করার যে সুযোগ দান করেছেন তার চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারত!

সুধীবৃন্দ! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি অনুভব করছি আমার বক্তব্য বেশ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এ অনুভূতিও আমার রয়েছে, আমি ভোজসভায় আপনাদের সাথে কথা বলছি। বন্ধুগণ! ভোজসভা হয়ত কপালে আরো জুটবে। কিন্তু আপনাদেরকে এভাবে এক সাথে আমি আর কবে কোথায় পাব।

আমি আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই এবং এটা কোন তোষামোদ কিংবা চাটুকারিতা নয়, কর্মের ময়দানরূপে আপনাদেরকে আল্লাহ পাক এমন এক সরল কোমল মনের অধিকারী, ধর্মপ্রাণ ও ইসলামের প্রতি অনুগত জনশক্তি দান করেছেন যা ইসলামী বিশ্বের খুব কম দেশেই আমি দেখেছি। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি আপনাদের খিদমতে আরয করছি, এ

নিয়ামতের যথাযোগ্য কদর আপনাদের করা উচিত। ঝানু রাজনীতিবিদ কিংবা জাদরেল কূটনীতিবিদের খোঁজ আপনি পৃথিবীর অনেক দেশেই পাবেন। বিস্ময়কর প্রতিভাবান লোকেরও হয়ত কমতি হবে না। কিন্তু ইখলাস, মুহব্বত, সরলচিত্ততা ও হৃদয়ার্দ্রতা সবখানে আপনি খুঁজে পাবেন না। সৌভাগ্যের বিষয়, আপনাদের দেশে এগুলো পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। এগুলো আপনাদের আগে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। এমন মূল্যবান সম্পদের এমন নির্দয় অপচয় কিছুতেই মার্জনীয় হতে পারে না।

একবার আমি TORONTO-তে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাকে NIAGARA FALL দেখতে নিয়ে যাওয়া হলো। এটা নাকি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি!

কয়েক হাজার 'ফিট' উচ্চতা থেকে প্রবল বেগে প্রচণ্ড শব্দে অনবরত পানি নেমে আসছে। সে এক আজব ব্যাপার! পৃথিবীর সব দেশ থেকেই পর্যটক দল এই জলপ্রপাত দেখতে যায়। আমিও গিয়েছিলাম। আচ্ছা, বলুন তো! এই বিশাল জলপ্রপাত থেকে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা না হয় কিংবা সেচ ও কৃষি কাজে তা ব্যবহৃত না হয়, তবে কি একে এক বিপুল সম্ভাবনাময় সম্পদের অপচয় বলে গণ্য করা হবে না। মনে রাখবেন, তদ্রূপ আপনাদেরকেও আল্লাহ্ পাক প্রবল শক্তিধর এক জলপ্রপাত দান করেছেন। সেটা হলো ঈমান ও ইখলাসের জলপ্রপাত, প্রেম ও সত্যের জলপ্রপাত যা আমি এ জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। এ জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করুন। দেখবেন যে সব সমস্যা আজ জটিল ও সমাধানের উর্ধ্বে বলে মনে হচ্ছে, এক নিমিষেই তার সরল সমাধান হয়ে যাবে। আমি আবার বলছি, কর্মের ময়দানরূপে এক সম্ভাবনাময় জাতি আপনাদেরকে দান করা হয়েছে। কর্মের এমন সর্বোত অনুকূল ময়দান আমি পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখেছি। এ জাতি থেকে যে কোন কাজ আপনারা নিতে পারেন। তবে এটা পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের কাজ নয়। এ হচ্ছে ঈমান, বিশ্বাস, ইখলাস ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের কাজ, আপন জাতিকে যারা কল্যাণকর কিছু দেয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, অথচ প্রতিদানের প্রত্যাশী নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি লাভই যাঁদের চরম ও পরম লক্ষ্য, এ জাতিকে তারা পরশ পাথরে পরিণত করতে পারেন। আমি সম্ভাবনার এমন আলোক-রশ্মি দেখতে পাচ্ছি, এ জাতি একদিন শুধু বাংলাদেশেই নয়, বরং গোটা আলমে ইসলামীতে এক নতুন শক্তির সঞ্চার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ মনোরম স্বপ্নের বাস্তবায়ন শুধু তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত উপরিউক্ত নিয়ামতগুলোর কদর করব। সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করব। এ জাতি মহাশক্তিধর এক জলপ্রপাত!

একে আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করুন। দীর্ঘ দিন থেকে এ বিপুল সম্ভাবনাময় সম্পদের অপচয় হয়ে আসছে এবং এখনো হচ্ছে। এ প্রবহমান জলপ্রপাত থেকে যদি সঠিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় তবে শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশই নয়, গোটা আরব বিশ্বও সে আলোর স্নিগ্ধ পরশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে।

আমি আবার বলছি, এ জাতির আপনারা যোগ্য মর্যাদা দিন। প্রবীণ ও নবীনদের মাঝে এবং আলেম সমাজ ও আধুনিক শিক্ষিত সমাজের আজ যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে, ক্রমশ যে ব্যবধান বিস্তৃত হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব তা অপনোদন করুন। উভয়ের মাঝে সেতু-বন্ধন রচনা করুন এবং পরস্পর পরিচিত হোন; আলিঙ্গনাবদ্ধ হোন। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কেবল এ দেশকে, এ জাতিকে অফুরন্ত ঈমানী শক্তির আধার ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহ্র পতাকাবরদাররূপে গড়ে তুলতে পারে। আপনারা ইসলামী উম্মাহ্র দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিবার। এ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকেই স্ব স্ব দায়িত্ব, শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন হতে হবে।

অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি আবারো আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, নতুন শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাকে আপনারা ওয়াকিফহাল করেছেন। এক নতুন আশাবাদের দোলায় আমার হতাশ হৃদয় আবার সজীব হয়ে উঠেছে। ইসলামী বিশ্বের ঘটনাবলী, লেবাননের মর্মান্তিক পরিণতি, ইরাক-ইরান ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, আরব জাহানের সম্পদ মোহ ও বিলাসপ্রিয়তা, সর্বোপরি ইসলামী উম্মাহ্র চরম নির্লিপ্ততা আমার হৃদয়ে বারবার যে রক্ত ক্ষরণ ঘটাচ্ছে তাতে আপনারা আজ কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও শীতল প্রলেপ দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, এখনো ইসলামের সৌভাগ্য তারকা আলো বিকীরণ করতে পারে। কে বলতে পারে, এখান থেকেই হয়ত শুরু হবে ইসলামী পুনর্জাগরণের বিজয় যাত্রা!

একজন উপমহাদেশীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসাবে (যেমন আমার পরিচয় দেয়া হয়েছে) আমি দেখতে পাচ্ছি, অযাচিতভাবেই প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা আল্লাহ্ পাক আপনাদের দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! কোন কিছুরই অভাব আপনাদের মধ্যে নেই। এখন প্রয়োজন শুধু ইসলামের বন্ধনকে অন্য সকল বন্ধনের ওপর প্রাধান্য দেয়া। কোন শ্লোগানই যেন ইসলামের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে না পারে! আল্লাহর সাথে হতে হবে আমাদের আসল সম্পর্ক। সকলকেই একদিন সেখানে ফিরে যেতে হবে। ঈমান, বিশ্বাস, ইখলাস ও আমল ছাড়া কোন কিছুই কাজে আসবে না সেদিন।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই আমাদের হৃদয়ে থাকবে প্রেম ও মমতা । পৃথিবীর সব ভাষার প্রতি থাকবে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ। দেশের ও মায়ের ভাষাকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা আমাদের সব কিছু উজাড় করে দেব। কিন্তু কোন ভাষার প্রতিই আমাদের ঘৃণা থাকবে না। আমি তো এতদূর পর্যন্ত বলতে চাই, আপনারা হিন্দুস্তানে আলেম সাহিত্যিকদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করুন যারা হিন্দুস্তানীদেরকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত করার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করবেন। গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ভাষাভিত্তিক উন্নাসিকতার সাথে ইসলামের ইতিহাস পরিচিত নয়। মুসলমানগণ সব ভাষাই শিক্ষা করেছেন। সব ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। সারগর্ভ ইসলামী সাহিত্য দ্বারা একেকটি ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। ফারসী ভাষার কথাই ধরুন। অগ্নিপূজকদের পশ্চাৎপদ ভাষা ছাড়া তার স্বতন্ত্র কোন পরিচয় ছিল না। ইসলামই তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। গতি ও উচ্ছলতা দান করেছে। ফারসী সাহিত্যের অমর পুরুষ শেখ সাদী, হাফিজ, সিরাজী, জালালুদ্দীন রুমী—এঁরা ইসলামেরই ফসল। অন্য ভাষার ইতিহাস পড়ে দেখুন, একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন সেখানেও।

এদেশে যে প্রতিষ্ঠানটি আমাকে সবচেয়ে বেশী আশান্বিত করেছে তা হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যেমন ব্যাপক, সম্ভাবনাও তেমনি বিপুল। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধিজীবী ও আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের প্রতিটি শাখায় পর্যাপ্ত সাহিত্য গড়ে তোলা। ভাষা, রচনাশৈলী, আঙ্গিক, উপস্থাপন ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সাহিত্যকে হতে হবে মানোত্তীর্ণ ও আকর্ষণীয় যেন সহজেই তা পাঠকচিত্ত জয় করে নিতে পারে এবং সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক পথের নির্দেশনা দিতে পারে। আমার দৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠান এদেশের ইসলামী পুনর্জাগরণের সোনালী ভবিষ্যতেরই এক পূর্বাভাষ।

এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং সর্বশেষ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে আবারো মোবারকবাদ জানাচ্ছি যার ব্যবস্থাপনায় আজ এ সুবর্ণ ও ঐতিহাসিক সুযোগ আমি লাভ করেছি।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন!

# বাংলা ভাষার নেতৃত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

[১৪ মার্চ ১৯৮৪ জামিয়া-ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট আলেম, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। ভূমিকাতে হিন্দুস্তানী উলামাদের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ও তার ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তিনি মূল বক্তব্যে ফিরে যান।]

উপস্থিত আলেম-ওলামা, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও আমার প্রিয় বন্ধুগণ!

আপনাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে দেশ জাতির প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আপনারা এ জাতির ঈমান ও বিশ্বাসের অতন্দ্র প্রহরী। ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন বিন্দুমাত্র শিথিল না হয় সে ব্যাপারে আপনাদেরকে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। যে দেশ ও যে জাতির জন্য আল্লাহ পাক আমাদের নির্বাচিত করেছেন তাদের ব্যাপারে অবশ্যই আপনাদেরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামের সাথে এ দেশের সম্পর্ক যদি বিন্দুমাত্র শিথিল হয় কিংবা অনৈসলামী কার্যকলাপ ও ইসলামবিরোধী তৎপরতা শুরু হয়, তবে মনে রাখবেন, রাসূলের ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হিসাবে আপনাদেরকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে ঃ রাজনৈতিক কর্ণধাররা জিজ্ঞাসিত হবেন কিনা প্রশ্ন এখানে নয়। কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, সর্বপ্রথম আলেমদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে। তোমাদের চোখের সামনে আমার রেখে আসা দ্বীনের এমন অসহায় অবস্থা কিভাবে হতে পারল? কোন্ মুখ নিয়ে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ? প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহ বলেছিলেন, আমি বেঁচে থাকতে দ্বীনের কোন অঙ্গহানি ঘটবে এটা কি করে হতে পারে?

এই মুহূর্তে আপনাদেরকে খুঁটিনাটি মতপার্থক্য শিকেয় তুলে রেখে এক বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এই মুহূর্তে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ পথ নির্দেশনার বড় প্রয়োজন ইখলাস, আত্মত্যাগ, প্রেম ও নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত করুন যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে যাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে। এ যুগে শাসন ক্ষমতা লাভের

জন্য অপরিহার্য জ্ঞান, দক্ষতা ও উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সে অংশটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তাদেরকে তাদের ভাষায় বোঝাতে হবে। আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস যেন থাকে, আপনারা নিঃস্বার্থ ও প্রকৃতই কল্যাণকামী। তাদের কাছে যেন আপনাদের কোন প্রত্যাশা না থাকে। বিভিন্ন প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে। এ এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা! নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর তখন অটল অবিচল থাকতে হবে। কেননা আপনাদের বিনিময় আল্লাহর হাতে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির দিকে আমি আপনাদের সযত্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো এদেশের ভাষা (বাংলা ভাষা)-কে আপনারা অস্পৃশ্য মনে করবেন না। বাংলা ভাষা ও তার সাহিত্য-চর্চায় কোন পুণ্য নেই, যত পুণ্য সব আরবী আর উর্দুতে, এ ধারণা বর্জন করুন। এটা নিছক মূর্খতা। নিজেদেরকে বাংলা ভাষার বিরল প্রতিভারূপে গড়ে তুলুন। আপনাদের প্রত্যেককে হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক, সাহিত্যিক ও বাগ্মী-বক্তা। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা, লেখনী হতে হবে রসসিক্ত ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী যেন আজকের ধর্মবিমুখ শিক্ষিত তরুণ সমাজ ও অমুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের লেখনী ছেড়ে আপনাদের সাহিত্যকর্ম নিয়েই মেতে ওঠে, বিভোর হয়ে থাকে।

দেখুন, একথা আপনারা লাখনৌর অধিবাসী, উর্দু ভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক ও আরবী ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এক ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আল-হামদুলিল্লাহ! আমার বিগত জীবন আরবী ভাষার সেবায় কেটেছে এবং আল্লাহ চাহেন তো বাকী জীবনও আরবী ভাষার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখব। আরবী ভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা, বরং আমি মনে করি, আরবী আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের কথা থাকুক। আল্লাহর শোকর, আমার বংশের অনেক সদস্যের ও আমাদের অনেক ছাত্রের সাহিত্য-প্রতিভাও খোদ আরব সাহিত্যিকদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

বন্ধুগণ! উর্দু ভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের খিদমতে যে তার যৌবন নিঃশেষ করেছে, সে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামবিরোধী শক্তির রহম-করমের ওপর ছেড়ে দেবেন না। "ওরা লিখবে আর আপনারা পড়বেন"—ঐ অবস্থা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করা উচিত নয়। মনে রাখবেন, লেখনীর

এক অদ্ভুত প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি আছে। লেখনীর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমন কি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মধ্যে সংক্রমিত হয়, অনেক সময় পাঠক হয়ত তা অনুধাবনও করতে পারেন না। ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের বিদ্যুৎ প্রবাহ। হযরত থানভী (রঃ) বলতেন ঃ পত্র যোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ বা পীর তাওয়াজ্জুহ্ সহকারে মুরীদকে লক্ষ্য করে যখন পত্র লেখেন তখন সে পত্রের অক্ষরে অক্ষরে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাব শক্তি। এ ব্যাপারে আমার বক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মাদের রচনাসম্ভার আজো মওজুদ রয়েছে। পড়ে দেখুন আপনার সালাতের প্রকৃতি বদলে যাবে। হয়ত পঠিত বইটির বিষয়বস্তুর সাথে সালাতের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তিনি যখন লিখছিলেন তখন তাঁর তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। এখন আপনি তাদের লেখনী পড়ে তারপর গিয়ে সালাত আদায় করুন। হৃদয় জাগ্রত ও অনুভূতি সচেতন হলে অবশ্যই আপনি উপলব্ধি করবেন, আপনার সালাতের অবস্থা ও প্রকৃতি বদলে গেছে। অনেকবারই আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। আপনি অমুসলমানদের লেখনী পড়বেন; তাদের রচিত গল্প, উপন্যাস ও কাব্যের রস উপভোগ করবেন এবং তাদের লিখিত ইতিহাস নির্দ্বিধায় গলাধঃকরণ করবেন, অথচ আপনার হৃদয়ে তার কোন দাগ কাটবে না, এটা কি করে হতে পারে? আপনার অবচেতন মনে হলেও 'লেখনী' তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেই। আমি মনে করি, আপনাদের জন্য এটা বড় লজ্জার কথা। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না, এ দেশ যে দেশে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক আলেমের জন্ম হয়েছে, সেখানে বাংলায় কুরআনের প্রথম তরজমাকারী হচ্ছেন একজন হিন্দু সাহিত্যিক।

এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকদেরকে বিশ্বের দরবারে আপনারা তুলে ধরুন, নজরুল ও ফররুখকে তুলে ধরুন, তাঁদের অনবদ্য সাহিত্যকর্মের কথা বিশ্বকে অবহিত করুন। নিবিষ্ট মন ও গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে তাঁদের সাহিত্য পড়ুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করুন এবং আল্লাহ তাওফীক দিলে আরবী ভাষায়ও তাদের সাহিত্য পেশ করুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাহিত্য প্রতিভার জন্ম এদেশে হয়েছে। তাঁদের কথা লিখুন, বিশ্বের কাছে তাঁদেরকে তুলে ধরুন। আল্লাহর রহমতে এমন কোন যোগ্যতা নেই যা আপনাদের দেয়া হয়নি। আমাদের মাদরাসাগুলোতে এমন অনেক বাংলাদেশী ছাত্র আমি দেখেছি যাদের মেধা ও প্রতিভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ষা জাগে। প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার

সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা তাদের মুকাবিলায় একেবারেই চুপসে যেত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেয়া হয়েছে। আমার এ ধারণাই ছিল না, এতো সুন্দর আরবী লেখার লোকও এখানে রয়েছে। কখনো হীনমন্যতার শিকার হবেন না। সব রকম যোগ্যতাই আল্লাহ আপনাদের দান করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না।

আমার কথা মনে রাখবেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। দু'টি শক্তির হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে ঃ অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে। অনৈসলামী শক্তি বলতে সেই সব নামধারী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের কথাই আমি বোঝাতে চাচ্ছি যাদের মন-মগজ ও চিন্তা ও কর্ম ইসলামী নয়। মোটকথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। এমন অনবদ্য সাহিত্য গড়ে তুলুন যেন অন্য দিকে কেউ আর ফিরেও না তাকায়। আল-হামদুলিল্লাহ! আমাদের হিন্দুস্তানী আলেমগণ প্রথম থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে সাহিত্য, কাব্য, কাব্য-সমালোচনা, ইতিহাসসহ সর্বত্র আজ আলেম সমাজের দৃপ্ত পদচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবীদার একেবারেই নিষ্প্রভ। একবার একটি প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় উর্দু সাহিত্য সাময়িকীর তরফ থেকে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীদের দায়িত্ব ছিল উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্বাচন। বিচারকদের দৃষ্টিতে পুরস্কার তিনিই লাভ করলেন যাঁরা মাওলানা শিবলী নো'মানীকে উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে প্রমাণ করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের ওপর কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন কিংবা সেমিনার হলে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, মাওলানা আবদুস সালাম নদভী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান কিংবা মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে। উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর দু'টি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সে দুটি হচ্ছে মওলভী মুহম্মদ হুসাইন আযাদ-এর "আবে হায়াত" ও আমার মরহুম পিতা মাওলানা সাইয়েদ আবদুল হাইকৃত "গুলে রানা" (কোমল গোলাপ)।

মোটকথা, হিন্দুস্তানে উর্দু সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেইনি। ফলে আল্লাহর রহমতে সেখানে একথা কেউ বলতে পারে না, মাওলানারা উর্দু জানে না কিংবা টাঁকসালী উর্দুতে তাদের হাত নেই। এখনও হিন্দুস্তানী আলেমদের মধ্যে এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন,

যাদের সামনে দাঁড়াতেও অন্যদের সংকোচ বোধ হবে। বাংলাদেশে আপনাদের তাই করা উচিত। আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন। দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ দেশের আলেম সমাজের জন্য জাতীয় আত্মহত্যারই নামান্তর।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমার এ দু'টি কথা মনে রেখো। এর বেশী কিছু আমি বলতে চাই না। প্রথম কথা হলো, এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব তোমাদের। ইসলামের সাথে এদেশের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই যেন শিথিল হতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের এই শত শত মকতব-মাদরাসা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমার কথায় দোষ ধরো না। আমি মাদরাসারই মানুষ , মাদরাসার চৌহদ্দীতেই কেটেছে আমার জীবন। আমি বলছি, আল্লাহ্ না করুন, ইসলামই যদি এদেশে বিপন্ন হলো তবে মকতব-মাদরাসার কোনই যৌক্তিকতা নেই। তোমাদের পয়লা নম্বরের কাজ হচ্ছে এদেশে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা। ইসলামের সাথে জাতির সম্পর্ক অটুট রাখা। দ্বিতীয় কথা হলো, যে কোন মূল্যে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব ও সঠিক পথ-নির্দেশনা নিজেদের হাতে নিতে হবে। আর তা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য অর্জন ছাড়া কখানো সম্ভব নয়। গতকালও আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় বলেছি, আমার খুবই আফসোস হচ্ছে, আমি আপনাদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলতে সক্ষম নই। আপনাদের ভাষায় আপনাদের সম্বোধন করতে পারলে আজ আমার আনন্দের সীমা থাকত না। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ভাষাই বিদেশী কিংবা পর নয়। পৃথিবীর সকল ভাষাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং প্রতিটি ভাষারই রয়েছে নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য। ভাষা বিদ্বেষ হলো জাহেলিয়াতেরই উত্তরাধিকার। কোন ভাষা যেমন পূজনীয় নয়, ঘৃণ্যও নয়। একমাত্র আরবী ভাষাই পেতে পারে পবিত্র ভাষার মর্যাদা। এছাড়া পৃথিবীর আর সব ভাষাই সমমর্যদার অধিকারী। মানুষকে আল্লাহ পাক বাকশক্তি দিয়েছেন এবং যুগে যুগে মানুষের মুখের ভাষা উন্নতি ও সমৃদ্ধির বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করে বর্তমান রূপ ও আকৃতি নিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। মুসলমান প্রতিটি ভাষাকেই মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কেননা মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পৃথিবীর সকল ভাষাই আমাদেরকে সাহায্য করে। প্রয়োজনে যে কোন ভাষা শিক্ষা ইসলামেরই নির্দেশ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রা.)-কে হিব্রু ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, অথচ হিব্রু হচ্ছে নির্ভেজাল

ইহুদী ভাষা। দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমরা যদি উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকি তবে তা স্বাভাবিকভাবেই অনৈসলামী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ফলে যে ভাষা ও সাহিত্য হতে পারত ইসলাম প্রচারের কার্যকর মাধ্যম তাই হয়ে দাঁড়াবে শয়তানের শক্তিশালী বাহন। আপনাদের এখানে কলকাতা থেকে অশ্লীল সাহিত্য আসছে। সাহিত্যের ছদ্মাবরণে কমিউনিজমের প্রচার চলছে। ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের মাল-মশলা তাতে মেশানো হচ্ছে। আর সরলমনা তরুণ সমাজ গোগ্রাসে তাই গিলছে। এর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না।

ভাইসব! আপনারা তিরমিযী, মিশকাত কিংবা মিযানের শরাহ্ লিখতে চাইলে তা আরবী-উর্দুতে লিখুন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জনগণকে বোঝাতে হলে জনগণের ভাষাতেই কথা বলতে হবে। আমি আপনাদের খিদমতে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, পাক-ভারতে হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহশাস্ত্রেরও ওপর এ পর্যন্ত অনেক কাজ হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাখ্যা গ্রন্থও লেখা হয়ে গেছে। সেখানে নতুন সংযোজনের বিশেষ কিছুই নেই। আপনাদের সামনে এখন পড়ে আছে কর্মের এক নতুন বিস্তৃত ময়দান। দেশ ও জাতির ওপর আপনাদের নিয়ন্ত্রণ যেন শিথিল হতে না পারে, আপনাদের দেশের মানুষ যেন মনে না করে, দেশে থেকেও আপনারা বিদেশী। স্বদেশের মাটিতে এই প্রবাস জীবন অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখবেন, এদেশের মাটিতেই আপনাদের থাকতে হবে এবং এদেশের জনগণের মাঝেই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। এ দেশের সাথেই আপনাদের ভাগ্য, আপনাদের ভবিষ্যত জড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন ঃ

ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم
هذافى بلدكم هذا فى شهركم هذا الا فليبلغ الشاهد الغائب

"হে মুসলমানগণ! তোমাদের খুন, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের আবরু-ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম।"

ভাষাগত পার্থক্যের কারণে কোন মুসলমান ভাইকে অপমানিত করা, তার ইয্যত-আবরু লুণ্ঠন করা কিংবা তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ অবৈধ, হারাম ও জুলুম।

قد جعل الله لكل شىء قدرا -

"প্রতিটি বস্তুর জন্য আল্লাহ পাক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ও স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" কোন মুসলমানের জন্য সে সীমা লংঘন করা বৈধ নয়। সাহিত্য

প্রতিভার বিকাশ ঘটাও, কাব্যের রস উপভোগ কর, কিন্তু অতিরঞ্জন করো না। কোরআন শরীফকেও যদি কেউ পূজা করা শুরু করে, উপাস্য জ্ঞানে তাকে সিজদা করে তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। কেননা ইবাদত শুধু আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। তবে সব ভাষাকেই স্ব স্ব মর্যাদায় রেখে মাতৃভাষাকে ভালোবাসা, স্বীয় অবদানে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অপরিহার্যও বটে।"

বন্ধুগণ! পরদেশী মুসাফির ভাইয়ের এ কথাগুলো যদি স্মরণ থাকে তবে একদিন না একদিন তার গুরুত্ব আপনারা অব্যশই উপলব্ধি করবেন।

فستذكرون ماأقول لكم وافوض امرى إلى الله - ان الله بصير بالعباد -

"তোমাদেরকে যে কথাগুলো আমি বলছি তা অদূর ভবিষ্যতে তোমরা স্মরণ করবে; আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্‌র হাতে সোর্পদ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সব কিছু দেখেন।"

আকাশের ফিরিশতারা শুনে রাখুক এবং "কিরামান কাতিবীন" লিখে রাখুক, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। আমি আবার বলছি, শেষবারের মত বলছি, তোমরা এদেশের মাটিতে যদি বাঁচতে চাও, ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাও, তবে এটাই হচ্ছে তার বিকল্প উপায়। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন!

# ইসলামের সাথেই এদেশের ভাগ্য জড়িত

[১৬ই মার্চ, ১৯৮৪ রোজ শুক্রবার ঢাকা জাতীয় মসজিদে বায়তুল মোকাররমে প্রদত্ত খোৎবা]

হামদ ও সালাতের পর।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا-وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا - وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

"তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে আর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যাতে তোমরা সরল পথ পেতে পার।" [আলে-ইমরান ঃ ১০৩]

প্রিয় ভাই সকল! আল্লাহ্ পাকের হাজার শোকর, তিনি এক জায়গায় একত্রে এতো অধিক সংখ্যক মুসলমানের মুখ দর্শনের সৌভাগ্য দান করেছেন!

এমন এক সময় ছিল যখন একজন মুসলমানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য চোখ তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকত। দুনিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, হাতের আঙ্গুলে তা গোণা যেত। আর আল্লাহ্‌র রহমতে পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা শত কোটিও ছাড়িয়ে গেছে। এই মোবারক মুহূর্তে দুনিয়ার কত লক্ষ মসজিদে আল্লাহর মুমিন বান্দাগণ আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হতে উপস্থিত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

আমাদের প্রত্যেকের এ অনুভূতি থাকা উচিত, আল্লাহ্ আমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন! বস্তুত কালেমার বড় সৌভাগ্য এবং ঈমান ও তাওহীদের সৌভাগ্যই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় ধন-দৌলত হাসিমুখে লুটিয়ে দেয়া যেতে পারে এ সৌভাগ্য লাভের মোকাবেলায়। ঈমান ও তাওহীদের মূল এমনই যে, কোন মুসলমানকে যদি বলা হয়, তোমাকে দশ দুনিয়ার সম্পদ দেয়া হবে যদি তুমি কালেমার বিশ্বাস প্রত্যাহার করে নাও, তবে সেই মুহূর্তে তার মুখ থেকে বুক ফাটা চিৎকার বেরিয়ে আসবে, হে দীন দুনিয়ার মালিক! কী আপরাধ করেছি যে শয়তানের লোলুপ দৃষ্টি আমার ঈমানের ওপর পড়ল?

তুরস্কের অভিশাপ কামাল আতাতুর্কের সময় আরবীতে আযান দেয়ার ব্যাপারে সরকারী বিধিনিষেধ জারী হয়েছিল। বাধ্যতামূলকভাবে তুর্কী ভাষায় আযান দিতে হতো। তুর্কী মুসলমানগণ আরবী ভাষায় আযান শোনার জন্য ছটফট করছিল। তুর্কীরা আমাকে জানিয়েছে, সরকারী বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পর প্রথম যখন আরবী ভাষায় আযান দেয়া হলো, মসজিদের মিনারে যখন ধ্বনিত হলো الله اكبر। আরবী আযানের সেই সুমধুর সুর মূর্ছনায় গোটা তুর্কী জাতি এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছিল যে, রাস্তায় নেমে এসে তারা উল্লাসে নৃত্য শুরু করে দিয়েছিল। হাজার হাজার দুম্বা এই খুশীতে যবাই করে ফেলেছিল যে, মৃত্যুর পূর্বে মদীনার ভাষায় মদীনার আযান শোনার সৌভাগ্য হলো। এখন আমরা নবীজীর সামনে গিয়ে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে দাঁড়াতে পারব। রাস্তায় রাস্তায় জনতার ঢল দেখে যে কোন পর্যটকের এ ধারণা হতে পারত যে, বুঝিবা তুর্কীরা সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছে!

কন্সটান্টিনোপলের বৃহত্তম মসজিদে জামে সুলায়মানীতে আমি সালাত আদায় করেছি, অন্যান্য মসজিদেও আমি গিয়েছি। সালাম ফিরিয়েই তুর্কীরা আরবী ভাষায় যে কথাটি বলে তা এই, الحمد لله على نعمة الاسلام "আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন, এখন তার প্রশংসা ও শোকর।" আমি বলছি না, আপনারাও তুর্কীদের অনুকরণ শুরু করুন। আলেমগণ কিছুতেই এতে অনুমোদন করবেন না.আমাদের । তাই বলা উচিত যা আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি তুর্কীদের এই সকৃতজ্ঞ অনুভূতিকেও আমি শ্রদ্ধা না করে পারি না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হও। ইসলামকে নিয়ে গর্ব করতে শেখো। যতদিন তোমরা ইসলামকে দুনিয়ার সকল সম্পদের ওপর প্রাধান্য দেবে, ইসলামের মোকাবিলায় সর্বস্ব বিসর্জন দিতে শিখবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ও তোমাদের দেশের ওপর আসমানের কল্যাণধারা বর্ষণ অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا -

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করো ঃ যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরে ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিলে, তখন তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।"

আল্লাহর অনুগ্রহ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করো। তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে, একে অন্যের খুন পিয়াসী ছিলে। فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। হৃদয়ে হৃদয়ে ভালোবাসার ফুল ফুটিয়েছেন। فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। বল, কোথায় এভাবে বড়-ছোট, আমীর-গরীব, রাষ্ট্রপ্রধান ও সাধারণ নাগরিক এক সাথে এক কাতারে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে শামিল হতে পারে? আল্লাহ্র ঘরে আসার পর মাহমুদ-আয়াযের সকল ব্যবধানই মুছে যায়। এখানে সাদা কালো সবাই ভাই ভাই। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যত বিরোধ ও লড়াই ছিল ইতিহাসের পাতায় আজ তার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই। ভাষা ও বর্ণের দ্বন্দ্ব, গোত্র ও সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব, ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, ভূস্বামী ও ভূমিহীনদের দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে গোটা পৃথিবী ছিল দ্বন্দ্বমুখর। মানুষের হাত লাল হতো মানুষেরই খুনে। মানুষের আহাজারি ও আর্তনাদ চাপা পড়ে যেত মানুষের নারকীয় উল্লাস ও অট্টহাসিতে فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই হলে। এরপর আল্লাহ এরশাদ করেছেন ঃ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে তোমরা উপনীত হয়েছিলে। আল্লাহ তা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। যদি আল্লাহর দীন অবতীর্ণ না হতো, যদি নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে প্রেরিত না হতেন, যদি আল্লাহ্র শেষ নবীর শুভাগমন না হতো তবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে আর কিছুই তো অবশিষ্ট

থাকত না। দেখুন, পৃথিবীর কত বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনায়ক আজ ঈমান ও তাওহীদের মতো সহজবোধ্য ও সাধারণ জ্ঞান (Common Sense)-টুকু থেকে বঞ্চিত, অথচ আমার আপনার মতো সাধারণ লোককে আল্লাহ্ ঈমানের দৌলত দান করেছেন। কোন দর্শন, কোন আন্দোলন ও কোন স্লোগানই যেন এ জাতির সামনে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে না দাঁড়াতে পারে। বোখারী শরীফের হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "কেউ যদি তিনটি বিষয়ের অধিকারী হতে পারে তবে বুঝতে হবে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথমত, আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলই তার কাছে পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। দ্বিতীয়ত, কুফরী জীবনে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক মনে হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলদেরই উত্তরাধিকার। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ط قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ـ

"ইয়াকূবের মৃত্যুর সময় তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিলেন, "আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?" তখন তারা উত্তরে বলল, "আপনার, ইব্রাহীমের, ইসমাঈলের ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করবো যিনি এক, অদ্বিতীয়।" [বাকারা ঃ ১৩৩]

মৃত্যুর সময় ইয়াকূব তাঁর সন্তানদের ডেকে বৈষয়িক কোন কথা বলেন নি। বলেন নি, অমুক স্থানে আমার অত সম্পদ গচ্ছিত আছে, অমুকের কাছে অত পাওনা আছে, তোমরা তা সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিও। এটা বলা অস্বাভাবিক কিংবা অন্যায় হতো না। তা না করে সন্তানদের ডেকে তিনি বললেন ঃ হে প্রাণাধিক পুত্রগণ! আমাকে একটা কথাই শুধু বলো ماتعبدون من بعدى আমার এ চোখ দুটো বন্ধ হওয়ার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তোমাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে না পারলে কবরেও আমার শান্তি হবে না। তারা উত্তরে বলল, আব্বাজান! আপনি এতটা পেরেশান কেন? ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলায়হিমুস সালামের পবিত্র রক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত। আমরা মরে যাওয়া পছন্দ করব কিন্তু মুহূর্তের জন্য শিরকের পাপ স্পর্শ সহ্য করব না। نعبد الهك واله ابائك আমৃত্যু আমার, আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষের মাবুদ আল্লাহ্র অনুগত থাকব। সন্তানদের এ উত্তর শুনে

তবে তিনি আশ্বস্ত হলেন। এই হওয়া উচিত প্রত্যেক মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। নিজের ও পরিজনদের ঈমানের হিফাজতের জন্য তাকে থাকতে হবে সদাসতর্ক, সদাসন্ত্রস্ত। সন্তান ও পরিজনদের শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে দিতে হবে যেন তার মৃত্যুর পরও তারা ঈমান ও তাওহীদের প্রতি অবিচল থাকতে পারে, সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত না হয়। প্রত্যেক মুসলমানকেই নিজের পরিজনদের ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা (Gurantee) লাভ করা অপরিহার্য। ঈমানের সাথে সাথে শিরক ও কুফরীর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের প্রতিও অন্তরে থাকতে হবে প্রচণ্ড ঘৃণা। শিরক ও কুফরীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ছাড়া ঈমান সর্বদা অরক্ষিত। এজন্য কুফরীর প্রতি ঘৃণা পোষণের কথা ঈমানের আগে উল্লিখিত হয়েছে فمن يكفربا لطاغوت ويؤ من باالله "যারা তাগুতেকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে।"

ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহর শোকর আদায় করুন। কত বড় দেশ আপনাদেরকে আল্লাহ দান করেছেন! এদেশ সম্পর্কে কুদরতের ফয়সালা এই, ইসলামের মাধ্যমেই এদেশ সম্মান ও গৌরব লাভ করবে, কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করবে। মসজিদে নববীর মিম্বরের প্রতিনিধিত্বকারী আপনাদের এ মসজিদের মিম্বরে বসে বলছি, এ দেশের সুখ-শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তা ইসলামের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ না করুন, যদি এ দেশ কখনো আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের ব্যাপারে কৃতঘ্ন প্রমাণিত হয়, ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে কিংবা এ দেশের মানুষ আল্লাহ্র রজ্জুকে ছেড়ে অন্য কোন রজ্জু আঁকড়ে ধরতে চায় তবে এ দেশের ধ্বংস অনিবার্য। কোন পরিকল্পনা, প্রকল্প ও বাইরের কোন সাহায্য ও ছত্রছায়াই এ দেশকে আল্লাহ্র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বন্ধুগণ! সেই সাথে এ কথাও মনে রাখবেন, মুসলমানদের কাছে আল্লাহর দাবী এই,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُدْخُلُوْا فِيْ السِّلْمِ كَافَّةً ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।" [বাকারা ২০৮]

মাথাকে মসজিদে গলিয়ে দিয়ে গোটা দেহ বাইরে রেখে দিলে একথা বলা যাবে না, আপনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন। তদ্রূপ আল্লাহ্ পাকেরও দাবী হলোঃ তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলাম প্রবেশ করো। আকীদা ও বিশ্বাস, ইসলামী আহকাম ও বিধি-বিধান, ইসলামী আইন ও সমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন—এক কথায় গোটা 'আল-ইসলামে'র কাছে নিঃশর্ত

আত্মসমর্পণ করতে হবে। একমাত্র তখনই শুধু আল্লাহ্র দরবারে আপনার ইসলাম গ্রহণ স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করবে। হযরত ইব্রাহীমের কাছে যখন আল্লাহর নির্দেশ এলো اسلم "হে ইব্রাহীম! পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করো।" তখন সাথে সাথেই তিনি বলে উঠলেন ঃ اَسْلَمْتُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র দরবারে আমি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম।" আপনাকেও আমাকেও ইব্রাহীমের মিল্লাতভুক্ত হওয়ার সূত্রে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্র রহমতের ছায়াতলে একবার আশ্রয় গ্রহণ করে দেখুন আকাশ থেকে নিয়ামত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা কিভাবে নেমে আসে।

وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ـــ

"বস্তিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিত তাহ্লে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বরকত ও প্রাচুর্যের দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিত।"

[আরাফ ঃ ৯৬]

আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, ইসলামের সাথে এ দেশের ও রাসূলে আরাবী সাল্লালাহু আলাইয়হি ওয়াসাল্লামের সাথে এ জাতির সম্পর্ক চিরঅটুট থাকুক! রিযিক, নিয়ামত, বরকত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা এ জাতির ওপর বর্ষিত হোক! সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা এখানে বিরাজ করুক! ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবাসা, সম্প্রীতি, আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করুক!

# বুদ্ধিবৃত্তিক স্বনির্ভরতা অর্জন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব

[১৯ শে মার্চ ১৯৮৪ ইং-তে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত সমাবেশে দেশের বুদ্ধিজীবী ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আল্লামা নদভীর প্রদত্ত ভাষণ।]

উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত পুলকিত ও আবেগাপ্লুত। আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো শোকর, আজকের এই মুবারক মজলিসের মাধ্যমে আমার দশ দিনব্যাপী বাংলাদেশের সফরের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটছে। সেই সাথে আজকের এই মজলিসে "খিদমতে খাল্‌ক" প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

প্রথমে আমি উপস্থিত লেখক বুদ্ধিজীবীদের খিদ্‌মতে অনুমতি হলে বলতে চাই, আমার সহকর্মী ও স্বগোত্রীয় বন্ধুদের খিদমতে একটি কথা আরয করতে চাই। সমগোত্রীয় এজন্য, আমিও আপনাদের মতো লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

আপনাদের সামনে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন কিংবা একটি ধাঁধা তুলে ধরতে চাই। আপনারা অবশ্যই জানেন, হিজরী সাত শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি নতুন শক্তিরূপে তাতারীদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। বর্বর তাতারীরা মধ্যেএশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাস করত। তাদের চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল ছিল খুবই সংকীর্ণ। হাজার বছর ধরে বদ্ধ জলাশয়ের মাছের মতো বিচ্ছিন্ন জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর এক সময় আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রকাশ ঘটল। বর্বর তাতার জাতি তাদের সংকীর্ণ পরিবেষ্টন ভেঙে-চুরে এক দুর্বার গতিতে বেরিয়ে এল। তখনকার ইসলামী সালতানাত বা মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল সুদূর বিস্তৃত, বিশেষত তুর্কিস্তানের খাওয়ারিযম শাহের সালতানাত ছিল তৎকালীন আলমে ইসলামীর বিশালতম সালতানাত। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তির মূলে পচন ধরে গিয়েছিল। সমাজের অধিকাংশ লোক হয়ে পড়েছিল অপরাধাসক্ত। সম্পদ, ক্ষমতা, বস্তুসভ্যতা ও সংস্কৃতির চোরা পথে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে। পক্ষান্তরে সভ্যতার আলোবঞ্চিত তাতারীরা ছিল একটি প্রাণবন্ত জাতি। নবুওতী পথ-

নির্দেশনা ও আসমানী শিক্ষার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না সত্য, তবে তাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কোন ব্যাধিও ছিল না যা তাদের জাতীয় শক্তি ও উদ্যমে অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অলস ও বিলাসী জীবনের প্রতি আসক্ত করে তুলতে পারে। এমন একটি প্রাণবন্ত জাতি যখন খাওয়ারিযম সালতানাতের ওপর আপতিত হলো তখন খাওয়ারিযম শাহের সুশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনী সে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে পারল না। মোটকথা, তাতারীদের মুকাবিলা ছিল এক জরাগ্রস্ত সালতানাত ও অপরাধাসক্ত জাতির সাথে। ফল এই দাঁড়াল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমন্বয়ে যে সালতানাত আলমে ইসলামের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা দেখতে দেখতেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। খাওয়ারিযম সালতানাতের পতনের পর আলমে ইসলামীতে এমন কোন শক্তি আর অবশিষ্ট ছিলো না যারা তাতারীদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রুখে দাঁড়াতে পারে। মুসলিম উম্মাহ্ তখন এমন হীনবল ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাতারীদের মনে করা হতো আসমানী মুসীবত এবং প্রায় প্রবাদ বাক্যের মত একথা ছড়িয়ে পড়েছিল–

اذا قيل لك ان التتر قد انهزموا فلا تصدقه -

সব কিছুই বিশ্বাস করতে পারো, তবে কেউ যদি বলে তাতারীরা মার খেয়েছে তবে সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করো না। আকাশ ভেঙে পড়া সম্ভব কিন্তু তাতারীদের পরাজিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই ছিল সমসাময়িক আলমে ইসলামীর বাস্তব চিত্র।

বন্ধুগণ! হয়ত কিছুটা বিরক্ত বোধ করছেন, আলেম ও বিজ্ঞজনদের এই ভাবগম্ভীর মজলিসে অসভ্য তাতারীদের প্রসঙ্গ টেনে আনার কী প্রয়োজন ছিল? বন্ধুগণ! একটি বিশেষ প্রয়োজনেই তাতারীদের আমি এখানে টেনে এনেছি এবং মুসলমান বানিয়েই এনেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে একটুখানি সময় দিন।

ইতিহাসের এক বড় জিজ্ঞাসা, তাতারী জাতি এক সময়ে গোটা আলমে ইসলামীকে পিষে মেরেছিল, সুদীর্ঘ ছয় শ' বছরের ঐতিহ্যবাহী হারুনূর রশীদের বাগদাদ যে তাতারীদের বর্বরতায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, দজলা নদীর পানি একবার মুসলমানদের রক্তে লাল আর একবার লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের কালিতে নীল হয়ে গিয়েছিল, সেই নিষ্ঠুর জাতি কোন্ আশ্চর্য উপায়ে অকস্মাৎ জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে বসল! এক সময় আলমে ইসলামীর জন্য যারা ছিল মূর্তিমান অভিশাপ, পরবর্তীকালে তারাই হলো ইসলামের মুহাফিজ, রক্ষক। কিভাবে এটা সম্ভব হলো? কি কি কার্যকারণ এর পেছনে সক্রিয় ছিল? কোন্ ঊর্ধ্ব শক্তি

ইসলামের সামনে এমন একটি নিষ্ঠুর ও শক্তিমদমত্ত জাতির মাথা নত করে দিয়েছিল? ইতিহাসের এটা একটা প্রশ্ন যার বস্তুনিষ্ঠ উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে।

এ অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনার পেছনের মূল কারণ ছিল দু'টি। প্রথমত ইসলামী উম্মাহ্র ওলী ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গগণ তাতার জাতির প্রতি তাদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। আল্লাহ্র দরবারে তারা প্রার্থনার হাত তুললেন। শেষ রাতে ব্যথিত হৃদয়ের আহাজারিতে আল্লাহ্র আরশ কাঁপিয়ে দিলেন। হিকমত, মহব্বত, প্রেম ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আহলুল্লাহ্ ও আল্লাহ্র ওলীদের উপরোক্ত কর্মতৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত জনৈক ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক তাঁর The preaching of Islam নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমি আমার "তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমত" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তা বিবৃত করেছি। অন্য একটি কার্যকারণও এর পেছনে সক্রিয় ছিল। সেই কার্যকারণটির সাথেই আজকের মজলিসের সম্পর্ক আর এজন্যই শুধু এ মজলিসে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

শক্তির সব কয়টি উপায়-উপকরণই তাতারীদের কাছে মজুদ ছিল। সামরিক শক্তি তথা মার্শাল স্পিরিটের কোন কমতি ছিল না। শৌর্যবীর্য ও রণকৌশলেরও অভাব ছিল না। কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সহজ সরল, বিলাসহীন জীবনেও তারা অভ্যস্ত ছিল পুরামাত্রায়। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের দৈন্য ছিল চরম। কোন লিটারেচার বা সাহিত্যসম্ভার ছিল না তাদের কাছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও কোন ধারণা ছিল না তাদের। ছিল না কোন উন্নত আইন ব্যবস্থা। যাযাবর জাতির মত গুটি কতক উদ্ভট আইন-কানুন ছিল তাদের সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ। এমন কি যে ভাষায় তারা কথা বলত সে ভাষায় কোন হস্তাক্ষর পর্যন্ত ছিল না তাদের কাছে। এক কথায় সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদার উপহারে সমৃদ্ধ মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর যখন তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা একেবারেই শূন্যহস্ত ছিল। তাদের কাছে না ছিলো ভাষা ও সাহিত্য, না ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি আর না ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যূনতম অনুশীলন। মুসলিম লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তারা তাদেরকে সাহিত্য দিলেন, কাব্য দিলেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করালেন আর শেখালেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। এভাবে গোটা তাতার জাতির ভেতর মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে ধীরে ধীরে গোটা জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিল অর্থাৎ একদিকে

আল্লাহর ওলী ও প্রিয় বান্দাগণ প্রেম, ভালোবাসা, ইখলাস ও নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে তাতার জাতির হৃদয় জয় করলেন। অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ তাদের মস্তিষ্ক জয় করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়াল, তলোয়ার কিংবা অস্ত্রের ধারই কোন জাতির ওপর, কোন জাতির জন্য বিজয় লাভের একমাত্র পথ নয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য লাভের মাধ্যমেও একটি জাতিকে অতি সহজেই গোলাম বানানো যেতে পারে। আর রাজনৈতিক গোলামীর চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক গোলাম কোন অংশেই কম নয়।

আমি আপনাদেরকে একথাই বলতে চাই, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে জাতি অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত সে জাতির অস্তিত্ব সর্বদাই বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন। বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে যারা নিজেদের চিন্তার খোরাক কিংবা সাহিত্যের মাল-মশলা সংগ্রহ করে, বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে দেওলিয়া জাতি কোন দিন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না। নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে উপরোক্ত জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধই তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মমতও গ্রহণ করে বসবে। মানব জাতির ইতিহাসে এমন উত্থান-পতনের ভূরি ভূরি নযীর রয়েছে।

আপনাদের খিদমতে আমি আরো আরয করতে চাই, আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন নি। নয়-দশ দিনের এ সংক্ষিপ্ত সফরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ভ্রমণকারী একজন সচেতন পর্যটকের দৃষ্টি নিয়ে এ জাতিকে আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এ প্রতীতি জন্মেছে, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, সরলতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, প্রেম ও হৃদয়ের উষ্ণতার দিক থেকে এ জাতি পৃথিবীর অন্য কোন জাতির চেয়ে পিছিয়ে নেই। এ জাতির মেধা ও বুদ্ধিমত্তা যেমন স্বচ্ছ, প্রেম ও ভালোবাসাও তেমনি গভীর, নিখাঁদ। কিন্তু সেই সাথে আমি এদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যদি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে আপনারা কোন জাতি কিংবা শ্রেণীর প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন, তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথেই আমাকে এ কথা বলতে হবে, জাতি হিসাবে যে কোন মুহূর্তে আপনাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা অর্জনও অপরিহার্য। এ ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। নিজেদের নেতৃত্ব নিজেদের হাতেই থাকা উচিত। আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলছি, অন্য কোন দেশের, এমন কি আপনাদেরই স্বভাষী, যারা কোন প্রতিবেশী দেশে বাস করে তাদেরও বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গোলামী করা উচিত নয়।

সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা সমুন্নত রাখুন। আর্থিক মাশুলের মত বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুলও মানুষকে আদায় করতে হয়। আর তা আর্থিক মাশুলের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর ও বেদনাময়। অতএব, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুল নিজেদের দেশেই আদায় করুন। নিকটতম দেশ কিংবা শহরেও তা পাচার হতে দেয়া উচিত নয়। এ দেশের অর্থ-সম্পদ বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর, বাইরের কোন সমাজ থেকে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পাচার হয়ে আসাও তেমনি ক্ষতিকর। হ্যাঁ, একমাত্র ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ওহীর অবতরণ ক্ষেত্র হারামাইন শরীফাইন থেকে ভাব, চিন্তা ও পথ-নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে উপমহাদেশীয় আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো থেকেও চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পাথেয় সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু চিন্তা, বিশ্বাস, ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে যাদের সাথে মৌলিক বিরোধ রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণ, সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ খুবই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে।

দু'টি পথে তাতারী জাতি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমত আধ্যাত্মিক পথে, দ্বিতীয়ত বুদ্ধিবৃত্তিক পথে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানগণই ছিল তখন শীর্ষ জাতি। মৌলিক গবেষণা, আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজকের ইউরোপ তখন ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব তখন এককভাবে মুসলমানদের হাতেই ছিল। সামরিক ও রাজনৈতিক বিচারে যদিও তারা ছিল বিজিত, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে তারাই ছিল বিজেতা আর তাতারীরা ছিল বিজিত। ফলে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিজয়ী জাতিকে মাথা নত করতে হয়েছিল বিজিত জাতির কাছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে আজ আমার সে আশঙ্কাই হচ্ছে। এক হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই ও কল্যাণকামী বন্ধু হিসাবে আপনাদের জন্য আমার পরামর্শ, নিজেদের সাহিত্য ও কাব্য নিজেরাই গড়ে তুলুন। সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতি গ্রহণ করুন এবং তার উৎকর্ষ সাধনে একনিষ্ঠ ও নিবেদিত হোন। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, জাতীয় কবি হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামকেই আপনাদের তুলে ধরা উচিত। নজরুলের কাব্য ও সাহিত্যকর্ম বিশ্ব-সাহিত্য সভায় তুলে ধরুন এবং নজরুলকে নিয়ে গর্ব করুন। আপনাদের নিজেদের ভিতরেও অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সে সব প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করুন। নিজেদের ভিতর থেকেই স্টাইলের জন্ম দিন। নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, এটা খুবই সংবেদনশীল ক্ষেত্র। এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। সাংস্কৃতিক জগতে আপনাদেরকে পূর্ণ

স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসাবে বলছি, এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আর ইতিহাসের প্রতিশোধ বড় নির্মম।

যে কারণে আপনাদের দেশ থেকে আমি আনন্দ ও আশাবাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি তা হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপস্থিতি। বস্তুতপক্ষে এটা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির জন্য নিজস্ব একাডেমী থাকা একান্তই অপরিহার্য। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎস স্বদেশের মাটিতে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বাইরে থাকাটা স্বাধীন জাতির জন্য আদৌ মর্যাদাজনক ও কল্যাণকর নয়। হিন্দুস্তান ও মিসরের মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ শুধু এই, তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উৎস ছিল ইউরোপে, কেম্ব্রিজে, অক্সফোর্ডে কিংবা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। বাইরে থেকে আপনারা যা খুশি আমদানী করুন, খাদ্য আমদানী করুন, বৈজ্ঞানিক উপকরণ , কলকজা ও কারিগরি বিদ্যা আমদানী করুন। কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও আদর্শ আমদানি করা বন্ধ করুন। বাংলাদেশের মত স্বাধীনচেতা জাতির জন্য নিজস্ব স্টাইল থাকা উচিত।

সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতির প্রচলন হওয়া উচিত। কলকাতা ও পশ্চিম বঙ্গ আপনাদের অনুকরণ করুক। আপনারা তাদের অনুকরণ করতে যাবেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আপনারা ইমাম হোন। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী কোন স্বাধীন জাতির জন্য মুকতাদী হাওয়া গর্বের কথা নয়। আপনাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব ইতিহাস। আপনাদের পক্ষে অন্য কোন জাতির দুয়ারে, আয়তন ও সংখ্যায় তারা যত বড়ই হোক, ধারনা দেয়া শোভনীয় নয়। প্রথম কাতারে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান আপনাদের জন্য নয়। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-কাব্য, এক কথায় বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যতদিন আপনারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন না করবেন, নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম না হবেন ততদিন আশ্বস্ত হওয়ার কোন উপায় নেই। যতদিন আমাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাঙ্গন আমাদের সামাজিক ও জাতীয় তথা ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে না আসবে, সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন না করবে ততদিন সেগুলোর ওপরও ভরসা করার উপায়ই নেই। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

আরেকটি কারণেও আমার মনে আজ আনন্দ ও আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। বিলম্বে হলেও খিদমতে খাল্‌ক বা আর্ত মানবতার সেবার গুরুত্ব আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সেজন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গতকাল সোনারগাঁয়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার সেবা, কার্যক্রম ও যাবতীয় ব্যবস্থা অবলোকন করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্টাফ সদস্যগণ ও স্থানীয় লোকজনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। গড়ে প্রতিদিন কতজন রুগী আসেন, কতজন রুগীকে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়, কি পরিমাণ ঔষধ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সত্যি এটা আল্লাহর বিরাট মেহেরবানী। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রের দিকে বিলম্বে হলেও আপনারা মনোযোগ দিয়েছেন যা এতোদিন খৃস্টান মিশনারীদের একচেটিয়া ময়দান মনে করা হতো। বস্তুত আর্ত মানবতার সেবার ছদ্মাবরণেই তারা এদেশের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বত্র আজ এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, মিশনারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের তুলনায় অধিক উন্নত ও সেবাধর্মী। যেহেতু তাদের মধ্যে মিশনারী মনোভাব থাকে সেহেতু চিকিৎসাপ্রার্থীদের সাথে তারা অত্যন্ত কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে। ফল এই দাড়াঁয়, মানুষ সেখানে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলেও তার আত্মা হয়ে পড়ে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত। অন্তত এ ধারণা নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়, আমাদের চেয়ে এরা অনেক ভালো লোক। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ আছে, আছে সহানুভূতিপূর্ণ কোমল হৃদয়। এটাও এক ধরনের রোগ। একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে আরো মারাত্মক ও ক্ষতিকর আরেকটি রোগ নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তাই আমি মনে করি যে, এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো আর্ত মানবতার সেবায় গোটা জাতির আত্মনিয়োগ করা। খিদমতে খাল্‌কের ইসলামী আদর্শ সমাজের বুকে পুনরুজ্জীবিত করা যাতে মানুষ নিজের ঈমান ও বিশ্বাসের হিফাজত করে সহজ উপায়ে সঠিক চিকিৎসা কিংবা অন্ততপক্ষে সহৃদয় পরামর্শ লাভ করতে পারে। এই মহান প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপস্থিত থাকতে পেরে আমি ও আমার সফরসঙ্গীরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

শুধু এ কথাই আমি আপনাদের বলব। প্রথমত শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তার রেযামন্দি লাভই যেন হয় আপনাদের যাবতীয় উদ্যোগ, আয়োজন ও কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ বিশ্বাস রাখবেন, আপনারা ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বরং আমার ফতোয়া এই, আপনারা ইবাদতে ও সর্বোত্তম ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

"দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট লাঘব করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কষ্ট লাঘব করে দেবেন।" আরো ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ পাক বান্দার সাহায্যরত থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে।" হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে, "কিয়ামতে আল্লাহপাক একদল লোককে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি অসুস্থ হয়ে ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসো নি।" তারা বলবেঃ হে মহামহিম আল্লাহ! আপনি কিভাবে অসুস্থ হতে পারেন? ইরশাদ হবে ঃ আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যদি তাকে দেখতে যেতে, তবে আমাকেও সেখানে দেখতে পেতে। বলুন, এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, সেবা ও চিকিৎসার সাথে প্রেম ও সহানুভূতিও যোগ করতে হবে। তবেই এ বিরাট পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে। এই দুর্বল মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ের কোমল মাটিতে ঈমান ও কল্যাণের বীজ বপন করে দিন, ইনশাআল্লাহ্ কোন একদিন তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অন্ততপক্ষে এ বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে হবে, আল্লাহই হচ্ছেন শেফা দানকারী। ঔষধ ও চিকিৎসক উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহ্র নির্দেশই ঔষধ তার ক্রিয়া করে। ঔষধের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এর পর যখন রুগী শেফা লাভ করবে তখন তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে। তার বিশ্বাসের ভিত মজবুত হবে।

আপনাদের সকলকে, বিশেষ করে সভাপতি সাহেব ও ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাদেরকে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। একটি সঠিক ও নির্ভুল ক্ষেত্র আপনারা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছেন। আপনাদের এ দূরদর্শিতা দেশ ও জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। এটা শুধু দেশের খিদমত নয়, দ্বীনেরও বিরাট খিদমত। আল্লাহ্ পাক এ প্রকল্পটিকে স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা দান করুন।

সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে একথাও বলব, অমুসলিম ভাইদের সাথেও সমান আচরণ করুন। এক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, এরা আল্লাহর বান্দাহ, আল্লাহই এদের সৃষ্টি করেছেন। এদের কোনরূপ কষ্ট লাঘব করতে পারলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং আমরা উত্তম বিনিময় লাভ করব। সেবার ক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমানের পার্থক্য করা উচিত হবে না, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মোট কথা, আপনার চিকিৎসা সহায়তা নিতে এসে সে যেন কোন রকম দ্বৈত আচরণ অনুভব করতে না পারে। আমাদের বোনেরাও সেবার ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদের হৃদয়ের স্বভাব কোমলতা এক মূল্যবান সম্পদ।

এমন কিছু তারা করতে পারেন যা পুরুষদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের হিন্দুস্তানে ও এখানেও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার বোনেরাও পর্দার পেছনে থেকে আমার কথাগুলো শুনছেন জানতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহপাক তাদেরকে সমাজ সেবায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন!

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ! আরেকটি বিষয় আরয করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আপনাদেরকে মিসরবিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবন আস (রা.)-এর একটি ঐতিহাসিক বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তখনকার দুনিয়ার মিসরের অবস্থান ছিল তাহযীব-তমদ্দুন ও সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে। নীল নদীবিধৌত মিসর ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামল ভূখণ্ড। এমন একটি সমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ জয় করার পরও কেন জানি হযরত আমর ইবন আস (রা.) কোন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। একজন বিজয়ী সেনাপতির মনে যে স্বাভাবিক পুলক অনুভূত হয় তার লেশমাত্রও ছিল না তাঁর অন্তরে। কেননা তিনি ছিলেন নবীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এক সাহাবী। কুরআনের শিক্ষা ও নবুওতের দীক্ষায় তাঁর অন্তর ছিল আলোকউদ্ভাসিত। তিনি ছিলেন যুগপৎ ঈমানী প্রজ্ঞা ও সাহাবীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সুদূর ভবিষ্যত পানে। বিজয়ী আরব মুসলমানদের ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাণী যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। আরব বিজয়ীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন انتم فى رباط دائم। দেখো, মনে রেখো, মিসরের সবুজ শ্যামল উর্বর মাটি, মিসরের সম্পদ ভাণ্ডার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দেশের তাহযীব-তমদ্দুন তোমাদের মনে যেনো কোন মোহ সৃষ্টি করতে না পারে। এদেশের প্রাকৃতিক রূপ ও জৌলুসে তোমরা যেন আত্মবিমোহিত হয়ে পড়ো না। এখানে তোমাদের সঠিক অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থেকো। মনে রেখো, তোমরা এখানে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছ। এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকিতে তোমরা অবস্থান করছ। একথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করো না যে, তোমরা কিবতীদের ওপর বিজয় লাভ করেছ কিংবা রোম সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডার দখল করে নিয়েছ। একথাও মনে করো না, আরব উপদ্বীপ খুব নিকটে। কোন অবস্থাতেই আত্মপ্রতারণার শিকার হয়ো না। انتم فى رباط دائم। এমন এক নাযুক জায়গায় তোমরা আছ যে, মুহূর্তের অসাবধানতায় তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে! প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে। এক ঐশী বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারক হয়ে তোমরা এদেশে এসেছ। এক মহত্তম চরিত্রের

আহ্বান নিয়ে তোমরা এখানে পদার্পণ করেছ। মুহূর্তের গাফলতি ও দায়িত্ববিচ্যুতি তোমাদের এ বিজয়কে ধূলি লুণ্ঠিত করে দিতে পারে। সেই জীবন-দর্শন থেকে চুল পরিমাণও যদি বিচ্যুত হও যা তোমরা মদীনার পুণ্য মাটিতে নবুওতের পবিত্র সাহচর্যে লাভ করেছ, তবে তোমাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে এবং মিসরে যারা আজ তোমাদের এ বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে তারাই সেদিন তোমাদের বুক লক্ষ্য করে তরবারি উঁচিয়ে ধরবে। যদি মনে করে থাকো, সম্পদ উপার্জন, বিলাসী জীবন যাপন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতেই তোমরা স্বদেশ ভূমি ছেড়ে মিসরে এসেছ, তবে এ দেশবাসী তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা করবে না। একটি প্রাণীও সহীহ্ সালামতে ফিরে যেতে পারবে না।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে এক আরব সৈনিক যিনি কোন ইউনিভার্সিটির স্কলার ছিলেন না, বিজীয় আরবদের লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন তা আজ এই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্বের, বিশেষত আপনাদের এ দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

বন্ধুগণ! আপনাদের মনে রাখতে হবে, "انتم فی رباط دائم। তোমরা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছ। মুহূর্তের অসাবধানতা তোমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে দিতে পারে।

# দাক্ষিণাত্যের উপহার

# আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভের সবচে' আবেদনশীল কার্যকারণএবং এর বিস্ময়কর ফলাফল

[হায়দারাবাদের 'সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব্ ইংলিশ এন্ড ফরেন লেংগোয়েজেস' (Central Institute of English And Foreign Languages) আয়োজিত উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর নবাব মীর আকবার আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া এ্যারাবিক সেমিনার'-এর উদ্বোধনী ভাষণ। তাং ১১ অক্টোবর ১৯৮২ খৃঃ]।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইনস্টিটিউটের আরবী শাখা-প্রধান আবদুল হালীম নদভী আরবীতে সমাগত বক্তা ও শ্রোতাদের স্বাগতম জানান। অতঃপর ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর রমেশ মোহন সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃত করেন ইংরেজীতে। লাখনৌ ইউনিভার্সিটির 'রিডার' ডক্টর ই'জায আহ্মাদ ইংরেজীতে মাওলানা (আলী নদভী)-এর পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ সব আনুষ্ঠানিকতার পর মাওলানা নদভী সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

হাম্দ ও সালাত!

মাননীয় সভাপতি, মহাপরিচালক ও সুধীবৃন্দ!

বক্তব্যের প্রারম্ভেই আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে উর্দুতে কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করছি। বক্তৃতার ভাষা হিসাবে আরবীর ন্যায় সুমধুর, প্রাঞ্জল ও সুব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা আমার জন্য পরম আনন্দ ও সম্মানের ব্যাপার, বিশেষত সেমিনারের ভাষা যখন আরবী নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু হায়দারাবাদের মাটিতে ও উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াতলে বসে উর্দু ব্যতীত অন্য কোন ভাষা ব্যবহারে সংকোচবোধ হয়। কারণ উর্দু ভাষার উন্নতি বিধান ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে উর্দুকে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে হায়দারাবাদের অগ্রণী ভূমিকা ও উসমানিয়া ইউনিভার্সিটির অবদান সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং এখানে আমার চিন্তা-ভাবনা ও মনের কথাগুলো প্রকাশ করার দাবী ঐ ভাষায়ই যথার্থভাবে করতে পারে।[১]

---

১. উল্লিখিত কারণ ব্যতিরেকে উর্দুতে বক্তৃতা করার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। আরবী ভাষায় বক্তৃতা করলে শ্রোতৃমণ্ডলী, বিশেষত সভাপতি ও মহাপরিচালক মহোদয়ের জন্য বক্তৃতার তরজমা করার প্রয়োজন পড়ত, অথচ তরজমায় মূল বক্তব্যের গতি ও আবেগ স্বভাবতই ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে।

এ মহতী মাহফিলের উদ্বোধনের জন্য মনোনীত করে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। এই বিরাট সম্মান গ্রহণ করার কোন অধিকার যদি আমার থেকে থাকে, তবে তা কেন সে কথা আল্লামা ইকবাল নিম্নের কবিতাটিতে বলেছেন ঃ

مرا ساز گر چه ستم رسیده زخمه هائے عجم رها

وه شهید ذوق وفا هوں میں که نو! مرے عربی رهے

"আমার 'সারংগি' যদিও আজমের (অনারব) ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, আমি তো প্রেম-বিশ্বস্ততার বেদীতে উৎসর্গীকৃত। কারণ আমার বাঁশরিতো আরবীই ছিল।"

বন্ধুবর ডক্টর ই'জায তাঁর পরিচিতি প্রদানের পূর্বে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, চিন্তাধারা ও মনোভাব প্রকাশের জন্য আরবীকেই আমি মূল মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছি এবং আমার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে আমার অধিকাংশ রচনাই আরবীতে। পরে তা উর্দু ও ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয়েছে। তাই আমার এ দাবী অসংগত নয়, জন্মসূত্রে আমি অনারব-ভারতীয় হলেও আমার হৃদয়ের ভাষা আরবী।

সুধীবৃন্দ! মাতৃভাষার বাইরে কোন বিদেশী ভাষায় মনোযোগ নিবদ্ধ করা, তার পেছনে মেধা ও দক্ষতা ব্যয় করা এবং অধিকাংশ সময় তা আহরণে অতিবাহিত করা বাস্তবিকই একটি স্বভাব-বিরুদ্ধ (Unnatural) ব্যাপার। এ ব্যাপার সংঘটনের জন্য প্রয়োজন যুক্তিযুক্ত এক শক্তিশালী আবেদনের। ফিত্‌রাত্‌ ও স্বভাবগুণেই মানুষে তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষায়ই তার স্বভাবজাত প্রতিভার বিকাশ ও স্ফুরণ ঘটে। বিশ্ব সাহিত্য ও বিশ্ব ভাষার ইতিহাসের অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য এটাই, ভাষাই মানুষের মেধা-প্রতিভা ও তার বাস্তবানুগ আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে থাকে। মানুষের প্রেম-প্রীতি, তার বিচ্ছেদ-বেদনা, তার অন্তরের লুক্কায়িত ফল্গুধারা মাতৃভাষা আশায় স্বভাবজাত গতি ও উদ্দীপনার সাথে প্রস্রবণের রূপ নিয়ে উদ্বেলিত ও নির্ঝরিত হতে থাকে। আমার সীমিত অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রেক্ষিতে বলতে পারি, নিজ ভাষা পরিত্যাগ করে বিদেশী ভাষার পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে তোলা, এজন্য স্বীয় মেধা ও সম্ভাবনাকে ব্যয় করা এবং সে ভাষায় কাব্য ও সাহিত্যের চিরস্মরণীয় অবদান রেখে যাওয়ার মনোভাবের মোট চার ধরনের কারণ হতে পারে ঃ ১. রাজনৈতিক, ২. আর্থ-সামাজিক, ৩. ইলমী ও

একাডেমিক এবং ৪. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক। এই কার্যকারণ চতুষ্টয়ের বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এ পৃথিবীর রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও সময়ের ক্রিয়ার তো আমরা ভুক্তভোগী ও এর বাস্তব সাক্ষী। ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার পর ভারত বৃটেনের মাঝে একটা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পৃথিবীতে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রাখতে ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে উদ্বুদ্ধ যে কোন উচ্চাভিলাষী ভারতীয় তরুণের জন্য ইংরেজী ভাষায় যোগ্যতা অর্জন ও ব্যুৎপত্তি লাভ করা তখন অতীব জরুরী হয়ে পড়েছিল। এ যুগে এসে উল্লিখিত দু'টি উপকরণ (রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক) একীভূত হয়ে গিয়েছিল, সংঘটিত হয়েছিল তাদের সম্মিলন। (কোন ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে এখানে আমাদের আলোচনা হচ্ছে না) এ প্রক্রিয়ার পরিণতি কী হয়েছিল? ভারতের শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতর মেধাগুলো সমকালীন আধুনিক শিক্ষা কেন্দ্র তথা স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে ভর্তি হতে থাকল। এ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার জের চলল এক শতাব্দী কাল। সেই রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ইস্যু আমাদের ইল্‌ম ও আদব, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্লাটফরমে কি পরিমাণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা-ই আজ আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়। লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, হিন্দু-মুসলমানের মাঝে ইংরেজী ভাষার এমন কতক সুলেখক ও সুবক্তা তৈরি হয়েছিলেন যাদের যোগ্যতা ও পারদর্শিতার স্বীকৃতি খোদ ইংরেজী ভাষাভাষীরা দিয়েছে এবং তাদের শিক্ষিতজনেরা আগ্রহের সাথে এদের রচনা ও বক্তৃতা পড়েছেন এবং শুনেছেন। কিন্তু ঐ দু'টি উৎসের সমন্বিত শক্তি মিলেও এ দেশীয়দের ইংরেজী প্রতিভার এমন উন্নত পর্যায় ও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি, যার ফলে এদের বক্তৃতা বিবৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করা এবং সাহিত্য সমালোচনা ও কাব্য রচনার রীতিনীতি, সুর, ছন্দ ও বর্ণনাশৈলীতে এদের পরামর্শ গ্রহণে ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করা যেতে পারে। এ দেশীয়দের ইংরেজী দক্ষতা? ভাষাভাষীদের সমকক্ষ বা তাদের ঊর্ধ্বে হওয়ার স্বীকৃতি প্রদানে ইংরেজদের বাধ্য করতে পারেনি। আংগুলে গোণা যায় এমন কয়েকজন মনীষীর ইংরেজী প্রতিভা ও বিশুদ্ধ ইংরেজী কথন ও লিখনের স্বীকৃতি ইংরেজরা দিয়েছে। মুসলমানদের এমন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ (যাঁর নাম আমাদের অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়কেও আনন্দিত করবে, তিনি হলেন মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, ইংরেজরা তাঁর ইংরেজী জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং রুচিশীল শিক্ষিত ইংরেজ অফিসারগণ তাঁর কমরেড (Comrade) পত্রিকা পড়ে তার ভাষা ও ব্যঙ্গ উপভোগ করতেন। তা ছাড়া আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ, আহমাদ শাহ পিটার বুখারী (অল ইন্ডিয়া রেডিও-এর প্রতিষ্ঠাতা ও এর রূপরেখা

নির্মাণকারী)-এর ইংরেজীও ভাষাভাষীদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। খাজা কামালুদ্দীন, আপনাদের (হায়দারাবাদের) ডক্টর সাইয়েদ আবদুল লতীফ, আল্লামা ইকবালও ইংরেজীতে অনর্গল বলতে ও লিখতে সক্ষম ছিলেন। এই হায়দারাবাদের স্যার আমীন জংও ইংরেজীতে লেখনী ধরেছেন।[১]

কিন্তু ইংরেজরা এঁদের ভাষা ও প্রতিভার স্বীকৃতিতে মস্তকাবনত হবে, তাদের রচনা প্রবন্ধ পড়ে সুরুচি ও স্বাদে মোহিত হবে, বিমুগ্ধ আগ্রহে তাদের কাব্যরুচি ও সাহিত্যানুভূতি এঁদের সহিত্যকর্ম দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য এঁদের মাঝে দু'একজন ব্যতিক্রমও রয়েছেন। এঁদের মাঝে শীর্ষে রয়েছেন "স্প্রিট অব ইসলাম' (Spirit of Islam)-এর স্বনামধন্য রচয়িতা রাইট অনারেবল সায়্যিদ আমীর আলী। তাঁর প্রখর মেধা, নিরলস সাধনা ও মর্মজ্বালার মানদণ্ডে বিদেশী ভাষাভিজ্ঞতার যে উচ্চতম আসন তাঁর প্রাপ্য ছিল, সাধারণত কোন ভাষায় তরুণ সমাজ বিদেশী ভাষার সে স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হয় না। ইংরেজী শেখা লোকদের মধ্যে কতক তো এমনও ছিলেন, যারা নিজের ভাষা ভুলে থাকার আত্মপ্রতারণা ও ইংরেজী ভাষার পাখা-পেখম ধার করে ময়ূর সাজার কসরত করেছেন। তাদের আকুতি দেখে ইংরেজ সাহিত্যিক, লেখকগণ চোখ বুজে বুকে হাত রেখে (সান্ত্বনা দেওয়ার স্বরে) এতটুকু স্বীকৃতি অবশ্য দিয়েছেন, "হ্যাঁ, কোন কোন ভারতীয় বিশুদ্ধ ও উত্তম ইংরেজী লিখে ফেলতে পারেন।"

তৃতীয় উৎস হলো জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন, গবেষণা ও সুরুচি অর্জনের সাধনা। প্রাচ্যবিদ মনীষিগণ (ORIENTALISTS) এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ কথা সন্দেহাতীত (যা আমি বিস্তারিতভাবে আমার সদ্য প্রকাশিত রচনা 'ইসলামিয়াত'-এ আলোচনা করেছি) যে, বহু মুস্তাশ্‌রিক বা 'প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত' জ্ঞান আহরণের একনিষ্ঠ উদ্যম ও গবেষণা-অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং স্বীয় নির্বাচিত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য শ্রম ও গবেষণা দক্ষতার প্রমাণ পেশ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা এমন বিশেষজ্ঞ-সুলভ তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় ও ছাপ রেখেছেন যে, প্রাচ্য ও ইসলামী বিশ্বের আলিম ও বিদ্বান সমাজেও তাদের গবেষণালব্ধ বিষয় থেকে উপকৃত হয়েছে।

---

১. সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাকালে সকল দক্ষ ইংরেজীবিদ ও সকল লেখক জার্নালিস্টদের পূর্ণাংগ তালিকা প্রদান কঠিন ব্যাপার ছিল। এ তালিকায় ইন্‌ডিপেনডেন্ট (The Indepndent) সম্পাদক মিস্টার সাইয়েদ হুসাইন ও 'বোম্বাই ক্রনিকল' (Bomby Chronicle) সম্পাদক সাইয়েদ আবদুল্লাহ বেরলভী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাদের অনেকে তো শুধু দিনের পর দিন আর মাসের পর মাসের হিসাবে নয়, বরং বছরের পর বছর, ত্রিশ-চল্লিশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি বিষয়ের গবেষণা অধ্যয়নে ব্যয় করে সে বিষয়ে তাঁর গবেষণা-অধ্যয়নের নির্যাস সুধীজন সমীপে পেশ করেছেন।[১]

কিন্তু তাদের (ব্যতিক্রম বাদে) প্রায় সকলেরই অধ্যয়ন তত ব্যাপক ও গভীর নয়। তারা কোন বিষয়কে অধ্যয়নের লক্ষ্যরূপে নির্ণীত করে তাতেই গবেষণা-অধ্যয়ন সীমিত রেখেছেন। (আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীর প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন নি) আরবীর বিভিন্ন শাখা ও ইসলামিয়াতে তাদের দৃষ্টি ব্যাপক, গভীর ও তীক্ষ্ণ নয়। আরবী ভাষায়ও (যা ইসলামী গ্রন্থমালার মূল মাধ্যম) তারা পূর্ণাঙ্গ ও স্বনির্ভর দখল অর্জন করতে পারেন নি। তাদের রচনা-লিখনীও আলিমসুলভ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। বৃটেনের কোন কোন শীর্ষস্থানীয় 'প্রাচ্যবিদ'-এর সাথে আলোচনার ফলে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারা আরবীতে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞতার অধিকারী নন এবং আরবীর বহুমুখী চিন্তাধারা ও অনন্য বর্ণনাশৈলীর অধিকারী প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতাও সীমিত ও অপ্রতুল।

এখন আমি বিদেশী ভাষায় দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করার (বিশেষত আরবীর ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) শেষ উৎসটির প্রতি—মূলত যা প্রথম উৎস—আলোকপাত করতে চাই। এটি হলো ধর্মীয়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও (জীবন ধারায় ক্রিয়াশীল) মৌলিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত উৎস। বিষয়টির বিশদ বর্ণনা এরূপ–যে দীন ও ধর্ম আরবী ভাষাকে তার দা'ওয়াত ও আহ্বান প্রচারের ও তার শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছে, সে দীন ঐ ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে আহরণ করা যেতে পারে না। সে দীনের শিক্ষা-দীক্ষা, তার গূঢ় তত্ত্ব, তার যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার প্রকৃত রূহ ও আত্মার সমঝ ও উপলব্ধি ঐ ভাষার সহায়তার ওপরই নির্ভরশীল। সুতরাং নির্ভেজাল এক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে সে ভাষা ও তার সাহিত্য-সরোবরে অবগাহন করতে হবে, তাতে নিমজ্জিত হয়ে তার রং ও রুচিতে রঙীন ও রুচিবান হয়ে নিজেকে সমর্পিত করতে হবে তার আত্মার হাতে। দেহ ও মন সঁপে দিতে হবে দীনের ভাষার প্রাণের সমীপে।

---

১. মাওলানা নদভীর অন্যতম আরবী বক্তৃতা যা 'দারুল মুসান্নিফীন আজমগড়'-এ অনুষ্ঠিত 'ইসলাম আওর মুস্তাশরিকীন' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত হয়েছিল, তাতে প্রাচ্য পণ্ডিতবর্গের সমালোচনার দিকসমূহ ও তাদের দৃষ্টিভংগী ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তমালার পর্যালোচনা রয়েছে। বক্তৃতাটির উর্দু তরজমা 'ইসলামিয়াত আওর মাগরিবী মুস্তাশ্‌রিকীন আওর মুসলমান মুসান্নিফীন' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পারস্য–ইরান উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইরান গর্ববোধ করত তার ভাষা ও সাহিত্যের। এ গর্ববোধের অধিকার তার রয়েছে। কেননা ইরানী (ফার্সী) ভাষা হলো সাহিত্য, তাসাওউফ ও অধ্যাত্মবাদ, প্রেম-বিরহ, ভাবপ্রবণ কল্পনা, রচনা ও ভাব প্রকাশের উত্তম উপকরণসমৃদ্ধ এক ভাণ্ডার। আজও আমরা বিমোহিত ও তন্ময়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ি সা'দী, হাফিয, মাওলানা রূমী, জামী, কুদসী, উরফী, নাজমীরীর ন্যায় যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য সাধকদের রচনা মাধুর্যে। কিন্তু এ ইরানই যখন আরবী ভাষা আহরণ ও তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জনে আকৃষ্ট হলো, (বিশেষত দ্বীনী ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে) তখন সে জন্ম দিল মনীষী সীবাওয়ায়হ্কে। তাঁর রচিত 'আল-কিতাব' নাহু (আরবী ব্যাকরণ ও ভাষানীতি) শাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ, অন্যতম ভিত্তি, বরং প্রথম ও প্রধান ভিত্তিরূপে স্বীকৃত। আরও জন্ম দিল 'দালাইলুল ই'জায' ও 'আসরারুল বালাগাহ' রচয়িতা মনীষী শায়খ আবদুল কাহির জুরজানীকে। আরবী সাহিত্য ও কাব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় তথা তার নাড়ী-নক্ষত্র সম্বন্ধে যারা সুবিজ্ঞ, চিকিৎসকসুলভ অভিজ্ঞান ও ভাষা সাহিত্যের স্বভাব-প্রকৃতির পরিচিতি ও রুচিবোধ্যতার স্বীকৃতি প্রদানে খোদ আরবী ভাষীরাও মস্তকাবনত। ইরান গর্ব করতে পারে যামাখ্শারী, সাক্কাকী, আবু আলী ফারেসী–আর কত নাম উল্লেখ করব—এঁদের আরবী দক্ষতা-প্রতিভার! এঁরা এক একজন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ভবনের এক একটি মজবুত স্তম্ভ। আসুন, আরবী লুগাত ও অভিধান শাখায়–যা একটি নাযুক ও স্পর্শকাতর বিষয়—এখানে মসনদ অধিকার করে রয়েছে আল্লামা মাজ্দুদ্দীন ফিরোযাবাদীর ব্যক্তিত্ব। তাঁর গ্রন্থ 'কামূস'('অভিধান') আজ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাংগন ও ইলমী জগতে সর্বাধিক সমাদৃত ও বহুল প্রচলিত। ইরানকে আরবী ভাষায় দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছিল দীনী, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা। বিগত যুগের মেধাবী ও প্রতিভাবান তরুণ মুসলিম সমাজ এ রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল, আরবী ভাষায় উস্তাদ ও শিক্ষকসুলভ অভিজ্ঞতা অর্জন ও তার সাথে অন্দর মহলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ গড়ে তোলা ব্যতীত আল-কুরআনের রহস্য-ভাণ্ডার, হাদীস শরীফের গুরুত্ব ও 'উসূলে ফিকাহ্-এর নাযুক ও সূক্ষ্ম জটিল আলোচ্য বিষয়গুলো যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করা যেতে পারে না। তাদের এ অবগতি ও উপলব্ধির সুফলরূপে ইরান জন্ম দিয়েছিল যুগশ্রেষ্ঠ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যাকরণ ও ভাষা-নীতিবিদ, ভাষা ও সাহিত্যবিদ, উদ্ঘাটন প্রতিভাসম্পন্ন অলংকার ও বালাগাতবিদ, অভিধান বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ

মুফাস্‌সিরবৃন্দকে, আরব দেশেও যাঁদের তুলনা মেলা ভার। আর তাই শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের ন্যায় গোঁড়া লোকও মুক্ত কণ্ঠে এ স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য হয়েছেন ঃ

ان اكثر حملة العلم من العجم -

"ইলমে ও জ্ঞানের অধিকাংশ ধারক-বাহক জন্ম দিয়েছে অনারবদেশগুলো।"

এবার আসুন, আমাদের ভারতবর্ষে। এখানেও মূল উৎস ও উদ্দীপকের কাজ করেছে ঐ অভিন্ন বিষয়। আরব দেশসমূহের সাথে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের বয়স হবে আপনাদের অনেকের বয়সের তুলনায় কম, অথচ এ ভারতই দীনী ইল্‌ম ও আরবী ভাষা-বিজ্ঞানে এত মহান ও বিশাল গবেষণা ও উদ্‌ভাবনসমৃদ্ধ অবদান রেখেছে যার তুলনা খোদ আরব দেশসমূহেও বিরল।

একটু আগেই যে 'কামূস'-এর কথা উল্লেখ করলাম, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যারূপে প্রণীত হয়েছে 'তাজুল আরূস'। প্রণয়ন করেছেন আমাদেরই পড়শী অযোধ্যার কৃতী সন্তান ভারত-গৌরব আল্লামা সাইয়েদ মুরতাযা বিলগ্রামী। 'যাবদী' নামে তাঁর সমধিক পরিচিতি রয়েছে, আর এ নামের কারণে অনেক সুশিক্ষিত লোকও তাঁকে ইয়ামানী মনে করে থাকেন। এ কিতাবের বিশালতা সম্পর্কে শুনুন, পৃথিবীর কোন ভাষায় কোন অভিধান গ্রন্থের ব্যাখ্যা এর চাইতে বিশদ ও বিস্তৃততর লেখা হয়েছে, আমার পরিচিত কোন ভাষা সম্পর্কে এমন কোন তথ্য আমার জানা নেই। গ্রন্থকারের জীবনকালেই তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর কিতাবখানি স্বর্ণ দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছিল—(রূপক অর্থে নয়, বাস্তবেই!) সে যুগের বড় বড় রাজা-বাদশাহ তাঁকে তাঁর দেশে পদার্পণের দা'ওয়াত দিয়ে তাঁর নিকট থেকে 'সনদ' গ্রহণ করেছেন। ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, কায়রোতে তাঁর দরবার জমত যেন কোন সম্রাটের শাহী দরবার! আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা ঃ সাইয়েদ মুরতাযাকে অনুপ্রাণিত করেছিল কোন্ জিনিসটি? তা কি কোন রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক বিষয় ছিল? রাজনৈতিক উৎস যাচাই করে দেখুন, তখন গোটা আরব দেশ ছিল তুর্কীর শাসনাধীন। ভারতবর্ষের সাথে তুর্কীদের নিয়মতান্ত্রিক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনো। দূতাবাসের প্রচলন তো এই সেদিনের ব্যাপার! বিদেশে চাকুরী করার প্রথাও তখন চালু ছিল না। তা হলে আরবী ভাষায় এত অধিক অভিজ্ঞতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জনে সাইয়েদ মুরতাযাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল কোন্ বিষয়টি? কী ছিল তাঁর আকর্ষণ যার ফলে তিনি 'কামূস-এর এমন এক ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন

করে ফেললেন। মূল গ্রন্থ প্রণেতা খোদ আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী তা দেখে যাওয়ার সুযোগ লাভ করলে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দাতিশয্যে ব্যাখ্যাকারের হাতে চুমু খেতেন। এ মনীষীরই অপর একটি অনন্য গ্রন্থ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালীর চিরন্তন ও যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ইহ্য়াউ উলুমিদ্দীন'-এর অনবদ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين (ইত্হাফুস সাদাহ্ আল মুত্তাকীন শরহু ইহ্য়াউ 'উলুমিদ্দীন'-মুত্তাকী মনীষীবর্গ সমীপে ইহ্য়াউ 'উলুমিদ্দীনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তাঁর এ গ্রন্থকে নির্দ্বিধায় আখ্যায়িত করা যায় একটি 'দাইরাতুল মা'আরিফ'—"বিশ্বকোষ" নামে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'পরিভাষা' সম্পর্কিত বিষয়টি একটি কঠিন ও নাযুক বিষয়। এর তুলনা করা যায় সাগরবক্ষে চলমান জাহাজের দিক নির্ণায়ক 'কম্পাসে'র সাথে। চুল পরিমাণ ব্যবধানের কারণে জাহাজ হতে পারে লক্ষ্যচ্যুত; হারিয়ে ফেলতে পারে গন্তব্যের দিশা। অনুরূপভাবে যে কোন বিষয়ের যে কোন পরিভাষায় আপনি ভ্রান্তির শিকার হলে আপনি না সে কিতাব বুঝতে সক্ষম হবেন, আর না সমর্থ হবেন তার কোন মাসআলা নির্ভুলভাবে উপস্থাপিত করতে। আরবী ভাষার ইল্ম ও জ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে এ বিষয়ে লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যা দু'টি। এক ঃ দস্তুরুল উলামা; দুই. কাশ্শাফ ইসতিলাহাতিল ফুনূন। প্রথমখানি মাওলানা আবদুননবী আহমদ নগরীর রচনা। আর দ্বিতীয় গ্রন্থের রচয়িতা হলেন হিজরী দ্বাদশ শতকের সুবিজ্ঞ মনীষী শায়খ মুহাম্মদ আলী থানবী। গোটা আরব বিশ্ব আজ পর্যন্ত এ দুই গ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করতে সক্ষম হয়নি। এ বিষয় প্রাচীন উৎসরূপে বিদ্যমান রয়েছে আল্লামা খাওয়ারিযিমীর ক্ষুদ্র কিতাব 'মাফাতীহুল উলুম'। আমার এ দাবী আমি আরবের আলিম ও বিদ্বান সমাজে উত্থাপিত করলে তাঁরা এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'গারীবুল হাদীস' (হাদীসের অভিধান)-শাস্ত্রে অনেক কিতাব প্রণীত হয়েছে। এ বিষয়ের বৃহৎ ও প্রমাণ্য গ্রন্থ হলো আল্লামা ইবনু আছীরের 'নিহায়াহ্'। কিন্তু এ বিষয়ের যে কিতাবখানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা, নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যাপক বিস্তৃতির সর্বাধিক অধিকারী তা হলো পাটনার আল্লামা মুহাম্মদ তাহির-এর 'তাস্নীফ মাজমা'উ বিহারিল আনওয়ার'। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে অনুষ্ঠিত এক সুধীজনসমাবেশে জামি' আযহারের খ্যাতিমান আলিম আহমাদ শেরবাসী আমার পরিচিতি দিয়েছিলেন এ কথা বলে, ইনি সে দেশের বাসিন্দা যারা এ কথা বলে গৌরব করতে পারে, সে দেশে গ্রন্থিত হয়েছে 'মাজমা'উ বিহারিল আনওয়ার'-এর ন্যায় মহাগ্রন্থ যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না আযহারের বিদ্বান সমাজও।

উলুমে দীনিয়ায় ইসলামের তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ভাবন বিষয়ক রচনা গ্রন্থনায় ভারতের অবদানের তুলনা নেই বিশ্ব গ্রন্থাগারে। একমাত্র 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-এর নাম নেয়াই যথেষ্ট মনে করি। গ্রন্থকার হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী (র)। বিষয়বস্তু হলো দীনের তত্ত্বকথা ও শরীআতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ ছাড়া উল্লেখ করা যায় উসূলে ফিকাহ-এর কিতাব 'মুসাল্লামুছ ছুবূত।'[১]

সুধীবৃন্দ! আমার এতক্ষণের নিবেদনের উদ্দেশ্য এ দাবী করা, কোন ভাষা শেখা ও তাতে পাণ্ডিত্য অর্জনের পেছনে কার্যকর ও সর্বাধিক শক্তিশালী অনুপ্রেরক হচ্ছে দীনী ও রুহানী, ধর্মীয় ও আত্মিক প্রেরণা। তা এমন এক শক্তিশালী উৎক্ষেপক যা অতিশয় ভারী যে কোন বস্তুকে মুহূর্তের মধ্যে ভূতল থেকে সুউচ্চ প্রাসাদের ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করতে পারে। কয়েকটি নমুনা ও দৃষ্টান্ত আমি পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি। মোটকথা, যথার্থ উদ্দীপনা সৃজিত হলে মানুষ যে কোন ভাষায় সে ভাষাভাষীদের চাইতে অনেক অগ্রগামী হতে পারে। কেননা দীন ও আত্মিক অনুপ্রেরণা যখন বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করছে, তাহলে সে অনুপ্রেরণা যত সবল হবে, কলম ও ভাষা ততই বেগবান ও ক্রিয়াশীল হবে। আরবী ভাষার কোন তালিবে ইলম, কোন প্রকৃত ছাত্র যদি আল-কুরআনকে তার মূল রূহ ও স্পিরিটসহ আহরণ করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয় এবং সে অনুসারে নিরলস সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, তা হলে আমি আপনাকে নিশ্চিত গ্যারান্টি দিতে পারি, সে এক্ষেত্রে যে কোন উল্লেখযোগ্য আরবী ভাষীর চাইতে অগ্রগামী হয়ে যাবে।

মানুষের ধীশক্তি ও তার সুপ্ত প্রতিভাকে আন্দোলিত করার সর্বাধিক শক্তিশালী উপকরণ বা যন্ত্র হলো প্রেম ও উদ্দীপনা। এ প্রেম ও উদ্দীপনার আত্মিক শক্তিই ইকবালের মুখ থেকে নিঃসৃত করেছে এমন ফারসী কাব্যসম্ভার যার তুলনা পেশ করতে পারে নি আধুনিক ইরানও। উর্দুতেও একই অবস্থা। লাহোর অবস্থান করে (অথচ তাঁর কথ্য ভাষা ছিল পাঞ্জাবী) তিনি পেশ করেছেন এমন অনবদ্য উর্দু কাব্য যা পাঠকের রক্ত প্রবাহে সৃষ্টি করে উদ্দাম গতিধারা। লাখনৌ, দিল্লীর সমঝদার পাঠকদেরও স্বীকার করতে হয়েছে, ইকবালের বাণীতে যে অন্তর্দাহ ও বিদ্যুৎ ক্রিয়া রয়েছে, তাতে যে উচ্চমানের আদিভৌতিক বিষয়বস্তু রয়েছে, তা সে সব রথী-মহারথী কবিদের কাব্যতে অনুপস্থিত, যারা সেই অন্তর্দাহ থেকে বঞ্চিত।

---

১. বিখ্যাত মানতিক গ্রন্থ 'সুল্লামুল উলূম'-এর মুসান্নিফ মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারীর অপর রচনা হলো মুসাল্লামুছ ছুবুত। যা দীর্ঘ যুগ ধরে আযহার-এর আলিমগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রেখেছিল এবং যার অনেক ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে।

একটি না'ত পরখ করে দেখুন, উর্দু-ফারসীর না'ত ও নবী প্রশস্তি কাব্যে যে সজীবতা, যে স্পন্দন, যে উদ্দীপনা ও যে প্রভাবক্রিয়া রয়েছে, তা আরবী না'ত কাব্যে (ব্যতিক্রম বাদে) অনুপস্থিত। ১৯৫৬ খৃ. দামিশকের একটি মজলিসের কথা মনে পড়ে। মজলিসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অনেক খ্যাতিমান অধ্যাপক ও নগরীর সাহিত্যিকবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এক মনীষী আমাকে প্রশ্ন করলেন, বলুন তো, আরবীর না'ত কাব্যে সে প্রতিক্রিয়া নেই কেন, যা উর্দু-ফার্সীর না'ত কাব্যে রয়েছে। আপনার অনুবাদ ও আলোচনা শুনে তা-ই মনে হচ্ছে। জবাবে আমি বললাম, এর কারণ দ্বিবিধ। এক. দূরত্ব ও বিরহের অনুভূতি। যেসব মনীষি এ না'তসম্ভার পেশ করেছেন, জামী, কুদ্সী ও ইকবাল হন কিংবা জাফর আলী খান, মাহির আল-কাদিরী আর আমজাদ হায়দারাবাদী হন, তাঁদের প্রত্যেকের মাঝে উদ্বেলিত হচ্ছিল প্রবল আকর্ষণ, দূরত্ব ও বিচ্ছেদ বঞ্চনার অনুভূতি। দ্বিতীয় কারণটি হলো– হৃদয়ের জ্বালা ও অন্তর্দাহ, মনের অচঞ্চল আকুতি। এর প্রভাবে হৃদয়ের নিভৃত কোণ থেকে উদ্বেলিত হয়েছে বিষয় ও ভাষা; তাতে এসেছে আকর্ষণীয় ক্রিয়াশক্তি। ভারতের কোন কোন দা'ঈ ও দীনের আহ্বানকারীর ইদানিংকালের কোন কোন আরবী রচনাও অনুরূপ গুণসমৃদ্ধ। ঐ উদ্দীপনা ও পটভূমি আরবী রচনা সাহিত্যে এক অভিনব পদ্ধতি ও নব দিগন্তের সূচনা করেছে। তাতেও রয়েছে সেই গতিবেগ, মনোহারিত্ব ও আকর্ষণী শক্তি যার প্রভাব এড়ানো শ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্যিকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, বরং তাঁদের রচনা পাঠে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের চোখও অশ্রুতে আপ্লুত হয়েছে।

শ্রোতৃমণ্ডলি! আরবী ভাষার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব ও কার্যকারিতা আমি অস্বীকার করছি না। আমি শুধু আবেদন করতে চাই, আপনারা ঐ সূত্রদ্বয়ের সাথে বুনিয়াদি ও মৌলিক তথ্যটি যোগ করে নিন। তা হলো, আরবীর মূল লক্ষ্য ও প্রকৃত কার্যকারিতা হচ্ছে যথাযথভাবে দীনের সমঝ হাসিল করা, কুরআন-হাদীসের গুরুত্ব ও সুপ্ত রহস্য কুরআন-হাদীসেরই ভাষার মাধ্যমে এবং তাদের ধারক ও বাহকের মর্যী ও লক্ষ্যের সাথে সংগতি রক্ষা করে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা আর কিঞ্চিৎ পরিমাণ মর্মজ্বালা ও অন্তর্দাহ সৃষ্টি করা। তা করা হলে আমি আপনাকে এ নিশচয়তা দিতে পারি, তখন আরবী ভাষা আপনাকে তার ভণ্ডার অবারিত করে দেবে।

এ প্রসঙ্গে আমি এ কথাও নিবেদন করব, আরবী ভাষা শুধু রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক ভাষা নয়, ব্যক্তি মানুষ, মানব সম্প্রদায়, জাতি ও বিভিন্ন দেশের ন্যায় ভাষাসমূহের মেযাজ, স্বভাব প্রকৃতি ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আরবী ভাষার মেজায হচ্ছে নববী, ঈমানী ও দাওয়াতী তথা নবীওয়ালা, ঈমানবাহক ও দীনের প্রতি আহ্বানসুলভ মেযাজ। জনৈক আরব কবি বলেছেন ঃ

ومكلف الا شياء ضدطبا عها - متطلب فى الماء جذوة نار -

"কোন বস্তু থেকে তার প্রকৃতি বিরোধী কর্ম সাধনে সচেষ্ট ব্যক্তিকে তুলনা করা যায় এমন লোকের সাথে, যে পানির ভেতর অগ্নিশিখা পেতে চায়।"

আপনাদের অভ্যন্তরে আরবী ভাষার বুনিয়াদ ও উৎসসমূহের সাথে সহমর্মিতা, সমবেদনা ও আগ্রহ উদ্দীপিত হোক, আরবী ভাষা যে সব বুনিয়াদ ও উৎসের বহিঃপ্রকাশে জন্ম নিয়ে ক্রমঅগ্রগতি লাভ করেছে এবং সে সবের ভিত্তিতে তার এ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, ভারতবর্ষে বাস করেও আমরা তা অধ্যয়ন ও তাতে দক্ষতা-ব্যুৎপত্তি অর্জন করব, সে বুনিয়াদগুলোকে আমাদের মাঝে সুদৃঢ় করতে হবে। এমন করলে আপনি দেখতে পাবেন, অন্যান্য উৎস-উপকরণের চাইতে তুলনামূলক কম সময়ে আপনি আরবী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হবেন।

উদ্যোক্তাগণকে মুবারকবাদ! আজকের এ সেমিনার সময়ের বিচারে যথাযথ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ডে যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিসাব, কারিকুলাম ও শিক্ষা দান পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। তাই সে সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা এবং তা অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ ও পন্থা উদ্ভাবন করা অপরিহার্য। নিসাব, তা'লিম ও এর তরীকা শিক্ষা দান পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা আপনাদের সমীপে পেশ করা হচ্ছে। আমাদের আরবী মাদ্রাসাসমূহের উস্তাদবৃন্দ ও পরিচালক-কর্তৃপক্ষকেও সে আলোচনা থেকে আলো গ্রহণ করা কর্তব্য। বন্ধুবর ডক্টর আবদুল হালীম নদভীকে অনুরোধ করব তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সেমিনারের আলোচনা-সিদ্ধান্তসমূহ সংকলন প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। তাহলে তা সেমিনারের একটা সুন্দর স্মরণিকা হয়ে থাকবে এবং তা হবে জাতির জন্য একটি কল্যাণকর পদক্ষেপ। পরিশেষে আর একবার উদ্যোক্তা-কর্তৃপক্ষের শুক্‌রিয়া আদায় করছি, যাঁরা আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং মনের কথাগুলো বলার সোনালী অবকাশ দান দিয়েছেন।

# মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যায় হায়দরাবাদের 'মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ওরেন্টিয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। ইনস্টিটিউট প্রধান নওয়াব মীর আকবর আলী খান পরিচিতিমূলক উদ্বোধন ভাষণ দান করেন।]

হামদ ও সালাত ঃ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا -

"সংশোধনের পর পৃথিবীতে আবার তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করো না।"

[সূরাতুল আ'রাফ ঃ ৮৫]

আমার প্রিয় মুসলিম ভাইগণ!

আপনাদের সামনে আমি কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। যুগে যুগে আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ যেমন করেছেন তেমনি হযরত শো'আয়েব (আ.)-ও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আপন জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "হে আমার জাতি! আল্লাহর যমীনে ইসলাহ ও সংশোধনের পর তাতে আবার ফাসাদ ছড়ায়ো না।" কত সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ তাঁর এ আবেদনের ভাষা, অথচ কী ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ এবং কেমন মর্মস্পর্শী ও দরদপূর্ণ এর প্রতিটি শব্দ!

সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোকদের সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণত বলা হয়, ফাসাদ সৃষ্টি করো না, গোলযোগ উসকে দিও না কিংবা অরাজকতার পথ উন্মুক্ত করো না। কিন্তু হযরত শো'আয়েব (আ.) তাঁর জাতির কাছে এই বলে আবেদন জানিয়েছেন ঃ

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا -

অর্থাৎ আল্লাহ্র যমীনে কোন দেশে সমাজ-সভ্যতা ও জীবনের গতিধারাকে মুক্তির পথে ফিরিয়ে আনা, আল্লাহর সাথে বান্দার বিস্মৃত সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন এবং জুলুম, শোষণ, ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন ও অধিকার হরণের মত পাশব বৃত্তি নির্মূল করার এ মহান জিহাদের কল্যাণে

আল্লাহর বান্দাদের জীবনে আজ আমূল পরিবর্তন এসেছে। সমাজ জীবনে কল্যাণ ও সংস্কৃতির অমিয়ধারা প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং দোহাই আল্লাহর! তাদের দীর্ঘ সাধনা ও কোরবানীর ফসল নষ্ট করে দিও না।

বুকের রক্তে উদ্যান সজীব হওয়া শুরু হয়েছে। এজন্য বহুজনের ইজ্জত, আবরু বিসর্জন দিতে হয়েছে, পরিবার-পরিজন কোরবান করতে হয়েছে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশের মোহ ত্যাগ করতে হয়েছে। একটি মাত্র উদ্দেশ্যই ছিল তাদের জীবনে, একটি মাত্রই উদ্দেশ্যই ছিল তাদের সামনে। তারা চেয়েছিল মানুষকে মানুষ হয়ে ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে জীবন যাপনের পথে ফিরিয়ে আনতে, মুক্তোমালার মত মানব সম্প্রদায়কে অভিন্ন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে। মানব সম্প্রদায়! তোমরা সকলে আদম (আ.)-এর সন্তান আর আদমকে তৈরি করা হয়েছে মাটি দিয়ে। এই মহান বাণী ছিল তাঁদের নিয়ামক। আল্লাহ্র কসম! মালা ছিঁড়ে ফেলো না, মুক্তাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে যে। ইতিহাস সাক্ষী, এই মুক্তোগুলো যখনই মানব ভ্রাতৃত্বের সংযোগ সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখন সেগুলো শুধু ছড়িয়ে পড়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং শুরু হয়েছে বিরতিহীন সংঘাত। তখন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে চুম্বকের সমমেরুতে বিকর্ষণের ন্যায় বিকর্ষণ ও স্পর্শ-বিদ্বেষ অবস্থান। তারা একে অপরকে আঘাত হেনেছে তরংগমালার ন্যায়, হাতাহাতি ও হানাহানি করেছে উদাম-উলংগ হয়ে। এভাবে সংযুক্ত মুক্তোমালা ও 'তাসবীহের মুক্তো ও দানাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে বিলীন হয়ে যায়নি, বরং পাশাপাশি যথাসম্ভব সম্মিলিত হয়ে, বাহিনীর রূপ ধরে আক্রমণ চালিয়েছে দূরের মুক্তা ও দানাগুলোর ওপর।

একবার আমি বলেছিলাম, পৃথিবীর বুকে শুধু অন্যায়-অসভ্যতাই আর এক অন্যায়-অসভ্যতার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এমন নয়, বরং একতাও লড়েছে একতার বিরুদ্ধে, সমষ্টি আঘাত হেনেছে আর এক সমষ্টিকে। যে ঐক্যের ভিত্তি গলদ, যে একতা মানব-প্রেম, মানব ভ্রাতৃত্ব ও রাব্বানী উবূদিয়াত-আল্লাহ্র দাসত্বের ভিত্তিতে রচিত হয়নি, যে ঐক্য অধিকার আদায় ও দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের সুষম বণ্টন ও ভারসাম্য রক্ষা, আল্লাহর ভয় ও মানুষের জানমালের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে একতা ও সমষ্টি ভয়াবহ ও ভয়ংকর। মোটকথা, বিক্ষিপ্ত মুক্তা ও দানাগুলো কখনো সীমিত অবস্থানে অবস্থান করেনি। আর নবীগণের আজীবন সাধনা ছিল বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলো মালায় গেঁথে দেয়া, দানাগুলো তাসবীহের সুতায় জুড়ে দেয়া। প্রতিপক্ষে শয়তানের জীবনের পণ হলো সেগুলোকে বার বার বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। হযরত শো'আয়ব (আ.)-এর

বাণীতে রয়েছে মনের আকুল ও মর্মস্পর্শিতার পরিচয়। আল্লাহর নবী-রাসূলগণ শত শত বছরের মেহ্নতে মানুষদের মানবতার সবক শিখিয়েছেন। মানুষ হয়ে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষের পরিচিতি পানির মাছ নয় যে যথেচ্ছা সাঁতরে বেড়াবে, শূন্যের পাখী নয় যে যথেচ্ছা উড়ে বেড়াবে, জংগলের সিংহ নয় যে গর্জন করতে থাকবে, বাঘ-ভালুক নয় যে ছিঁড়েফেঁড়ে উদরপূর্তি করবে। মানুষের সংজ্ঞা হলো এমন এক প্রাণী যারা আল্লাহর বান্দা হয়ে পৃথিবীতে অবস্থান ও চলাচল করবে। এ বিশ্ব আল্লাহ পাকের, তোমরাও আল্লাহ পাকের, তাহলে হানাহানি, অবাধ্যতা আর বিদ্রোহ কেন? তাই তিনি বলেছিলেন ঃ

وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا -

(সুশৃংখল ও সুসংহত করে দেয়ার পর যমীনের বুকে বিশৃংখলা ও সংঘাত ঘটিও না।) اصلاح। (ইস্‌লাহ–সংস্কার সাধন, সংশোধন করা) একটি সকর্মক ক্রিয়া মূল। সুতরাং তার জন্য চাই একজন মুসলিহ-(সংস্কারক ও সংশোধক) অর্থাৎ দা'ওয়াত, আহ্‌বান ও কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা। শব্দটি এক ব্যাপক অর্থ নির্দেশক। আয়াতের এ একক শব্দ বিবৃত করেছে নবুওতের ইতিকথা। সে ইতিহাস যখন নবীগণ অর্থাৎ মানব বাগানের চারাগাছগুলোর পরিচর্যাকারিগণ তাঁদের বরকতময় ও কল্যাণবহ সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এ ভূখণ্ডকে রূপান্তরিত করেছিলেন জান্নাতের শান্তি নিকেতনে। ফলে মানুষ মানব কল্যাণ বিলিয়ে দেয়াকে মনে করত মহা সৌভাগ্য। অন্যের কল্যাণে সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল মানুষ। ডাকাতেরা পাহারাদার হয়েছিল, হিংস্ররা হয়েছিল রক্ষক রাখাল। আত্মবিসর্জন ও পরকল্যাণের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল যে, ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন অকাট্য সাক্ষ্য না পাওয়া গেলে তা বিশ্বাস করা ছিল সত্যই সুকঠিন।[১]

কোন দেশ ও কোন সমাজের বুকে বিদ্যমান শৃংখলা, সংহতি ও নিরাপত্তার পরিবেশ ক্ষুণ্ন করা, পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও স্বার্থ বিজড়িত সামাজিক সংহতি ভেঙে দেয়া, সংকীর্ণ ও পংকিল স্বার্থপরতার বশীভূত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সংহতিপূর্ণ সমাজ ভেঙে পর্যুদস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া আল্লাহর বিধানে কঠিন

---

১. একটি দৃষ্টান্তঃ খিলাফতে রাশেদার যুগে কোন এক যুদ্ধে আহত এক মুসলিম যোদ্ধার কাছে তাঁর ভাই পানির পাত্র এগিয়ে দিলে তিনি অপর এক আহতের দিকে ইংগিত করে বললেন ঃ তাঁকে পানি পান করাও। তাঁর হাত মুখ ধুয়ে দাও। দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনের দিকে ইংগিত করলেন একই কথা বলে। একের পর এক চলল অপরকে অগ্রাধিকার প্রদানের এ ধারা। একে একে সবাই ঢলে পড়লেন শাহাদতের প্রশান্ত কোলে। পানি রয়ে গেল যেমন ছিল তেমনই।

অপরাধ ও সংস্কার প্রয়াসী নবীগণের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য জুলুম ও অনাচার। কোন সমাজে সৃষ্ট কোন বিশৃংখলা ও অবক্ষয় দেখে মানুষ যদি মনে করে, ওদের বিপদে আমাদের কি যায় আসে, ওদের মহল্লায়, ওদের সমাজে, অমুক শহরের অমুক অংশে কিংবা অমুক প্রদেশে জান-মাল লুণ্ঠিত হচ্ছে, নাগরিক অধিকার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অমুক জেলায় বা প্রদেশে মানুষ মানুষকে হত্যা করছে, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগে জ্বালাও পোড়াও চলছে, নিঃসংগ বা বিদেশী পথচারীদের ছিনতাই করা হচ্ছে, গুম খুন চলছে ঃ চলুক, আমাদের কী ক্ষতি হলো? আমাদের এলাকা, আমাদের সমাজ মহল্লাতো নিরাপদ রয়েছে। ঐ হেন কূপমণ্ডুকতা ও গরজে চিন্তার কুফল কী হতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত শুনুন! হাদীসে নববী থেকে এ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি, সংস্কার সাহিত্যেতো বটেই, মানবতাবাদের বিশ্ব সাহিত্যেও এর চাইতে উত্তম দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, কতক মুসাফির কোন জাহাজে আরোহী হলো। জাহাজটি দ্বিতল। ওপর তলা প্রথম শ্রেণী ও নীচটা ডেক। লক্ষ্য করুন, এ দৃষ্টান্তটিও নবী আলায়হিস সাল্লামের অন্যতম মুজিযাহ। কেননা জাহাজশিল্পের ইতিহাস যতদূর জানা যায় তখনও পর্যন্ত তাতে এত অগ্রগতি হয়নি যে, প্রথম ও ডেক শ্রেণী করার জন্য দ্বিতল জাহাজ নির্মাণ করা হবে। তদুপরি আরব ব-দ্বীপের এ ভূখণ্ডের অবস্থান সাগর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই তাঁর পক্ষে এমন দ্বিতল জাহাজের দৃষ্টান্ত প্রদান ঐশী ইল্‌মনির্ভর ছাড়া আর কী হতে পারে? দোতলায় কিছু যাত্রী রয়েছেন (আমরা তাদের প্রথম শ্রেণী বা আপার ক্লাস বলতে পারি)। নীচ তলায়ও যাত্রী রয়েছে। (সাধারণত গরীব-দুঃখীরা ওখানে সওয়ার হয়) খাবার পানির ব্যবস্থা দোতলায় (আপার ক্লাসকে তো কিছুটা অধিক সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে) নীচতলার লোকেরা দোতলা থেকে খাবার পানি নিয়ে আসতে বাধ্য। পানি নিয়ে আসার সময় স্বভাবতই কিছু পড়ে যায়। আর জাহাজের দোতলার কারণেও কিছু পড়ে থাকে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু না কিছু পড়েই যায়। কারণ পানি তো আর জানে না যে, অমুক নবাব সাহেবকে ভিজিয়ে দেয়া উচিত নয়, অমুক লাট সাহেবের গায়ে ছিঁটে পড়া উচিত নয়, অমুক শেঠের কাপড় ভিজিয়ে দেয়া অন্যায়। কিন্তু বার বার এ বেআদবী হওয়ায় আপার ক্লাসের মনে আঘাত লাগল। তারা আলোচনা করলেন, নীচের ইতরদের এ বাড়াবাড়িতো আর সহ্য করা যায় না। একজন ফোঁড়ন কাটলেন, আমাদের সাথে বেশ তামাশা করা হচ্ছে। পানি নেবে তারা তাদের প্রয়োজনে আর পেরেশানী পোহাতে হবে আমাদের? না, এ

আর চলবে না। তারা নীচতলার লোকদের নোটিশ দিয়ে দিল, পানির জন্য আর ওপরে এসনা, নীচেই আপন বন্দোবস্ত করে নাও। নীচতলার লোকেরা পরামর্শে বসল, পানি তো জীবনের সমস্যা। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। ঠিক আছে, ওপরে যাওয়া নাজায়েয হলে আমরা নীচেই ব্যবস্থা করে নেব। নীচে একটি ছিদ্র করে নিই, বসে বসেই বিনা মেহনতে পানি পেয়ে যাব। কারো দয়ার ওপর ভরসা করতে হবে না, বড় লোকদের চোখ রাঙানিও দেখতে হবে না। কারো তেল মালিশ, তোষামোদ করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (ভাবার্থ) দোতলার মসনদারোহীদের মাথায় যদি গোবর না থেকে থাকে, তাদের বুদ্ধি যদি ভোঁতা না হয়ে থাকে এবং তাদের যদি কপাল পুড়ে না থাকে, তাহলে তারা অবিলম্বে নীচ তলার লোকদের খোশামোদ করতে শুরু করবে। তাদের হাত ধরে বলবে ঃ বন্ধুরা! অমন করো না, তোমরা নির্বিবাদে ওপর থেকে পানি নিয়ে যেও (চাই কি আমরা তোমাদের এগিয়ে দেব)। তবুও দোহাই আল্লাহর, এমন কাম করো না। নীচে ছিদ্র করো না। কারণ জাহাজ ডুবে গেলেতো সবারই সলিল সমাধি ঘটবে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ডুবলে প্রথমে শ্রেণী ওয়লারাও ডুবে মরবে।

আমাকে আপনাকে বাহ্যত এ দেশেই জীবন কাটাতে হবে। মনে রাখতে হবে, দেশবাসীর জীবন মানব সমাজ ও সভ্যতার জাহাজতুল্য। আমরা সকলেই এক জাহাজের যাত্রী। এখন যদি আমরা স্বার্থ সিদ্ধির নীতি গ্রহণ করি, আত্মগরজে হয়ে যাই এবং নিজের ঘরে বসেই মিঠা পানির ব্যবস্থা করতে চাই, তাহলে কপালে ভালাই নেই। মিঠা পানির চেষ্টা ঘরে বসে করার অর্থ নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করা, নিজের স্বার্থ হাসিলের বুদ্ধি করা। আমার কাজ হয়ে গেলে আর কার কি হলো, তাতে আমার কি? এ মনোবৃত্তি ও কর্ম পদ্ধতি জাহাজের নীচ তলা ছিদ্র করারই সমার্থক। আমাদের এ দেশ নামক জাহাজে আজ কতজন কত ভাবে ছিদ্র করে যাচ্ছে! প্রত্যেকেই ব্যস্ত আপন চিন্তায়। সংকীর্ণ মনোবৃত্তিতে অন্যের প্রতি চোখ বন্ধ করে রয়েছি আমরা প্রত্যেকে। সমাজ ও সমষ্টির জীবনে এর কুফল কি হতে পারে সে বাস্তবতার ব্যাপারে আমরা আত্মভোলা হয়ে রয়েছি। আর শুধু এ দেশই নয়, সারা বিশ্ব আজ এ ব্যাধির শিকার।

বৈরুতে যা কিছু ঘটে গেল, তা এ সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর কুফল। ইসরাঈল দেখল সুবর্ণ সুযোগ! এ ফাঁকেই উদ্দেশ্য হাসিল করে নিতে হয়। এ স্বার্থ সিদ্ধির বেদীতে কতজনকে যে জীবন বলি দিতে হলো, মানবতার কি অধঃপতন ঘটল তা তো গৌণ ব্যাপার। লেবাননের মারুনী উপদলীয়দের সংগঠন (ফালাঞ্জীরা) মনে করল, এখনই সময়, এখন আমরা এক বড় শক্তির সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা

পাচ্ছি। অতএব, আমাদেরও কার্যোদ্ধার করে নেয়া উচিত। সেখানে যা ঘটেছিল, তা ছিল ভয়াবহ, জঘন্য ও সম্পূর্ণ নৈতিকতাবিবর্জিত। তাই তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সারা বিশ্ব সে ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল, তাদের ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আমাদের দেশে যা চলছে এবং ঘটছে তার প্রকৃতিও অভিন্ন। ব্যবধান শুধু স্তর ও মাত্রার। এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও অঞ্চল তাদের স্বার্থ সিদ্ধির ফিকিরে লেগে রয়েছে। প্রত্যেকে প্রাধান্য দিচ্ছে তার বংশ ও সমাজের, তা সে যতই অযোগ্য, অপাত্র হোক না কেন। আমাদের সমাজ জীবনে রাজত্ব চলছে স্বজনপ্রীতি ও স্বজন তোষণের।

আল্লাহর পাকের নবীগণ তো জগতবাসীকে সবক দিয়েছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তার। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন একক ব্যক্তিকে আবদ্ধ করেছিলেন সম্প্রীতি ও একতার বন্ধনে। আপনি উদার ও গভীর দৃষ্টিতে ঈমানদারী, বিশ্বস্ততা ও নিরপেক্ষতার সাথে খোঁজ নিয়ে বিচার করে দেখুন এবং ইতিহাসের পরিচ্ছেদগুলোকে পর পর বিন্যস্ত করে দেখুন, তাহলে আপনার কাছেও প্রতীয়মান হবে, আজও পৃথিবীতে মানবতার যে অবশিষ্ট পুঁজি বিদ্যমান, মানুষের মনে প্রেম-ভ্রাতৃত্বের যে ক্ষীণ ধারা বয়ে চলছে, মানব জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও আল্লাহ পাকের ভয়ের যে প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের দৃষ্টিতে মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর যেটুকু গুরুত্ব ও মূল্য আজও অবশিষ্ট রয়েছে, তা আল্লাহ পাকের নবীগণের ও তাঁদের বাণী ও পয়গামের বদৌলতে। পরবর্তীতে তাঁদের পদাংক অনুসারী নবীগণের সম্পাদিত মহৎ কর্মকে জীবন্ত রাখার সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ দীনের দরদসম্পন্ন আল্লাহওয়ালাগণের মেহনতেরই সুফল। আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ـ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ـ

"আর স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের কথা, (এ বিষয়ে) যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, আল্লাহ পাক তোমাদের মনগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দিলেন, তোমরা তাঁর মেহেরবানী ও অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা উপনীত (হয়ে) ছিলে অগ্নি গহ্বরের একেবারে প্রান্তে। তিনি (আল্লাহপাক) তোমাদের রক্ষা করলেন অক্ষতভাবে ও নির্বিঘ্নে।"

[সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৩]

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বিশ্ব মানবতা এসে দাঁড়িয়েছিল ধ্বংস গহ্বর ও সম্মিলিত আত্মহনন যজ্ঞের এক ভয়াবহ খাদের প্রান্তে, আর তারা তাতে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে ফেলেছিল। তখনই আবির্ভূত হলেন আল্লাহ্‌র এক প্রিয় বান্দা মুক্তির দিশারী নবীয়ে উম্মী (আমার আত্মা তাঁর তরে উৎসর্গীতকৃত) সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনি নিজেই যেমন একবার ইরশাদ করেছিলেন, "আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন যেন কেউ আগুনে জ্বালাল, পতংগ দল আত্মহারা হয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। অনুরূপভাবে তোমরাও (জাহান্নামের) আগুনে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছ, আমি তোমাদের কোমর ধরে ধরে দূরে সরিয়ে রাখছি।"

মানব জাতি ও মানবতার ইতিহাস আপনি খুলে দেখুন, দেখবেন, বার বার এমনই হয়েছে, দ্বিপদ মানুষ রক্তপিপাসু হিংস্র চতুষ্পদে পরিণত হয়েছে, তখন আল্লাহ্ পাকের কোন নবী-পয়গাম্বর শুভাগমন করে সে হিংস্র জিঘাংসাবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে কামিল ইনসান ও পরিপূর্ণ 'মানুষে' পরিণত করেছেন। ডাকাত-লুটেরাদের বানিয়ে দিয়েছেন পাহারাদার, হিংস্র পশুকে করেছেন পশুপালের রাখাল। নিরক্ষর অ, আ, ক, খ-য়ে অজ্ঞ ও মানবতায় অপরিচিতদের গড়ে তুলেছেন নৈতিকতার শিক্ষক ও আইন প্রণয়নকারীরূপে। কবির ভাষায় ঃ

درفشانی نےترے قطروں کو دریاکردیا
دل کوروشن کردیا انکھی کوبیناکردیا
خود نہ تھے جوراہ پرغیروں کے ھادی بن گئے
کیانظرتھی جس نےمردوں کومسیحاکردیا

"মুক্তা বরষণে তোমার বিন্দু হলো বিশাল বারিধি সমান,
হৃদয়ে জ্বালালে নূরের মশাল, নয়নে করিলে দৃষ্টিদান।
পথহারা ছিল যারা, তাদের করিলে দিশারী জগতের;
পরশ দৃষ্টি তব মুরদারে বানাল জীবনদাতা।"

অর্থাৎ তোমার পরশে সংকীর্ণতা উদার হলো, আঁধার মনে আলো উদ্ভাসিত হলো, কল্যাণ দৃষ্টি উন্মোচিত হলো, ভ্রান্তরা পথ-প্রদর্শক হলো আর মৃতরা হয়ে গেল অন্যদের ত্রাণকর্তা।

আমাদের এই উপমহাদেশেও যেটুকু মায়া-মমতা ও মানব প্রেম আজও অবশিষ্ট রয়েছে, তা সেই মনীষী সূফী-দরবেশগণেরই ঋণ ও অবদান যাঁরা ছিলেন মুহব্বত ও মানব প্রেমের পয়গামবাহক। মাহ্‌বুবে ইলাহী (আল্লাহ্‌র প্রিয়) হযরত

নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র.) যাঁর খলীফার খলীফা ছিলেন আপনাদের শহরে শায়িত হযরত খাজা গেসু দারায (র.) তিনি বলেছেন, দেখ, কেউ তোমার জন্য (পথে) কাঁটা রেখে দিলে (তোমাকে নির্যাতন করলে) তুমিও যদি বিনিময়ে কাঁটা রেখে দাও, দুর্ব্যবহার কর, তাহলে তো কাঁটার ছড়াছড়ি হয়ে যাবে, জুলুমে দেশ ছেয়ে যাবে। আর তোমার বিপক্ষের কাঁটা রাখার জবাবে যদি তুমি ফুল দিতে পার তাহলে ফুলে ফুল-সজ্জা হয়ে যাবে পৃথিবী। প্রেম ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে। সুতরাং কাঁটার ঔষধ কাঁটা নয়; কাঁটার প্রতিষেধক হচ্ছে ফুল। আর একবার তিনি বলেছিলেন, বাঁকার সাথে বাঁকা, সরলের সাথে সরল আচরণ করা ; সোজার সাথে সোজা, বাঁকার সাথে বাঁকা, ভালর সাথে ভাল, মন্দের সাথে মন্দ, মিষ্টি দিলে মিষ্টি, তিতার বদলে তিতা—এই হলো সাধারণ রীতি। কিন্তু আমাদের নীতি হলো সরলের সাথে সরল এবং গরলের (বাঁকার) সাথেও সরল।

অর্থাৎ ভালর সাথে ভাল, মন্দের সাথেও ভাল করা। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ ـ

"তোমার সাথে (আত্মীয়তা) বিচ্ছিন্নকারীকে জুড়ে রাখ, তোমার প্রতি অবিচারীকে ক্ষমা কর এবং তোমার সাথে যে অসদাচরণ করে, তার সাথে সদাচরণ কর।"

খাজা-ই বুযুর্গ হযরত মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.) এবং তাঁরও আগে এ দেশে শুভাগমনকারী বুযুর্গদের মাঝে হযরত সায়্যিদ আবুল হাসান আলী হাজবীরী (র.) থেকে শুরু করে এ সিলসিলার যথার্থ উত্তরাধিকারিগণের মাঝে যার জীবন চরিত্রই দেখুন না কেন, সর্বত্রই সবার কাছে পাওয়া যাবে প্রেম-প্রীতি ও মায়া-মুহব্বতের সবক। মর্মাহত হৃদয়ে সমবেদনার প্রলেপ, মানবতা থেকে নিরাশ হওয়া মুমূর্ষু মানবগোষ্ঠীকে সান্ত্বনা দান, সহমর্মিতা ও বেদনার সাম্য সৃষ্টি করা ছিল তাঁদের জীবনব্রত। তাঁরা এ সবক হাসিল করেছিলেন নবীগণের পয়গাম, তা'লীম ও জীবন-চরিত থেকেই। নবী চরিত্রের ব্রত গ্রহণ করেই তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন দেশে দেশে। মানবতার সে পাঠ শিখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। প্রেম ও মুহব্বত দিয়েই তাঁরা জয় করেছেন বিশ্ববাসীর হৃদয়। কবির ভাষায় ঃ

جو دلوں کو فتح کرلے وہی فاتح زمانہ ـ

"মনের ওপরে রাজত্ব করেন যিনি, তিনিই তো যুগ বিজয়ী।" তাঁরা আত্মপ্রেমে বিভোর ছিলেন না। তাঁদের প্রতি আত্মকেন্দ্রিকতার অপবাদ হবে জঘন্য অবিচার। আত্মকেন্দ্রিক মানুষেরা সহজে অন্যকে আঘাত হানতে পারে। দরবেশ-সূফীগণ ছিলেন পর কল্যাণে নিবেদিত। তাঁরা প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতেন না। আঘাত তো হেনে থাকে তীর, কামান, বর্শা ও তরবারিধারীরা। তাঁরা তো মানুষের অন্তর জয় করতেন অমিয় বাণী ও মধুর আচরণে। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াত, লোকেরা তাঁদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, বংশীয় মুরুব্বী ও রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের তুলনায় এ আত্মিক সম্পর্কওয়ালাদের প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের জন্য উৎসর্গ করত জান-মাল ও সহায়-সম্পদ।

শায়খ আহ্‌মদ খাট্‌টু (র.) [যাঁর নামে আবাদ হয়েছে 'আহ্‌মদাবাদ' শহর)-এর ঘটনা পড়ে দেখুন। তাঁর শৈশবে দুধ পানের বয়সে দিল্লীতে একবার প্রবল তুফান হয়েছিল। বাত্যা বিপর্যয়ে তিনি তাঁর ধাত্রীমাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এক কাফেলার লোকেরা তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে গুজরাটের খাট্‌টু এলাকায় অবস্থানকারী 'মাগরিবী সিলসিলা'র (বুযুর্গদের পশ্চিম আফ্রিকান ও স্পেনীয় সিলসিলা) অনুসারী এক বুযুর্গের কাছে পৌঁছে দিলেন। বাত্যা-তাড়িত হওয়ায় তাঁর জীবনীকারগণ তাঁকে নাম দিয়েছেন গানজে বাদ আওয়ারদ' বা 'তুফানে কুড়ানো মাণিক' নামে। অনেক বছর পরে বালিগ হওয়ার বয়েসে উন্নীত হওয়ার সময়ে তাঁর পরিবারের লোকেরা কোন উপায়ে সন্ধান জানতে পেরে খাট্‌টুতে উপস্থিত হলো। তারা শায়খের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, তরুণকে এখ্‌তিয়ার দিচ্ছি ঃ সে ইচ্ছা করলে এখানে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বাড়িতে যেতে পারে। শায়খ আহ্‌মদ সেই তরুণ বয়সেও পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বাড়ি-ঘর আর দিল্লীর আরাম-আয়েশের জীবনের চেয়ে খাট্‌টুর দারিদ্র, অসচ্ছলতা ও কষ্টের জীবনকে প্রাধান্য দিলেন। তিনি থেকে গেলেন সেখানেই।

এ মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য নিজেদের প্রস্তুত করা, সার্বিক ধ্বংসের কবল থেকে দেশটিকে রক্ষা করায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। এটা শুধু সরকার ও ক্ষমতাসীনদের দায়িত্ব নয়। সরকারের রয়েছে অনন্ত সমস্যা ও হাজারো রাজনৈতিক স্বার্থ। আল-কোরআনের আলোকে আপনাদের কর্তব্য হলো দীনের নিঃস্বার্থ সাধকবর্গ দীনের পথে আহ্বানকারী মানবতার কল্যাণকামীদের এবং দেশ ও সমাজের নিষ্ঠাবান নির্মাতাদের সাধনা জলাঞ্জলি না দেওয়া। আপনারা ولاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها। বাণীর পয়গাম প্রচার করতে থাকুন। কিয়ামতে আল্লাহ

পাকের আদালতে আপনার-এ প্রশ্নের জবাবদিহি করতে বাধ্য হবেন, দেশটিতে কিভাবে ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হলো? তোমাদের কর্তব্য ছিল এমন কর্ম, অবদান ও দৃষ্টান্ত পেশ করা যাতে অন্যদের এ বোধোদয় ঘটত, অর্থ জীবনের মূল অর্থ নয়, পয়সাই সব কিছু নয়, পদ ও পদমর্যাদাই মুখ্য নয়, সমাজে বিশেষ আসন প্রতিষ্ঠাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য নয়, বরং মুখ্য উদ্দেশ্য ও মূল আদর্শ আল্লাহ পাকের ভয় ও তাঁর আনুষংগিক হলো সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, এরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আপনারা প্রিয়ভাজন হওয়ার মর্যাদায় আসীন হোন। দেখুন না, এ দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ও চাবি আপনাদের হাতে সোপর্দ করা হয় কিনা?

ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তিদের প্রিয়ভাজন ও জননন্দিত হওয়ার বহু কাহিনী আমরা কিতাবের পৃষ্ঠায় পড়ি এবং তা আমাদের স্মরণ ভাণ্ডারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমষ্টি ও জাতীয় পর্যায়ে মিল্লাত হিসাবে 'মাহবুব' ও প্রিয়ভাজন হওয়ার ঘটনাবলীর ব্যাপারে আমরা গাফিল ও উদাসীন। আল্লাহ পাক যখন এ উম্মতকে 'জগতপ্রিয়' ও বিশ্বনন্দিত মিল্লাতে পরিণত করেছিলেন, যেমন এ মিল্লাত মানবতা রক্ষা ও তার বিকাশ সাধনে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ কুরবানী করেছিল এবং ন্যায় ও সত্যের আঁচল মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিল তখন চীন দেশের মত দূরদেশ থেকে (সে যুগের চীন আরব দূরত্বের পরিমাণ বোঝা যায় এ আরবী প্রবাদ বাণীতে اطلبو العلم ولو بالصين। চীনের মত দূর দেশেও ইল্‌ম আহরণ কর) সে চীন থেকে আরবের আব্বাসী সালতানাতের দরবারে প্রতিনিধিদল পাঠানো হলো এ মর্মে যে, আমাদের দেশে এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে না যাদের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে মামলা-মুকদ্দমায় সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষ বিচারে আশ্বস্ত হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর নামে খলীফাকে অনুরোধ, তিনি যেন এমন কিছু বিচারক পাঠিয়ে দেন যারা মামলা-মুকদ্দমায় ন্যায় ও নিরপেক্ষ ফায়সালা করে বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। এটা হলো মিল্লাতের 'মাহবুব' ও প্রিয়ভাজন হওয়ার স্তর ও মর্যাদা। এটা সেই সময়ের অবস্থা যখন এ মিল্লাতের ঈমান ও বিশ্বাস ছিল :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

"বিশ্বমানবতার কল্যাণের উদ্দেশে উত্থিত শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমরা"-এর ওপর। যারা বিশ্বাস করত, স্বার্থ সিদ্ধি, পারিবারিক ও বংশীয় আভিজাত্য ও গৌরব অর্জন এবং গোষ্ঠীভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি, বরং মানবতার সেবা ও বিশ্বজনীন কল্যাণের উদ্দেশে স্থায়ী সাফল্যের পথ-নির্দেশের স্বার্থে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ বিষয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। রোমানদের মুকাবিলায় যুদ্ধরত হযরত আবু উবায়দাহ (র.)-এর পরিচালনাধীন ইসলামী ফৌজ (সিরিয়ার) হিমসে অবস্থান করছিল। সেখানকার অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া (নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা কর) আদায় করা হয়েছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে দরবারে খিলাফাত থেকে নির্দেশ এল ইসলামী বাহিনীর সকল সৈনিককে 'ইয়ারমুক' রণক্ষেত্রে সমবেত হতে। কারণ সেখানে এ চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেনাপতি হযরত আবু 'উবায়দাহ নির্দেশ জারী করলেন সেনাবাহিনী স্থানান্তরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ইয়ারমুক অভিমুখে রওনা হয়ে যেতে এবং অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নিকট থেকে গৃহীত 'জিযিয়া' ফেরত দিয়ে দিতে। খাজাঞ্চীকে নির্দেশ দিলেন একটি পয়সাও যেন অবশিষ্ট না থাকে। ইয়াহূদী খ্রিস্টান নাগরিকদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থ তাদের ফেরত দেয়া হলে তারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল ঃ এমন করা হচ্ছে কেন? সেনাপতি আমীনুল উম্মাহ[১] জবাব দিলেন ঃ আপনাদের নিকট থেকে এ কর উসূল করা হয়েছিল এ ভিত্তিতে, আমরা আপনাদের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করব। আমরা এখন অনিবার্য কারণে সে দায়িত্ব পালন করার অবকাশ পাচ্ছি না। কারণ আমরা এখন অন্য স্থানে অভিযানে আদিষ্ট হয়েছি। আবার কবে পর্যন্ত এখানে ফিরে আসব তা নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা নেই। সুতরাং আপনাদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থ রাখার অধিকার আমাদের নেই। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সেনাপতির জবাব শুনে (সে বিধর্মী) লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহ তোমাদের আবার ফিরিয়ে আনুন! তারা তাদের পুরাতন মনিবদের তুলনায় মুসলমানদের শাসনাধীন থাকাকে প্রাধান্য দিত। তারা বলত, ওরাতো আমাদের নিকট থেকে ভারি ট্যাক্স উসূল করত এবং আমাদের রক্ত শোষণ করত, অথচ আমাদের সাথে তোমাদের আচরণ তো এই দেখলাম! এ হলো এ মিল্লাতের 'জনপ্রিয়' হওয়ার যুগের কাহিনী।

এ ধরনের বহু ঘটনাই রয়েছে। যে কোন ঘটনাই শুনবেন, দেখতে পাবেন, যে কোন অঞ্চলে মুসলমানদের গমনাগমন হয়েছে, সেখানকার বাসিন্দারা মুসলমানদের সংবর্ধনায় চোখ পেতে দিয়েছে। তারা ভেবেছে, এ যে রহমতের ফেরেশতা। তাঁদের আগমন ও অবস্থানে রোগবালাই, মহামারী বিদূরিত হবে, শস্য-সম্পদে বরকত (প্রাচুর্য) হবে। ন্যায়, সততা, প্রেম, স্বভাব, ঔদার্য, নৈতিকতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা আফ্রিকার দুর্ধর্ষ ও অজেয় বার্বার[২] জাতিকেও এমনভাবে ইসলামে দাখিল করে দিয়েছিল এবং

১. আমীনুল উম্মাহঃ নবী আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক হযরত আবূ 'উবায়দাহ্ (রা.)-কে প্রদত্ত খেতাব। অর্থ 'উম্মাতের বিশ্বস্ত' ব্যক্তি।

২. রোমানরা বার বার চেষ্টা করে বার্বারদের বশীভূত করতে পারেনি এবং অজেয় মনে করে সে চেষ্টা বর্জন করেছে।

ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এমন আসক্ত ও ধারক- বাহক বানিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁদের ভিন্ন পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে সরকারের[১] সব চক্রান্ত ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ পাকের ফযলে আজ পর্যন্ত সে বার্বার জাতি ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপে রূপায়িত এবং তার প্রতি তাদের আকর্ষণ ও ভালবাসা আরবীদের তুলনায় কমতো নয়ই বরং বেশীই।

সুধীবৃন্দ! আজ পর্যন্ত আমরা মিল্লাতের 'প্রিয় হওয়া'র বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখিনি। 'প্রিয়' হওয়ার জন্য কতকগুলো গুণে গুণান্বিত হলে সে ব্যক্তি 'প্রিয়' হয়ে যায়। আর জাতির মাঝে তার সমাহার ঘটলে জাতি প্রিয় ও নন্দিত হয়ে যায়। পৃথিবীতে মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য আজ একমাত্র পথ এটাই।

উৎসর্গ, ত্যাগ ও সেবার মনোবৃত্তি জনপ্রিয়তা বিধায়ক গুণাবলী। হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও এর অনুগমন করে, সভ্যতা-সংস্কৃতির সহযাত্রী বরং এর সেবক হয় এবং তাতে সে গর্ব বোধ করে। এ সব গুণ অর্জন না করে ক্ষমতাপ্রাপ্তি কিংবা পদমর্যাদার কোন ভরসা নেই, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার কোন নির্ভরতা নেই। আজকের অপরিহার্য প্রয়োজন হলো, মুসলিম তরুণ সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রমাণ পেশ করা। কর্মদক্ষতা, পারদর্শিতা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী অধিক পরিমাণে আমাদের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের চরম অর্থাভাব ও অনটন কালেও যদি কেউ লাখ টাকা ঘুষ দিতে চেষ্টা করে তাহলে তা স্পর্শ করা আমরা হারাম মনে করব, বরং ঘুষের প্রস্তাবকারীকে দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারব, তুমি আমার, আমার কওম ও মিল্লাতের মর্যাদাহানি করেছ। তোমার এদিকে লক্ষ্য হলো না, কোন মুসলমান ঘুষ নিতে পারে না। এ আচরণের সময় মুসলিম তরুণের মুখাবয়বও এরূপ ঘৃণ. ও ব্যথার অভিব্যক্তি পেশ করবে যেন কেউ তাকে গালি দিয়েছে। কোন মুসলমান জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই ও যে কোন বিভাগের কর্মরত থাকুক না কেন, সে হবে

১. ফ্রানসিস সরকার বার্বারদের মনে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ, সতন্ত্র সভ্যতা, সংস্কৃতির ধারক হওয়ার দাবী তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা বলেছিল, তোমরা আফ্রিকান, তোমরা আরব নও এবং আরবী তোমাদের ভাষা নয়। আরবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি উপনিবেশবাদ চাপানো। তোমরা স্বতন্ত্র জাতীয়তা ও নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ও নিজস্ব ভাষার পুনরুজ্জীবন সাধনে ব্রতী হও। আরব মুসলমানদের প্রতি তাদের ঘৃণা উদ্রেকের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বার্বাররা আজও আরবী সভ্যতা ও ভাষার ধারক ও বাহক রয়েছে।

কর্ম ও নীতির আদর্শ। বাস্তব কর্ম দ্বারাই সে প্রতীয়মান করবে, কোন ব্যক্তি, দল ও সংগঠন, বরং সরকারও তাকে কিনে ফেলতে পারে না। মোটকথা, মিল্লাতের বিশেষ ও নিজস্ব সমস্যার সমাধান কর্ম অবদানেই নিহিত। মর্যাদাশীল মিল্লাত হিসাবে মুসলমানদের টিকে থাকার পথ ও পন্থা এতেই সীমিত। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

"আল্লাহ্ পাক কোন বিদ্যমান অবস্থা (ও অর্জিত মান-মর্যাদা, শান-শওকত ক্ষমতা ও রাজত্ব) পরিবর্তিত করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই সাধন করে।" [রাদ ঃ১১]

আমরা ক্ষমতা হারিয়েছি আমাদের ভুলের পরিণতিতে। আমাদের অধিকার ও নির্ভরযোগ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে আমাদের বিচ্যুতির মাশুল হিসাবে। তার পুনঃপ্রাপ্তি নির্ভর করে যোগ্যতা অর্জনের ওপরেই। দুনিয়ার কোন শক্তির সাহায্য-সমর্থন তাতে কোন সুফল ফলাবে না। লেবানন ও ফিলিস্তীনের আরবরা প্রতারণার শিকার হয়েছে। কারণ তাদের কেউ নির্ভর করেছিল রাশিয়ার ওপর, কেউ ধরনা দিয়েছিল আমেরিকার দুয়ারে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তো স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا -

"শয়তান যথাসময়ে পিছু হটে যায় ধাপ্পাবাজি করে।"

বৈরুতে ও পার্শ্ববর্তী আরবরা হা করে তাকিয়ে থাকল, মুরুব্বীদ্বয়ের কেউ এগিয়ে এল না। সব কল্পনা ধুলোয় মিলে গেল। তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের সত্তায় ও তাদের দীনী শিক্ষা, নিজেদের কল্যাণ বারতা, প্রতিভা, যোগ্যতা, নিজেদের মহান দা'ওয়াতী প্রোগ্রাম ও নিজেদের উত্তম আমলের ওপর ভরসা করা ও এসবের সাহায্যে পরিস্থিতির মুকাবিলা করা। অমুকের দয়া-দক্ষিণ্যের সাথে আমাদের ভাগ্য বিজড়িত, এমন ভাবা ও বলা চরম গলদ ও বোকামি। মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ সাহায্যকারী সহায়ক নেই। আল্লাহ্র মদদের পরবর্তী সহায়ক হলো নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা, নিজেদের স্বকীয়তা, কল্যাণ বারতা। আপনারা প্রমাণ করুন, দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য আপনারা অপরিহার্য অংগ। আপনাদের বাদ দিয়ে দেশ সঠিক পন্থায় গতিশীল থাকতে পারে না। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত পুঁজিতন্ত্র ও সম্পদ পূজা, ক্ষমতামোহ ও শক্তির পূজা, সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ দৃষ্টিভংগী ও আল্লাহকে না জানার পরিণতিতে সৃষ্ট

ব্যক্তি ও সৃষ্টির স্বার্থ সিদ্ধির প্রবল ধ্বংস ও অপ্রতিরোধ্য সয়লাব ও উত্তাল তরঙ্গের কবল থেকে রক্ষা করে দেশ নামক জাহাজটিকে তীরে ভেড়ানো যেতে পারে না। তাকে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না।

সালতানাতে আসিফিয়ার (দাক্ষিণাত্য) শেষ যুগ দেখেছেন এমন অনেক লোক এখনো আপনাদের মাঝে রয়েছেন। তার স্মরণ তাদের তিলে তিলে দহন করে চলছে। আমি বলতে চাই, এখন তা মনে করে আক্ষেপ-আফসোস করলে কী লাভ! আপনারা এক নতুন যুগের সূচনা করুন, উদ্বোধন করুন একটি নতুন জীবনের। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

سبق پڑھ پھر شجاعت کا صداقت کا عدالت کا
لیا جائیگا تجھسے کام دنیاکی امامت کا

"সবক লও সততা, সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতার,
আহূত হবে তুমি বিশ্ব নেতৃত্ব লাগি ফের।"

পুনরায় নেতৃত্ব ও ইমামতের অধিকার সৃষ্টিকারীর গুণাবলীতে গুণান্বিত হও। বিশ্বমানবতা তোমাদের হাতেই। বিশ্ব পরিচালনার লাগাম তুলে শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং ইমামত ও নেতৃত্ব ব্যতীত এ বিশ্ব যথাযথভাবে কল্যাণকর বিশ্বরূপে পরিচালিত হতে পারে না। গোটা ইতিহাস আমার এ দাবীর প্রমাণ। পাশবিকতা, মোহান্ধতা, বাহুবল ও সম্পদের জোরে দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন চালানোকে দেশ পরিচালনা বলা যেতে পারে না। আজ বাস্তবে আমেরিকায় চলছে কি? রাশিয়ার চলাকে প্রকৃত চলা বলা যায় কি? যে রুশ আর যে আমেরিকার ক্ষমতার যুগে এবং তাদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় এমন বীভৎসতার বিস্তার ঘটতে পারে যা সেদিন মঞ্চস্থ হলো বৈরুতে। বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দাদের এহেন জঘন্যতায় সন্তুষ্ট হতে পারেন? তিনি কি সহ্য করবেন এ বর্বরতা? তিনি কি অধিক সময় এ কীটদুষ্ট জীবন ও ক্ষমতার স্থায়িত্বের অবকাশ দেবেন? কবির ভাষায় ঃ

حذر اے چیرہ دستاں سخت ہے فطرت کی تعز یریں -

"সাবধান নেকড়ে জালিম! প্রকৃতির কঠিন বাঁধন বড় নির্মম।" আল-কুরআনে ভাষায় ان بطش ربك لشديد - "তোমার প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তার পাকড়াও কঠিন পাকড়াও। (অনুবাদক)

ঐ দু'টিকে (রুশ-আমেরিকাকে) তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। ওদের ছেড়ে দেয়া হবে না। ওরা বিশ্বটাকে

ভেবে রেখেছে একটা শিকার খেলার মাঠ। মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে হোলি খেলছে ওরা। ওদের জন্যও রয়েছে ইয়াওমূল হিসাব—হিসাব-নিকাশের দিন, পরিণতি ভোগের দিন, আর তা খুব দূরে নয়। যে বস্তু তার উপকারী সত্তা হারিয়ে ফেলে, সে তার স্থায়িত্বের অধিকারও হারায়। ইউরোপের বর্তমান মতবাদ হচ্ছে যোগ্যতমের বেঁচে থাকার অধিকার। (SURVIVAL OF THE FITTEST) কিন্তু আল-কুরআনের দাবী হলো 'অধিক উপকারী' ও মঙ্গলময়-এর টিকে থাকার অধিকার। অর্থাৎ শুধু উপযোগিতা ও দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, উপকারী ও কল্যাণকর হওয়াও অপরিহার্য। আল-কুরআনের ইরশাদ মতে ঃ

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً - وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ - كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ -

"অতঃপর বুদ্‌বুদ ও ভাসমান ফেনা (খড়কুটা-আবর্জনা) তাতো শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, আর মানুষের জন্য উপকারী যা (পানি) তা ভূগর্ভে সঞ্চিত হয় (থেমে থাকে)। এভাবেই আল্লাহ্ পাক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (যাতে তোমরা তা অনুধাবন কর)।" [রা'দ ঃ ১৭]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কোন জাতির নৈতিক অধঃপতন আগে শুরু হয়, আর রাজনৈতিক অধঃপতন হয় পরে। গ্রীক, রোম, সাসানী সাম্রাজ্য, প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য ও ইসলামী সালানাতসমূহের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। আমাদের দেশের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাঙ্গনসমূহের পরিচালকবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞদের কর্তব্য বাস্তবসম্মত ও সুদূরপ্রসারী গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা। তাদের প্রকম্পিত হওয়া উচিত সে ভয়াবহ নৈতিক অধঃপতন লক্ষ্য করে যার লেলিহান শিখা বেষ্টন করে ফেলেছে গোটা দেশকে এবং যার পরিণতিতে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে , এদেশের অর্থ-সম্পদ, মর্যাদা ও ব্যক্তি, স্বজন ও রাজনৈতিক স্বাথt—শুধু কটি বিষয়েরই বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং এগুলোই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে বিবেচিত হচ্ছে। এর বাইরে অবশিষ্ট রয়েছে শুধু তাত্ত্বিক দর্শন, ধর্মপ্রাণ ও ধর্মানুসারীদের সারল্য যা তাদের ক্রমান্বয়ে কোণঠাসা করে দেয়ালে ঠেকিয়ে দিচ্ছে এবং যা যুগের দৃষ্টিতে নির্বুদ্ধিতামাত্র আর ওয়াইজ বক্তাদের বাগাড়ম্বর, বাচালতা। সর্বাধিক ভয়াবহ ও আশংকাজনক ব্যাপার হলো এই,

আসমুদ্র-হিমাচল এ বিশাল ভূখণ্ডে এ আহ্বান ও বাণী কারো মুখেই প্রচারিত হচ্ছে না ঃ দেশবাসি! তোমরা চরিত্র শুধরে নাও, নৈতিকতার সংশোধন কর, মানবতার পাঠ নাও, দেশটাকে বাঁচাও। একজনও নেই! আমাদের দলে আস, অমুকের নেতৃত্ব বরণ কর, এমন আহ্বান দেয়ার জন্য রয়েছে হাজারো মুখ। কিন্তু এ অভিযোগ কেউ করছে না, যা কিছু হচ্ছে সব ভ্রান্তি, সব ভুল। এক দফায় অবশ্য সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে, তা হলো ঃ ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক যা কিছু হোক, আমাদের পতাকাতলে আমাদের পরিচালনায় ও আমাদের নেতৃত্বে সংগঠিত হোক।

মনের বেদনা, বেদনাহত মনের কান্না, দেয়ালের লিখন ও দিগন্তে উদীয়মান উত্থান-পতনের ভাগ্য-তারকার বিধি আমি আপনাদের সামনে রেখেছি, আপনাদের শ্রুতিতে পৌঁছে দিয়েছি। এখন আপনাদের, বিশেষত তরুণদের দায়িত্ব পছন্দ হলে তা কাজে লাগানো। আত্মরক্ষা করুন, নিজেরা বাঁচুন, অন্যদের বাঁচান। দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন। নিজেরা উপকৃত হোন। দেশ ও জাতির কল্যাণ করুন, ভাগ্যত্রাতা চিনে নিন।

# আলিম সমাজের পদমর্যাদা : ধৈর্য, অবিচলতা ও বাস্তবোপলব্ধির সমন্বয়

[এ বক্তৃতার স্থান ছিল এডভোকেট জামীলুদ্দীন সাহেবের বাসভবন। সময় ছিল ১৪ই অক্টোবর, ১৯৯৮ এর রাত। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল হায়দারাবাদের 'মাজলিস-ই ইল্‌মী'। উপস্থিত ছিলেন হায়দারাবাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলিম, মাদরাসাসমূহের ফুযালা শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক- মণ্ডলী। মাওলানা কারী মুহাম্মদ তাকীউদ্দীন কিরাআত তিলাওয়াত করেছিলেন। স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন মাওলানা রিযওয়ান কাসিমী। অতঃপর মাওলানা নদভী তাঁর ভাষণ পেশ করেন।]

হাম্‌দ ও সালাত-এর পর।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ -

"হে ঈমানদারগণ, দৃঢ় প্রত্যয়ে আল্লাহ্‌র জন্য ইন্‌সাফের সাক্ষ্যদাতারূপে অবিচল থাক।" [সূরা-আল-মায়িদা ঃ ৮]

হযরত সুধীমণ্ডলি! উলমা-ই কিরামের এমন মহতী সমাবেশে কিছু বলা বড় কঠিন ব্যাপার। একটি প্রাচীন প্রবচন রয়েছে, "স্থান-কাল ভেদে কথা বলতে হয়।" সুতরাং আমি এ গুরুত্বপূর্ণ ও মহতী মজলিসের ক্ষেত্র ও পাত্রের অনুকূলে বক্তব্য ও নিবেদন পেশ করতে যথাসাধ্য যত্নবান হব।

মনীষীরা ছোট ছোট ঘটনা ও চলমান জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অমূল্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ ময়দানে শায়খ সা'দীর প্রতিভা অনন্য। মাওলানা রুমীকে আখ্যায়িত করা হয় 'উপমা-সম্রাট' নামে। উভয় মনীষী দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী থেকে অতি সূক্ষ্ম হিকমত ও বিজ্ঞতাপূর্ণ সুগভীর নির্যাস আহরণ করতেন। আমিও আমার ক্ষুদ্র পরিসরে অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত একটি শিক্ষণীয় বিষয় পেশ করছি। আপনারা জানেন, আমি দিল্লী থেকে সুদীর্ঘ পথ সফর করে হায়দারাবাদ পৌঁছেছি। আল্লাহ্-ই জানেন, গাড়ী পথে পথে কত এলাকা অতিক্রম করেছে এবং কতবার দিক পরিবর্তন করেছে। কিন্তু আমাদের

দিকদর্শন (কম্পাস) সর্বদা আমাদের সঠিকভাবে কিব্‌লার দিক নির্দেশ করেছে। গাড়ির গতি বদল ও দিক পরিবর্তনের পরোয়া সে মোটেই করেনি। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। কিন্তু সেই সাথে প্রচণ্ড ঈর্ষাও হলো, অতি নগণ্য ও ক্ষুদ্রতর একটি জড় পদার্থ মানুষের তৈরী, অথচ কত বিশ্বস্ত, অবিচল, দৃঢ়, আত্মমর্যাদাশীল এবং কী বিস্ময়কর তার নিয়মানুবর্তিতা! সে ভ্রূক্ষেপ করেনি গাড়ির গতি পরিবর্তনের দিকে, আর না তা উদ্ভাবক মানুষ প্রাণীটির অহরহ চঞ্চলমতিত্বের দিকে। সারা পথই সে সঠিক কিবলাহ নির্দেশ করেছে এবং আমরা তার নির্দেশনায় আশ্বস্ত হয়ে সালাত আদায় করেছি। সেই সাথে তার আচরণে আমার (মনুষ্য) মর্যাদায়ও আঘাত লাগল। আবার এ শিক্ষাও হলো, দিকদর্শনতো সর্বদা কিব্‌লাহ্‌র দিক নির্দেশ করতে থাকল, সে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করেনি বা লক্ষ্যচ্যুত হয়নি, তার পদমর্যাদার কর্তব্য পালনে অবহেলা করেনি। তার আচরণে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, আলিম সমাজকে মূলত 'দিকদর্শক ' হতে হবে। তাদের মাঝে নিহিত থাকবে দৃঢ়তা ও অবিচলতা। হাওয়া যেদিক থেকেই আসুক আর পরামর্শদাতারা যতই আওড়াতে থাকুক, چلوتم ادھرکو ھواھو جدھرکی চালাও তরী সে দিকে, যে দিকে গতি বাতাসের এবং বুদ্ধি খায়রাতকারীরা যতই বদান্যতা দেখাক, زمانه باتو نه مازد تومانه ماز 'যুগ তোমার অনুকূলে না হলে তুমিই যুগের অনুকূল হও" আলিমগণ এ পরামর্শে উদ্বেলিত না হয়ে তাঁদের জীবনবোধ হবে দার্শনিক কবি ইকবালের শিক্ষা—যিনি উচ্চস্তরের ইংরেজী শিক্ষিত হয়েও ছিলেন ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক কবি)

حدیث کم نظر ان ہے توبازمانه بساز

زما نه باتونه سازد تو بازمانه ستیز

"যুগের সাথে তাল মিলাও উক্তি অনভিজ্ঞ দুর্ভাগার; যুগের ফ্যাশন হলে প্রতিকূল, তুমি হও যুগ নির্মাণকারী।"

ইকবালতো আরও জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

گفتند جہاں ما ایابتوی مازد ـ

گفتم که نمی مازد گتند که برهم زن ـ

"জিজ্ঞাসিল, আমাদের এ যুগ জগতের তোমার সাথে আছে কি সদ্ভাব? বলিনু, নহে সে অনুকূলে মোর; নির্দেশিল—চেপে ধর টুঁটি তার।"

যুগের চাহিদা, সমকালীন ফ্যাশন ও জীবন যাত্রা তোমার ন্যায়বোধের অনুকূল না হলে তুমি সবলে তার মোড় ঘুরিয়ে দাও। সময় ও যুগের চাহিদার দাস হয়ো না; তাকে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত কর, যুগস্রষ্টা হও।

সুধীবর্গ!

মুসলিম উম্মাহ্ বিশ্ব জাতির মাঝে ও আলিম সমাজ বিদ্বান সমাজের মাঝে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মুসলিম উম্মাহর গতি অভিন্ন হবে। কেননা তাদের রয়েছে একটি কিবলাহ্ লক্ষ্যবিন্দু। বিশাল বিশ্বের যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, ঐ এক কিব্লার দিকে তারা তাদের গতি ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। কোন জাতিকে একটি নির্দিষ্ট কিবলা দান করার অর্থ হলো এ কথার ইংগিত দেয়া, তোমাদের দিলের কিবলা, তোমাদের অভাব ও প্রয়োজনের কিবলা তোমাদের জীবন সাধনার লক্ষ্যবিন্দু। তোমাদের চিন্তা ও চেতনার আবর্তন কেন্দ্র হবে এক ও অভিন্ন। সালাত আদায়কালে বায়তুল্লাহ্ কা'বা শরীফ এবং চিন্তা ও কর্ম তথা জীবন সাধনার সব পদেক্ষপ নিয়ন্ত্রিত ও আবর্তিত অভিন্ন লক্ষ্যে, একমাত্র আল্লাহ্র (যিনি প্রকৃত মাবুদ ও মাকসুদ বা উদ্দেশ্য তাঁর) রিযামন্দী ও সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে।

উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলি!

আল্লাহর ফযলে শুধু ইল্‌ম ও জ্ঞানে অধিকারীই নন, বরং আল্লাহ পাক আপনাদের অধিষ্ঠিত করেছেন দ্বীনের নেতৃত্বের আসনেও, বিশেষত এ মজলিস-ইলমী যা আমাদের সমাবেশ ক্ষেত্র, এর গুরুত্ব সমধিক। আর তাই এ অবকাশে আমি দু'টি মৌলিক তথ্যের ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু আরয করার কামনা রাখি।

এক. আকাইদ, দ্বীনের আদর্শ, নীতিমালা ও শরীয়তের মূলবিধি সম্পর্কিত বিষয়। এ ব্যাপারে আলিম সমাজ অবিচল থাকবেন, হুবহু দিক দর্শক যন্ত্রের ন্যায়। ব্যক্তি যত অধিক প্রভাবশালী হোকনা কেন, দিকদর্শক তার পরোয়া না করে নির্ভুল দিক নির্দেশ করবেই। শরীয়তের মূলনীতি ও বিধিমালার ব্যাপার অনুরূপ। এখানে অবকাশ নেই কোন প্রকার ঢিলেমি বা নমনীয়তার। হিকমত ও কুশলতা ভিন্ন ব্যাপার। আর শিথিলতা ও নমনীয়তা ভিন্ন ব্যাপার মুদাহানাত কুশলতা ও শিথিলতার মাঝে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। সত্য কথাও তো মানুষ প্রজ্ঞা ও কুশলতার সাথে প্রকাশ করতে পারে। তবে তার পদ্ধতি অবশ্যই হতে হবে বিজ্ঞ কুশলতাসুলভ। আল- কুরআনে নির্দেশ রয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

"আহ্বান কর তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমত ও কল্যাণকর উপদেশের মাধ্যমে।" [বনী ইসরাঈল ঃ ১১৫]

কিন্তু তার অর্থ এ নয়, ঢিলেমির বা নমনীয়তা থাকবে। কারণ ইরশাদ হয়েছে ঃ وَدُّوْا لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ

"ওরা (কাফির সরদাররা) কামনা করে, তুমি একটু নমনীয় হলে (ঢিলা দিলে) ওরাও নমনীয় হবে।" [কলম ঃ ৯]

কিন্তু তা করার অবকাশ নেই। এখানে আকীদা ও মূলনীতিতে আপোষ নেই (আর এজন্যই আমাদের শ্রেষ্ঠ আলিমগণকে গোঁড়া ও মৌলবাদী অপবাদ সইতে হচ্ছে)। আর আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি ঘোষিত হয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ -

"অতএব, তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর আর মুশরিকদের উপেক্ষা কর।" [সূরা-হিজর ঃ ৯৪]

আয়াতের সমাপ্তি অংশ-'মুশরিকদের উপেক্ষা কর' দ্বারা আদিষ্ট বিষয় উদ্দেশ্যে প্রচারের ক্ষেত্র নির্ণীত করা হয়েছে অর্থাৎ যেখানেই তাওহীদ ও শিরক, আস্তিকতা ও একত্ববাদ এবং নাস্তিকতা ও অংশীবাদ পাশাপাশি সীমান্তে অবস্থান করবে, সেখানেই فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ অকুণ্ঠ বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠে আদিষ্ট বিষয়ে প্রকাশ্য প্রচারের কর্তব্য পালন করতে হবে। উদারতা, নমনীয়তা ও আপোষ রফা অন্য কোন ক্ষেত্রে হলেও হতে পারে, কিন্তু তাওহীদ, সুন্নাত, শরীয়তের সুস্পষ্ট ভাষ্য ও দ্বীনের অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বিষয়সমূহের বিধান হলো ঃ বজ্র নির্ঘোষে প্রচার চালাও। "প্রকাশ্যে প্রচার কর" নির্দেশ যদি সার্বিক হতো অর্থাৎ তার সাথে কোন ক্ষেত্রের সংযুক্তি উল্লিখিত না হতো, তাহলে ফাঁক-ফোকড় বের করার অবকাশ থেকে যেত। কিন্তু اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ "মুশরিকদের উপেক্ষা করে চল" আয়াতাংশ তার স্থান ও পাত্রের স্পষ্ট তাফসীর ও ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং উলামা-ই-কিরামের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য তাওহীদের ব্যাপারে গোঁজামিলবিহীন দ্ব্যর্থতামুক্ত পরিষ্কার কথা বলে দেয়া। তবে তা হিকমতের সাথে হতে হবে অবশ্যই। তা যেন এমন না হয় (কবি গালিবের ভাষায়)

ع کہتے ہیں وہ بھلے کی لیکن بری طرح -

"বলেতো তারা ভালোই; কিন্তু মন্দ করে বলে, বরং উত্তম কথা প্রকাশ করতে হবে উত্তম পদ্ধতিতে।

কখনো কোন ফিৎনা, কোন হাঙ্গামা দেখা দিলে প্রাথমিক পর্যায়ে আলিমগণ সযত্নে কোমল ভাষা ও কল্যাণকামিতার বাচনভংগী ব্যবহার করবেন, হিকমত ও ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করবেন। কিন্তু লক্ষণীয় হবে যেন অপব্যাখ্যা বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি না হয়। মনীষীদের এ কুশলী কর্মপদ্ধতির সুফলস্বরূপ আজ পর্যন্ত এ দ্বীন অবিকৃত বিদ্যমান রয়েছে। দুধ আর পানির মিশ্রণ ঘটেনি। খাঁটি ও ভেজাল ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। এ পদ্ধতি অবলম্বনের পরেও কারো ধ্বংস হওয়ার সাধ জাগলে সে নির্বিঘ্নে তার সাধ পূরণ করুক! কিন্তু শরীয়ত ও তার বাহকদের দোষারোপ করার অবকাশ পেতে পারবে না। ইতিহাসের ব্যাপক ও সুগভীর অধ্যয়ন থেকে জানা যাবে, এ উম্মতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটি বছরও এমন অতিবাহিত হয়নি, যখন সার্বিকভাবে এ উম্মত গোমরাহী ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। স্থানীয়ভাবে বিভ্রান্তি অনেক ঘটেছে কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মাহ কখনো সর্বব্যাপক ও সার্বজনীন গোমরাহীর শিকার হয়নি। হাদীস শরীফেও তো রয়েছে ঃ

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِى عَلَى ضَلَالَةٍ -

"আমার উম্মত কোন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে সমষ্টিগত ঐকমত্যে উপনীত হবে না।" এর প্রতিপক্ষে রয়েছে ইহুদীবাদ ও খ্রিস্টবাদ। ইহুদীবাদতো তার সূচনাতেই বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার প্লাবনে ভেসে গিয়েছে। খৃষ্টবাদ তার শৈশব কাল থেকে চলতে শুরু করেছে রাজপথ ছেড়ে বাঁকা মেঠো পথ ধরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে তার সে বক্র গতি। পবিত্র কুরআন তাই খ্রিস্টানদের আখ্যায়িত করেছে ضالين 'বিভ্রান্ত' নামে। প্রথম চলার মুহূর্তেই সে ধরেছিল ভিন্ন পথ, কিন্তু আল্‌হামদুলিল্লাহ্! ইসলাম রয়েছে সুরক্ষিত। তাওহীদ ও শির্‌ক-এর পার্থক্য, সুন্নত ও বিদআতের ব্যবধান, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের ভিন্নতা ও অমুসলিমদের জীবন ব্যবস্থা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইসলামী জীবন বিধান ও তাহ্‌যীব-তামাদ্দুনের পার্থক্য আজো সুস্পষ্ট রয়েছে। কোন বিশেষ সময়ে কোন বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কারণে কোন দেশ বা দেশবাসীর কোন ফিৎনা ও চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার কথা স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রেও আলিম সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেন নি, বরং তখনও যথাসাধ্য শক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগে তার প্রতিরোধ তৎপরতায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তার ক্ষতির প্রভাব দূরীকরণ ও সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছেন। সার্বিকভাবেই মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ـ

"ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়িয়ে যাও ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসাবে।" আমাদের ব্যবহারিক ভাষায় খোদায়ী ফওজদার একটি কটাক্ষসূচক শব্দ রয়েছে। এভাবে বলা হয় ঃ আপনি কি খোদায়ী ফওজদার নামে যে এমন এমন? (বাংলাদেশে এর কাছাকাছি ব্যবহার রয়েছে ইসলামের ইজারাদার) ; কিন্তু قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ (আল্লাহর অতন্দ্র প্রহরী কথাটি খোদায়ী ফওজদার-এর প্রায় সমার্থবোধক। قَوَّامِيْنَ শব্দটি মুবালাগাহ অর্থজ্ঞাপক গুণবাচক বিশেষ্য) শব্দ রূপ 'খোদায়ী ফওজদার' হওয়ার পদ মর্যাদাই প্রকাশ করছে। قَائِمِيْنَ لِلّٰهِ (সাধারণ গুণবাচক বিশেষ্য) হলে এতখানি অর্থ হয়ত হতো না। এখন আয়াতের অর্থ হলো, কারো চাহিদা থাক বা না থাক, কেউ সন্ধান করুক কিংবা না করুক, কেউ আহ্বান করুক কিংবা না করুক, আপনাকে আপনার কর্তব্য পালন করেই যেতে হবে। আপনাকে সর্বত্র পৌঁছে যেতে হবে। আয়াতে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়ে থাকলেও আলিম সমাজের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে, তাঁরা হবেন شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ হক, সত্যবাদিতা, ন্যায় ও ইনসাফের সাক্ষী এবং অতন্দ্র প্রহরী ও পতাকাবাহী। মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব যদি হয় বিশ্ব জাতিসংঘের তত্ত্বাবধান ও পাহারাদারী করা, তাহলে আলিম সমাজের (অতিরিক্ত) দায়িত্ব হলো ইসলামী উম্মাহ ও মুসলিম সমাজের তত্ত্বাবধান করা ও খোঁজ-খবর নিতে থাকা। এ দিকে লক্ষ্য রাখা, উম্মাহ্‌ ও সমাজ সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে হটে যাচ্ছে নাতো! সরল রেখা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে নাতো! এ ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব বাতাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণায়ক ব্যারোমিটার-এর সাথে হুবহু তুলনীয় যা যে কোন সময় যে কোন স্থানে বায়ু চাপ নির্দেশ করে। সব মওসুমেই বাতাসের গতি-প্রকৃতির সঠিক সংকেত প্রদান করে।

মহাত্মনবর্গ! আলিম সমাজের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো মুসলিম জনতাকে জীবনের বাস্তবতা, দেশের পরিস্থিতি ও পরিবেশ-পরবর্তী চাহিদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর প্রদান করে তাদের সদা অবগত ও সতর্ক রাখা। আলিমদের প্রচেষ্টা সব সময় অব্যাহত থাকবে যেন পরিবেশ ও জীবনের সাথে দ্বীন ও মুসলিম সমাজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এবং খেয়ালী ও কাল্পনিক জগতে তারা বিচরণ করতে শুরু করলে দ্বীনের আওয়ায তার প্রভাব ক্রিয়া হারিয়ে ফেলবে; আলিমগণ তাদের দাওয়াত ও ইসলাহী সংস্কারের কর্তব্য পালন করতে সক্ষম

হবেন না। শুধু এ পর্যন্তই নয়, বরং দ্বীনের বাহকদের পক্ষে এ দেশে টিকে থাকা সুকঠিন হয়ে পড়বে। ইতিহাস আমাদের এ শিক্ষাই দেয়, যেখানে আলিমগণ অন্য সব কিছু করেছেন, কিন্তু উম্মতকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করেন নি, পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করেননি, একজন সুনাগরিক ও রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ক অংগরূপে গড়ে ওঠার, দেশ ও জাতির নেতৃত্বে প্রদানের যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন নি, সে দেশ সে সমাজ ও জাতি মুখের (বিস্বাদ) গ্রাস উগরে দেয়ার মতই অমন লোককে উৎখাত করে দিয়েছে। উগরে দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছে; কারণ তারা নিজেদের জন্য অবস্থান ক্ষেত্র ও টিকে থাকার ব্যবস্থা করে রাখেনি।

আজ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন দূরদর্শী বুদ্ধি-দীপ্ত ও বাস্তবপন্থী ধর্মীয় নেতৃত্ব। আপনারা যদি মুসলমানদের শতকরা এক শ' জনকেও মুত্তাকী পরহেযগার ও তাহাজ্জুদ আদায়কারীরূপে গড়ে তোলেন আর পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ও সংযোগ না থাকে এবং তাদের এ খবর না থাকে যে, দেশ কোন্ রসাতলে যাচ্ছে, দেশে ও সমাজে চরিত্রহীনতা প্লাবন ও মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করছে এবং দেশময় মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে, তাহলে ইতিহাস সাক্ষী, সেরূপ পরিস্থিতিতে তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয আদায় করাই হয়ে পড়বে কঠিন। আপনারা যদি দেশের মাটিতে দীনদারদের নির্বিঘ্ন বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে অসমর্থ হন, তাদেরকে এমন নিঃস্বার্থ, একনিষ্ঠ ও সুসভ্য নাগরিকরূপে প্রমাণিত করতে না পারেন যারা দেশ ও জাতিকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করার জন্য সদা অস্থির থাকে এবং যারা রাখবে উন্নত ও আদর্শ অবদান, তাহলে মনে রাখবেন যিকির-আযকার, নফল ইবাদতসমূহ ও দ্বীনের আলামত ও প্রতীকসমূহ রক্ষা পাওয়াতো দূরের কথা আল্লাহ্ না করুন এমন সময়ও আসতে পারে যে, মসজিদগুলো বিদ্যমান থাকাও কঠিন হয়ে পড়বে। মুসলমানদের পরিবেশ বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভিন্‌দেশী বানিয়ে রাখলে জীবনের বাস্তবতার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে থাকলে এবং দেশের বুকে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে, নতুন নতুন জারিকৃত বিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞাত রাখলে, জনজীবনে ও জনতার মেধা-মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তারকারী অনুভূতিসমূহের বিষয়ে উদাসীন থাকলে তার পরিণতি হবে নেতৃত্ব দেয়া (যা উম্মতের জাতীয় কর্তব্য) তো পরের কথা, তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই হবে কঠিনতম চ্যালেঞ্জ।

মিসরবিজয়ী সাহাবী হযরত আম্‌র ইবনুল আস্ (রা.)-এর ঈমানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্ভবত এ কথা প্রতিভাত হয়েছিল, সদ্য বিজিত এ মিসর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বরং হাজার হাজার বছর ইসলামের ছায়ায় পরিচালিত হবে। কারণ তিনি দেখলেন, ইসলামের কেন্দ্রভূমি পবিত্র হিজায মিসরের নিকট দূরত্বে অবস্থিত। আর রোমান সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত হয়েছে, কিবতী (ফিরআ'ওনের বংশধর ও অনুসারী) খ্রিস্টানদের রাজত্বও শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং মিসর আজ থেকে অনাগত ভবিষ্যতের জন্য ইসলামী বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি আরবদের ও মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ তোমরা প্রতি মুহূর্তে সীমান্ত রক্ষায় ও যুদ্ধের ময়দানে রয়েছ। তোমরা হবে অতন্দ্র প্রহরী। এক পলকের জন্য চোখ বন্ধ করলে মৃত্যু অবধারিত। সীমান্ত চৌকিতে অবস্থানকারী সিপাহীকে প্রতি মুহূর্তে সজাগ সতর্ক থাকতে হয়। কোন প্রকার উদাসীনতা ও অসতর্কতার অমার্জনীয় অপরাধ এবং ঢিলেমি ও অবহেলা কিংবা অসতর্কতার অভিনয়ও মুহূর্তে ঘটাতে পারে তার করুণ পরিণতি।

সুধীমণ্ডলি! যে দেশের বুকে আমরা এখন আমাদের জীবন অতিবাহিত করছি, সে দেশটির পরিস্থিতি দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এ দেশটি বড় হলেও সে তার প্রতিবেশী দেশসমূহ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রভাব হতে বেপরোয়া হতে পারে না এবং পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বেও উঠতে পারে না। এদেশে এখন চলছে নিত্য-নতুন আদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনেক নেতিবাচক শক্তি ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তারা অতিশয় তৎপর ও অতি তরিৎকর্মা। শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে অহরহ রদবদল, কখনো তীব্র আঘাত হানছে দ্বীন ও আকীদার মূল ভিত্তিসমূহে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন ও রাষ্ট্রীয় ভাষার বিষয়টি নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটিয়েছে। এহেন অবস্থায় অব্যাহতভাবে পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করতে থাকা আমাদের কর্তব্য। আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে থাকা আমাদের দায়িত্ব।

উল্লিখিত কর্তব্য পালনের সাথে সাথে মুসলমানদের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করে তাদের বলে দিন, এ দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। তোমরা ঈমানদার-আমানতদার হয়ে, নীতিবান হয়ে, দেশ ও জাতির জন্য কাজের লোক হয়ে এ মাটিতে অবস্থান কর। তোমরা এখানে উপস্থাপন কর হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের দৃষ্টান্ত। তাহলে এমন সময়ও তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে যখন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, অধিকতর সঙ্গীন ও অধিক জটিল দায়িত্ব সোপর্দ করা হবে তোমাদের হাতে। আল্লাহ পাক ইউসুফ

আলায়হিস্ সালামকে বিশেষ দু'টি গুণ দান করেছিলেন–সংরক্ষণ সততা ও বিষয় অভিজ্ঞতা। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন, মিসর ও তার বাসিন্দাদের যা অবস্থা তাতে নিজের যোগ্যতা-দক্ষতা, কল্যাণকামিতা, মানবপ্রেম ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত এবং আল্লাহর বান্দাদের নিজের প্রতি আগ্রহী করে তোলার পূর্ব পর্যন্ত এ দেশে এ মাটিতে দ্বীনের প্রচার ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে না, বরং ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি না করে এক আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করাও হবে ভয়াবহ ব্যাপার! তিনি অসীম দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ধীরে অগ্রসর হতে থাকলেন লক্ষ্যের দিকে। আমরা যারা এখানে মুসলমানরূপে বাস করছি, আমাদেরও প্রমাণ করে দিতে হবে, এদেশ এ সমাজ আমাদের বাদ দিয়ে চলতে পারে না। আমাদের অনুপস্থিতি এদেশকে করে দেবে ধ্বংসের মুখোমুখী।

মনে রাখবেন, আমরা যদি দেশের পরিস্থিতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখি এবং তাতে প্রবাহিত অনুকূল-প্রতিকূল ও উষ্ণ-শীতল বায়ুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে থাকি, আমরা যদি উষ্ণতা ও আর্দ্রতামুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসস্থানের কল্পনা বিলাসে গা ভাসিয়ে দিই এবং তাতে জীবনকে নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্ত মনে করতে শুরু করি, তা হলে মনে রাখবেন, আমরা নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ ডেকে আনব। নিজেদেরই ঘটবে আত্মাহুতি, সাথে সাথে দ্বীনেরও অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। কেননা কোন দল উপদল কিংবা দেশের বাসিন্দাদের একটি অংশ অপরাপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকতে পারে না।

তবে বৃহত্তর জীবন ধারার সাথে সংযোগ রক্ষা অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ এবং তার জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট সীমানা ও চৌহদ্দি। আমি বলছি না, আপনারা তরলীভূত হয়ে আপনাদের সত্তা বিলীন করে দিন, বরং আপনারা অবিচল থাকুন আপনাদের পয়গাম ও বিশ্বজনীন দাওয়াত প্রচারে। আপনারা টিকে থাকুন আপনাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আপনারা পূর্ণ মাত্রায় ধরে রাখুন আপনাদের ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বর্জনেও আপনারা কঠিনভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন, কিন্তু বৃহত্তর জীবন প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন না। আমি 'জাতীয় জীবন' স্রোতের কথা বলছি না। আল্লাহ না করুন, জাতীয় ধারায় বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা যেন কোনদিনই আমার মুখ থেকে না বেরোয়। একবারও না। আমি বলছি, আপনারা 'জীবন স্রোত' থেকে হারিয়ে যাবেন না। কারণ জীবনের গতিধারা থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়, তারা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল তলে। জীবনধারীদের মাঝে তার অধিকৃত কোন স্থান থাকে না। ইসলামকে আমি এত সংকীর্ণ, গণ্ডিবদ্ধ ও অপূর্ণাংগ বিশ্বাস

করতে পারি না যে, পরিস্থিতি ও জীবনের বাস্তবতার দিকে মনোযোগ দিলেই ফরয-ওয়াজিব অনাদায়ী থেকে যাবে, 'আকিদা ও মৌলিক আদর্শ' বিশ্বাসে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। আমাদের বুযুর্গ পূর্বসূরিগণ শাহানশাহী পরিচালনা করেছেন, সাম্রাজ্যের কর্ণধার হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের তাহাজ্জুদে পর্যন্ত অনিয়ম দেখা দেয়নি। কোন সাধারণ ক্ষুদ্র সুন্নতও বর্জন করতে হয়নি। হযরত সালমান ফারেসী (রা.)-এর ঘটনা শুনুন। তিনি তখন ইরাকের রাজধানী মাদায়েনে অবস্থান করছেন। একদিন খাবার কালে খাদ্যের কিছু অংশ মাটিতে পড়ে গেলে তা সযত্নে তুলে নিয়ে পরিচ্ছন্ন করে তিনি খেয়ে ফেললেন। কেউ বলে উঠল, আরে, আপনি গর্ভনর হয়েও এমন করছেন! এতে যে ইজ্জত যায়! তিনি কি জবাব দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, তোমাদের মত আহ্মক নির্বোধদের খাতিরে আমি আমার হাবীব প্রিয়তমের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সুন্নত ছেড়ে দেব?

ব্যাপার এমন নয় যে, আগুনের উপস্থিতিতে পানি থাকতে পারবে না আর পানি এসে পড়লে আগুন নিভে যাবে। এ ধারণা ভ্রান্ত। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অবিচলতা, তাক্ওয়া নীতি ও অধিক ইবাদতের মাধ্যমেই একজন মানুষ সফল সুনাগরিক হতে পারে। আমি তো মনে করি, যারা বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং নীতি ও কর্তব্যে নিয়মানুবর্তী হয়, তারাই হতে পারে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর নাগরিক।

আজকের দিন শুধু ভারতেই নয়, সব সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ, এমন কি আরব দেশসমূহের অবস্থাও অনুরূপ। ইউরোপ ও আমেরিকার উষ্ণ হাওয়ার ঝাঁপটা লেগেছে সর্বত্র। মাথা চাড়া দিচ্ছে নতুন নতুন ফিৎনা-হাংগামা। সংঘাত-সংঘর্ষ চলছে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের। পরবর্তী যুগে নতুন নতুন চাহিদা ও জীবন-ধারায় নতুন নতুন সমস্যা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। সেসব দেখেও না দেখা এবং 'ওসব কিছু নয়' বলা নিতান্তই ভুল। বাস্তবতাবোধ, উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সার্বজনীনতার প্রমাণ পেশ করার প্রকৃষ্ট ও বৃহত্তর ক্ষেত্রের অবকাশ রয়েছে হায়দারাবাদে। এখানে রয়েছে ইল্ম ও শিক্ষার প্রসার, আমল ও কর্ম অবদানের প্রেরণা। এখানে স্থাপিত হচ্ছে নতুন নতুন সংস্থা সংগঠন, জন্ম নিচ্ছে নীতি ও দাওয়াতী আন্দোলন। কিন্তু মুসলমানদের মৌলিক অভাব রয়েছে সামগ্রিক নেতৃত্বের। তাদের প্রয়োজন রয়েছে নির্ভুল পরামর্শের। আমাদের করণীয় বিষয় দু'টি। এক. আকীদা, ধর্ম বিশ্বাস, নীতি, আদর্শ ও শরী'য়তের অপরিহার্য অকাট্য

বিধানমালার ব্যাপারে পাহাড়তুল্য অবিচলতা ও ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা। দুই. জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর ব্যাপারে পূর্ণ উপলব্ধি, পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা, সম্পূর্ণ সচেতনতা ও ভরপুর সমবেদনা। এ দু'য়ের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হলে ইনশাআল্লাহ বিপদসংকুল পরিস্থিতি তো কেটে যাবেই, সেই সাথে একান্ত আশা করা যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাদের নাগালে এসে যাবে এ দেশের নেতৃত্ব।

মুসলমানদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনা ও নাগরিক কর্তব্যবোধ (Civil Sense) জাগ্রত করুন। যে গ্রাম, যে মহল্লা, যে বস্তিতে তারা বসবাস করবে, সেখানে পরিদৃষ্ট হবে অনন্য স্বাতন্ত্র্য। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে, এটা মুসলমানদের মহল্লা, এগুলো মুসলমানদের বাড়ি-ঘর। দ্বীনের প্রকৃত রূহ্, জীবনী শক্তি ও তার বাহ্যিক প্রতীক আবরণ সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের করণীয় হচ্ছে কর্তব্যসচেতন নাগরিক জীবন যাপন, মানবতা প্রেম, বাস্তবতার উপলব্ধি, বুদ্ধিমত্তা, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা, বিপদের মুহূর্তে দেশ রক্ষা ও দেশের খিদমতে আত্মনিবেদন ও বিপদ বরণ করে নেয়া। আপনারা (আলিম সমাজ) এ বিষয়ে আদর্শ হন; মুসলমানদের তৈরি করুন দৃষ্টান্ত ও আদর্শরূপে।

وصل الله تبارك وتعالى سيدنا مولنا محمد واله وصحبه وسلم-

# অনৈসলামী প্রথা বর্জন অত্যাবশ্যক

[হায়দারাবাদের মীর আলম পুকুর এলাকায় অবস্থিত জামিয়া' আরাবিয়া দারুল উলুমে সমবেত উলামা', মাদরাসা শিক্ষকবৃন্দ, আরবী শাখার ছাত্র ও শহরের মান্য-গণ্য ব্যক্তিবর্গের সমাবেশে ১৯৮২ ইং ১৪ই অক্টোবর সকাল দশটায় এ বক্তৃতা হয়। একজন কারী সাহেব উদ্বোধনী কিরাত তিলাওয়াত করেন। তবে লক্ষ্যণীয়, কারী সাহেব সভা-সমাবেশে সাধারণভাবে প্রচলিত পঠিতব্য কিরাত তিলাওয়াত না করে সূরা বাকারার ১০৪-১০৫ আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন।]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا.......

এ যেন ছিল গায়বী ইশারা। অতিথিবক্তা আয়াতদ্বয়ের আলোকে হায়দারাবাদের তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনার অবকাশ পেয়েছিলেন। হায়দারাবাদে প্রচলিত কুপ্রথা-কুসংস্কারগুলোর মাঝে তখন 'চামর দোলা মিছিল' নিয়ে মাযারে ওরছ পালন করার হিড়িক চলছিল এবং এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের রূপ ধারণ করেছিল। বক্তা আয়াতের আলোকে মুসলমানদের জন্য অনুকরণ বর্জনের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ব ব্যক্ত করেন।

এ সমাবেশে উদ্বোধনী বক্তৃতা করেছিলেন দারুল উলুমের বিল্ডিং ফান্ড কমিটির সভাপতি এবং 'রাহ্নুমা-ই-দাকান' (দাক্ষিণাত্য দিশারী) পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর জনাব সাইয়েদ লাতীফুদ্দীন কাদির সাহেব।]

হাম্‌দ ও সালাত!

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

সুধীবৃন্দ!

আজকের মজলিসের কারী সাহেব এ আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন। আমিও তা তিলাওয়াত করলাম। আয়াতের সহজ সরল অর্থ হলো–হে ঈমানদার লোকেরা! راعنا (রা'ইনা) শব্দ বলবে না, انظرنا (উন্‌যুরনা) বলবে এবং মনোযোগের সাথে নবীর কথা শুনবে। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।" আমাদের জেনে রাখা কর্তব্য আর যাদের জানা রয়েছে তাদের তা সজীব রাখা বাঞ্ছনীয়, এ আয়াত কোন্ পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল, আমাদের কাছে তার দাবী কি এবং তাতে আমাদের জন্য রয়েছে কী পয়গাম?

راعنا, আরবী ভাষার বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল শব্দ। অর্থ 'আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য দিন।' (শ্রোতাদের প্রতি) একটু অনুগ্রহ-মনোযোগ দিন। আবার انظرنا - ও আরবী ভাষার বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল শব্দ যার অর্থ আমাদের জন্য ক্ষণিক অপেক্ষা করুন, কথাটি শুনে-বুঝে নেওয়ার মত বিরতি ও অবকাশ আমাদের দিন। দু'টি শব্দ আরবী ভাষার প্রচলিত শব্দ, নিখুঁত শব্দ। কিন্তু ব্যাপার কি? আল্লাহ পাক একটি শব্দ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত তিলাওয়াত চলবে যে মহান কিতাবের, তাতে এ শব্দ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হচ্ছে। শুধু কি তা-ই? প্রাথমিক যুগ শেষ হলো। কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুরু হলো এমন সব দেশেও আরবী যাদের মাতৃভাষা নয়, আরবী সেখানে কথ্য-লেখ্য ভাষা নয়। কিন্তু আপাতবিচারে এ ক্ষুদ্র বিষয়ের নিষেধাজ্ঞাকে এত গুরুত্ব প্রদান করা হলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের দেশে দেশে পঠিতব্য কুরআন বহু ভাষায় তরজমা ও অনুবাদ হবে যে কুরআনের তাতে স্থান দেয়া হলো এ নিষেধাজ্ঞাকে। কিন্তু কেন? বিষয়টি ভেবে দেখার উপযোগী। শব্দটি কী অপরাধ করেছিল যে তাকে অপাংক্তেয় ঘোষণা করে তারই সমার্থক অন্য শব্দ লিখিয়ে দেয়া হলো : এটা বলবে, ওটা বলবে না। উচ্চারণেও বিধি-নিষেধ!

মূল ব্যাপারটি মনস্তাত্ত্বিক! পৃথিবীর বুকে যে ব্যক্তি, যে দল বা জামা'আতের নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার অভিযোগ থাকে, যারা অবিচারের শিকার মনে করে নিজেদের এবং হীনমন্যতায় আক্রান্ত হয়, তারা উপহাসমূলক ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে এবং কথার তুবড়ি দিয়ে মনের ঝাল মেটাতে চেষ্টা করে। এতে তারা কিঞ্চিত প্রবৃত্তি সুখ উপভোগ করে তাতে মনকে সান্ত্বনা দেয়। উর্দু ভাষায়ও এ ধরনের নিষ্পাপ শব্দ রয়েছে যা বাহ্যত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। কিন্তু নিকৃষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'আপনি তো বড় উস্তাদ' (বেশ ভদ্রলোক, (লাখণৌ বসবাসের সুবাদে এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে।)

নবী আলায়হিস্ সালামের দরবারে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, কোন আলোচনা শুরু হলেই তারা অতি আগ্রহ দেখিয়ে বলত : راعنا, (আমাদের প্রতি একটু দৃষ্টি দিন, কথাটি বুঝে নেয়ার সুযোগ দিন) কিন্তু তারা এ শব্দটি একটু টানসহ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করত যার ফলে শব্দটি راعينا, হয়ে যেত। তার অর্থ হলো 'আমাদের রাখাল'। পরিচ্ছন্ন ও মেধার লোকদের মন এ অর্থের দিকে ধাবিত হতো না যে, এখানে রসিকতা ও উপহাস করা হচ্ছে। ইহূদীদের এ আচরণের কারণ ছিল, তাদের ধারণা মতে ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ইয়া'কূব আলায়হিস সালামের বংশধর ব্যতীত পৃথিবীর অপর সব জাতির লোকেরা ছিল

তৃতীয় শ্রেণীর এবং পশু ও জড়বস্তুতুল্য। অ-ইহুদীদের জন্য আজও, তাদের ভাষায় অ-ইহুদীদের উদ্দেশ্য প্রয়োগ করার জন্য Gentile শব্দের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে যার অর্থ 'ধর্মহারা বা ম্লেচ্ছ'। তারা বিশ্বাস করত এবং দাবীও করত, উম্মী ও নিরক্ষর আরববাসীদের সাথে যে কোন ধরনের আচরণ বৈধ। তাদের সাথে মিথ্যা বলা অপরাধ বা মিথ্যা নয়। তাদের কোন জিনিস আত্মসাৎ করা চুরি নয়। তাদের নির্যাতন করাতে পাপ নেই। এই মনোভাব উল্লিখিত হয়েছে তাদের দাবী মক্কীয় আল-কুরআনে। এই আয়াত তারা বলত ঃ

لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ -

"উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ হবে না।"

সাহাবা-ই-কিরামের সরল মনে তাদের এ দুরভিসন্ধি ধরা পড়েনি। কিন্তু আল্লাহ্ পাকতো সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞ। তিনি তো 'লাহ্নূল তথা কাওল' কথার সুর ও ভংগীর গুপ্ত উদ্দেশ্যও জানেন। সুতরাং চিবিয়ে চিবিয়ে অস্পষ্টতা, আঞ্চলিকতার রেশ ধরে টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণের বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। আল্লাহ্ পাক সাহাবীগণকে পথ-নির্দেশ করলেন, আরবী ভাষার শব্দসম্ভারে ঐ অর্থ প্রকাশ এই একটি মাত্র শব্দে সীমিত নয়; কাজেই তোমরা رَاعِنَا না বলে اُنْظُرْنَا বলবে। কেননা দ্বিতীয় শব্দটিতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ নেই।

এখানে লক্ষ্যণীয়, একটিমাত্র শব্দের ব্যাপারেও আল্লাহ্ পাক সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দিচ্ছেন যাতে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয় এবং মুসলমানদের মুখ থেকে এমন কোন শব্দ উচ্চারিত না হয় যা নবুওতের যথাযথ মর্যাদার উপযোগী নয়। তাহলে অমুসলিমদের আচার-আচরণ ও প্রথা-প্রতীক, যাতে তাদের বিশ্বাস, দেবদেবী ও পৌত্তলিক দর্শন প্রতিবিম্বিত হয়, তার অবলম্বন কিভাবে বৈধ হতে পারে? আয়াতখানি আল-কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার পেছনে নিহিত রহস্য ও হিকমত এটাই। বিগত রমযানে আপনাদের তারাবীহ্ সালাতেও এ আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে। তা থেকে গেলে কুরআনের খতম পূর্ণাঙ্গ হতো না এবং ভুলে থেকে গেলে শেষ দিকে পড়ে নেয়ার কড়া তাগিদ দেয়া হতো।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ঃ এ ঘটনা ও নির্দেশের পক্ষদ্বয় ইহুদী ও মহান আনসার মুহাজিরগণের যুগ তো আর এখন নেই, সুতরাং এখনও তার বিধান অব্যাহত বিদ্যমান থাকার হিকমত ও ফায়দা কি? জবাবে আমি বলব, এর রহস্য ও উদ্দেশ্য হলো স্থায়ীভাবে এ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা যে, কোন ভিন্ন জাতির কূট

অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত একটি শব্দ ব্যবহার করাই যখন নিষিদ্ধ হলো, তাহলে ভিন্ন জাতির নিজস্ব আচার-প্রথা, তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক প্রতীক আচরণসমূহ গ্রহণ করা কি অনুমোদিত হতে পারে? অতএব, এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, অন্যরাতো শোভাযাত্রা ও মিছিল করে তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি প্রকাশ করে থাকে, তাহলে আমাদেরও অনুরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত। ওরা মন্দির উৎসবে পতাকা তোলে, তাই আমাদেরও পাঙ্খা মিছিল (চামরদোলা) নিয়ে মাযারে ওরস করা উচিত। হযরত উমর (রা)-এর প্রশংসায় ইরশাদ হয়েছে, "উমর (রা.) যে রাস্তায় পথ চলে শয়তান সে রাস্তা ত্যাগ করে অন্য পথ ধরে।" আমাদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য যাতে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হই এবং তাওহীদ ও সুন্নত অনুসরণের পথ থেকে আমাদের পদস্খলন না ঘটে; আমরা ভিন্ন কোন সীমান্তে তাড়িত না হই। মাত্র একটি শব্দের ব্যাপারেও যদি আল্লাহ পাকের গায়রত ও মর্যাদাবোধে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত ও আজ পর্যন্ত অভিধান ব্যবহারে বিদ্যমান رَاعِنَا (রায়েনা) শব্দটির ব্যবহার মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হতে পারে, তাহলে অমুসলিমদের ও জাহিল জাতিসমূহের রীতি ও প্রথা গ্রহণ করে তাদের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের সঙ্গে একাত্মতা দেখানো আল্লাহ পাকের অসীম মর্যাদাবোধ কম্পিত হয়ে উঠবে না কি?

ভারতের অমুসলিম বাসিন্দাদের বন্ধন শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর ধর্ম ও সমাজের সংযোগ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশে তাদের ধর্ম ও সমাজ নেতারা এ সব অনুষ্ঠান, সমাবেশ ও জাঁকজমকের প্রচলন ঘটিয়েছে। কারণ এসব না করলে তাদের ধর্ম ও সমাজের মাঝে সংযোগ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাদের সমস্যা বা উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের দাসত্বের স্বীকৃতি বা তার পূজা করার নয়। তাদের সমস্যা হলো, হিন্দু ধর্মও একটা ধর্ম, কিন্তু তার পরিচয় দানের উপায় কি? এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠান-শোভাযাত্রা আবিষ্কার করেছে। রামলীলা, দশরা, হোলি, দেয়ালী এবং বাংলাদেশে দুর্গা, কালী, সরস্বতী পূজা ও দাক্ষিণাত্যের গণপতি পূজা উৎসব এ সবই ঐ উদ্দেশ্যেই রচিত।

পক্ষান্তরে ইসলাম একটি প্রাণবন্ত ও সজীব ধর্ম। তার রয়েছে প্রাণ-শক্তি, স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও জীবন্ত রীতিনীতি ও প্রতীক। এ সবের সঠিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে একটি ঘটনা থেকে। একদিন জনৈক ইহুদী আলিম হযরত উমর (রঃ)-এর খিদমতে নিবেদন করলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাব

(আল-কুরআন) এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা আপনারা অহরহ তিলাওয়াত করে থাকেন। তেমন আয়াত যদি আমাদের ইহুদীদের জন্য নাযিল হতো, তা হলে (নাযিল হওয়ার) সে দিনটিকে আমরা ঈদ ও উৎসব দিবস হিসাবে স্থির ধরতাম।[১] হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন্ আয়াত? ইহুদী আলিম বললেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

"আজ তোমাদের জন্য পূর্ণাংগ করে দিলাম তোমাদের দ্বীন, পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য আমার নি'মাত এবং মনোনীত করলাম ইসলামকে তোমদের দ্বীনরূপে।" [সূরা ঃ মায়িদাহ-৩]

ইহুদী আলিম জানতেন, ইহুদী ধর্ম ও শরী'য়তের ইতিহাসে 'অমুক ইসরাঈলী (ইহুদী) নবীর মাধ্যমে নবুওতের সমাপ্তি রচিত হলো" এমন কোন ঘোষণা নেই। কারণ বাস্তব ব্যাপার হলো, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আসমানী দ্বীনে এরূপ ঘোষণা বিদ্যমান নেই, "এখন দ্বীন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে।" বিগত সব জাতি ও ধর্ম তাদের এ শূন্যতা প্রকটভাবে অনুভব করত। কেননা নিত্যদিনে তাদের কাছে কোন না কোন নবুওতের দাবীদার এসে তার নবী হওয়ার দাবী করে বসত। ইহুদী খ্রিস্টান ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের তাদের রচনা ও নিবন্ধে এ আকুতি ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায়, একি ঝামেলা হলো! এ কোন্ বিপদ, নিত্য-নতুন নবীর উদ্ভব হচ্ছে! আর খ্রিস্টান ইহুদী জনসমাজ চরম বিভেদ-বিশৃংখলায় ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে, নিত্য-নতুন সমস্যা গজিয়ে উঠছে। তাই আয়াতের উল্লেখ করে ইহুদী আলিম বলতে চেয়েছিলেন, আল্লাহ্ পাক আপনাদের (মুসলমানদের এত বড় ও মহান নি'য়ামত দান করেছেন যার ফলে চিরদিনের জন্য বিশৃংখলা ও নিত্যদিনের ঝগড়া ও কলহের বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের বিস্ময় হলো, যে আয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিল এবং যার মাধ্যমে এ অভূতপূর্ব নিয়ামত আপনাদের ভাগ্যে নির্ধারিত হলো তা আপনাদের উৎসব দিবসে পরিণত হলো না কেন?

হযরত উমার (রা.) ইয়হুদী আলিমকে এমন সরল সহজ জবাব দিলেন, তা কোন দ্বীনের তত্ত্ববিদ ও সরাসরি নববী দরবারের শিক্ষাঙ্গনে উচ্চতর প্রশিক্ষণ

---

১। বুখারী শরীফ, কিতাবুত তাফসীর।

প্রাপ্ত বিজ্ঞজনের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন ঃ আমরা উত্তমরূপে অবগত রয়েছি, এ আয়াত কখন কোথায় (কি পরিস্থিতিতে) নাযিল হয়েছিল। জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে আরাফাতে নাযিল হয়েছিল এ আয়াত।

হযরত উমর (রা.)- এর জবাব ছিল এতটুকুই। এ জবাবের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. ঐ দিনটি আগে থেকেই 'ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিবস', বিশ্ব মুসলিম সেদিন ইবাদত করে থাকেন একত্র সমাবেশে। অতএব, নতুন করে এটিকে উৎসব দিবস ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা নেই। দুই. আয়াত যেদিন-ই নাযিল হয়ে থাক এবং তার বিষয়বস্তু যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, আমরা তাকে উৎসবে পরিণত করতে পারি না। কেননা হযরত সাল্লাহুল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী উম্মতের জন্য দু'টি ঈদ সাব্যস্ত করে দিয়েছেন—ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ও অনুমোদিত উৎসব দিবস ঐ দু'টিতেই সীমিত। সুতরাং অন্য কোন উৎসব প্রামাণ্য ও শরীয়তসম্মত হতে পারে না। তা ছাড়া মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঈদ পার্বণে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। অমুসলিমদের উৎসব পার্বণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধুমধাম, রং-তামাশা, রংগলীলা, ঠাট্টা-উপহাস ও লজ্জা-শরমের আবরণ তুলে রেখে যা ইচ্ছা তাই করার অবাধ স্বাধীনতা যাতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে যাওয়াতো রয়েছেই, অনেক ক্ষেত্রে উৎসবামোদীরা আত্মহারা হয়ে সভ্যতা-নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইসলামী উৎসবের (দুই ঈদ) অবস্থান হলো, সাধারণ সময় যে চাশ্‌ত-এর সালাত ফরয ওয়াজিব তো নয়-ই, সুন্নতে মুআক্‌কাদাহও ছিল না, দুই ঈদের দিনে সে চাশ্‌ত-এর সময় দু'রাকাত সালাত বিধিবদ্ধ করে দেয়া হলো এবং তাকে সুন্নতে মুআককাদাহ (বা ওয়াজিব) সাব্যস্ত করা হলো। আর শুধু তাই নয়, নিত্যকার সালাতের দুই তাকবীর-তাহ্‌রীমাহ ও রুকুর তাক্‌বীরের স্থলে তিন তাকবীর বাড়িয়ে দিয়ে দুই রাকআতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের বিধান দেয়া হলো। এ এক মজার ব্যতিক্রমী উৎসব! ইবাদত ও সালাত বাড়িয়ে দেয়া হলো, সালাতের তাকবীরও বাড়ানো হলো, তদুপরি খুত্‌বা বর্ধিত হলো। এ হচ্ছে ইসলামী উৎসবের বৈশিষ্ট ও প্রকৃতি।

হযরত উলামা-ই কিরাম! আপনারা একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তথা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ। আপনাদের দায়িত্ব এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং এর তত্ত্ববধান করা যে, মুসলমানরা رَاعِنَا (বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুকরণকারীদের) দলে ভর্তি হতে যাচ্ছে না তোঃ মনে রাখবেন رَاعِنَا বলার চাইতে رَاعِنَا করায় লিপ্ত হওয়া আরও ভয়াবহ ও মারাত্মক। সতর্ক দৃষ্টি

রাখতে হবে যাতে অমুক দল সম্প্রদায় অমুক অনুষ্ঠান শোভাযাত্রা করছে, তাহলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আমাদেরও অমুক অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর করতে হবে, এ ধরনের মনোভাব ও চিন্তাধারা যেন মুসলমানদের পেয়ে না বসে। কেননা এ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি راعنا বলার চাইতেও নিকৃষ্টতর। কারণ راعنا তো একটি মাত্র শব্দের ব্যাপারে যা ইথারে ভেসে যায়। কিন্তু অমুসলিমদের নকল অনুকরণে কোন অনুষ্ঠান পালা-পার্বণ করা হলে তা তো আমলী ও বাস্তব راعنا হয়ে যাবে। তার প্রতিক্রিয়া বিস্তৃত হবে আকীদা-আমল-তাহযীব, তামাদ্দুন-সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ জীবন সব ক্ষেত্রে। দুষ্ট ক্যান্সাররূপে এর বিষক্রিয়া ছড়িয়ে যাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সমাজ ক্ষত-বিক্ষত হবে মহামারীর আঘাতে। এই আলিম সমাজের কর্তব্য হলো যখনই সমাজ জীবনে কোন বিদ্‌আত, কোন গর্হিত আচার-অনুষ্ঠান ও অমুসলিম অনুকরণের কোন অবস্থা মাথা চাড়া দিতে শুরু করে, তখনই প্রথম মুহূর্তেই তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেন, এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার এ সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দরগা ও মাযারগুলোতে আজ যা কিছু হচ্ছে তার অধিকাংশই অমুসলিমের অনুকরণপ্রসূত। ঐ সব কুপ্রথা ও বিদ'আতের ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যাবে, কবে কোন্ পরিস্থিতিতে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং এর পেছনে কার্যকর উৎস কি ছিল।

দ্বীনের রূহ হচ্ছে ইবাদত, দ্বীনের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয়ে তাঁর সমীপে আত্মসমর্পণ, দ্বীনের মূলমন্ত্র হচ্ছে তাওহীদ। দ্বীনের সজীবতা হচ্ছে সারল্য, দ্বীনের রূহ—আত্মা হচ্ছে এমন বিষয় ও কর্ম যা দ্বারা প্রতিপালনকারী নিজেও উপকৃত হতে পারে এবং সমাজের অন্যদেরও উপকার পৌঁছাতে পারে। দেখুন, ঈদুল আযহার সালাতের সাথে সাথে কুরবানী করার বিধানও রাখা হয়েছে। গ্রাম ও মহল্লায় এমন অনেকে বসবাস করে, মাসের পর মাস এক টুকরো গোশ্‌ত জোটে না যাদের কপালে। তাদের মন চায় একবার একটু গোশতের স্বাদ পেতে। তাদের জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করা হলো, আজ পেট পুরে গোশ্‌ত খেয়ে নাও। মনের আকুতি মেটাও। সে সাথে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম-এর সুন্নত জীবন্ত করার প্রয়াসে অবতীর্ণ হও। বিশেষভাবে আলিম সমাজের দায়িত্ব হলো, ইসলামী সমাজে চুপিসারে ও অবচেতনভাবে যেন কোন راعنا-র অনুপ্রবেশ না ঘটে সেদিকে তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা। লক্ষণ দেখা মাত্রই এর প্রতিরোধ করতে হবে। নবী আলায়হিস সালাম উম্মতের জন্য তাঁর ওয়াসিয়তে ইরশাদ করেছিলেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ -

"তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নত ও খুলাফা-ই রাশিদীনের (হিদায়াতপ্রাপ্ত কল্যাণের বার্তাবাহক খলিফাগণের) সুন্নত অনুসরণ করা। সকলে সুদৃঢ়ভাবে দাঁত কামড়ে তা ধরে রাখ।"[১]

আমাদের মাদরাসাগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো এটাই ছিল, তারা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী তৈরি করবে যারা দীনের সীমান্ত রক্ষায় আত্মনিবেদিত থাকবে যাতে কোন চোর বা গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ না ঘটে। এখন তারাও যদি লবণের খনিতে পড়ে লবণ হয়ে যায় অর্থাৎ যেমন দেশ তেমন বেশ-এর দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে যায়, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কর্তব্য বিস্মৃত গড্ডলিকা প্রবাহের মত হয়ে যায় এবং শরীয়তঅসম্মত ও শরীয়তবর্জিত যে কোন গর্হিত কাজে সমর্থন দিতে শুরু করে, অধিকন্তু তারাই সে সবের নেতৃত্বে অবতীর্ণ হয়, তা হলে আর আশা-ভরসা কোথায়? কবির ভাষায় ঃ چوں كفر از كعبه برخيزد كجا مانه مسلمانى কা'বা-ই থেকে যদি জন্ম হয় কুফরীর, মুসলমানী রইবে তখন কোথা? জাতির রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে যায়, তাহলে সে জাতির অবলুপ্তি আর কতদিনের ব্যাপার!

আরবী ভাষা শেখার বদৌলতে প্রাপ্ত চাকুরীই যদি মূল হয়, তাহলে আরবী আর ইংরেজীর মাঝে ব্যবধান কি রইল? আলিমগণ 'ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া' খেতাবে ভূষিত। নবীগণ ছিলেন দ্বীনের ব্যাপারে অতিশয় মর্যাদাবোধসম্পন্ন ও অনুভূতিপ্রবণ। ইহুদীরা হযরত মূসা আলায়হিস সাল্লামের খিদমতে আবদার করল—اجعل لنا الها كما لهم الهة। আমাদের জন্য এমন কোন প্রকার জৌলুসপূর্ণ মাবূদ (প্রতিমা) বানিয়ে দিন, যেমন রয়েছে ঐ (মিসরীয় কিবতী) লোকদের। তিনি তখন নবীসুলভ তেজস্বিতার সাথে বজ্রগম্ভীর জবাব দিয়েছিলেন ঃ

انكم قوم تجهلون - ان هولاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون -

"তোমরা তো চরম গণ্ডমূর্খের দল। (আরে) এরা যাতে (লিপ্ত) রয়েছে তাতো ধ্বংসোন্মুখ; আর তারা যা কিছু করে তা তো বাতিল ও ভণ্ডুল।"[২]

১. মিশকাত শরীফ; হযরত ইরবাদ বিন সারিয়াহ-(রা.) বর্ণিত।
২. সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৭-১৩৮।

বিশ্বনবীর রিসালাত যুগে এক সফরের সময় হুবহু এমনই মর্যাদাপূর্ণ ও অনুকরণশীল মনোভাবপ্রসূত একটি ঘটনা ঘটেছিল। আরবের কোন কোন গোত্রের 'যাত আনওয়াত' নামে সজীব পল্লবিত গাছের প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। তারা সে গাছে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত, তার তলায় নৈবেদ্য পেশ করত, বলি দিত এবং সেখানে এক দিন অবস্থান করত। গাযওয়া-ই-হুনায়ন (হুনায়ন যুদ্ধ)-এর সময় গাছতলার ঐ দৃশ্য দেখে কিছু নতুন মুসলমান (যাদের অন্তরে তখনও ঈমান সুদৃঢ় হয়নি) বলে ফেলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদের জন্য মনের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদনের একটি ক্ষেত্র ও কেন্দ্র নির্ধারণ করে দিন যেমন এসব গোত্রের রয়েছে। তাদের এ প্রস্তাব হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবীসুলভ গায়রত ও মর্যাদাবোধে কম্পন সৃষ্টি করল। তিনি বজ্রগম্ভীর জবাব দিলেন, "তোমরা তো হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর কওমের অনুরূপ ঘটনা ঘটালে। অবশ্যই বোঝা যায়, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রতিটি পদক্ষেপ ও পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করবে।"[১]

আলিমগণকে হতে হবে অনুরূপ তেজ ও গাম্ভীর্যসম্পন্ন এবং তাওহীদ ও সুন্নত বিষয়ে মর্যাদাবোধসম্পন্ন। আমাদের দ্বীনি আরবী মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এ ধরনের ইস্পাতদৃঢ় তেজস্বী মনোভাবসম্পন্ন ও মর্যাদাবোধসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যেই। চিরদিন এ বৈশিষ্ট স্থায়ী ও অক্ষুণ্ন রাখা এ প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্র আমানত ও কর্তব্য।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

১. সীরাত ইবনে হিশাম খণ্ড-২, পৃ. ৪৪২ মূল রিওয়াত সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহেও রয়েছে।

# দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী

[এ বক্তৃতাটি হয়েছিল ১২ই অক্টোবর (১৯৮২ ইং) সকাল দশটায় আওরংগাবাদ আযাদ কলেজের ছাত্র-অধ্যাপক, শহরের গণ্যমান্য ও সুধীজনের এক বিশাল সমাবেশে। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন খ্যাতিমান কবি জনাব সিকান্দার আলী ওয়াজেদ (সাবেক সদস্য, রাজ্যসভা)। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিচিতি ভাষণ দিয়েছিলেন কলেজের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জুলফিকার হুসাইন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর মাজহার মুহিউদ্দীন। মাওলানা নদভী তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন সূরা কাহফের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে।]

হাম্‌দ ও সালাত।

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى - وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا -

‘ওরা একদল তরুণ, যারা তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল, আর আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের সৎ পথে চলার শক্তিকে। তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিয়েছিলাম যখন তারা (ঈমানের পথে চলতে) উদ্যত হলো এবং বলল, আমাদের রব তো (তিনি যিনি) আসমান ও যমীনের রব, আমরা কখ্‌খনো তাঁকে ব্যতীত কোন মা’বুদ (প্রতিমা)-কে ডাকব না (‘ইবাদত করব না)। কেননা তাহলে তো আমরা অবশ্যই অন্যায় উক্তি করার অপরাধ করে ফেললাম।”

[সূরা কাহাফ ঃ ১৩–১৪]

সুধীবৃন্দ! আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানে আজ আমার দ্বিতীয়বার উপস্থিতির সৌভাগ্য হলো। যে মহান মনীষীর নামের[১] সাথে এ প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ, তাঁর সাথে আমাদের প্রতিষ্ঠান (নদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ), তার পৃষ্ঠপোষক, পরিচালকবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর সান্নিধ্য ও সুনজর লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এ প্রিয়তম সম্বন্ধ, তদুপরি এই প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান ক্ষেত্র আওরংগাবাদের সাথে

---

১. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র.)। বিস্তারিত বিবরণ, মাওলানা নদভী-এর পুরানে চেরাগ, ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

জড়িয়ে রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সে ইতিহাস শুধু সামরিক শক্তির ইতিহাস নয়, নয় শুধু বিজয়ের ইতিহাস, সে ইতিহাস সাহসিকতা, উচ্চাভিলাষ ও দৃঢ় প্রত্যয়ের। সে ইতিহাস দরবেশী ও পার্থিব বিমুখতার ইতিহাস। আমার দৃষ্টিতে আওরাংগবাদ হলো ভারতের গ্রানাডা। গ্রানাডা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার চোখে গ্রানাডা ও আওরাংগাবাদের ইতিহাসে রয়েছে অনেক সাদৃশ্য। তবে এটি একটা স্বতন্ত্র বিষয় যা ভিন্নভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

সুধীবৃন্দ! আপনাদের খিদমতে সূরা কাহফ্-এর দু'খানি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। সমকালীন স্টাইল ও ধারায় এর শিরোনাম করা যায় এরূপে "দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী" (বা সাত তরুণের অভিযাত্রা।[1] এ কাহিনীতে মানব বংশধরদের তরুণগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে এক বিশেষ পয়গাম ও উন্নত আদর্শ, যে পয়গাম ও আদর্শ সর্বকালীন ও সর্বজনীন, যার প্রতিক্রিয়া শুধু মন-মস্তিষ্ককেই প্রভাবিত করে না বরং তা প্রতিভা, সাহসিকতা, উদ্যম ও সংকল্পের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা সঞ্চারে কার্যকরী হতে পারে। এ কাহিনী কখনো হৃদয় সিক্ত করে শিশির বিন্দু ঝরিয়ে, কখনো আঘাত হানে ফুল ও পাপড়ির চাবুক হয়ে। আমিও আজ তরুণদের কাছে তরুণদের কাহিনীই শোনাতে চাই। বস্তুত আমি শোনাচ্ছি না, বরং আল-কুরআনই তা শোনাচ্ছে। আল-কুরআনই তাঁদেরকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে তাঁদের চিরস্মরণীয় করে দিয়েছে সর্বযুগের জন্য। তাঁদের সমাসীন করেছে 'আইডিয়েল' ও অনুসরণীয় আদর্শের আসনে। কাহিনী বিবৃত হয়েছে সহজ ভাষায়, সাবলীল ভংগীতে ও সংক্ষেপে। কিন্তু তা অতিশয় শিক্ষাপ্রদ ও গভীর।

এ কাহিনীর পটভূমি নিম্নরূপ ঃ ইতিহাসখ্যাত রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ শামের ফিলিস্তীন এলাকায় একটি নতুন দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। তখন এ দাওয়াতের বাহক ছিলেন সায়্যিদুনা হযরত 'ঈসা মসীহ্ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম। আমরা মুসলমানরাও তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করি। তিনি দাওয়াত দিলেন তাওহীদের, একত্ববাদের। সারা বিশ্ব তখন শিরক ও অনাচারের আঁধারে নিমজ্জিত। নিশ্ছিদ্র আঁধারের বুকে ক্ষীণ আলোর রশ্মিরূপে উদ্ভাসিত হলো এক নতুন পয়গাম। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম একটি ধ্বনি উচ্চকিত করলেন। শিরক, বংশ পূজা তথা সাম্প্রদায়িকতা, প্রথা পূজা, কুসংস্কার, বস্তুবাদ ও মানবতার নির্যাতন শোষণের বিপরীতে তাওহীদ ও আল্লাহ পাকের নির্ভেজাল ইবাদতের ওপরে রচিত হয়েছিল তাঁর পয়গামের মূল ভিত্তি।

---

১. এ সংখ্যা সম্পর্কে আল কুরআন বলেছে, "কেউ বলেন তিনজন, চতুর্থ ছিল তাদের কুকুর, কেউ বলেন পাঁচজন, ষষ্ঠ তাদের কুকুর। অনুমানে ঢিল নিক্ষেপ। আর কেউ বলেন সাতজন, অষ্টম তাদের কুকুর....এরপর আল-কুরআন শেষ সংখ্যা উল্লেখ না করায় মুফাস্সিরগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাদের সংখ্যা ছিল সাত।)

কতক মানুষ তাঁর এ দাওয়াত কবুল করে তার ধারক বাহকে পরিণত হলো। নতুন ব্রত নিয়ে তারা নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কেন্দ্রের সন্নিকটে উপনীত হয়ে সেখানে দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করল।

পৃথিবীর বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত অভিজ্ঞদের তুলনায় জীবনী শক্তিতে উচ্ছল তরুণরাই নতুন ফলপ্রসূ আহ্বানে অধিকতর দ্রুত সাড়া দিয়ে থাকে। কারণ অভিজ্ঞতা, লাভালাভ চিন্তা, প্রথা-সংস্কার ও আশা-নিরাশা বয়স্কদের পথে বড় অন্তরায় ও বিপত্তি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে তরুণরা হয় সম্পর্ক বন্ধন ও আসক্তির (Attachment) বেড়াজাল থেকে মুক্ত। তাই বিপ্লবী কর্মসূচীতে তরুণরাই বয়স্কদের তুলনায় অধিক উচ্ছল ও অগ্রগামী। তারা সামান্য ধাক্কায় সকল পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে এগিয়ে চলে সমুখ পানে।

আল-কুরআন এই তরুণদের নির্দিষ্ট কোন বয়সের কথা উল্লেখ করে নি এবং এটাই আল-কুরআনের প্রকাশ ভঙ্গী। কেননা যদি বলা হতো, তারা ছিল ১৮-২০ বছরের তরুণ। তাহলে এর চেয়ে অল্পাধিক বয়সের লোকেরা এ অজুহাত সৃষ্টির অবকাশ পেয়ে যেত, একথা আমাদের জন্য বলা হয়নি। এজন্য আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ انهم فتية। ওরা তরুণদের একটি ছোট দল। আরবী ভাষায় অভিজ্ঞরা জানেন, فتية শব্দে বয়সের তারুণ্যের সাথে সাথে মন-মেধা-মস্তিষ্ক, উচ্চাভিলাষ ও সংকল্পের তারুণ্য ও উচ্ছলতার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে। এজন্য আমি তার তরজমায় (যুবক না বলে) কতিপয় তরুণ শব্দ ব্যবহার করেছি। فتية শব্দটি বহুবচন, একবচন হলো فتى - এ শব্দের আর একটি বহুবচন রয়েছে তা হলো فتيان, তবে فتية শব্দরূপ দশ সংখ্যায় নিম্নবর্তী বহুবচন جمع قلت নির্দেশ করে। আল-কুরআন এ শব্দরূপ ইংগিত করেছে, তারা সীমিত সংখ্যক তরুণ ছিল। এটাই চিরন্তন বিধি। যখনই পৃথিবীর বুকে সমাজ সংস্কার ও একমাত্র নির্ভেজাল ইবাদতের আহ্বান এসেছে, তখন প্রাথমিক পর্যায়ে নগণ্য সংখ্যক লোকেরাই তাতে সাড়া দিয়েছে। আল্লাহ পাক যাদের বিশেষ তাওফিক দান করেন, তারাই বিশুদ্ধ দ্বীনি দাওয়াতে সাড়া দেয়ার সৎ সাহস দেখাতে পারে।

এই আয়াতে এদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাকের গুণবাচক নামসমূহ থেকে 'রব্' গুণবাচক নামটির উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ انهم فتية امنوا بربهم - (রবের প্রতি ঈমান আনয়নকারী তরুণ দল) এ নাম

অতি অর্থবহ। কেননা সরকার ও শাসকগোষ্ঠী প্রকারান্তরে (কথায় কিংবা কাজে) দেশবাসীর রিযিকদাতা ও 'আহার সরবরাহক'-এর দাবীদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। দেশবাসীর মনেও এ ধরনের ধারণা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে থাকে, নিজেদের জীবন নির্বাহ ও মান-ইজ্জতের জীবন যাপনের জন্য জীবনে সুখ-শান্তি উপভোগ করতে হলে সরকার ও প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাদের তল্পীবাহক হয়ে তাদের পদাংক অনুসরণ করতে হবে এবং 'জ্বী হুজুর' মার্কা হতে হবে। এটাই উন্নতি ও সমৃদ্ধির সরল পথ আর তা করতে না পারলে নিরাপদ সচ্ছল জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে আল-কুরআনের শব্দ চয়ন 'আংটির মাঝে হিরক খণ্ডতুল্য' যার এক একটি শব্দের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে এক একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

তরুণ দল পৌঁছে গেল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে যেখানে পত পত করে উড়ছে পরাক্রমশালী রোমান পতাকা। সে সাম্রাজ্যটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক সুসংহত, সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে উপনীত হওয়ার গৌরবদীপ্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। সে সাম্রাজ্যটি উন্নততর আইন ও শাসনতন্ত্রে শাসিত পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও শাহানশাহীরূপে স্বীকৃত। এই সাম্রাজ্যটি ও তার সম্রাটদের নাকের ডগায় সরাসরি মুখের ওপরে জনসমুদ্রের ভিড়ে দাঁড়িয়ে এই নগণ্য সংখ্যক তরুণ স্লোগান তুলল, নিজেদের সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে তার প্রচারে ব্রতী হলো। কী অদম্য সাহস ও উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল সে তরুণ হৃদয়গুলো! তাদের গৃহীত মতবাদই ছিল তখনকার বিশুদ্ধ মাযহাব, সে যুগের খাঁটি ইসলাম। কেননা খ্রিস্টবাদ তখন পর্যন্ত ছিল ভেজাল ও বিকৃতিমুক্ত। আহ্বায়ক দল, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের পয়গামের একনিষ্ঠ পতাকাবাহী দল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে উপনীত হয়ে ঘোষণা দিল ঃ আমদের রিযিকদাতা, আমাদের প্রতিপালন ও জীবন ধারণের ব্যবস্থাপক হুকুমত নয়, সম্রাট নয়। আমাদের রিযিকদাতা প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ ربنا رب السموات والارض 'যিনি আসমান ও যমীনের রব, প্রতিপালক, তিনিই আমাদের প্রতিপালক।' এ ঘোষণা দেয়া হলো এমন এক রাজশক্তির সরাসরি মুখের ওপর যারা জীবন যাপনের সব উপকরণ রেখেছিল কুক্ষিগত করে। বাসিন্দাদের জীবন-জীবিকা ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হতো তাদের হাতে অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারাই ছিল লাভ-ক্ষতি ও কল্যাণ-অকল্যাণের সব ক্ষমতার অধিকারী। তাই সে সময় বুদ্ধিমত্তা, বাস্তববোধ ও চাতুর্যের দাবী ছিল সে রাজশক্তি ও হুকুমতের সাথে স্বীয় ভাগ্য জড়িয়ে নেয়া কিংবা অন্তত নীরব নির্বাক নিরাপদ জীবন যাপন করা। কিন্তু তরুণরা গ্রীক পৌত্তলিক ধর্ম, রোমান

পৌত্তলিক ধর্ম ও তাদের দেবদেবীদের অস্বীকার করে বসল, অথচ রোম সাম্রাজ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ, আদর্শ, কর্মসূচী, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন পৌত্তলিকতার অখণ্ড প্রভাব। গোটা সমাজ তখন শির্ক, অংশীবাদ ও কুপ্রথা-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। গ্রীক ও রোমে (এবং প্রাচীন ভারতেও) আল্লাহ্ পাকের গুণাবলীর কাল্পনিক রূপ দেয়া হতো দেবতার আকৃতিতে। প্রতিটি দেবতার নামে স্থাপিত হতো বড় বড় উপাসনালয় এবং বিশালকায় প্রতিকৃতি ভাস্কর্য। তাদের মধ্যে কোনটি প্রেমের দেবী, কোনটি স্নেহ-মমতার, কোনটি দাত্রী, কোনটি যুদ্ধ-দেবতা, কোনটি প্রভাব-প্রতিপত্তির, আবার কোনটি বা রোদ-বৃষ্টির। কিন্তু নতুন প্রেরণার উদ্বুদ্ধ তরুণরা এক মুখে একবাক্যে সব অস্বীকার করে বসল। শুরু হলো আলোড়ন। তারা ঘোষণা করলঃ

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاْ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا ـ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ط لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَيِّنٍ ط فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ـ

"আমাদের রব (তিনিই, যিনি) আসমানসমূহ ও যমীনের রব- মালিক। আমরা কখ্খনো তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বুদ সাব্যস্ত করে ডাকব না। (তেমন করলে তো) আমরা তখন অন্যায় অযৌক্তিক কথা বলে ফেলতাম। এই যে আমাদের কওম (স্বগোত্র), এরা তাঁকে বর্জন করে আরো অনেক পূজনীয় সাব্যস্ত করে রেখেছে। এরা ওদের ব্যাপারে কোন স্পষ্ট প্রমাণ কেন পেশ করছে না? সুতরাং আল্লাহ্র নামে যারা মিথ্যা আরোপ করে, তাদের চেয়ে অধিক অনাচারী আর কে?" [সূরা কাহফ ঃ ১৪-১৫]

এ বিবরণে আল-কুরআন আর একটি তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে। তা হলো, সফলতা লাভের জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের। দাওয়াতের বাহকদের সাহসিকতায় ভর করে প্রথম পদক্ষেপ মানুষের পক্ষ থেকে হলেই আল্লাহ্ পাকের মদদ এগিয়ে আসে তার সহায়তায়। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ امنوا بربهم وزدناهم هدى (তারা তাদের কর্তব্য পালন করে অগ্রগামী হলো, তারা তাদের 'রব'-এর ওপরে ঈমান আনল আর (আমার মদদ তখন সাব্যস্ত হলো) আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিলাম। (অন্য এক আয়াতে রয়েছে - والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "আমার (দ্বীনের পথে জন্য যারা সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদের হিদায়াত দেব আমার পথের।"

মানুষ যদি এ প্রতীক্ষায় থাকে, কোন বিষয় কোন বাণী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে কিংবা তাদের কণ্ঠহার হয়ে যাবে, তবে তা হবে ভুল।

প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেকেই, হিম্মত ও সাহসিকতার সূচনা করতে হবে পথ চলার, তবেই হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে মহান রাব্বুল আ'লামীনের মদদ ও সহায়তা। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ وربطنا على قلوبهم (তারা অগ্রগামী হলো) আমি তাদের মনের জোর ও উদ্যমকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করলাম। কারণ ( আমি জানতাম,) সে যুগের পরাশক্তি ও পরাক্রমশালী সরকার ও সম্রাটদের সাথে ছিল তাদের প্রতিযোগিতা। তারা নিয়েছিল সরকারী মতবাদ ও ধর্ম বর্জন করে একটি নতুন দ্বীনের দীক্ষা।

এটাই আল-কুরআনে বর্ণিত আসহাবুল কাহফ (গুহাবাসী)- এর ঘটনা। জর্দানের পূর্বাঞ্চল সফরকালে (১৯৭৩) আমার সে গুহা দেখার সুযোগ হয়েছে, যে গুহায় তারা আরামে ঘুমুচ্ছেন। জর্দান প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের মহাপরিচালক গবেষক বন্ধুবর ওয়াফা আদ-দাজ্জানী সাথে থেকে আমাকে সে গুহা পরিদর্শন করিয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণ দ্বারা সে গুহাটিই আসহাবুল কাহফের আলোচ্য গুহা হওয়া প্রমাণিত করেছেন।[১]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যুগ যুগ ধরে এ কাহিনীর স্মরণে পদ্য কবিতা রচিত হয়েছিল এবং তা সে দেশের সাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে। আমি আমার 'মা'রিকা-ই-ঈমান ও মাদ্দিয়াত' (ঈমান ও বস্তুবাদের সংঘাত) গ্রন্থে তুলনামূলক পর্যলোচনার আলোকে বিষয়টির আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। ইতিহাস অধ্যয়নে এ কথাও বোঝা যায়, ঐ তরুণ দলে অধিকাংশই ছিল রাজকীয় দরবার সদস্যদের সন্তান যার অর্থ, তারা (পরোক্ষে) ক্ষমতাসীন সরকারের কৃপা-লালিত ছিল। কারো পিতা, কারো চাচা আর কারো বড় ভাই উচ্চ পদে আসীন ছিল। এ কারণে বিষয়টি আরও জটিল ও সঙ্গীন রূপ ধারণ করেছিল। কারণ একথা বলে তুবড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ ছিল না, ক'টি অখ্যাত, অনুল্লেখ্য, ছন্নছাড়া তরুণ উন্মাদগ্রস্ত হয়ে বিদ্রোহের স্লোগান তুলেছে। আর সরকারী ধর্ম বর্জন করার ঘোষণা দিয়ে এক নতুন ধর্মমত গ্রহণের দাবী করেছে, বরং তারা ছিল সাম্রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর ও উচ্চপদধিকারীদের সন্তান, যাদের সাথে জড়িত ছিল গোটা পরিবার ও পরিবারের ভাগ্যলিপি, মান-মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ব্যাপার। তাদের এ আচরণবিধি সমস্যার জন্ম দিল। এ পদক্ষেপের

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ ওয়াফা আদ-দাজ্জানীর গবেষণামূলক গ্রন্থ اكتشاف الكهف واصحاب الكهف। 'ইকতিশাফুল কাহফি ওয়া আসহাবিল কাহফ' (আরবী) আমার 'মা'রিকা-ই-ঈমান ও মাদ্দিয়্যাত' কিতাবে তার রচনাকালীন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণীত স্থানের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে আমার সে মতের পরিবর্তন হয়েছে।

ফলে একদিকে তাদের পিতা, অভিভাবকও পরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এক বিব্রতকর ও নাযুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। যে কোন মুহূর্তে রাজদরবারের সামনে মাথা নত করে তাদের প্রশ্নের জবাব দানে বাধ্য হওয়ার আশংকা ছিল, তোমরা তোমাদের অধস্তন ও সন্তানদের এ বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখলে না কেন? অন্যদিকে ছিল অভিভাবক মুরুব্বীদের জন্য কঠিন পরীক্ষা। এ সুযোগ্য ও সাহসী তরুণদের অভিভাবক হিসাবে তারা ছিল তাদের ভবিষ্যতের প্রতি আশাবাদী। তারা স্বপ্ন দেখছিল সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

পরিবারের তরুণদের প্রতি তার অভিভাবকরা যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করে থাকে, এ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি আল-কুরআন মনোহর বচনভঙ্গীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে। হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালাম যখন তাঁর 'ছামুদ' কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আবেগাকুল ও মর্মাহত ভাষায় তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করল, "আমরাতো তোমাকে নিয়ে ভবিষ্যতের আশার জাল বুনছিলাম, তোমার প্রতি আমাদের মনের কোণে ছিল গভীর প্রত্যাশা। আমাদের ধারণা ছিল, তুমি সোজা লাইন ধরে (জাতি যে লাইনে চলছে) সিধা চলে আসবে এবং কিছুটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে খান্দান ও বংশের সুনাম বৃদ্ধি করবে। তুমি  হবে পরিবার ও খান্দানদের গর্বের ধন—গৌরবমণি।"

আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

قالوا يصلح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا -

সালিহ (আ.)-এর দাওয়াত শুনে লোকেরা বলল, সালিহ! তুমি তো ছিলে আমাদের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু, আশার পাত্র! তুমি কি আমাদের সব আশা পানি করে দিলে? নতুন হাংগামা শুরু করে গোটা জাতির বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলে? জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করলে? আল-কুরআনের مرجو শব্দের কাছাকাছি অর্থ রয়েছে ইংরেজীর Promising শব্দে। 'আশার পাত্র' আশাপ্রদ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় কোন শিক্ষার্থী, কোন চৌকষ তরুণ সম্পর্কে এভাবে বলা হয়ে থাকে, তোমাকে দিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের অনেক আশা-ভরসা, তোমাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্ন, তুমি আমাদের আশার পাত্র ও কেন্দ্রবিন্দু।

গণনায়  এ তরুণরা ছিল স্বল্প সংখ্যক। বিভিন্ন যুক্তি ও প্রাপ্ত তথ্যে তাদের সংখ্যা 'সাত'-এর অধিক না হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু বাস্তব বিচারে তাদের সাথে জড়িয়ে ছিল কয়েক শত বিশিষ্ট লোকের ভাগ্য। প্রত্যেক তরুণের পেছনে ছিল তাদের পরিবারের বংশ ও আত্মীয়তার ধারা। তাদের পদক্ষেপ সকলের জন্য

ডেকে আনছিল মহাবিপদ সংকেত! সম্পৃক্তদের দেখা হচ্ছিল সন্দেহের দৃষ্টিতে। নির্মূল হয়ে যাচ্ছিল কত বংশের আশা ও ভবিষ্যত। স্বাচ্ছন্দ্য ও অগ্রগতির জোয়ার হচ্ছিল ব্যাহত। অগভীর দৃষ্টিতে কেউ মনে করতে পারে, এত বড় কি আর সমস্যা! মাত্র সাত-আটটা লোকই তো। ধরে মেরে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! সাতটা লোককে বিনাশ করলেই, তাদের জীবন আয়ু ফুরিয়ে দিলেই বিশাল সাম্রাজ্যের কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হলো? কিন্তু বাস্তব অত সহজ নয় ; কারণ ব্যাপার এক ব্যক্তিরই থেকে যায় না, বিশেষত সমাজবদ্ধ সভ্য দেশে এক ব্যক্তিকে এককভাবে কল্পনা করা যায় না। (সমাজ বন্ধনবিহীন) একাকী এক ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে। সুতরাং সে বিদ্রোহ দেখতে সাত ব্যক্তির হলেও তাতে সত্তরটি পরিবার অভিযুক্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে সমস্যাটিও জটিলতর ও প্রকট রূপ ধারণ করতে পারে। বিষয়টির উল্লেখযোগ্যতার অধিকারী হওয়াতে আল-কুরআন তা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তরূপে পেশ করেছে।

এ সমস্যার সমাধানে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, তার বিশদ বর্ণনা আর আজকের ইতিহাস ঘেঁটে পাওয়া যেতে পারে না। তবে সর্বযুগের ক্ষমতাসীন চক্রের অভিন্ন দমন নীতির প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভীতি ও প্রলোভন উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছিল। অবশ্য স্থান নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়, কী ধরনের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছিল কিংবা কোন পদ্ধতিতে লোভ-লালসা দেয়া হয়েছিল এবং কী সোনার হরিণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। এ ধরেনর ক্ষেত্রে, বিশেষত বিপ্লবীরা তরুণ হলে ঘুষ, ঘুষি, চেয়ার ও বুলেট তথা লোভ ও ভীতি উভয় পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, বিশেষত অভিজ্ঞ ক্ষমতাসীনরা ভীতির চেয়ে লোভ দেখানোকে অধিক কার্যকর ও সুফলদায়ক মনে করে থাকে। এ উভয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন এমন এক মনীষীর অভিজ্ঞতা হলো–কোড়ার চাইতে তোড়া অধিক স্পর্শকাতর ব্যাপার। বুলেটের ভীতির চেয়ে পদ ও চেয়ারের লোভ অধিক লোভনীয় ও মোহনীয়। শাসনদণ্ডের অধিকারী ক্ষমতাসীনরা কখনো উত্তোলন করে চাবুক আর কখনো বা তুলে ধরে মুদ্রাভর্তি থলে। সুতরাং বলা যায়, তরুণদের সামনে ঘুষ ও ঘুষি, চাবুক বা থলে বা কোড়া ও কড়ি দু'টিই এসেছিল। তারা চাবুকের আঘাত সহ্য করেছে অম্লান বদনে। আর তোড়া ভেঙে দিয়েছিল তুড়ি দিয়ে, নির্যাতন সয়েছিল পিঠে, লোভ ও লাভ ঠেলে দিয়েছিল দু'পায়ে আর তারা এ শক্তি, অন্তরের এ ধৈর্য, অবিচলতা, সহনশীলতা, ও সহিষ্ণুতা ত্যাগ ও তিতীক্ষার অধিকারী হয়েছিল মহান আল্লাহর অপার কৃপায়। এ কথাই বলা হয়েছে ঃ وربطنا على قلوبهم "আমি তাদের কল্‌বগুলোকে করেছিলাম ধৈর্য্য অবিচলতামণ্ডিত।"

পৃথিবীর ইতিহাসে একথাই বলে, কোন সমাজ ও দেশ ভয়াবহ দুর্যোগ ও অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতে পারে এমন ক্ষণজন্মা তরুণদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে যারা ভবিষ্যতের আশা দলতে পারে দু' পায়ে, স্বার্থত্যাগ করতে পারে অবলীলায়। উল্লিখিত তরুণ দল ছিল মহৎ গুণে গুণান্বিত। কিন্তু তাই বলে তারা অপরিণামদর্শী, নির্বোধ বা উন্মাদ (Abnormal) ছিল না। তারা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মহারা, কিন্তু সচেতন। তাদের কথাবার্তা ও আলাপ- আলোচনা প্রমাণ করে, তারা ছিল সম্পূর্ণ সুস্থ অনুভূতি ও চিন্তাশক্তির অধিকারী, বিচক্ষণ ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন সুবোধ তরুণ। তবে তাদের জীবনে একটা অভাব তাদের দৃষ্টিতে প্রকটরূপে ধরা পড়েছিল। শুধু অন্নবস্ত্রের সহজলভ্যতা, পেট ও দেহের চাহিদা পূরণ তাদের আত্মার প্রশান্তি সৃষ্টিতে সক্ষম ছিল না। তাদের চিন্তাধারায় ছিল–দু' বেলা পেট ভরা আহার, তাতো কোন ধনীর ঘরের কুকুরের কপালেও জোটে। কোন বড় লোকের কুকুরও হয়তো এমন খাঁটি দুধ খেতে পায় যা অনেক দরিদ্র ঘরের সন্তানের দু'চোখে দেখার ভাগ্য হয় না। কোন কুকুর হয়ত এমন সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্যে পালিত হতে পারে যা আশরাফুল মাখলুকাত—সৃষ্টির সেরা মানুষ স্বপ্নে দেখে না। কিন্তু তাদের মতে এমন হাজার স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালিত কুকুর তেমন নিরন্ন বিবস্ত্র মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত (বরং তারও যোগ্য নয়) যে মানুষের মন সজীব ও সমৃদ্ধ হয়েছে আল্লাহর মা'রিফাত ও পরিচিতি লাভ এবং তাঁর প্রতি ঈমানের দৌলতরূপ সম্পদে। এ চিন্তার সাথে আল্লাহ্ পাক তাদের দান করেছিলেন সুজাতি মানবগোষ্ঠীর প্রতি মর্মবেদনা ও কল্যাণ কামনা। তাই তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, সম্পদ ও সম্পত্তি জীবনের লক্ষ্য নয়, পশুর মত পেট পূজা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া কাম্য নয়, বরং আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে সে ভয়াবহ ধ্বংস থেকে যা ভ্রান্ত 'আকীদা, ভ্রান্ত লক্ষ্য, ভ্রান্ত কর্মসূচী ও জঘন্য নৈতিকতারূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। আত্মরক্ষার সাথে সাথে নিজেদের জাতি, নিজেদের পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করতে হবে সে অশুভ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে যা তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে রেখেছে দেশ ও জাতির মাথার ওপর। ইতিহাস সাক্ষী, এমন অকুতোভয় সংগ্রামী মুজাহিদ দলই উপনীত হয় সফলতার দ্বারপ্রান্তে। তারা গোটা জাতি ও স্বদেশকে রক্ষা করে নিজেদের সুখ-শান্তি ও সম্পদ-সম্ভোগ উৎসর্গ করার বিনিময়ে। প্রয়োজনে তারা কুণ্ঠিত ও বিচলিত হয় না জীবন বিলিয়ে দিতে । যুগ যুগ ধরে মানবতার ইজ্জত বেঁচে রয়েছে তাদেরই অবদানে। দেশ ও জাতির ভাগ্যে জুটেছে শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও ইনসাফের নিশ্চয়তা। সততা-সত্যবাদিতা ও হক–এর দাওয়াতের অবিরাম ধারা জীবন্ত রয়েছে তাদেরই খুনের স্রোতে।

প্রিয় তরুণরা! আমাদের এ দেশ এখন চরম দুঃখী; ঈমানী, মানবিক, নৈতিক অবক্ষয় ও নৈরাজ্যের শিকার। দ্বীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ভয়াবহ নৈরাজের কথা এখন আলোচনা করার অবকাশ নয়। সেজন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র সময় ও সুযোগ (তাছাড়া কলেজে অধ্যয়নরতদের মাঝে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ই রয়েছে)। নৈতিক নৈরাজ্য বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করছি। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমাদের অবস্থা সংক্ষেপে প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার পূর্ব মহূর্তে মৃত্যু বিভীষিকায় পতিত মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা। দেশ এখন দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংস গহ্বরের প্রান্তে কিংবা আগ্নেয়গিরির লাভা মুখে। করাপ্‌শন ও দুর্নীতি ছেয়ে আছে গোটা দেশে মহামারীরূপে। দায়িত্ববোধ, কর্মোম্মদনা, কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্তব্য পালনে শ্রম দানের আগ্রহ এবং স্বদেশ প্রেম ও স্বদেশেবাসীর প্রতি হামদরদী- সমবেদনা—এ সব এখন কল্পনার সোনার হরিণ। প্রশাসনের যে কোন চেয়ারের দিকে লক্ষ্য করবেন, দেখতে পাবেন, প্রত্যেক চেয়ারধারী যেন ওঁৎ পেতে বসে রয়েছেন পকেট ভর্তি করার মতলবে। পেট ও পকেট পূর্তি না করে যারা কাগজ ভাঁজ (অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন) করে চলেছেন, তারা ঈর্ষাযোগ্য মানুষ (কিংবা করুণার পাত্র অধম হতভাগা)। সার্বিক অবস্থা এমনই বলা যায়, যখনই কেউ কোন কাজ নিয়ে কোন অফিসার-কেরানীর সামনে এল, তার চেহারা নিরীক্ষণ শুরু হলো, মতলব কি পরিমাণ (ঘুষ) বাগানো যাবে তা আন্দাজ করা। তার মুখাবয়বে কি অভিব্যক্তি রয়েছে, কোন বিপদের সংকেত বা লক্ষণ রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য নিরীক্ষণ নয়, বরং আগন্তুকের জীবনের স্তর ও মান (STANDARD) পরিমাপ করাই উদ্দেশ্য। এ মানসিকতার পরিণতিতে প্রবাসীদের দেশে প্রত্যাবর্তন আনন্দের বিষয় না হয়ে দুঃখ-বেদনার বোঝা বহনে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রবাস শেষে আত্মীয় মিলনের কাঙ্ক্ষিত আনন্দের পরিবর্তে মন থাকে দুরু দুরু শংকায় শংকিত। অজানা বিপদ ও বেইজ্জতির আশংকা মাটি করে দেয় স্বজন মিলনের আনন্দ বাসনাকে। প্রতি মুহূর্তের চিন্তা হয়ে যায় কত ঘুষ যেন দিতে হবে! এমন কেন হতে পারছে না, প্রবাস প্রত্যাগতরা আমাদের ভারতীয় ভাইয়েরা সীমান্তে (ত নৌ বা বিমান হোক) উপনীত হয়ে অনুভব করবে স্বর্গীয় সংবর্ধনা, উপলব্ধি করবে আনন্দ ও মর্যাদা।

আমাদের এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয়, আপনারা এ মুহূর্তটিই কলেজ (ও শিক্ষা জীবন) ছেড়ে দিয়ে সমাজ সংস্কারে লেগে পড়ুন, দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। তা আমি বলতে পারি না। কেননা আমি নিশ্চিত জানি, আপনাদের পক্ষে দেশ ও জাতির একনিষ্ঠ সেবা করা তখনই সম্ভব হবে, যখন আপনারা উত্তম ছাত্র জীবন যাপন করবেন। উত্তমভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে সুমহান বৈশিষ্ট্য অর্জন করবেন। নিজের ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম সহকারে শিক্ষা

জীবন সমাপ্ত করবেন। আমাদের বাসনা এতটুকু, কর্মজীবনে আপনারা কর্ম পালন, দায়িত্ববোধসম্পন্ন ও কর্তব্যসচেতন হবেন, দেশপ্রেমিক হবেন এবং মুসলমান হলে এক একজন খাঁটি মুসলিম হবেন। আমাদের মাঝে থাকবে সহায়তার মনোবৃত্তি প্রেরণা। আরামের তুলনায় কাজ করে আপনারা অধিক আনন্দবোধ করবেন। সারা দেশের শাসন ও প্রশাসন এখন নড়বড়ে ও ভগ্নপ্রায়। সার্বিক শৈথিল্য ও উদাসীনতা গ্রাস করে ফেলেছে গোটা জাতিকে। জনজীবন এখন বিপর্যস্ত। অভিযোগ করব কোন বিভাগের বিপক্ষে, কাঁদব কোন শাখার পরিণতিতে? সারা দেহ জরাগ্রস্ত, ক্ষত-বিক্ষত; মালিশ প্রলেপ আর কত লাগানো যায়!

আমার মুসলিম সন্তানেরা! বিশেষভাবে বলছি, বিষয়গুলো অন্যদের ক্ষেত্রে নাগরিক ও নৈতিক কতর্ব্য হতে পারে, তোমাদের জন্য তো দ্বীনী ও মাযহাবী ফরয ও কর্তব্য। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ - اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَاِذَا

كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ -

"মাপ ও পরিমাপের ওজন বাটখারায় কম দেয় যারা, তাদের জন্য অকল্যাণ ও ধ্বংস কপাল পোড়া) যারা অন্যদের থেকে মেপে নেয়ার সময়তো পুরোপুরি (কাটা ঝুলিয়ে) দেয়, কিন্তু অপরকে মেপে দেবার ক্ষেত্রে ওজনে কম দেয়।"

[সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ আয়াত-১-৩]

আল্লাহ পাক এ আয়াতে কত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এবং বাস্তব তথ্য প্রকাশ করেছেন। মাপে কম দেয়া শুধু দুধের দোকান বা আটা-নুন-তেল-মরিচের মুদী দোকানের সীমিত ব্যাপার নয়, 'তাতফীফ' মাপে কম দেয়া, দাঁড়ি মাপার কারবার করা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। আমাদের সমাজ ও প্রশাসনিক কাঠামো ঠকবাজ ও লুটেরা বর্গীর রূপ ধারণ করেছে। সকলেই এ ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত। নিজের হক ও প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় উসূল করা এবং সেজন্য প্রয়োজনে হাতাহাতি লাঠালাঠি করা আর অন্যের হক দেয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করা বা আধাআধি দেয়া স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

এ হেন পরিস্থিতিতে আপনারা যদি ভারতের বুকে মান-মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে চান, নিজেদের অবস্থান তৈরি করে তা সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করতে চান তাহলে তার একমাত্র উপায় হলো, বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল দ্বীন অনুসরণ, উন্নত ও নিখুঁত নৈতিকতা অর্জন এবং সমাজ সেবার উন্নত ও আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

এদেশের বুকে নেতৃত্ব লাভে অভিলাষীদের জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে দ্বীনের তৎকালীন তরবিয়াত শিক্ষা-দীক্ষা। আল-কুরআনের হিদায়ত, পথ-নির্দেশনা ও নবী আলায়হিস সালাম ও সাহাবীগণের আদর্শ ও উন্নত জীবন-চরিতের আলোকে জীবন গঠন করা। (সূরা কাহ্ফ বিবৃত) তরুণদের জীবনকর্মে জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিপদসংকুল কর্মপ্রান্তরে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও আশা-বাসনা জলাঞ্জলি দিলেই কোন জাতি রক্ষা পাবে বিপর্যয় ও বিনাশের চরম হুমকি থেকে এবং আর একটু সাহসিকতা ও উদারতা নিয়ে অগ্রগামী হলে আশা পোষণ করা যাবে মানবতার কল্যাণ সাধনের। কবি আকবার ইলাহাবাদী যথার্থই বলেছেন ঃ

نازکیا اس پہ جوبدلاہے زمانے تمہیں
مرد وہ ہیں جو زمانہ کوبدل دیتے ہیں

"যুগের স্রোতে ভেসে চলেছ, এ নয় গৌরব তোমার; কালের প্রবাহ রুখে দেয় যে পুরুষ, তারই মাথায় পরাও গৌরব মুকুট।"

গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলা গর্ব ও গৌরবের বিষয় নয়। যুগ-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে মানব কল্যাণে প্রবাহিত করাই পৌরুষদীপ্ত তরুণের অবদান।

واخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين-

# জীবন ও চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন অপরিহার্য

[১৭ই অক্টোবর ১৯৮২ ই আওরঙ্গাবাদ জামে মসজিদে প্রদত্ত ভাষণ]

হামদ ও সালাত।

সুধীবৃন্দ ও মুসলিম ভাইগণ, আমাদের মজলিসের ক্বারী সাহেবের তিলাওয়াতে এ আয়াতখানিও ছিল ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا -

"বলুন, ইয়া রব হে প্রতিপালক! আমাকে উত্তমভাবে কল্যাণের সাথে প্রবেশ করান এবং উত্তমভাবে কল্যাণের সাথে নিষ্ক্রান্ত করুন, আর আমাকে আপনার পক্ষ থেকে সহায়ক প্রতিপত্তি (শক্তি) দান করুন!" [সূরা ঃ আল-ইসরা'-৮০]

আওরঙ্গাবাদে উপস্থিতি আমার সত্য-ইতিহাস অধ্যয়নের স্মৃতি ভাণ্ডারে আলোড়নের ঝড় তোলে। স্মৃতিগুলো ছবি হয়ে ভেসে ওঠে দৃষ্টির সম্মুখে। আর এটা কোন সাধারণ ব্যাপার বা অবাক কাণ্ড নয়। ইতিহাসের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এটা একটা কঠিন সমস্যা। তারা তাদের ইতিহাস অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়ে কোথাও অবস্থান করতে পারেন না। ইতিহাসের নির্যাস মেঘের শামিয়ানা হয়ে তার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নিষ্কৃতির শত চেষ্টা করেও তিনি তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না। আওরঙ্গাবাদকে আমি 'ভারতের গ্রানাডা' নামে উল্লেখ করে থাকি। ইতিহাসবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমার এ উপমার রহস্য সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কেননা উভয়ের (স্পেনের গ্রানাডা ও ভারতের আওরঙ্গাবাদ) মাঝে গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। গ্রানাডায় ছিল আরবী ইসলামী হুকুমত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গোটা ইউরোপে ইসলামের ডংকা বাজিয়েছে। গোটা ইউরোপ ছিল তার প্রভাবের সামনে নতজানু। তার অবদান কৃপা থেকে ইউরোপ কোনদিন নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। ইউরোপকে সে যা দিয়েছে তা আক্ষরিক অর্থেই অনেক ও অঢেল। হ্যাঁ, যদি সে সারা ইউরোপকে ইসলাম সম্পদে সম্পদশালী করে দিত। এটা ছিল তার বড় ধরনের বিচ্যুতি। আর সে বিচ্যুতির মাশুলস্বরূপ আল্লাহ পাক তাদের দেশটিই ছিনিয়ে নিলেন।

আরবরা ইউরোপীয়দের দিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো। যুক্তি ও বাস্তবতার আনুগত্য ও অনুসন্ধান এবং গবেষণার পন্থা ও অভ্যাস। আধুনিক ইউরোপের উন্নতি ও অগ্রগতির পেছনে এ সবের প্রভাব ও কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। আন্দালুস তথা মুসলিম স্পেনই ইউরোপকে 'কিয়াস' ও অনুমান-নির্ভরতা থেকে ইসতিকরা' ও গবেষণার পথ দেখিয়েছিল। 'কিয়াস' হলো অনুমানভিত্তিক অর্থাৎ মেধা ও অধ্যয়নের বলে কোন মূলনীতি ও সার্বিক বিধি (থিওরী) স্থির করে এককসমূহকে তার সমান্তরালে নিয়ে আসা এবং এভাবে সার্বিক বিধি থেকে কোন বিশেষ এককের মান ও অবস্থান নির্ণয় করা। আর 'ইস্‌তিক্‌রা" হলো এককগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষার পর তার সমষ্টিগত ও সার্বিক অধ্যয়নের গবেষণালব্ধ নির্যাস থেকে কোন মূল বিধি ও থিওরীতে উপনীত হওয়া অর্থাৎ এককগুলো প্রমাণ ও সাক্ষ্য দেয়, সার্বিক ও মৌলিক বিধি এমনই হওয়া উচিত।

ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতি, অতিপ্রাকৃত দর্শন (তাত্ত্বিক দর্শন) বর্জন করে বিজ্ঞান-টেকনোলজি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পন্থা অবলম্বনের পেছনে ইস্‌তিকরার ও গবেষণার মূলনীতি মেনে নেয়াই কার্যকর কারণ। আর এ পন্থা মুসলিম স্পেনের ঋণ ও অবদান। স্পেন তাদের দিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গ্রীক দর্শনের গবেষণালব্ধ ফলাফল। স্পেনীয়রা গ্রীক দর্শন আহরণ করে তা আত্মস্থ করার পর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে এবং তা-ই অনূদিত হয়েছে ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায়।

কিন্তু তাদের মারাত্মক বিচ্যুতি ছিল ইউরোপে বিশুদ্ধ ও মৌলিক ইসলামের প্রসার না ঘটানো। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করলেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কথা সাহিত্যের উন্নয়নে নিমগ্ন হলেন। যাহোক, এটা এ মজলিসের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আওরঙ্গাবাদ মনের পুরান ক্ষত তাজা করে দেয়। তাই আবেগ-উদ্বেলতা আমাকে বাধ্য করেছে এসব কথা আওড়াতে। সেখানে যখন আরবী ইসলামী সালতানাতের পতন ঘটল, তখন এখানে ভারতবর্ষে তার সূচনা হলো। ওখানে পতনের শেষ পরিচ্ছেদ লেখা হচ্ছিল, আর এখানে ভারতীয় মুগল সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসছিল। মুগল সাম্রাজ্যের ভাল-মন্দ ও দোষত্রুটি যা-ই থাক, তা মুসলিম অধিকারের একটি প্রতীক ছিল। ইতিহাসবিদও সমালোচকগণ তার যতই সমালোচনা ও দোষ বর্ণনা করুন, আমরা তো তাদের বহু বিস্তৃত অবদান ও নীতিসমূহের স্বীকৃতি দানে বাধ্য।

অবশ্য এ সমালোচনা উত্থাপনে আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা হলো এ বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল্লাহ পাকের একটি বড় নিয়ামত, অনুগ্রহ, অবদান। আল-কুরআনও রাজ্য-রাজত্বকে বড় নিয়ামতরূপে উল্লেখ করেছে। কওমের প্রতি হযরত মূসা আলায়হিস সালামের বাণী উদ্ধৃত করে আল-কুরআন বলেছে ঃ

يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ -

"হে আমার স্বজাতি! স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যে তোমাদের মাঝে নবী-পয়গাম্বরদের মনোনীত করলেন এবং তোমাদের বানালেন রাজা-বাদশাহ আর তোমাদের দিলেন এতে সব কিছু যা তিনি দেননি (অন্য) কাউকে, জগতবাসীদের মাঝে।" [সূরা মায়িদা ঃ ২০]

মোটকথা, রাজ্য ও রাজ-ক্ষমতা একটি মহান নি'য়ামত। কিন্তু তা কোন কারখানায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বা বহনযোগ্য কোন বস্তু নয় যে, ইচ্ছা করলেই তা কোথাও থেকে বহন করে অন্য কোথাও স্থাপন করা হবে কিংবা কোথাও থেকে তুলে অন্য কোথাও লাগিয়ে দেয়া যাবে অথবা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শাসনাধিকার হলো বিশেষ ধরনের কর্তব্যবোধ, সৃষ্টির প্রতি সহযোগিতা, সমবেদনা, নৈতিকতা, জনসেবা ও জনকল্যাণের উদ্দীপনার একটি বহিঃপ্রকাশ ক্ষেত্র অর্থাৎ কোন জামাআত, কোন দল বা জাতি যখন বিশেষ ধরনের স্বভাবজাত ও নৈতিক গুণাবলী ও কর্ম অবদানে সমৃদ্ধ হয়, তখন তাদের সে স্বভাব ও নীতিবোধের এ কর্ম-অবদানের বিস্তৃতি ও গভীরতার মানদণ্ডে কোন ভূখণ্ডে তাদের যোগ্যতা-পারদর্শিতা প্রকাশের অবকাশ দেয়া হয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ -

"অতঃপর আমি তাদের (পূর্বসূরীদের) পরে তোমাদের পৃথিবীর বুকে খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত বানালাম, (উদ্দেশ্য) যাতে দেখে নিতে পারি, তোমরা কেমন কর্ম-আচরণ কর।" [সূরা ইউনূস—১৪]

মৌলিক বিষয় হলো, অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও বাহ্যিক আচার-অবদান অর্থাৎ এমন জীবন পদ্ধতি যা শুধু সালতানাত ও রাজ্যাধিকার নয়, বরং তার চেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ্‌র মা'রিফাত ও পরিচিতি, আল্লাহ্‌র দরবারে প্রিয় হওয়ার স্বীকৃতি ও দৃষ্টির গভীরতা, কল্যাণ প্রসূতি দান করার মাধ্যমে হিদায়াত ও আল্লাহ পাকের অসীম রহমত প্রাপ্তির দরওয়াযা খুলে দেয়। রাজ্যাধিকার ও শাসন ক্ষমতা তো এর একটা অতি সাধারণ ও লঘু প্রতীক মাত্র। ঈমানী সীরাত ও ঈমানী নৈতিকতা হলো এমন বিষয় যার ফলে দিকদিগন্তে ও ব্যাপক জনতার মাঝে বিস্তৃত হয় বিজয় প্রভাব, ক্ষমতা প্রদত্ত হয় মানুষের মনের ওপরে শাসন চালাবার। ঈমানী চরিত্র দান করে এমন বাদশাহী যার তুলনায় হাজার (পার্থিব) রাজত্ব তুচ্ছ ও নগণ্য। কারণ সব কল্যাণের উৎস ও প্রস্রবণ সে মূল বিষয়টি তা সীরাত ও ঈমানী চরিত্রবল। একবার কোথাও আমি বলেছিলাম, "সংকল্প সংগঠন জন্ম দেয়, সংগঠন সংকল্প জন্ম দেয় না।" প্রকৃত বিষয় হচ্ছে সঠিক সংকল্প। ব্যক্তি ও সমষ্টির মনে সঠিক ও যথার্থ সংকল্পের উদ্ভব হলে শত শত প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী ও ভংগুর। এই সজীব হয়, আবার এই নির্জীব ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, আবার বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের সংকল্প সঠিক ও যথার্থ রূপ ধারণ করলে, নিয়ত ও বাসনা নির্ভুল ও সঠিক হলে, মানব জীবন, স্বভাব-চরিত্র শরী'য়তের কাঠামোতে গড়ে উঠলে এবং আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষ পন্থায় গঠিত হলে, মোটকথা মেধা-মস্তিষ্ক যদি সঠিক গন্তব্য, সঠিক গন্তব্যাভিমুখে এমন নির্ভুল গতিতে অগ্রসর হয় তখন প্রতিটি লোমকূপ থেকে এ ধ্বনি উঠতে থাকে ঃ

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا -

তখন তাদের তো তাদের—গোলামদের পদতলে লুণ্ঠিত হতে থাকে কিস্‌রা ও কায়সারের তাজ আর রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি হয় অবলুণ্ঠিত। কবি ইকবালের ভাষায় ঃ

در شبستان حرا خلوت گزید
قوم وا ئين وحكومت افريد
ماند شبها چشم اومحرم نوم
تابتخت خسروى خوبيه قوم -

"নির্জন হেরা গুহার একান্ত রজনীমালা,
নিভৃতে রচিয়া চলে জাতি ও হুকূমত।
ধ্যানমগ্ন মহামানবের বিনিদ্র যামিন,
কওমের পদতলে লুটায় কিস্‌রার তখ্‌ত।"

অর্থাৎ হেরা পর্বতগুহায় নিভৃত রাত্রি বাসকালেই জন্ম নিয়েছিল একটি নতুন জাতি, রচিত হচ্ছিল তার হুকূমত ও শাসনতন্ত্র। আর হেরার বিনিদ্র রাতগুলোই অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কওমকে মনোবল দিয়েছিল পারস্য সম্রাটের সিংহাসনকে একটা সাধারণ শয্যা বা চাটাই মনে করার।

কিসরা হোক কিংবা কায়সার, পারস্য সম্রাট হোক কিংবা রোমান আমপায়ার, পার্থিব জৌলুস ও জাঁকজমক তাদের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগাতে পারে নি। বহু মূল্য রাজকীয় সিংহাসন তাদের দৃষ্টিতে ছিল নগণ্য একটি মাদুর কিংবা চাটাই। আর তাতে খচিত হীরা-পান্না, মোতি-মুক্তো ছিল তাদের কাছে মাটির ঢেলামাত্র। সিংহাসন ও মাটির শয্যায় কোন ব্যবধান তারা দেখতে পায়নি।

তাহলে লক্ষণীয় আসল বিষয়টি কী? মূল ব্যাপার কোথায়? আল্লাহ পাকের মন্‌জুর হলে, তাঁর হিকমত ও মহাজ্ঞানের ফয়সালা হয়ে গেলে নতুন রাজ্য ও রাজশক্তির উদ্ভব হয়। আল্লাহর হিকমতের 'তাকাযা' ও দাবী অন্যরূপ হলে আরও বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। আমাদের পূর্বসূরী সম্বলহীন দরবেশগণ ছিন্নবস্ত্রধারী আল্লাহওয়ালা ফকীরগণের অনেকে আপনাদের এ মাটিতে আরামে ঘুমিয়ে রয়েছেন। তারা হুকুমত করতেন রাজা-বাদশাহ্‌দের ওপর। হযরত খাজা বুরহানুদ্‌দীন গরীবের জীবনী ও ঘটনাবলী পড়ে দেখুন, আর পড়ুন হযরত খাজা মুঈনুদ্দীনের ঘটনাবহুল জীবনী। শায়খ যয়নুদ্‌দীনের ঘটনাবলী পড়ে দেখুন। একটি ঘটনা বলছি। শায়খ যয়নুদ্‌দীনকে তাঁর সমকালীন বাদশাহ দরবারে তলব করলেন। তলবকারী ছিলেন সে যুগের সর্বাধিক ক্ষমতাধর সম্রাট। কোন কারণে তাঁর মিযাজ বিগড়ে গিয়েছিল। শয়খ যায়নুদ্‌দীন কি করলেন? খাজা বুরহানুদ্‌দীনের মাযারে গিয়ে লাঠি গেড়ে দিলেন—দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে বললেন, এবার আস! দেখা যাক কার কত সাহস, কার কত বুকের পাটা! তুলুক দেখি আমাকে এখান থেকে? অবশেষে রাজ ক্ষমতাই তাঁর সমীপে অবনত হয়েছিল, তিনি আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেননি। ইতিহাসে রয়েছে এমন আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত।

মোটকথা, মূল নিয়ন্ত্রক হলো সীরাত সৃষ্টি করা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা আল-কুরআনে যার শিরোনাম— ادخلنی... আগমন ও প্রস্থান, প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ হবে কল্যাণের সাথে। প্রবেশ ও প্রবেশাধিকার হবে তোমার মর্যী ও বিধি মুতাবিক, প্রস্থান ও প্রত্যাগমনও হবে তোমরাই মর্যী ও নির্দেশিকা মুতাবিক। এ বিষয়টিকেই বলা হয়েছে ঃ مُدْخَلَ صِدْقٍ ও مُخْرَجَ صِدْقٍ "কল্যাণ ও মঙ্গল

হয়ে আগমন, কল্যাণ ও মঙ্গল হয়ে বিদায় গ্রহণ।" আর সে ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে এভাবে - وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا (তোমার দেয়া শক্তি-সামর্থ্যকে বানাও আমার সহায়ক) অর্থাৎ কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের শক্তি-সামর্থ্য সরবরাহ হবে তোমার মহান দরবার ও ভাণ্ডার থেকে অর্থাৎ আপনি ব্যতীত মদদদাতা কোন সত্তা নেই। আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের মাঝে শক্তি সৃষ্টি করে দিন। মুসলমানদের শক্তি-সাহসের রহস্য এখানেই নিহিত।

আর রাজত্ব, তা ক'দিন কার স্থায়ী হয়েছে? সালতানাত ও রাজত্ব স্থায়ী বিষয় হলে খিলাফতে রাশেদাহ স্থায়ী হয়ে যেতো। পরবর্তী যুগের কোন সাম্রাজ্যের কথা বললে আব্বাসী সালতানাত স্থায়ী হতো যার অধিকার ও বিস্তৃতি ছিল এশিয়া-আফ্রিকার গোটা সভ্য অঞ্চলের ওপর। আমাদের ভারতে মুগল শাহানশাহী কত বড় সালতানাত ছিল, কিন্তু তা-ও বিলীন হয়ে গিয়েছে। মোটকথা, এ সব বিষয় (রাজ্য ও ক্ষমতা) আল্লাহ্ পাকের নি'য়ামত। তিনি কাউকে তা দান করলে তা থেকে উপকার লাভে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। আমি তাকে তুচ্ছ বিষয় বলতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমি বলতে চাই, তা মুসলমানদের জন্য জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার নয়। এমন ব্যাপার নয়, সালতানাত ও রাজ্য হারিয়ে ফেললেই মুসলিম উম্মাহও বিলুপ্ত বা নির্জীব হয়ে যাবে। আর রাজ্যাধিকার পেলেই উম্মত জীবন লাভ করবে। কারণ এ উম্মতের অবস্থান সালতানাতের ঊর্ধ্বে। উম্মত রাজ্যের ঊর্ধ্বে, রাজ্য উম্মতের ঊর্ধ্বে নয়। সালতানাত উম্মতের কল্যাণের জন্য, উম্মত সালতানাতের উদ্দেশে সৃজিত নয়। সীরাত ও চরিত্রই রাজ্য জন্ম দেয়, বরং রাজত্ব ও ক্ষমতার চাইতে উন্নততম ও ঊর্ধ্বতম বিষয় জন্ম দেয়। তেমন চরিত্র খোদ আল্লাহ পাকেরও প্রিয়। তার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ সারা বিশ্বের সপ্ত মহাদেশের ক্ষমতাও দান করতে পারেন এবং তা দান করেছেনও। যেমন হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামকে: কখনো বা অন্য কোন মহান চরিত্রের অধিকারী কোন প্রিয় বান্দাকে। তবে মানদণ্ড এ আয়াতেই وقـــل رب ادخلنى। অর্থাৎ "আমার জীবন, আমার মরণ, আমার আচার-আচরণ, আদান-প্রদান, আমার ওঠা ও বসা, আমার প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি পদক্ষেপ (ইয়া আল্লাহ) তোমরা মর্যী ও সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত।" আল-কুরআনের নিজস্ব ভাষায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায় ঃ (যার শিক্ষা দেয়া হয়েছে নবী আলায়হিস্-সালমকে)।

قُلْ إِنَّ صَلَوٰتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -
لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

"বলুন, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মৃত্যুবরণ, (সব-ই) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের (সন্তুষ্টি সাধনে) নিবেদিত, যার কোন শরীক (অংশী) নেই; আর আমি এ বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছি, আর আমি আত্মসমর্পণকারী সর্বপ্রথম মুসলিম।" [সূরা ঃ আল-আন্'আম-১৬২]

মুসলিম জীবন গড়ে ঢেলে সাজাতে হবে শরীয়তের কাঠামোতে, কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে এবং নবী-চরিত্রের আদর্শে। মনচাহী ও কামনার দাসরূপে নয়। গমন- প্রত্যাগমন, আচার-আচরণ, আদান-প্রদান, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা সব হবে শরীয়ত নিয়ন্ত্রিত, প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রবৃত্তিপূজারী হয়ে হুকূমত ও শাসন চালানো যাবে না, প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে অন্যের হুকুম ও শাসন মেনে নেয়া যাবে না। কামনার তাড়নায় কাউকে বশীভূত করা হবে না। কামনা চরিতার্থের সাথে কারো সামনে অবনত হওয়া যাবে না। এ সবই হচ্ছে ঃ

اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ -

যে কোন কাজ, যে কোন পদক্ষেপ সূচিত ও পরিচালিত হবে শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে। প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি মুহূর্তে লক্ষণীয় হবে—আল্লাহ পাকের মর্যী ও বিধান। আল্লাহ পাকের হুকুমে 'অবনত হও' হলে তাই করতে হবে, হুকুম যদি 'থেমে যাও' হয়, তবে তা-ই করতে হবে। সাহাবা-ই কিরাম ছিলেন এর বাস্তব নমুনা। কবি (আলতাফ হুসায়ন) হালী সাহাবী স্তুতিতে বলেছেন ঃ

بھڑکتی نہ تھی خود بخود اگ انکی
شریعت کے قبضہ میں تھی باگ انکی
جہاں کرد یانرم نرمائیے وہ
جہاں کردیا گرم گربائیے وہ

[সাহাবীগণের (রা.) শরীয়ত নিয়ন্ত্রিত জীবন]

"অকারণে ফুঁসে ওঠেনি কভু অগ্নি তাঁদের
শরীয়ত নিয়ন্ত্রিত ছিল লাগাম তাঁদের
নম্রতার স্থান-কালে কোমল নম্র মাটির সমান
তেজস্বিতার ক্ষেত্রে তাঁরা দীপ্ত তেজীয়ান।"

অর্থাৎ ব্যক্তিস্বার্থে তাঁরা কখনো উত্তেজিত বা অবনমিত হতেন না। শরীয়তের নির্দেশে মাথা ভূলুণ্ঠিত করতেন কিংবা আগুনের তেজে ফেটে পড়তেন। ন্যায়ে উদার আর অন্যায়ে কঠোর ছিল তাঁদের জীবনের মূলনীতি। হযরত আলী (রা.) এক কাফিরদের বুকে তরবারি চালাতে উদ্যত হলেন। কাফির তাঁর গায়ে থু থু ছিটিয়ে দিলে শান্তভাবে তাকে ছেড়ে দিলেন। বিস্ময়াভিভূত কাফিরের প্রশ্নের জবাবে বললেন ঃ তোমার ব্যক্তিসত্তাকে ঘৃণা করি না, ঘৃণা করি তোমার কুফ্‌রী ও আল্লাহদ্রোহিতাকে। তোমাকে হত্যা করা উদ্দেশ্য, তোমার কাফিরসত্তাকে বিলীন করার উদ্দেশ্যে আর তা ব্যক্তিস্বার্থে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়। আল্লাহর দ্বীনের সপক্ষে ক্রোধের কারণে তোমার থুথুর পরে হত্যা ইখলাস ও নিষ্ঠাকে কুলষিত করতে পারে। [অনুবাদক]

হযরত! ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক হিসাবে পুরাতন স্মৃতি আমাকে জ্বালাতন করছে, মনের মাঝে তুলছে ঝড়, আলোড়ন। সে ব্যাপার স্বতন্ত্র—কিন্তু আল-কোরআন তো চিরন্তন চিরসজীব গ্রন্থ এবং আল-কুরআন আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে আগত যুক্তিবুদ্ধিসমৃদ্ধ জীবন্ত সমাধান  ইসলামী চরিত্র গঠনই মুখ্য বিষয়। অর্থাৎ প্রবৃত্তির চাহিদা ব্যক্তিস্বার্থ ও সাময়িক স্বার্থ চিন্তাকে শরীয়তের সামনে অবনত করে দিয়ে তার অনুগত ও আজ্ঞাবহ বানাতে হবে। মিথ্যা মর্যাদা, ক্ষণিকের সুনাম বা বাহ্‌বা লাভ, খ্যাতির স্পৃহা, সমসাময়িকীদের দৃষ্টিতে মর্যাদার আসন লাভ করা তুচ্ছ বিষয়, মুখ্য নয়। মুখ্য হলো আল্লাহ পাকের বিধান, আর আল্লাহ পাকের বিধান অর্থ তিনি আমাদের কী ধরনের জীবন পছন্দ করেন তা অনুসন্ধান করা এবং চলমান ক্ষেত্রে ও সময়ে ইসলামের দাবী কি তা খুঁজে বের করা। যাবতীয় সাধ্য-সাধনা, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সব পদক্ষেপকে পরিমাপ করতে হবে মহানবীর সুফলের মানদণ্ডে। সব শ্রম ও অধ্যবসায় আবর্তিত হবে মুখ্য উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু ঘিরে। সামাজিক স্বার্থে বা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নয়, বরং ইসলাম ও ঈমানের দাবীর ভিত্তিতে।

সারা বিশ্বে আজ ছড়িয়ে রয়েছে মুসলিম জাতি। এমন কোনো দেশ রয়েছে কি যেখানে আপনাদের দেশের লোকেরা নেই। কিন্তু তাদের এ বিশ্বজোড়া বিস্তৃতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একটাই, দ্বীন ও ঈমানের দাওয়াত, প্রসারের জন্য নয়, মানবতার প্রতি মর্মবেদনার কারণে নয়। ইংল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা, এমন কি আরব দেশসমূহের ভয়াবহ অধঃপতনে ব্যথিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণে তারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েনি। সুতরাং তা اخرجنى مخرج صدق কল্যাণব্রতে বহির্গমন নয় এবং ঐসব দেশে প্রবেশ করাও ادخلنى।

مدخل صدق কল্যাণ উদ্দেশে প্রবেশ নয়। জীবিকা ও অর্থ উপার্জনের স্বার্থ তাদের দেশ ছাড়া করেছে। অর্থ উপার্জন মনোবৃত্তিই তাদের অন্যত্র প্রবেশ করিয়েছে, স্বার্থ হাসিলের দাবিতে তারা মক্কা ছেড়ে নিউইয়র্ক যেতে কুণ্ঠিত হবে না। আবার স্বার্থ হাসিলের সুযোগ দেখা দিলে মক্কায় চলে আসতে পিছপা হবে না। কিন্তু তা এ উদ্দেশ্যে হবে'না, সেখানে হারাম শরীফ রয়েছে, বরং এ উদ্দেশ্যে যে, সেখানে রয়েছে অর্থ উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা আপনার অবিশ্বাস হলো যে কোন মুহূর্তে যাচাই করে দেখতে পারেন। কাজেই তাদের উদ্দেশ্যে مخرج صدق ও مد خل صدق -এর বিধান অনুযায়ী আমল করা নয়, অথচ তা ছিল আল্লাহর হুকুম যার তা'লীম ও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল মহান নবীকে এবং তাঁর মাধ্যমে ও ওসিলায় উম্মতকে শেখানো হলো رب اد خلنى مد خل صدق আমাদের জীবন, মৃত্যু, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিচ্ছেদ এবং আমাদের ভাঙা-গড়া আল্লাহর মর্যী ও বিধানের অনুযায়ী করে নিতে হবে। তাহলে দেখতে পাবেন তার অবর্ণনীয় সুফল, আল্লাহ্ পাকের অপার দান ও মহিমা। আমার অভিযোগ ও মাতম এটাই, আমাদের চরিত্র বিগড়ে গেছে, মন-মানসিকতার আমূল বিকৃতি ঘটেছে। শরীয়ত এখন আমাদের পরিচালক নয়, আমাদের সমস্যাবলী সমাধানে সালিস ও শরীয়তের বিচারক হওয়ার শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। শরীয়তের স্থলে আমরা কামনা ও প্রবৃত্তিকে বিচারক নিয়োগ করেছি। স্বার্থই আমাদের বিচারকর্তা হয়েছে। এক কথায় এখন মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন চারিত্রিক বিপ্লব সাধন যার লক্ষ্য হবে জীবন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মর্যী ও চাহিদা মুতাবিক গড়ে তোলা, এমন মানসিকতা সৃষ্টি করা যে, তিনি যা করাবেন তাই করব, তিনি যা বর্জন ও বিসর্জনের নির্দেশ দেবেন, যা ছিনিয়ে নেবেন, তা পরিত্যাগ করব।

একটু আত্মবিশ্লষণ ও আত্মযাচাই করে দেখুন। নামে তো আমরা সকলেই মুসলমান। এতেও আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করছি। কারণ তা-ও আল্লাহ পাকের হাযার নি'য়ামত—মেহেরবানী। কেননা নবীগণের সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে, আমাদের কাছে রয়েছে ঈমানের মহান দৌলত। আমি তাঁর মর্যাদা অস্বীকার করছি না, তার গুরুত্ব ক্ষুণ্ন করছি না। কিন্তু আমাদের চরিত্র ও নৈতিকতার অবস্থাটা কি? যখনই কোথাও কোন স্বার্থের গন্ধ পেয়ে যাই, তাতেই আকৃষ্ট ও ধাবিত হই। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য সংসদ ও এসেম্বলীতে সদস্য পদ লাভ করা, কোন কমিটির সদস্য হতে পারা, বেতন-ভাতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা, সুনাম ও সুখ্যাতির অধিকারী হওয়া। জীবনের অপরাপর

ক্ষেত্রেও অবস্থা অভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিয়ে-শাদীর ব্যাপার ধরুন। তাতে যা কিছু হচ্ছে–সঠিক কিংবা অঠিক উদ্দেশ্য একটাই ঃ সমাজে খ্যাতি লাভ, নাম ফোটানো, হৈ চৈ আর ধুমধামের চর্চা হোক। সকলে বলুক, অমুকের বিয়ে হয়েছে–কী শান-শওকত, কী ধুমধাম, কত সজ্জা, কত জৌলুস আর কত যৌতুক-উপহার! একে কি বলা যায় কল্যাণে গমন ও কল্যাণে প্রস্থান? মুসলমানের সর্বপ্রথম কর্তব্য তো হলো, কথা জিজ্ঞেস করা, এ বিষয়ে, এ মুহূর্তে এ পদক্ষেপে আমাদের জন্য শরীয়তের বিধান কি? আমাদের জন্য এটা জাইয কি না?

সাহাবা-ই কিরাম (রা.) জীবন গড়েছিলেন সেভাবেই। মদের মত আসক্তি সৃষ্টিকারী বস্তু (ছেড়ে দিলেন নির্দ্বিধায়)—কেমন তার আসক্তি (আল্লাহ হিফাযত করেছেন আমাদের সকলকে তাঁর ফযল ও মেহেরবানীতে)–কবির ভাষায় ঃ

چھٹتی نہیں ظالم منہ سے لگی ہو ئی -

এত দুষ্ট। হটানো যায় না তারে কোন কৌশলে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোল্ডারের যুগে মদ নিরোধ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। তার বিস্তৃত রিপোর্ট পড়ে দেখুন, কত বুদ্ধি-কৌশল, কত প্রচার-প্রপাগান্ডা চালান হলো, কত কোটি ডলার ব্যয় করা হলো, জীবন সাধনা করা হলো, মারাত্মক ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে তা বর্জনে উৎসাহিত করা হলো। কিন্তু ইতিহাস বলছে, সমস্যার সমাধান না হয়ে আরো জট পাকিয়ে গেল। মদখোরদের যেন জিদ চড়ে গেল ঃ না, মদ ছাড়া যেতেই পারে না! অবশেষে প্রেসিডেন্ট ও সরকারকে হার মানতে হলো। মদখোরেরা হার মানল না।

প্রতিপক্ষে আসুন সাহাবীগণের (রা.) যুগে বুকে জীর্ণ চাটাই ও হোগলায় উপবেশন করে আল্লাহ পাকের বান্দা রাসূল আকরাম (সা.) ঘোষণা করলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা (বেদী) ও লটারী, তীর, (এ সবই) অপবিত্র, পংকিলতা ও শয়তানী কাজ-কারবার। তাই তা থেকে দূরে সরে থাক যাতে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হও।" [মায়িদাহ্ ঃ ৯০]

এ ঘোষণার ধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই প্রতিধ্বনি এল انتهينا - انتهينا। "ছেড়ে দিলাম, ফিরে গেলাম"। প্রত্যক্ষদর্শীরা মদীনার

তখনকার পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছে, ওষ্ঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে যে মদ মুখ গহ্বরে প্রবেশ করছিল, তাও আর সামনে এগুতে পারে নি। এক বিন্দুও নয়, তখন তখনই উগরে ফেলা হয়েছে, যেখানে বসা ছিল সেখানেই উগরে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা তার বিবরণ দিয়েছে, এ ঘোষণার পর মদীনার অলি-গলিতে শরাব প্রবাহিত হতে লাগল, যেমন পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। এবারে আসুন পরবর্তী ইতিহাসে, মহান খলিফা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালে। তখন রোম, পারস্য ও সিরিয়া মুসলমানদের পদানত, সম্পদ প্রাচুর্যে ঢল নেমেছে, বহির্বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথেও পরিচিতি ঘটেছে। কিন্তু শরাব পান করার ঘটনা ক'টি ঘটেছে?

আজ অভাব যে বস্তুটির যা সাধন করতে পারবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা পরিস্থিতির আমূল রদবদল ঘটাতে পারে, তা হলো ইসলামী সীরাত ও ঈমানী চরিত্র গ্রহণ করা। সম্মিলিতভাবে সে প্রয়াস চালাতে পারলে তার সুফল তো হবে অভাবনীয়। আলহামদুলিল্লাহ! বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেহনত শুরু হয়ে গিয়েছে। আসুন, প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিবেদিত হই, সবাই মিলে সম্মিলিত কর্মসূচীও গ্রহণ করি। সর্বস্তরের লোকই এ মজলিসে রয়েছেন। আসুন! অন্তত আমরা (উপস্থিতরা) প্রত্যেকে এ সংকল্প করি, শরীয়তকে অগ্রাধিকার দেব, আল্লাহ্‌র আইন ও শরীয়তের বিধান জ্ঞান নিয়ে তদনুসারে আমল করব, ছোট-বড় যে কোন কাজ হোক—রাজনীতি ও রাজনৈতিক নির্বাচনের ব্যাপার থেকে শুরু করে বিয়ে-শাদী, খাত্‌না (মুসলমানী), আকীদা, বাড়ি-ঘর তৈরি ও উদ্বোধন, সম্পদ-সম্পত্তির বণ্টন, আয়-ব্যয়, উপার্জন, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ—সব ব্যাপারেই আগে দেখে নিতে হবে, শরীয়ত তার অনুমতি দেয় কিনা? সে বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি?

আমাদের মাঝে এরূপ মন-মানসিকতা জন্ম নিলে সব চেষ্টাই ফলবতী হবে, ফলবতী হবে এখানে আপনাদের উপস্থিতি, আর আমার আগমন এবং আপনাদের সাথে আলাপও হবে অর্থবহ। অন্যথায় তা হবে– لسستند وكوفتنه وبر طوا ستنه - এলাম, বসলাম, কতক্ষণ বক্ বক্ করে উঠে গেলাম। আল্লাহ করুন আর এমন যেন না হয়।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে একই অবস্থা চলছে। আমরা বলে অবকাশ পাচ্ছিনা, আপনাদের শোনার অভ্যাস দূর হচ্ছে না। এভাবে চলতে পারে না। কোন অর্থবহ সুফল হাতে আসা উচিত। আসুন, যিনি সালাতে অভ্যস্ত নন,

আসন্ন জুহর থেকে আমরণ অঙ্গীকার করুন সালাত আদায়ে আর অবহেলা করবেন না। আর এক ওয়াক্তও কাযা হতে দেবেন না। আল্লাহ্ না করুন, কোন না-জাইয বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে থাকলে এ মুহূর্তে তওবা করুন ঃ আর নয়, হাত ধুয়ে ফেললাম।

মুসলমানরা রাজনীতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে, সব দিন, সব জায়গায় এ মায়াকান্না শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে, প্রাণ আইঢাই করছে। আর নয়! প্রথম জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকেই দেখে আর শুনে আসছি, এমন কোন জলসা-অনুষ্ঠান, সমাবেশ-সম্মেলন হয় না যেখানে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার জন্য মায়াকান্না কাঁদা হয় না। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেই, নেই কোন সংকল্প, ফল হচ্ছে না কিছুই। সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক প্রয়োজন স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তন সাধন; অন্যথায় সাধিত হবে না কিছুই। আল্লাহ্ পাক যখন তাঁর প্রিয় রাসূলকেও নির্দেশ দিলেন এবং শিক্ষা দিলেন, ওযীফারূপে দায়িত্ব অর্পণ করলেন, দু'আ শেখালেন। বল ঃ

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ـ

তাহলে আমাদের সাধারণ মানুষদের হিসাব-নিকাশ কোথায়? কোন সাধারণ আইনদাতাও তার আইনের পরিবর্তন কিংবা ব্যতিক্রম ঘটায় না। আর এতো আল্লাহ্ পাকের বিধান। তবে বিধানের মূল কথা হলো ঃ তোমার আত্মপরিবর্তন ও আত্মসংশোধন আগে সাধন করবে, তাহলে আসবে আমার মদদ ও নিয়ামত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْانِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ...

"ওহে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর আমার সে সব নি'য়ামত (ও অনুগ্রহ) যা আমি তোমাদের ইন'আম (দান) করেছিলাম। আর পূরণ কর সে অঙ্গীকার যা তোমরা আমার সাথে করেছিলে; তাহলে আমিও পূর্ণ করব সে অঙ্গীকার যা আমি তোমাদের সাথে করেছি।" [আল-বাকারা ঃ ৮০]

অর্থাৎ "হে বনী ইসরাঈল (সে কালের শ্রেষ্ঠ সম্মানিত জাতি)! তোমরা আল্লাহ্ পাকের ইহ্সান অনুগ্রহ স্মরণে রেখে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ

করলে আমিও তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করব। এটাই সফলতা প্রাপ্তির ক্রমবিন্যাস। অথচ আমরা চাচ্ছি, আল্লাহ্ পাক আমাদের সাথে তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন, পরের কাজ পরে দেখা যাবে। এ যেন সেই দু'আর মতো, ইয়া আল্লাহ! আমাকে এক লাখ টাকা দাও, তাহলে অর্ধেক তোমার নামে খরচ করব। আর একান্ত আমাকে বিশ্বাস না হলে তোমার অর্ধেক তুমি রেখে দাও, আমার পঞ্চাশ হাজার আমাকে দিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাকতো 'আলীমুন খাবীর-সব জানেন, সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে খবর রাখেন। অন্তর্যামী- অন্তরের অন্তস্থলের সব অবস্থা ও চিন্তা-ধান্দা জানেন—তাই মনের মাঝে কি দুরভিসন্ধি রয়েছে, তাঁর অজানা থাকে না।

আমাদের অবস্থা তো এই, সব অভিযোগ সব আল্লাহ্র নামে–এমন কেন হচ্ছে? আখেরী নবীর পেয়ারা উম্মত কেন দুর্দশাগ্রস্ত? শ্রেষ্ঠ উম্মত কেন অপদস্থ ও পর্যুদস্ত? কেন তারা সব দেশে সব ক্ষেত্রে মার খাচ্ছে? আরে ভাই! এতদিন যে ওয়ায-নসীহত চলছে, তাবলীগ জামাত মেহনত করে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে রদ-বদল কী ঘটেছে? বিয়ে-শাদীতে সেই কুপ্রথা-কুসংস্কারের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। মুসলমানদের মাঝে অপব্যয়ের স্বভাব অপরিবর্তিত। এ শহরেই কোথাও যাওয়ার পথে দেখলাম এখানে আলোকসজ্জা, সেখানে আলোকসজ্জা। মন আশংকা করল হয়ত কোন মুসলমান বাড়ীই হবে। কী জৌলুস সে সজ্জার! মনে হচ্ছিল যেন সব আলো আর বাতি ওখানে একত্র করা হয়েছে। আমরা নিজের অবস্থান থেকে সামান্য হটতে রাজী নই। এখানে বেশ অবিচল আমরা। দশ বছর আর বিশ বছর আগে অবস্থা যেমন ছিল, যেমন জীবন-পদ্ধতি ছিল, আজও তেমনি রয়েছে। সালাতে যাদের অনিয়ম ছিল, তারা নিয়মানুবর্তী হয়নি, যারা (মদ) পান-আপ্যায়নে অভ্যস্ত ছিল, তাদের পান-আপ্যায়ন অপরিবর্তিত রয়েছে। সম্পদ, সম্পত্তি, বান্দার হক ও লেন-দেনে দ্বীনদারী-বিশ্বস্ততা যাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় ছিল, আজও তারা তাকে ফালতু মনে করে। যা যেমনভাবেই আসুক অধিকার করে নেয়া হচ্ছে আর অভিযোগ ঃ আল্লাহ কেন....? (আমি বলতে চাই) আপনাদের এই দেশের কথাই ধরুন। আপনারা সততা ও সত্যবাদিতা অর্জন করুন। নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করুন। সহমর্মিতা-সমবেদনায় গুণান্বিক হোন, আপনাদের মাঝে জন্ম লাভ করুক মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জাগ্রত হোক দেশরক্ষার পরিপূর্ণ চিন্তা ও সংকল্প। তাহলে তখন এটা জোর-জবরদস্তির বা অবাস্তব ব্যাপার হবে না। আল্লাহর বিধানতো রয়েছেই–মানব স্বভাবের বিধান হিসাবে আমিতো জোর গলায় বলতে

পারি, আপনাদের কাছে এ প্রস্তাব নিয়ে আসা হবে, বার বার অনুরোধ-খোশামোদ করা হবে—দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে, আপনারাই এর বিহিত ব্যবস্থা করুন, শাসন ভার গ্রহণ করুন। কারণ এ গাড়ী আর চলছে না। এটাই মানব প্রকৃতি। মানুষ আপনাকে পছন্দ করে, আপনার হাতে কাজের দায়িত্ব দিতে চায়, তাদের সময় বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা করে আপনার অধীনে পরিচালিত হতে চায়। মানুষের এ স্বভাব চিরন্তন। যখন তারা জেনে ফেলবে, আপনাকে দিয়েই তাদের কাজ সমাধা হতে পারে, আপনিই তাদের সমস্যার সমাধান দিতে পারেন। তাহলে কোথায় থাকবে জাতিভেদ, বর্ণভেদ। কেথায় তলিয়ে যাবে গোত্র-গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িকতা! সকলেই এক বাক্যে অনুরোধ করবে, প্রস্তাব করবে, আপনিই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে শেষ রক্ষা করুন!

আপনি সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত থাকবেন, অথচ কাজ কিছুই করবেন না, এভাবে পরিচালনার নেতৃত্ব অধিকার করা যায় না। নেতৃত্ব লাভের পন্থা অভিযোগ আর অভিযোগ করতে থাকা নয় যে, আমাদেরও এ অধিকার দিতে হবে, আমাদের দাবী মেনে নিতে হবে। নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করুন, তখন দেখবেন, সংখ্যালঘু হওয়ার প্রশ্নতো উহ্যই থেকে যাবে। তখন এক ব্যক্তি এককভাবে তার দ্বীনদারী ও বিশ্বস্ততা, আল্লাহর ভয়, তাকওয়া ও যোগ্যতার বলে সকলকে দমিয়ে অবনত করে দিতে পারে এবং স্বীকৃতি আদায় করতে পারে তার দক্ষতা-প্রতিভার। রাজনীতির মাঠের অভিযোগ-চিৎকার, রাজনৈতিক বাদ-প্রতিবাদ, মিছিল হরতাল অনেক হয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটাই নি। ফলে আমাদের অবস্থাও রয়েছে যথার্থ ও অপরিবর্তিত।

আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এ সংকল্প করে নিক , সে যেখানেই থাকুক না কেন, যে কোন বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট ও চৌকিতে তার নিয়োগ- অবস্থান হোক না কেন, সে প্রমাণিত করে দেবে, সে একজন সৎ ও সত্যবাদী মানুষ। সে একজন কর্মঠ কর্মী, হক ও ইনসাফের ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিমের তার দৃষ্টিতে কোন ব্যবধান নেই; হারাম পয়সার দিকে চোখ তুলে তাকানোও সে নিজের জন্য হারাম মনে করে। এমন (পরীক্ষামূলকভাবে) কিছুদিনের জন্যই করে দেখুন না, তখন আমাদের এই দেশের রূপরেখা কি দাঁড়ায়। আপনি কোন্ মসনদে অবস্থান করতে পারেন । আমাদের বোধোদয় ঘটুক-এ বলেই শেষ করছি ঃ

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين -

# কাশ্মীরের উপহার

# কাশ্মীর উপত্যকায় নির্ভেজাল তাওহীদের পয়লা পয়গাম ও তার প্রথম পতাকাবাহী

কাশ্মীরে ইসলাম তালায়ারের জোরে নয়, রুহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছিল।

[এ বক্তৃতা ১৪০২ হিজরীর পহেলা মুহাররাম (৩০শে অক্টোবর, ১৯৮১ খ্রিঃ) রোজ শুক্রবার শ্রীনগরে জামে মসজিদ জুমআ'র সালাতের পূর্বে এক বিরাট মুসল্লী সমাবেশে প্রদত্ত হয়। এতে শ্রীনগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েক হাজার মুসলিম অংশ গ্রহণ করেছিলেন।]

বাদ হাম্‌দ, সালাত, দু'আ ও মুনাজাত।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ - وَلَايَاْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابًا - اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

"আল্লাহপাক বলেন, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক কিতাব, হিকমত ও নবুওত দান করবার পর সে মানুষকে বলবে ঃ আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, এটা তার জন্য শোভন নয়, বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর এবং ফিরিশতাদেরকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দেবে না। তোমাদের মুসলিম হবার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবে?" [আল্-'ইমরান ঃ ৭৯-৮০ আয়াত]

ভ্রাতৃবৃন্দ ও বন্ধুগণ!

শ্রদ্ধেয় মীর ওয়াইজ মাওলানা মুহাম্মদ ফারূক-এর মুখ থেকে এই মাত্র আপনারা জানতে পারলেন আমি ছত্রিশ বছর পর এখানে এসেছি।[১]

---

১. শ্রীনগরের পয়লা সফর ১৩৬৪ হি. রমযান আগস্ট ১৯৪৫-এ হয়েছিল।

শরীর-স্বাস্থ্য ও বয়স যে গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে করে ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলা যায় না। সব কিছুই আল্লাহ্র মর্যির ওপর নির্ভরশীল। ছত্রিশ বছর পূর্বে যখন এখানে এসেছিলাম সে সময় মীর ওয়াইজ হযরত মাওলানা ইউসুফ শাহ (র.) জীবিত। আমি তাঁর মেহমান ছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে নতুন দিল্লীতে নিজামুদ্দীন-এর তাবলীগী মারকাযে ও লক্ষ্ণৌ-এর নদওয়াতুল 'উলামার শিক্ষাকেন্দ্রে। এখানে পা ফেলতেই সেদিনগুলোর কথা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে, সে সব দৃশ্য ও আমার স্মরণ পথে উদিত হচ্ছে যখন তিনি এই জামে' মসজিদের মিম্বর থেকে কুরআন- হাদীসের মণি-মুক্তোসম বাণী বর্ষণ করতেন। আজ তাঁর চেহারা আমার মানসপটে দেদীপ্যমান। আমি যখন আসলাম, তখন তিনি মহাস্রষ্টা ও মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর দর্জা বুলন্দ করুন এবং আমাদের বর্তমান মীর ওয়াইজ মাওলানা মুহাম্মদ ফারূক-এর হায়াত দারায করুন এবং তাঁর 'ইলমে ও আমলে তরক্কী দান করুন। আমীন!

ভাইয়েরা আমার!

যে মুসাফির এতদিন পর এল এবং আগামীতে আর আসতে পারবে কিনা একথাও যখন সে সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারে না, আর এমন আশাও যখন অবধারিতভাবে নেই তখন তার পক্ষে আপনাদের খিদমতে কি তোহ্ফা পেশ করা উচিত? এমতাবস্থায় মানুষ তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু স্বীয় হৃদয় ও তার বক্ষপ্রদেশ থেকে বের করে উপহার হিসাবে সবার সামনে রেখে দেয়। এজন্যই চাচ্ছি, এই নগণ্য খাদেমের নিকট যে মূল্যবান থেকে মূল্যবান তোহ্ফা রয়েছে তাই আপনাদের পেশ করি। মূল্যবান তোহ্ফা এ দীন খাদেমের মালিকানাধীন বস্তু নয়, তার ঘরের জিনিসও নয়। এটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কালাম-ই-ইলাহীর মাধ্যমে পেয়েছে। আর এই বস্তু কিয়ামত অবধি সেই মহান দরবার থেকেই একজন পায়। হিদায়াতের উৎস একটাই। এজন্য আমি আপনাদের সামনে সবচেয়ে জরুরী পয়গাম ও সর্বাপেক্ষা জরুরী সবকের পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

এখনই জনাব মীর ওয়াইজ কয়েকটি মুবারক নাম উচ্চারণ করেছেন। সেসবের ভেতর হযরত আমীর-ই কবীর সাইয়েদ আলী হামদানীর পবিত্র নামও রয়েছে।

তাঁর ও তাঁর সিলসিলার সাথে আমার এক ধরনের পারিবারিক তথা খান্দানী সম্পর্কও রয়েছে। আর তা এভাবে যে, তিনি ও আমার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ

আমীর-ই-কবীর সাইয়েদ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী (র.) একই সিলসিলাভুক্ত ছিলেন[1] এবং তাঁর সাথে আমার একটা হৃদয়ের সম্পর্কও অনুভূত হয়। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, হযরত মীর সাইয়েদ 'আলী হামদানী (র.)-কে খাতলান[2] থেকে কোন বস্তু এখানে টেনে এনেছিল? এই সুন্দর উপত্যকার অপূর্ব সৌন্দর্যই কি তাঁকে টেনে এনেছিল? হিমালয় পর্বতশ্রেণীর সমুন্নত শৃঙ্গরাজি ও এ উপত্যকার শ্যামল সজীবতাই কি টেনে এনেছিল তাঁকে? আপনাদের জানা দরকার, তিনি যে ভূখণ্ড থেকে এসেছিলেন তাও সৌন্দর্যের আধার ছিল। ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ ছিল তা। তারপরও সে কোন্ বস্তু যা তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছিল? আপনারা সদাসর্বদা তাঁর নাম নিয়ে থাকেন। আল্লাহ্র শোকর, শতাব্দী গুজরে যাবার পরও তাঁর সাথে আপনাদের সম্পর্ক কায়েম আছে আর আমি মনে করি, তাঁর চেষ্টা-সাধনা এবং তাঁর ইখ্লাস ও রূহানিয়াত তথা নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিকতার বরকতেই এখনও এখানে ইসলাম নিরাপদ।

আমি কি আপনাদেরকে বলব, সে কোন্ বস্তু যা তাঁকে এখানে টেনে এনেছিল ? তা ছিল এক সূক্ষ্ম ঈমানী মর্যাদাবোধ। যে স্বীয় প্রেমাস্পদকে যত বেশী ভালবাসে, তার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে যত অধিক পরিচয়, তার ভেতর তত পরিমাণ স্বীয় মাহবুব তথা প্রেমাস্পদ সম্পর্কে গায়রত ও মর্যাদাবোধের সৃষ্টি হয়। একজন অজ্ঞ ও জাহিল মূল্যবান মণি-মুক্তা ও জওরাহেরাতকে একখণ্ড ঢেলার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে, দামী হীরক খণ্ডকে না জানার কারণে ভেঙে ফেলে। কিন্তু জহুরীকে দেখুন, নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় জ্ঞান করে একে কত সতর্কতার সাথে হিফাযত করে সে! ঠিক তেমনি বাগানরক্ষক মালীকে দেখুন,

---

১. আমীর-ই-কবীর সাইয়েদ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী (র.)-এর মৃত্যু ৬৭৭ হি.। আবুল জনাব হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা (র.)-এর মৃত্যু ৬৭৭ হি.। আবুল জনাব হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা (মৃ. ৬১০ হি.) অন্যতম খলীফা ছিলেন যাঁর সিলসিলায় আমীর 'আলাউদ্দৌলা সিমনানী (র.)-এর শাখার সাথে আমীর-ই কবীর সাইয়েদ 'আলী হামদানীর সাথে (মৃত্যু ৭৮৬ হি.) সম্পর্কিত ছিলেন। এ ছিল সুহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলা। কাশ্মীরে একে কুযরোবী, বিহারে ফেরদৌসী ও দাক্ষিণাত্যে একেই জুনয়াদী বলা হয়। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনরী (মখদুম বিহারী নামে পরিচিত, (মৃত্যু ৭৮৬ হি.) এ সিলসিলার অন্যতম মহান বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর "মুকতূবাত-ই সাহ্সদী" অত্যন্ত বিখ্যাত। (বিস্তারিত জানতে চাইলে ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ৩য় খণ্ড দ্র.) [উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ দ্র.]।

২. খাতলান মাউরা উনরা উনন্নহর এলাকার সমরকন্দের নিকটবর্তী অনেক শহরের সমষ্টি। জীহূ নদীর উজানে অবস্থিত। এ জেলার একটি জায়গায় "খাতল", বহুবচনে "খাতলান" বলা হয়।

সে কিভাবে একটি ফুলের জন্য নিজেকে কুরবান করে দেয় এবং ফুলের গায়ে সামান্য আঁচড় লাগুক কিংবা দাগ পড়ুক, তা সে পসন্দ করে না। বুলবুলকে জিজ্ঞেস করুন ফুল সম্পর্কে, আর পতঙ্গকে জিজ্ঞেস করুন প্রদীপ শিখা সম্পর্কে, 'আশিককে জিজ্ঞেস করুন মাশুক সম্পর্কে এবং তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চান তো জিজ্ঞেস করুন আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণীবাহক পয়গম্বর ও আরিফদেরকে।

আঁ-হযরত (সা.) তাওহীদের সবচেয়ে বড় আমানতদার ছিলেন। আর ছিলেন এর সবচেয়ে বড় মুবাল্লিগ, দা'ঈ বা দাওয়াত প্রদানকারী। মা'রিফাতের অধিকারী সত্তা ও তাওহীদের মূল তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁরই নিয়ে আসা সম্পদ আজও বণ্টিত হয়ে চলেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বণ্টিত হতে থাকবে। তোমাদের ও আপনাদের আঁচলে আল্লাহ্‌র ফযলে সে সম্পদই বর্তমান। আঁ-হযরত (সা.) (আমার জীবন তাঁর জন্য উৎসর্গীত হোক) আল্লাহ্‌ সম্পকে সর্বাধিক জ্ঞাত, আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত, আল্লাহ্‌র সর্বাধিক যাচ্‌নাকারী, আল্লাহ্‌র ওপর সর্বাধিক কুরবান তথা জীবন উৎসর্গকারী। এজন্যই তাঁর গায়রত ও মর্যাদাবোধের অবস্থা ছিল এই, একবার এক ব্যক্তি কেবল এতটুকু বলেছিল ঃ

مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াত পাবে, আর যে ব্যক্তি এতদুভয়ের নাফরমানী করবে সে হবে পথভ্রষ্ট। আঁ-হযরত (সা.) এটা বরদাশ্‌ত করতে পারেন নি। তিনি বললেন ঃ

بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله

"তুমি দেখছি কথা বলার রীতিও জান না। (আলাদা আলাদা) এভাবে বল, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নাফরমানী করবে, সে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হবে"।[১] ঠিক তেমনি এক লোক বলেছিল ঃ ماشا الله وشئت যদি আল্লাহ ও আপনি চান (তাহলে এ কাজ হয়ে যাবে)। একথা শুনে আঁ-হযরত (সা.) বললেন ঃ جعلتني والله عدلا بل ماشاء الله وحده ঃ তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? না. তুমি এভাবে বলো না বরং বল, যদি একা আল্লাহ চান (তাহলে হবে)।[২]

এ হলো গায়রত মর্যাদাবোধের অবস্থা। একজন সত্যিকার আশিকের প্রেম ও ও মুহব্বতের পরিমাণ হয় যতখানি, ততটাই হয় তার গায়রত ও মর্যাদাবোধ।

---

১. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, কিতাবুল জুমুআ, ২৮৬ পৃ.।
২. মুসনাদে আহ্‌মদ, ১ম খণ্ড,২৮৩ পৃ.।

মর্যাদাবোধ প্রেম ও মুহব্বতের অধীন, অধীন জ্ঞান ও অকপটতার। যদিও উদাহরণটা শোভন হচ্ছে না, তবু এর থেকে ভাল উদাহরণও পাওয়া যাবে না। তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কত নাযুক হয় দেখুন দেখি! এই সম্পর্ক কত কাছের, কত স্থায়ী, কতটা আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ! স্ত্রীর সম্পর্কে স্বামীর ও স্বামীর সম্পর্ক স্ত্রীর গায়রত ও মর্যাদাবোধ কত বেশী হয়। স্বামী কখনই এটা বরদাশ্‌ত করতে পারে না (যদি সে শরীফ হয়, হয় পৌরুষদীপ্ত ও আত্মমর্যদাসম্পন্ন) যে, তার স্ত্রীর ওপর কারুর সামান্য ছায়াও পড়ুক, কারুর সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কও থাকুক কিংবা প্রকাশ পাক কারুর প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও।

হযরত আমীর-ই-কবীর মীর সাইয়েদ 'আলী হামদানী ছিলেন একজন আরিফ বিল্লাহ্ ওলীয়ে কামিল, ' আশিক-ই-খোদা ও একজন 'আশিক ই-রাসূল। আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে, দীনের মেযাজ সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবহিত। চিকিৎসক যেমন হাত ধরে রোগীর নাড়ীর খবর বলে দিতে পারেন, তিনি ছিলেন তাই। এজন্য তিনি দ্বীন সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে এরূপ গায়রত ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন যে, লাখো কোটি মানুষের মাঝে কদাচিৎ এরূপ পাওয়া যায়। তিনি শুনতে পেলেন, কাশ্মীর নামে লম্বা-চওড়া এক বিরাট উপত্যকা আছে। সেখানকর লোকেরা আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে অনবহিত। সেখানে বিশ্বের স্রষ্টা ভিন্ন ও তাঁর মহিমার সত্তা ছাড়া ও ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু ব্যতিরেকে আর সব কিছুর পূজা অর্চনা হয়, মূর্তিপূজা করা হয়। কিছু জিনিস আছে মাটির ভেতর, কিছু আছে যমীনের ওপর, কিছু দাঁড়িয়ে আছে আর কিছু আছে শায়িত অবস্থায়। লোকে যার ভেতরই সামান্য শক্তির বিকাশ দেখতে পায়, দেখতে পায় ভল-মন্দ কিংবা লাভ-ক্ষতি করবার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য কিংবা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অথবা কিছুটা রূপ অথবা সৌন্দর্য অবলোকন করে, অমনি তার সামনে মস্তক নুইয়ে দেয়। আমার ধারণা, যদি তিনি এখানে না আসতেন তাহলে সম্ভবত আল্লাহ ও তদীয় রাসূল তাদের কাছে ধরা পড়তেন না। কেননা তিনি যেখানে থাকতেন সেখান থেকে নিয়ে এই কাশ্মীর উপত্যকা পর্যন্ত বড় বড় দ্বীনের রূহানী তথা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে গোটা ভারতবর্ষই পড়ে ছিল যেখানে হাযার হাযার 'আলিম, শত শত মাদরাসা ও খানকাহ ছিল। কিন্তু উন্নত ও বুলন্দ হিম্মতের অধিকারী একজন মানুষ এ দেখে না যে, কেবল আমার একার ওপর এত বড় দায়িত্ব আরোপিত হয় কিনা! এ দায়িত্ব ও অপরিহার্য কর্তব্যকে তিনি তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন। কেউ তাঁকে হাযারও বাধা দিক, হাযারো প্রতিবন্ধকতা তাঁর পথে কেউ খাড়া করুক, পাহাড় দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে তাঁর রাস্তা আগলে রাখুক, উত্তাল সমুদ্র হোক

বাধার বিন্ধ্যাচল, তিনি কারো পরওয়া করেন না। এ ছিল যেন কোন আসমানী আওয়াজ যা তিনি শুনতে পেয়েছিলেনঃ সাইয়েদ! ওঠো, কাশ্মীর যাও এবং সেখানে তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ছড়িয়ে দাও।

সাইয়েদ 'আলী হামদানী পরিষ্কার অনুভব করেন, আল্লাহ্‌র নিকট আমাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। ময়দানে হাশর সামনে, আল্লাহর আরশ বর্তমান আর তাঁরই রহমতের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আম্বিয়া-ই-কিরাম ও আওলিয়াকুল। সেখান থেকে প্রশ্ন ভেসে আসছে ঃ সাইয়েদ 'আলী! তুমি জানতে, আমার সৃষ্ট যমীনের একটি অংশে গায়রুল্লাহর পূজা হচ্ছে, গায়রুল্লাহ্‌র সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা হচ্ছে, কামনা ও বাসনার জাল বিছানো হচ্ছে, সব কিছু জেনে-শুনে কিভাবে তুমি তা বরদাশ্‌ত করলে? মীর সাইয়েদ 'আলী হামাদানীর সামনে ছিল এ দৃশ্য। যদি সারা দুনিয়ার 'আলিম-'উলামা ও জ্ঞানী মনীষী একত্র হয়েও তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন, হযরত! এ প্রশ্ন আপনাকে করা হবে না, তথাপিও তিনি বলতেন ঃ না, না, আমাকেই করা হবে এ প্রশ্ন। আমার গায়রত, মর্যাদাবোধ ও পৌরুষ এতটুকু সহ্য করতে পারে না, আল্লাহ্‌র এই বিশাল যমীনের একটি ছোট্ট অংশেও গায়রুল্লাহর ওপর আশা-ভরসা ও ভীতির সম্পর্ক থাকুক, একে মানুষের (চাই কি সে জীবিতই হোক কিংবা মৃত) ভাগ্য পরিবর্তনকারী মানা হোক, সন্তান-সন্ততি ও রিয্‌ক প্রদানকারী হিসাবে আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকে বিশ্বাস করা হোক এবং অপর কোন সত্তাকে সব সময় ও সর্বস্থানে হাযির জ্ঞান করা হোক। যদি আমি জানতে পারি, উত্তর মেরু কিংবা দক্ষিণ মেরুতে অথবা হিমালয়ের সমুন্নত ও সবুজ গিরিশৃঙ্গের ওপর এমন একজনও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী মানুষ আছেন যিনি গায়রুল্লাহর পূজা করছেন, যিনি গায়রুল্লাহকে উপকার কিংবা ক্ষতির মালিক মনে করেন, গায়রুল্লাহকে এই সৃষ্টি জগতের হাকিম তথা শাসক ও ব্যবস্থাপক মনে করে, তাহলে সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছান আমার জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। মনে রেখ, আল্লাহ বলেন ঃ

الا له الخلق والا مر -

"সৃষ্টি যে মহান আল্লাহ্‌র, হুকুম ও তাঁরই।" [সূরা আ'রাফ-৫৪]

এমন নয় যে, সৃষ্টি তো তিনি করেছেন, কিন্তু হুকুম চলছে অন্য কারুর। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য অন্য কাউকে হাওয়ালা করে দেননি, আমি পয়দা করলাম আর শাসন তুমি চালাও। স্রষ্টা তিনি, আর শাসক তথা ব্যবস্থাপকও তিনিই। তাজমহলের মত নয়; এ তাজমহল তৈরি করেন সম্রাট শাহজাহান। তিনি তুর্কিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে মিস্ত্রী ডেকে নিয়ে আসেন। শিল্পী ও কারিগরেরা তাদের শিল্প ও কারিগরী নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। তারা এসেছিলেন, চলেও গিয়েছেন। এখন তাজমহলে যার যেমন খুশী প্রশাসন চালাক, সিংহাসন পাতুক, ভাঙুক কিংবা বানাক। সৃষ্টি এমন নয়।

এ দুনিয়া তাজমহল নয়। এ দুনিয়া কুতুব মিনারও নয়। এ দুনিয়া, এর সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁরই বজ্র মুঠিতে, তাঁরই কুদরতী হস্তে। এখানকার একটি ছোট্ট বিষয়ও তিনি অপর কারো হাওয়ালা করেন নি ।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ -

"তার সিংহাসন (জ্ঞান) আসমান-যমীনসহ সর্বব্যাপী।" তাঁর ক্ষমতার অধিষ্ঠান গোটা সৃষ্টি জগতের ওপর এবং সমগ্র যমীন জুড়ে তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতার প্রভাব পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর ন্যায় একটি গ্রহই কেবল নয়, সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহ, সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ, গোটা সৌর জগতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সব কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

হযরত সাইয়েদ 'আলী হামদানী (র.)-কে যে জিনিস এখানে টেনে এনেছিল তা ছিল তাওহীদের মর্যাদাবোধ। আপনারা এও মনে রাখবেন, সাইয়েদ 'আলী হামাদানী এই ভূখণ্ডটি তলোয়ারের বলে নয়, প্রেমের জোরে জয় করেছিলেন, রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার জোরে জয় করেছিলেন, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দ্বারা জয় করেছিলেন জয় করে ছিলেন দরদ দিয়ে। আরবদের এক জলসায় আমি একথা বলেছি। আমি বলেছি, সেই ব্যক্তির রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা কি কেউ পরিমাপ করতে পারবে, পরিমাপ করতে পারবে কি তার প্রভাবের তিনি মাত্র তিনবার পরিভ্রমণ করেছেন আর তিন পরিভ্রমণেই গোটা আঞ্চলটিকে তিনি ইসলামের অনুসারী বানিয়ে ফেলেছেন? ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, তিনি গোটা কাশ্মীর তিনবার পরিভ্রমণ করেছেন। তন্মধ্যে একবারের ভ্রমণ ছিল সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়টি ছিল কিছুটা ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তৃতীয়বারের ভ্রমণে তিনি ঘরে ঘরে গিয়েছেন এবং সবাইকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহর এক বান্দা কয়েকজন সফর-সঙ্গীসহ আসছেন এবং গোটা অঞ্চলকে অঞ্চল মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র ফযলে আজও তারা মুসলমান, আজও তাদের অন্তরে ঈমানের উষ্ণতা বর্তমান এবং দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যা তাদের থেকে তাওহীদের এই আমানত ছিনিয়ে নিতে পারে। এমন কেউ নেই 'আবদ ও মা'বুদের মধ্যকার বিরাজিত এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে।

ভাইয়েরা আমার! মনে রাখবেন, যদি এই ভূ-খণ্ডে কোথাও গায়রুল্লাহর পূজা হয়, তার নিকট নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করা হয়, তার দরবারে প্রার্থনার হাত বাড়ানো হয়, কোন শিরকমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহলে মীর সাইয়েদ 'আলী হামদানীর রূহ তাঁর কবর মুবারকেও কষ্ট পাবে।

এই গায়রত ও ঈমানী মর্যাদাবোধেরই একটি নমুনা ছিল, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অন্তিম মুহূর্তে ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর পরিবার ও বংশের লোকদের ডেকে জড়ো করলেন এবং বললেন, স্নেহের পুত্তলি সকল! আমার পিঠ কবর স্পর্শ করবে না যতক্ষণ না তোমরা আমাকে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সান্ত্বনা দিচ্ছ, দুনিয়া থেকে আমার বিদায় নেবার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? পরিবারের সকলেই দৃঢ় স্বরে বলল, "শংকিত হবেন না, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমরা আপনার প্রভু-প্রতিপালক, আপনার পিতা ইসহাক, পিতৃব্য ইসমাঈল ও পিতামহ ইবরাহীম (আ.)-এর একক ও অংশীহীন প্রভুর ইবাদত করব।"

قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ -

"তারা বলল ঃ আমরা আপনার ইলাহ্ ও আপনার পিতা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের যিনি ইলাহ্, তাঁর ইবাদত করব; তিনি একক ইলাহ্, আর আমরা তো তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।" [সূরা আল-বাকারা ঃ ১৩৩]

আপনি কেন আমাদের এ প্রশ্ন করছেন? আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনি শৈশব কাল থেকে যেভাবে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছেন, আমাদের নরম কচি মনে যে তাওহীদের পবিত্র বীজ বপন করেছেন, আমরা তা থেকে সরে যেতে পারি না। আমরা আপনার সত্যিকারের মাবুদ, যিনি একক, তাঁরই 'ইবাদত করব, যাঁর ইবাদত করতেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক।

অতঃপর তিনি নিশ্চিন্ত হলেন ও খুশী মনে প্রফুল্ল চিত্তে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। এই যে আওলিয়া-ই কিরাম, বুযুর্গানে দ্বীন ও ইসলামের আহ্বায়ক (দাঈ)-বৃন্দ—এঁরা ঐ সব নবীর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত। ইয়াকূব (আ.)-এর পেরেশানী এ বিষয়েই ছিল, না জানি আমার সন্তান-সন্ততি ও বংশধরেরা শিরক-এর জঞ্জালে সেভাবে আটকে পড়ে যেভাবে শত শত নয়, হাযার হাযার কওম তাদের প্রতিষ্ঠাতা ও দা'ঈদের অবর্তমানে আটকে গেছে!

ভাইয়েরা আমার! যা কিছু বলা হলো তা মন দিয়ে শুনুন এবং আমল করুন। এ উপত্যকার জন্য মীর আলী হামদানী (র.) ও তাঁর সঙ্গীদের সহযোগিগণ যে তোহফা ও পয়গাম বয়ে এনেছিলেন তা ছিল মূলত তাওহীদের সম্পদ। তাকে সযত্নে বুকে তুলে রাখুন। আল্লাহ রাব্বুল আলমীনকেই এ দুনিয়ার মালিক, ব্যক্তি ও জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের মালিক, দুনিয়ার সব কিছুর মালিক-মুখতার মনে করুন। তাঁরই আস্তানার পর মাথা নত করুন। তাঁরা

আল্লাহ্র এই সমস্ত পয়গামই বহন করে এনেছেন, এ পয়গামই আওলিয়া-ই-কিরাম বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন এবং এ পয়গামই দুনিয়ার তাবৎ সংস্কারক ও ইসলামী রেনেসাঁর সকল বিজয় ও কামিয়াবীর জন্য অপরিহার্য শর্ত। সম্মান ও শক্তি লাভের শর্ত এটাই। এর সামনে হস্ত প্রসারিত করুন এবং একেই সযত্নে বুকে তুলে রাখুন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ـ

"যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে; আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" [সূরা আ'রাফ–১৫২]

সম্ভবত লোকে একথা বলতে পারে, আমরা কবে গো-বৎস পূজা করেছি? এ থেকে আমরা হাজারো বার তওবা করি। এ ধরনের বোকামি ও মন্দ কাজ কি আমরা করতে পারি? আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নাযিলকৃত গ্রন্থে এই বলে তার জওয়াব দিয়েছেন, আমরা এ ধরনের মিথ্যা রচনাকরীদের সাজা দেই। সমস্ত শেরেকী 'আকীদা ও আমলকে এর ভেতর শামিল করে নিয়েছেন। শির্ক-এর বুনিয়াদ সব সময়ই মনগড়া কিস্‌সা-কাহিনী ও ভিত্তিহীন গল্প-গুজবের ওপর হয়ে থাকে। সাধারণত শির্ক ও অলীক কিস্‌সা যমজ সন্তানের ন্যায় পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে। এজন্যই আল্লাহ পাক শির্ক-এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ

"সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন থেকে।" [সূরা হজ্জ ঃ ৩০]

শির্ককে আল্লাহ তা'আলা তদীয় কিতাবে পরিষ্কার ও খোলাখুলি মহাঅপবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ

"আর যে কেউ আল্লাহ্র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" [সূরা নিসা ঃ ৪৮]

আমি আপনাদের এ মুহূর্তে সেই মিম্বর থেকে সম্বোধন করছি যে মিম্বর হচ্ছে মিম্বর-ই-রাসূল (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত এবং যা মসজিদে নববীর মিম্বরের চিহ্ন বহন করছে, এর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে, সেই মিম্বরের ওপর বসে বলছি, আপনাদের সব সমস্যার সমাধান হবে, আপনাদের সমস্ত বিপদ-আপদ ও

অসুবিধা সূর্যালোকে ভোরের কুয়াশা যেমন অপসৃত হয় সেভাবে অপসৃত হবে, সকল মুসীবত কর্পূরের মত উবে যাবে যদি আপনারা তওহীদের আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন এবং যত দিন পর্যন্ত আপনাদের মাঝে নির্ভেজাল তওহীদের প্রতিষ্ঠা না ঘটছে, সর্বপ্রকার শিরকমূলক ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার অবসান না ঘটছে, হাজারো চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে না, একথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। আল্লাহ্‌র সাহায্য ও মদদ যদি আপনাদের অনুবর্তী না হয় তাহলে কোন চেষ্টা-তদবীরই ফলপ্রসূ হবে না। আর তাঁর সাহায্য লাভ ঘটলে আশংকারও কোন কারণ থাকবে না।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে তোমাদেরকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ যদি তোমাদেরকে অপদস্থ করতে ইচ্ছা করেন, অতঃপর এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? আর মু'মিনেরা আল্লাহ্‌রই ওপর নির্ভর করুক।"

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين ـ

# জাতীয় জীবনে বুদ্ধিজীবীদের স্থান ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য

[৩০শে অক্টোবর শুক্রবার বাদ-'আসর মীর ওয়াইজ মনযিলে আলিম-'উলামা, মসজিদের ইমাম ও সমাগত সুধীবৃন্দের সামনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করা হয়।]

জনাব মীর ওয়া'ইজ মাওলানা মুহাম্মদ ফারূক সাহেব ও উলামারে কিরাম!

আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি এজন্য যে, যে সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের খিদমতে আমাকে এক এক করে হাযির হবার দরকার ছিল, স্বয়ং তাঁরাই আজ এখানে তশরীফ এনেছেন, আর আমি এক জায়গায় বসে তাঁদের যিয়ারত ও মোলাকাত লাভের সৌভাগ্য হাসিল করছি। আমি মীর ওয়াইজ সাহেবের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যে দায়িত্ব আমার কাঁধে বর্তে ছিল তার হাত থেকে তিনি আমাকে অত্যন্ত সদয় ও আন্তরিকতার সাথে মুক্তি দিয়েছেন।

সমাগত ভদ্রমণ্ডলি! স্বল্প সময়ের মধ্যে এ ধরনের সম্মানিত সুধী সমাবেশে উপস্থিত সুধীবৃন্দের খেদমতে কি পেশ করব?

আমি একটি হাদীসের সাহায্য গ্রহণ করতে চাই। বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

اَلَاإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَإِذَافَسَدَتْ
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ -

উদ্ধৃত বাক্যের মধ্যে কালামে নবুওয়তের নূর (আলো) পরিষ্কার চমকাচ্ছে। গভীরভাবে এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ "মনে রেখ, মানুষের দেহের ভেতর 'গোশতের একটি টুকরো' রয়েছে। টুকরোটি যদি সুস্থ থাকে, তাহলে সারা শরীরই সুস্থ থাকে। আর সেটিতে যদি কোন বিপর্যয় দেখা দেয় কিংবা অসুস্থ হয়, গোটা শরীরই অসুস্থ বোধ করতে থাকে, পীড়িত হয়ে পড়ে। তোমরা কি জান গোশতের টুকরোটির কি নাম?" এরপর রাসূল (সা.) নিজেই তার উত্তর দেন, "জেনে রাখ, সেটি হচ্ছে কল্‌ব (হৃদয়)।" আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি তা

হলো, মানুষের দেহাভ্যন্তরে যে রকম হৃদয় (দিল্) থাকে, উম্মাহ্ বা জাতি ও সম্প্রদায়েরও তেমনি একটি হৃদয় থাকে, মানবতারও দিল্ থাকে। আর এই দিল্ মানব জাতির দেহের মধ্যে স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকে এবং এই মানব জাতিরূপ দেহের গোটা ব্যবস্থাপনাই এর ওপর নির্ভরশীল। এই দিল্ যদি খারাপ হয়ে পড়ে (এই খারাপের রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হতে পারে), আর এই খারাপ ও বিকৃতির প্রকৃতি যে রকমই হোক না কেন, দিল্ যখন এই বিকৃতির ফলে প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন গোটা দেহ যন্ত্রটাই আর প্রভাবিত না হয়ে পারে না। গোটা দেহের ভারসাম্য হয়ে পড়ে তখন বিপর্যস্ত। শরীরের আগের অবস্থা দিল্ ও দিমাগ তথা হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই উভয়কেই সম্বোধন করছি। আজ আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, আমি মনে করি তারা সবাই সাহিবে কলব তথা হৃদয় মনের অধিকারী। আমি অবশ্য আহলে দিল্ বলছি না, কারণ কথাটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এবং এর মর্মও বিরাট তাৎপর্যপূণ। শায়খ সা'দী (র.) صاحب دلے گفته[1] -এর উল্লেখ করলে সম্মানার্থে صاحب دلے فرمود[2] কথাটি বলতেন। আহলে দিল্ যাঁরা তাঁরা তো বিরাট মর্যাদার অধিকারী! আমরা সকলেই অবশ্য আসহাবে কুলূব বা হৃদয়ের অধিকারী। আপনারা চিন্তা করে দেখুন, দিলের পক্ষে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকার জন্য ও নিজের প্রকৃতিগত ওজীফা, গোশতের একটি টুকরো হিসাবে, দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে, বিরাট নাযুক ও কঠিন দায়িত্ব বটে!

এখন আমি আপনাদের সামনে আরয করতে চাই, দিলের জন্য তিনটি বস্তু অপরিহার্য যাতে করে সে তার প্রকৃতিগত কর্ম সম্পাদন করতে পারে এবং শরীরের শৃংখলা ও নিয়ম-নীতি ঠিকমত বজায় থাকে। প্রথম যেটা দরকার তা হলো দিল (হৃদয়, মন, আত্মা, হৃৎপিণ্ড) হবে জীবন্ত। শরীরের সমস্ত কিছু নির্ভর করে তার প্রাণ স্পন্দনের ওপর। যদি দিলেরই মৃত্যু ঘটে, তাহলে তো আর কোন প্রশ্নের অবকাশই রইল না। জনৈক কবি বলেছেন ঃ

مجھے یہ ڈرھے دل زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگی ھی عبارت ھے تیرے جینےسے

"হে জীবন্ত দিল্! আমার ভয় হয় তুমি না আবার মারা যাও। কারণ একমাত্র তোমার বেঁচে থাকার কারণেই এ জীবন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।" প্রথম শর্ত, দিল্ হবে জীবন্ত, জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে গভীরভাবে বিজড়িত। দ্বিতীয় কথা হলো, দিলের মধ্যে হরকত থাকতে হবে। হৃৎপিণ্ড হবে সচল, সক্রিয় ও গতিশীল। হৃৎপিণ্ডের এই ক্রিয়া ও স্পন্দন থেমে যায়, আপনারা জানেন, তাহলে

---

১. আহলে দিল বলেছেন; ২. আহলে দিল ফরমান।

হৃৎপিণ্ড শেষ হয়ে যাবে–সেই সঙ্গে খতম হবে শরীরও। এর পর জীবনের আর কোন প্রশ্নই থাকবে না। হৃৎপিণ্ডকে সচল, সক্রিয় ও গতিশীল রাখবার জন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে? বলা যায়, চিকিৎসার মাধ্যমে শারীরিকভাবে অঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়ে ও যান্ত্রিক উপায়ে[১] হৃৎপিণ্ড সচল রাখা যায়। আপনারা সবাই জানেন, হৃৎপিণ্ডকে সচল ও সক্রিয় করে তোলার জন্য যেভাবে একজন মানুষ স্বীয় জীবনের জন্য হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করে, ঠিক তেমনি একজন ডাক্তার বা চিকিৎসক ও হার্ট স্পেশ্যালিস্ট হৃৎপিণ্ড সচল ও সক্রিয় করে তোলার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করে? তারা চেষ্টা করে, কোনভাবে কিংবা যে কোন উপায়ে হৃৎপিণ্ডকে একবার সচল ও সক্রিয় করে তুলতে, এরপর চেষ্টা করে সেই সচল ও সক্রিয় অবস্থা বাকী রাখতে। তৃতীয় শর্ত, হৃৎপিণ্ডের মাঝে উত্তাপ থাকবে, তা যেন নিরুত্তাপ ও ঠাণ্ডা না হয়ে যায়। দেখা গেল, অপরিহার্য তিনটি শর্ত হলো জীবন, সচল গতিশীলতা ও উত্তাপ।

এখন আমি আরয করব, দেশের যে অংশে ও যে জাতি, সম্প্রদায় কিংবা যে পরিবারেরই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হোন না কেন, তার জন্যও এই তিনটি শর্তই অপরিহার্য। প্রথমত, তিনি যিন্দাদিল হবেন। দ্বিতীয়ত তিনি সচল ও সক্রিয় হবেন। তৃতীয়ত, তার ভেতর উত্তাপ থাকতে হবে। এর ভেতর কোন একটিও যদি চলে যায় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক যদি জীবন ও যিন্দেগী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে সাধারণের অবস্থা কি হবে আপনারা তা অনুমান করতে পারেন। মনে করুন, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় (elites)-এর উদাহরণ ঠিক পাওয়ার হাউজের ন্যায়। মুসলিম মিল্লাত যে মিল্লাত অদ্যাবধি টিকে রয়েছে নিজস্ব এই পাওয়ার হাউজের সম্পর্কের কারণে, তার পাওয়ার হাউজ কখনো বন্ধ হয়নি, পরিত্যক্ত হয়নি। অনেক সময় আপনারা দেখতে পান, কিছুক্ষণের জন্য পাওয়ার হাউজ আপনাদের শহরে কর্ম বিরতি পালন করে এবং তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক তারের ভেতর বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সর্বত্র অন্ধকারে ছেয়ে যায়, বিরাজ করতে থাকে থমথমে অবস্থা। মিল্লাতের পাওয়ার হাউজ এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ তথা তার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ইতিহাস আমাদেরকে বলে দেয়, কোন যুগেই মুসলিম মিল্লাতের এই পাওয়ার হাউজ বন্ধ হয়নি। মুসলিম উম্মাহর ধারাবাহিকতার ইতিহাস বস্তুতপক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতার ইতিহাস। আপনি যদি একটু গভীরভাবে দেখতে চান তাহলে আপনারা যাকে মুসলিম মিল্লাতের অমরত্ব ও

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ Pace maker-এর আবিষ্কার এতদুদ্দেশ্যেই।

স্থায়িত্বের ইতিহাস বলেন, তা মুসলিম মিল্লাতের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ তথা এই বুদ্ধিজীবী (elites) সম্প্রদায়ের অমরত্বের ও ধারাবাহিকতার ইতিহাস। মিল্লাতের ভেতর প্রতিটি যুগেই এমন লোক বর্তমান ছিলেন যাঁরা স্বয়ং জীবিত ছিলেন, ছিলেন সচল ও গতিমান, উষ্ণ উত্তাপের অধিকারী। তাঁদের কারণেই মিল্লাতের শিরা-উপশিরায় রক্তের বণ্টন সঠিকভাবে সম্পন্ন হতো। আপনারা জানেন, হৃৎপিণ্ড রক্ত বণ্টন করে এবং তার কারণে এ রক্ত শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়। মিল্লাতের হৃৎপিণ্ড কখনো ও কোনো পর্যায়েই তার কাজ বন্ধ করে নি। মিল্লাতের ওপর যে অবনতি দেখা দিয়েছে এবং মিল্লাত যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার কারণ, তার পাওয়ার হাউজ বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা খ্রিস্টান জাতির ইতিহাস পড়ে দেখুন, ইয়াহুদী জাতির ইতিহাস পাঠ করুন, জানতে পাবেন, বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত আম্বিয়া-ই-কিরাম (আ.)-এর বিদায় নেবার অত্যল্পকাল পরেই ইসরাঈলী পাওয়ার হাউজ কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল। কি ছিল সে কাজঃ আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মখতিয়ানের কাজ, সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-এর কাজ, হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ করার কাজ এবং নিষ্কম্প আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল, হক কথা যথাযথভাবে বলা—তাতে কেউ খুশীই হোক আর কেউ বেজারই হোক (তাতে কিছু যায় আসে না)। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস বলে, এই পাওয়ার হাউজ তার কাজ পরিত্যাগ করেছিল। কুরআন মাজীদ তার সাক্ষী।

"ঈমানদারগণ! (কিতাবধারীদের ভেতর) বহু 'আলিম ও সাধু-দরবেশ (আহবার ও রুহ্বান) জনগণের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করত এবং লোকদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দিত।" [সূরা তাওবা ঃ ৩৪] এর থেকে বড় সাক্ষ্য আর কিছু হতে পারে না যে, বনী ইসরাঈলের পাওয়ার হাউজ কি ছিলঃ তারা ছিলেন তাদের 'আহবার ও রুহ্বান', তাদের 'আলিম-উলামা ও সাধু-দরবেশগণ। আজকের পরিভাষায় ও ইসলামী পরিভাষায় আপনি যদি 'আহবার রুহ্বান'-এর তরজমা করেন তাহলে এর তরজমা হবে ঃ 'আলিম-'উলামা ও পীর-বুযুর্গই সাধারণ জনগণের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে না-হকভাবে ভক্ষণ করত এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দিত অর্থাৎ যে কাজ করবার দরকার ছিল সে কাজ তারা করত না। কিন্তু যা করার প্রয়োজন ছিল না, সমীচীন ছিল না, তাই তারা করত। এর অর্থ একমাত্র এই হতে পারে, পাওয়ার হাউজ তার আসল কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তার মৌলিক কর্তব্য কর্ম সম্পাদন থেকে সে সরে দাঁড়িয়েছিল, পরিবর্তে অন্য কাজ শুরু করেছিল। যে কনেস্টবল কিংবা পুলিশ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে সে যদি তার স্থান পরিত্যাগ করে এবং পানি পান করাতে থাকে, হারিয় যাওয়া পথিককে পথের সন্ধান বাৎলাতে থাকে তাহলে যাত্রীদের

ভেতর ঠক্কর লাগবে, গাড়ীতে গাড়ীতে হবে সংঘর্ষ, একটা দুটো নয়, বহু দুর্ঘটনাই ঘটবে। যদিও সে ভাল কাজই করছে, পুণ্যের কাজ করছে, খুব সওয়াবের কাজ করছে। পিপাসার্তকে পানি পান করাচ্ছে, রাস্তার সন্ধান বাৎলে দেবার জন্য বহু দূর অবধি গমন করছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সে শাস্তির হকদার হবে যদি সে তার আসল কাজ ছেড়ে দেয়, সে তার ডিউটি ছেড়ে দেয়। 'আলিম-'উলামা ও পীর-বুযুর্গের কি কাজ ছিল? তাঁদের কাজ ছিল আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা, যুহদ ও অল্পে তুষ্টির জীবন যাপন করা, অন্য পকেটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা, অন্যের সম্পদের দিকে দৃকপাত না করা এবং যা পাওয়া গেল তারই ওপর শোকরগুযারী করা। কিন্তু তারা কি করল? يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ তারা অন্যায়ভাবে না-হক পন্থায় লোকের সম্পদ ভক্ষণ করতে শুরু করল। নিজেরা মেহনত করত না, অন্যের পরিশ্রম থেকে ফায়দা লুটত। অন্যদের মেহনত কি? নিজের ও নিজের বাল-বাচ্চাদের পূর্তির জন্য দৌড়-ঝাঁপ কিংবা ছোটাছুটি করা তাদের পরিশ্রম থেকে এই সব 'আলিম ও পীর নিজেরা মুফ্‌ত ফায়দা লুটত্। কিন্তু তাঁদের নিজেদের যে মেহনত ছিল, তারা পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে মেহনত করেছিল, 'ইল্‌ম হাসিল করতে যে মেহনত করেছিল তার অর্জিত ফসল তারা লোককে দিত না। নিজের পরিশ্রমলব্ধ ফসলে তারা জনগণকে শরীক করত না। উল্টো জনগণের মেহনতলব্ধ ফল-ফসলের ওপর তারা এমনভাবে কর্তৃত্ব জাঁকিয়ে বসত যে, তার একটা বিরাট অংশই তাঁদের সেবাই উৎসর্গ হয়ে যেত। ويصدون عن سبيل الله তাদের কাজ ছিল, মৌলিক দায়িত্ব ছিল লোকদের রাস্তা বাৎলানো তথা পথ প্রদর্শন। তাঁরা এর বিপরীতে লোকদের পথভ্রষ্ট করতে লাগল অর্থাৎ তারা নিজেদের পথ-প্রদর্শকের সারি থেকে সরিয়ে পথ-ভ্রষ্টকারীর ভূমিকায় নামিয়ে দিল। আপনারা যদি বিভিন্ন মিল্লাত তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইতিহাস পড়েন তাহলে আপনারা জানতে পারবেন, তাদের পাওয়ার হাউজ প্রথমে বন্ধ হয়েছে, এর পরেই কেবল মিল্লাতের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, বিকৃতি এসেছে।

এটাই সব জাতির ইতিহাস, সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাস। কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাস এর থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের ইতিহাস এই যে সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততম যুগেও আমাদের পাওয়ার হাউজ তার কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত হয়নি, আরোপিত দায়িত্ব পালন থেকে ক্ষণিকের তরেও বিমুখ হয়নি। আর এমন এক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে এক্ষেত্রে যে, যদি কেউ এ ব্যাপারে কোন কসমই খেয়ে বসে তাহলে তাকে কসম ভঙ্গকারী হিসাবে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। আমি যদি বলি, এই মিল্লাতের ইতিহাসে একটি মাসও এমন অতিক্রান্ত হয়নি যে মাসে তার পাওয়ার হাউজ একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহর

এমন কোন বান্দা মুসলিম বিশ্বের কোন অংশে, কোন ভূখণ্ডে ছিল না যিনি হককে হক বলতেন, বাতিলকে বাতিল, তাহলে একথা ঠিক বলা হবে না। এর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য-প্রমাণ সিহাহ্ সিত্তায় বর্ণিত রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি ঃ

لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى قَوَّامَةٌ عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا ـ

"আমার উম্মতের ভেতর প্রতিটি যুগে এমন একদল অবশ্যই থাকবে যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, থাকবে সুদৃঢ়। অন্যে যতই বিরোধিতা করুক না কেন, আর কেউ তাদের সাহায্য না-ই বা করুক, কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না।"[১]

কোন এলাকা কিংবা অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় সম্প্রদায়, যারা সে সমাজের হৃৎপিণ্ডসদৃশ, চাই তা মুর্দাই হয়ে যাক অথবা তা নিষ্প্রাণ ও নিশ্চলই হয়ে যাক কিংবা খতম হয়ে যাক, তার উষ্ণ উত্তাপ, ব্যস! আমাদের এখন এটাই দেখতে হবে, এই তিনটি শর্ত আমাদের ভেতর পাওয়া যায় কি না? জীবন, ক্রিয়া ও উত্তাপ। যদি জীবন থাকে, কিন্তু জীবনের ক্রিয়া না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের জীবনে স্থবিরতা ও জড়তা পয়দা হয়ে গেছে। এর উদাহরণ প্রবহমান পানির ন্যায়। প্রবহমান পানি যেমন থেমে যাবার পর খারাপ ও দূষিত হতে শুরু করে এবং তার ভেতর দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়, ঠিক তেমনি আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিপর্যয় এসে দেখা দেবে। তিন নম্বর কথা হলো, আপনার ভেতর উত্তাপও থাকতে হবে অর্থাৎ আপনার ভেতর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক, 'ইশ্ক-ই-রাসূল, আল্লাহ্র দীদার তথা দর্শন ও জান্নাত লাভের প্রতি প্রবল আগ্রহ, ঈমানের শক্তি ও হক-কথা বলার মত সাহস থাকতে হবে। এরপর কেউ হাজারো ষড়যন্ত্র করুক এই দেহকে খারাপ করবার জন্য, দেহ খারাপ হবে না। কিন্তু কল্ব তথা হৃৎপিণ্ড যদি তার ক্রিয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে দুনিয়ার তামাম রাষ্ট্র ও সমস্ত শক্তি এক জোট হয়েও এই দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। যেমন কোন বৃক্ষের যদি একবার জীবনী শক্তি ফুরিয়ে যায় তাহলে হাজারো বালতি পানি ঢেলেও আপনি তাকে তরতাজা ও সবুজ শ্যামল রাখতে পারেন না, অল্প দিনেই তা শুকিয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠে পরিণত হয় (জাতীয় জীবনের উদাহরণও ঠিক তেমনি)।

---

১. সুনান-ই-ইবনে মাজা।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলি!

ইতিহাস আমাদের বলে, ভারতবর্ষে প্রতি যুগেই এমন সব লোক গুজরে গেছেন যারা হক-কথা বলতেন। তাঁদের ভেতর প্রাণের উত্তাপ ছিল, অবশিষ্ট ছিল তাদের ভেতর ঈমানের উত্তাপ ও প্রেমের উষ্ণতা। যে কোন লোকই তাদের নিকট বসত সেই প্রভাবিত হতো। তাদের পার্শ্ব অতিক্রমকারীও এর থেকে বঞ্চিত হতো না। তারাও এর পরশ অনুভব করত। তাদের শরীরও বিদ্যুতায়িত হতো।

আপনারা তাসাওউফের ইতিহাসে ও সুফিয়া-ই-কিরামের আলোচনায় সচরাচর শুনে থাকেন, তাঁদের ভেতরও আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল ও নির্ভরশীলতার পরিবর্তে একে অপরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা, সক্রিয়তার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল এবং তারা রসম-রেওয়াজের পূজারী হয়ে গিয়েছিল। এসব অবশ্য পরের কথা এবং বিশেষ স্থান, কাল বা পাত্রের ভেতর সীমাবদ্ধ। আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের সূফিয়া-ই-কিরাম ও মাশাইখদের দেখতে পাই, তাঁদের মাধ্যমে সাধারণ গণমানুষের মধ্যে ঈমান ও আমলের একটি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতো। যদি কোন শহরে এ ধরনের একজন মানুষও পাওয়া যেত তাহলে তাঁর বদৌলতে সে শহরে অলসতা, অন্ধত্ব, মূর্খতা, আল্লাহ্-বিস্মৃতি, বিত্ত-পূজা, সুবিধাবাদ ও সুযোগ-সন্ধানী মানসিকতার পরিপূর্ণ আক্রমণ হতে পারত না। এমনও হতে পারত না যে, তাঁর উপস্থিতিতে গোটা সমাজ এসব ব্যাধির শিকারে পরিণত হবে এবং এর স্রোতে ভেসে যাবে! এমন হতো না। একজন মানুষ বসে আছে, আল্লাহর বান্দা, আর গোটা শহরে এক ধরনের উত্তাপ ও উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছে। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া দিল্লীতে এসে বসলেন। মনে হচ্ছিল, সারা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু বুঝি এটাই। কি সরকার, কি দরবার, আমীরই কি আর উযীরই বা কি, কবি কি আর সাহিত্যিকই কি, আর কিই-বা আলিম, তামাম মাখলুক যেন তাঁর দিকে ধাবিত হচ্ছে! এরপর এল খাজা নাসির উদ্দীন চেরাগে দিল্লীর যুগ। সমগ্র পরিবেশ তাঁর আলোকোত্তাপে প্লাবিত ও উত্তপ্ত হয়ে গেল। প্রতিটি শহরের অবস্থাই ছিল তাই। আপনারা আপনাদের এই কাশ্মীরের অবস্থাই দেখুন না! এখানে আল্লাহর এক সিংহ শার্দুল আসলেন। হযরত আমীর-ই-কবীর সাইয়েদ 'আলী হামদানী (র.)-এর কথাই বলছি। তিনি এসেই গোটা অঞ্চলটাকে মুসলমান বানিয়ে ফেললেন। আজও তাঁর খুলুসিয়াত তথা অকপট নিষ্ঠার বরকতে, তাঁর লিল্লাহিয়্যাত-এর বরকতে সমস্ত রকমের খারাবী সত্ত্বেও এখানে মুসলমান আছে। কী ছিল তা? সেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও উত্তাপ। একটি হৃৎপিণ্ডের শক্তি ও ওজনই বা কতটুকু? আপনাদের

দেখুন, শরীর কত বড়, আর সে তুলনায় হৃৎপিণ্ড কত ছোট! কিন্তু গোশ্‌তের এই ছোট্ট টুকরোটিই গোটা দেহের ওপর রাজত্ব চালায়। সমস্ত শরীরের ভাল-মন্দ সব কিছু এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সমাজ ও জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থিব-প্রীতি ও বিত্ত-পূজার আগমন ও তাদের ভেতর নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া প্রকৃত বিপদের সংকেত দেয়।

আমি একটি ঘটনা বলছি। একজন বুযুর্গ আমাকে ঘটনাটা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, হায়দারাবাদে একবার এক বুযূর্গের হাঁটুতে ব্যথা হলো। আমি তাঁর হাঁটুতে ব্যথার মলম মালিশ করছিলাম। বুযূর্গের বিরাট ভক্ত, খাদেম ও মুরীদকুল যখন মজলিসে বসত তখন এরূপ নিশ্চুপ ও আদবের সঙ্গে বসত যে, মনে হতো সবার মাথায় পাখি বসে আছে (كان على رؤسهم الطير) হযরত বলেন! আর সবাই মন দিয়ে শোনে। সেদিন জানি না কি হলো, একজন কথা বলে এক জায়গা থেকে তো অন্যখান থেকে আরেকজন তার কথা কেটে দেয়। একজন কথা বলল তো সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেউ উত্তর দেয় এভাবে কথার গুঞ্জন ও বাদ-প্রতিবাদের ফলে মনে হচ্ছিল যেন এ কোন বুযূর্গের মজলিস নয়, বরং এখানে যেন কোন বাজার বসেছে আর আমরা সে বাজারের কেউ ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা। এ যেন মাছের কিংবা সব্জির বাজার—ক্রেতা ও বিক্রেতার হাঁক-ডাকে সরগরম। আমার খুব আশ্চর্য লাগল, আজকে হলো কি? এ কি নতুন কথা যে, এখানে বুযুর্গ তাঁর পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সহকারে স্বয়ং সশরীর বর্তমান, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন লোকের কোন অনুভূতিই নেই তারা কোন বুযূর্গের সামনে বসে আছে। তিনি আমাকে বিস্মিত হতে দেখে পুনরায় তাঁর হাঁটুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি মনে করলাম বুঝি সেখানে বেশী ব্যথা করছে। আমি সেখানে বেশী করে মালিশ করতে লাগলাম। এরপর আমার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়তে লাগল, যখন দেখলাম, এর পরও লোকের থামার ও নীরব হবার কোন লক্ষণ নেই। তিনি আবার তাঁর হাঁটুর দিকে ইশারা করলেন। আমি সেদিকটাই মালিশ করতে থাকলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না আসলে ব্যাপারটা কি? সে সময় উক্ত বুযুর্গ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, হাঁটুর ব্যথার কারণে আমি রাত্রের নির্ধারিত আমলগুলো পুরো করতে পারিনি। তারই বরকতশূন্যতা ও অশুভ লক্ষণের প্রকাশ এভাবে দেখতে পাচ্ছ।

এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, একজন বুযুর্গের তাঁর নির্ধারিত আমলগুলো ছেড়ে দেবার পরিণতি যদি মাহফিলে এভাবে প্রকাশ পায় তাহলে অধিক সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর তাদের নির্ধারিত কর্তব্য-কর্মগুলো পরিত্যাগের

পরিণতি সমাজ ও পরিবেশের ওপর কি হবে? আপনারা হিসাব কষে বলুন, একের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যদি এতটা হয় তাহলে চারজনের কতটা হবে? আটজনের কত? পঞ্চাশ জনের? আল্লাহ না করুন, যদি কোন জায়গায় সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীই এমন হয়ে যায় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? মরহুম আকবর ইলাহাবাদী এ অবস্থাদৃষ্টে বলেছেন ঃ

رحم کر قوم کی حالت پہ تو اۓ ذکر خدا
بےادب ھو گئی محفل تیرے اٹھ جانےسے

"হে আল্লাহর যিক্‌র! এ জাতির অবস্থার ওপর দয়া করুন,
আপনার অবর্তমানেই এ মাহফিল শিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে।"

যখন সাধারণ মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেলায় দেখতে পাবে, তাঁদের ভেতরও সম্পদের প্রতি মোহ ও আকর্ষণ ঠিক ততটাই যতটা তাদের নিজেদের ভেতর, পদমর্যাদা ও সম্মান লাভের গুরুত্ব তাঁদের নিকট ততটুকুই যতটা আমাদের ভেতর, তাহলে বলুন, জনসাধারণের ওপর এর কি প্রভাব পড়বে?

কোন এক যুগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তো অবস্থা ছিল, আল্লাহর এক বান্দা এক জায়গায় বসে আছেন আর তিনি সেখানকার বাদশাহ ও স্থানীয় শাসকের দিকে মুখ তুলেও চাইছেন না। একজন বুযুর্গের ঘটনা বলি। তাঁর নাম শায়খুল ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইব্‌ন আবদুস সালাম। সুলতানুল উলামা ছিল তাঁর উপাধি। সে যুগের সব চেয়ে বড় শাফিঈ আলিম ছিলেন তিনি। দামিশ্‌কে বাস করতেন।

একবার খুতবার ভেতর বাদশাহ্‌র কোন ব্যাপারে তিনি সমালোচনা করেন। বাদশাহ এতে মনঃক্ষুণ্ন হন। তিনি শায়খ (র)-এর সঙ্গে এমনতরো আচরণ করেন যা কোন 'আলিমের সঙ্গে করা শোভন ও সমীচীন ছিল না। তিনি তাঁকে উপেক্ষা করে ও এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। ইতোমধ্যে কোথাও থেকে বাদশাহ্‌র একজন সম্মানিত মেহমান এসে উপস্থিত হন। তিনিও ছিলেন তার এলাকার একজন বাদশাহ ও শাসক। মেহমান তার মেযবানের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামকে চিনতেন এবং এও জানতেন, আজকাল তিনি (শায়খ) বাদশাহ্‌র ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। তিনি তার মেযবানকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার দেশে এর মত কোন আলিম হলে আমরা তাঁকে মাথায় তুলে রাখতাম। অথচ কী আশ্চর্যের ব্যাপার, এখানকার এমন একজন আলিমের সঙ্গে আপনি এরূপ আচরণ করছেন! অবশ্য বাদশাহ এতে কিছু মনে করেন নি। তিনি

তার ভুল বুঝতে পারেন। সে যা-ই হোক, বাদশাহ্ বাদশাহ্ই। তার খেয়াল হলো, আমি যদি এভাবেই চুপচাপ শায়খ (র.)-এর কাছে মাফ চেয়ে নিই এবং বলি, আমারই ভুল হয়েছে, তাহলে আমি ছোট হয়ে যাব এবং আমার ব্যক্তিত্বের ভীতিকর প্রভাব কমে যাবে। তিনি তার জনৈক নিকটজনকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, দেখ! তুমি শায়খ (র.)-কে গিয়ে একথা বলবে, আমি যে কোন মজলিসে উপবেশন রত অবস্থায় তিনি যেন আসেন এবং আমার হস্ত চুম্বন করেন (এভাবে তিনি যেন বাদশাহর আনুগত্য স্বীকার করেন)। এতে আমার সম্মানও বজায় থাকবে এবং লোকেও তা দেখবে। এরপর ক্রমান্বয়ে উভয়ের মাঝে সদ্ভাব ফিরে আসবে, পূর্বেকার অসন্তোষ ও মনোমালিন্যও দূর হয়ে যাবে। শায়খ (র.)-কে গিয়ে কেউ একথা জানালে তিনি বলে ওঠেন, জানি না তোমরা কোন্ কল্পনার মাঝে ডুবে আছ? আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি তো এতেও রাযী নই, তিনি এসে আমার হস্ত চুম্বন করুন। সেখানে আমি গিয়ে তার হস্ত চুম্বন করব সেতো আরও অসম্ভব। তাঁর কথিত উক্তি হুবহু সংরক্ষিত রেখেছে ইতিহাস। তাঁর ভাষায় ঃ (لاارض ان يقبل يد ى فضلا عن ان اقبل يده) ঠিক তেমনি আমাদের রাজধানী এই দিল্লীর (যাঁদের দিল্লীর প্রকৃত সুলতান বলা চলে) শ্রদ্ধেয় বুযূর্গ মাশাইখ-এরও অবস্থা ছিল এ রকম।

দিল্লীর বাদশাহ্ একবার হযরত মির্যা মাজহার জানে—জানাকে বলেন, “আল্লাহ্ আমাকে বিরাট সম্পদ দান করেছেন, রাজ্য দিয়েছেন, দিয়েছেন রাজত্ব। কিছু কবুল করুন।” তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন, قل متاع الدنيا قليل। বল, (হে রাসূল!) দুনিয়ার সম্পদ বড় অল্প। সেই স্বল্প সম্পদের ভেতর একটা ছোট্ট টুকরো হলো হিন্দুস্থান। এর ভেতরকার একটি ছোট্ট টুকরো আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন [সেই যুগের প্রচলিত একটি বিখ্যাত প্রবচন ছিল ঃ সালতানাতে শাহ্ আলম, দিল্লী থেকে পালাম (বর্তমানে বিমান বন্দর) পর্যন্ত বিস্তৃত) এই ছোট্ট ও ক্ষুদ্র অংশটুকুও যদি ভাগ-বাটোয়ারা করতে গিয়ে শেষ হয়ে যায় তাহলে আর থাকবে কি?

একবার বাদশাহ্ তাঁকে বললেন ঃ আমি আপনাকে কিছু টাকা দিতে চাই, মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন। তিনি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। বাদশাহ্ বললেন ঃ আপনি নিজে না নেন, গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিন। হযরত মির্যা বললেন ঃ দেখুন, টাকা-পয়সা কাজে লাগাবার নিয়ম-রীতি আমার জানা নেই। তার চেয়ে বরং আপনিই আপনার লোকদের দিয়ে বিতরণ করে দিন। এখান থেকে বিতরণ করতে শুরু করুন। দেখবেন কেল্লা পর্যন্ত পৌছুতে পৌছুতে সব ফুরিয়ে যাবে। যদি না ফুরোয়, সেখানে গিয়ে দেখবেন ঠিকই ফুরিয়ে গেছে।

এ ধরনের শত শত কিস্‌সা ছড়িয়ে রয়েছে। এসব হলো সে সব লোকের উদাহরণ যাঁরা সাধারণ মানুষের দিলে উত্তাপ সঞ্চার করতেন। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, পার্থিব সম্পদের প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ মানুষের প্রকৃতিগত وانه لحب الخير لشديد। সম্পদের প্রতি মোহ ও ভালবাসা তার মজ্জাগত। কিন্তু এর মুকাবিলায় যখন এসব দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, ভেসে ওঠে নিরাসক্ত মনের ও নিস্পৃহ মানসিকতার, পার্থিব জাঁকজমক ও পদমর্যাদার প্রতি নির্লোভ উদাসীনতার ছবি, তখন মানুষের ঈমান জীবন্ত ও সজীব হয়ে উঠত এবং দুর্দমনীয় লোভ প্রতিরোধ করবার শক্তি আমাদের মাঝে জেগে উঠত। অতঃপর মুসলিম সমাজ আর খড়-কুটোর মত ভেসে যেত না যেভাবে আজ তারা ভেসে যাচ্ছে।

নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্য কেবল জীবন ও তার স্পন্দনই যথেষ্ট নয়, তাদের জন্য উত্তাপও প্রয়োজন। উত্তাপের সৃষ্টি হয় কোথা থেকে? উত্তাপ সৃষ্টি হয় আল্লাহর যিক্‌র থেকে, উত্তাপ সৃষ্টি হয় দ'আ, মুনাজাত ও আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল তথা নির্ভরতা থেকে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলতে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করতে হয়, মুজাহাদা করতে হয়, তাহলে দিলের মাঝে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্য অবলম্বন ও অল্পে তুষ্টির যে সব গল্প-কাহিনী আপনারা ইতিহাসে পড়েন এবং এসব হযরত যাঁদের সম্পর্কে এসব কিসসা সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা কোন দায়ে পড়ে কিংবা মজবুর হয়ে এসব এখতিয়ার করেন নি, এ ছিল তাঁদের দিলের আওয়াজ। আর মজবুর তাঁরা ছিলেন বটে, তবে সে মজবুরী তাদের দিলের নিকট অর্থাৎ তাঁদের ভেতর থেকেই যেন কেউ বলে দিত : না, না, এ হতে পারে না। আমরা সম্পদের গোলাম নই, আমরা শক্তি ও ক্ষমতার গোলাম নই।

এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বজায় থাকা প্রয়োজন। স্বীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে তাদের ভেতর জীবন থাকবে, থাকবে জীবনের ক্রিয়া ও স্পন্দন, থাকবে উত্তাপ। কোন একটি জায়গা, কোন অবস্থান আল্লাহর এসব বান্দাহ্ থেকে যেন মুক্ত না হয়। তাঁদেরকে যেন কেউ এ অপবাদ দিতে না পারে, তারা বিকিয়ে গেছেন। হাজারও অপবাদ দিক, অমুক ভুল করেছেন, অমুকের বিদ্যা-বুদ্ধির ভেতর তমুক কমতি রয়েছে, তিনি তমুক জিনিষের কথা বলেন নি (এসব বলে বলুক), কিন্তু এ যেন না বলতে পারে এবং এ যেন অপবাদ আরোপ না করতে পারে যে, সে বিকিয়ে গেছে। এটা অনুধাবন করুন, উম্মাহর হেফাজতের গূঢ় রহস্য এই, মানুষ একজন দুজন যা-ই হোক না কেন, তিনি যেন সমস্ত সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে হন। যূসুফ (আ.)-এর চরিত্র

সম্পর্কে যখন মিসর-রাজ আযীয মিসরের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ ব্যাপারটা কি বলতো? মহলের চারদিকে কানাঘুষা চলছে। তুমিই বল দেখি, য়ূসুফের স্বভাব-চরিত্র কেমন? আযীয-পত্নী এর জবাবে বলেছিল ঃ ما علمنا عليه من سوء "সত্য বলতে কি, তাঁর স্বভাব-চরিত্রে আমি কোন দুর্বলতা দেখতে পাইনি।" আজও আমাদের আযীয-পত্নীর সঙ্গে মুকাবিলা চলছে। আজ সম্পদ আযীয-পত্নী যুলায়খার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শক্তি ও ক্ষমতা মদমত্ততা, যুলায়খা আজ পদমর্যাদা প্রীতি (আর এসবই আজ যুলায়খার মত প্রলুব্ধকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে)। আর মিসরের য়ূসূফ (আ.) কে ? দ্বীন! হ্যাঁ দ্বীন তথা ধর্মই আজ মিসরের আযীয য়ূসূফ। তাকে এমন হতে হবে যেন তাকে কেউ খরিদ না করতে পারে এবং সবাই যেন তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, ماعلمنا عليه من سوء "আমরা তাঁর স্বভাব কিংবা চরিত্রগত কোন দুর্বলতার কথা জানি না কিংবা এ জাতীয় কোন কথাও তাঁর সম্পর্কে শুনিনি।" যে কোন কোণ থেকেই যেন আওয়াজ ভেসে আসে, এ খাঁটি সোনা যার ইচ্ছা পরখ করে দেখুক! সত্যি বলতে কি, মুসলিম উম্মাহর যে মেযাজ আজও অবশিষ্ট রয়েছে তা এসব আল্লাহ্র বান্দা ও হৃদয়বান মানুষের বদৌলতেই, যাঁদের জন্য এই উম্মাহ্ বাতাসে উড়ে যায়নি যেভাবে অন্য উম্মাহ্ শুকনো পাতা কিংবা খড়-কুটোর মত উড়ো গেছে। এ উম্মাহ পানির তোড়ে ভেসেও যায়নি, যেভাবে অন্যান্য উম্মাহ্ খড়-কুটো ও আবর্জনার মত ভেসে গেছে।

দ্বিতীয় কথা, এই (মুসলিম) মিল্লাতের হেদায়েত ও তার দ্বীনের খতিয়ান নেবার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। দেখতে হবে নামাযের ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে কি না। এটাও দেখতে হবে, মুসল্লীর সংখ্যা কমছে না বাড়ছে; মসজিদ খালি হচ্ছে না ভর্তি হচ্ছে। জুয়ার আড্ডা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি মসজিদের সংখ্যা? মুসলমানদের মধ্যে নতুন কোন ব্যাধিতো বিস্তার লাভ করেনি? যেমন মদ্য পান, জুয়া খেলা কিংবা কোন কু-অভ্যাস ও রোগ-ব্যাধির পরিমাণ তো বাড়ে নি? এসব বিষয়ে চিন্তা করতে হবে, ভাবিত হতে হবে। অন্যায়-অনাচার ও দুর্নীতির বিস্তারে, ন্যায়, সুনীতি ও সদ্গুণাবলীর বিলুপ্তিতে দুঃখ পেতে হবে। এসব গুণই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্র স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দায়িত্ব। তাবলীগী জামাতের একটি বিরাট কৃতিত্ব, তারা উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সাধারণ গণমানুষের দুয়ারে নিয়ে গেছেন। প্রথমে সাধারণ মানুষ বিশিষ্ট জনদের দরবারে নিয়ে আসতেন।

তারা বিশিষ্ট জনদেরকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। আমি একথা বলছি না, এটাই একমাত্র পথ। কিন্তু একথা অবশ্যই বলব, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা চাই। তাদের কাছে যাওয়া চাই। গলি গলি ও মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে। গিয়ে দেখতে হবে, দ্বীনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে না কি কমছে; অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না কি অবনতি হচ্ছে! নতুন কি সৃষ্টি হলো? মরহুম আকবর ইলাহাবাদী বলছেন ;

گوں سے مل کے دیکھو=نقشوں کو تم نہ جا نچو لو

کیا چیز جی رھی ہے کیا چیز مرر ھی ہے

"ছবির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা না চালিয়ে জীবন্ত মানুষের সঙ্গে মিশে দেখ, কি জিনিস জীবিত হচ্ছে আর কি মরছে।" ভদ্রমণ্ডলি! এর চেয়ে বেশী বলার মত অবস্থায় এখন আমি নই, আর এর প্রয়োজনও নেই। আমি মনে করি, আসল কথা বলা হয়ে গেছে।[১] শেষে আমি বরকত লাভের উদ্দেশে প্রথমোল্লিখিত হাদীসটির আমি পুনরাবৃত্তি করছি ঃ

قال رسول الله صلى عليه وسلم الا ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهى القلب

---

১. এখানে এসে বক্তা তাঁর বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়েন। এমনি সময় তাঁর কয়েকটি কথা মনে পড়ায় তিনি আবার উঠে দাঁড়ান এবং বলেন ঃ তাওহীদের আকীদা দৃঢ়মূলকরণ, শিরক তথা অংশীবাদিতার জড়ে-মূলে উৎসাদন এবং আকীদার সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের চেয়ে বড় কোন ঔষধ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী বস্তু আর নেই। উলামায়ে কেরামের উচিত, তাঁরা যেন শহর ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে দরস-ই কুরআনের প্রথা চালু করেন এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসীরে বিশেষভাবে তওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠা ও শিরক প্রত্যাখ্যানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। পাঞ্জাবে মাওলানা হুসায়ন আলী ও শায়খুত্তাফসীর মাওলানা আহমদ আলী সাহেব লাহোরী-এর মাধ্যমে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং হাযার নয়—লক্ষ লক্ষ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তাদের আকীদার সংস্কার ও সংশোধন হয়েছে।

# দ্বীনের নবীসুলভ মেযাজ ও তার হেফাজতের প্রয়োজনীয়তা

[১৯৮১ সনের ৩রা নভেম্বর রোজ সোমবার তারিখে জোহরের পূর্বে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে মারকাযে জামাআতে ইসলামী, কাশ্মীর-এ জামা'আতের রফীক, রুক্‌ন, শুভানুধ্যায়ী ও শিক্ষিত সুধী সমাবেশে বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়।]

বা'দ হামদ ও সালাত

জনাব কায়েম-ই-মাকাম আমীর-ই জামা'আত, রুফাকা-ই-জামা'আত্, দোস্ত সকল ও সমাগত শ্রদ্ধেয় ভদ্র মহোদয়গণ!

এখানে দাওয়াত জানিয়ে, অতঃপর মানপত্র পেশের মাধ্যমে আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মানিত করেছেন, তজ্জন্য আমি সর্বাগ্রে আপনাদের শুকরিয়া জানাই। দু'আ করি, আমার প্রতি আপনারা যে সুধারণা ও আস্থা আপনাদের প্রদত্ত এই ভালবাসার ছোঁয়ামণ্ডিত মানপত্রে ব্যক্ত করেছেন আল্লাহ্ পাক যেন তা সত্যে পরিণত করেন। আমি এ ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় সচতন, এ মুহূর্তে এমন একটি জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অধিকারী জামা'আতকে সম্বোধন করছি যার সৃষ্টিই হয়েছিল চিন্তা-চেতনা ও অধ্যয়নের ওপর। এ কোন 'আম মানুষের সাধারণ সমাবেশ নয়। সেজন্য আমার বক্তৃতায় যদি বক্তাসুলভ উপাদান না থাকে তাহলে আপনারা যেন অস্বাভাবিক মনে না করেন।

আপনারা আমার প্রতি যে ভালবাসা, সুধারণা ও গভীর আস্থা ব্যক্ত করেছেন তারও হক রয়েছে। আমার বিবেকী মন, আমরা সীমিত চিন্তা-চেতনা, পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতারও দাবী যে, আমি আপনাদের সামনে এমন কিছু পেশ করি খোদ আমার নিকটও যা প্রিয় এবং আমি যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মনে করি। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه -

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের জন্য যা পসন্দ কর তা তোমার ভাইয়ের জন্যও পসন্দ কর।" হাদীসের ভাষা তাই যা আমি বললাম, কিন্তু আমাদের উলামায়ে কিরাম নানা রকম আপত্তি ও উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচার জন্য এর মর্ম বর্ণনা করেছেন এভাবে, "তোমাদের ভেতর কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।"

দায়িত্বশীল সুধী ও জামা'আতের কর্মীদের নিকট আমার প্রত্যাশা, আমি যে সৌষ্ঠব ও যে পরিমাপে কথা বলছি ঠিক সেই একই সৌষ্ঠব ও পরিমাপের সঙ্গে আপনারা তা গ্রহণ করবেন এবং অন্যদের নিকট তা পৌঁছেও দেবেন।

ভদ্র মহোদয়গণ!

যে জামা'আত ও যে দল থেকে কোন শিক্ষা, দর্শন, দাওয়াত ও আন্দোলন গ্রহণ করা হয় সেই জামা'আত বা দলের মেযাজ সেই আন্দোলন, শিক্ষা, দাওয়াত কিংবা দর্শনে প্রবাহিত হয়। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই আল্লাহ্র প্রকৃতিসম্মত বিধান। আপনি যে উস্তাদের নিকট পড়েন, যে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখেন সে উস্তাদ কিংবা শিক্ষকের চিন্তাধারাই নয় শুধু, বরং কথা বলার ভঙ্গিটি, কতক সময় তাঁর চাল-চলন পর্যন্ত আপনার ওপর ছাপ ফেলে, আপনি অজ্ঞাতসারেও তা অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন। আপনি যে দল কিংবা সম্প্রদায় অথবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে বেশীর ভাগ ওঠা-বসা করেন, জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে তাঁর প্রভাব আপনার চিন্তাগত কাঠামোকে, আপনার অনুভূতি, আপনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে ও আপনার মানস চেতনাকে প্রভাবিত করে। আর এটাই স্বাভাবিক। চিকিৎসাশাস্ত্রের কথাই ধরুন না কেন (তা সে প্রাচীনকালে কিংবা বর্তমান যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রই হোক), আমি দেখেছি একজন মেধাবী ছাত্র সেভাবেই ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপশন) দেন, ঠিক সেই পন্থায়ই রোগ নিরূপণ করেন, সেই সব বিষয় বর্জনের ও সেভাবেই সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দেন, বরং অনেক সময় এমনও দেখেছি, তারা হুবহু মূলের অনুকরণ করেন। কুস্তি খেলা যারা শেখেন তারাও একইভাবে শেখেন। তারা তাদের উস্তাদের চমকপ্রদ ক্রীড়া-কৌশল, দাও-প্যাঁচ কষার নিয়মাবলী, আখড়ায় অবতরণ করার এবং প্রতিপক্ষকে এক হাত দেখে নেবার কায়দা-কানুন একই পন্থায় আত্মস্থ করে থাকেন।

আল্লামা ইকবাল তাঁর গযল ও কাব্য-চর্চা সম্পর্কে যা বলেছেন প্রকৃত সত্য তার চেয়েও বেশী বিস্তৃত - ہر رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو - এই যে দ্বীন, দ্বীন-ই-ইসলাম যার অনুগ্রহ ও বদৌলতে আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে সরফরায করেছেন, ধন্য করেছেন, তা আমরা বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে পাইনি, বিজ্ঞ পণ্ডিত কিংবা দার্শনিকদের থেকেও তা গ্রহণ করা হয়নি, রাজনীতিবিদদের কাছ থেকেও আমরা তা গ্রহণ করিনি, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি

১. জামা'আতের আমীর মওলভী সা'দুদ্দীন এ সময় হজ্জে গিয়েছিলেন। ক্বারী সায়ফুদ্দীন ছিলেন তাঁর কায়েম-ই- মাকাম।

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা কোন বিজয়ী বীরের থেকে অথবা নির্ভেজাল মেধার অধিকারী লোকদের থেকেও এ দ্বীন গ্রহণ করা হয়নি, এ দ্বীন গৃহীত হয়েছে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম থেকে। এজন্য এ দ্বীনের গ্রহণকারীদের মধ্যে, এ দ্বীনের ওপর যারা চলছে তাদের ভেতর, এই দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারী ও দ্বীনের চিন্তা-ফিক্‌র পেশকারীদের ভেতর আম্বিয়া-আলায়হিমুস সালামের মেযাজ জারী থাকা দরকার। এটাই সেই "দানিশগাহ" (বিদ্যালয় ও মান-মন্দির)-এর ছাত্রদের সর্বাপেক্ষা বড় তরক্কী, বিরাট সৌভাগ্য (ব্যাখ্যা ভুল না হলে) ও মি'রাজ যে, তারা নববী মেযাজ যত বেশী সম্ভব গ্রহণ করবে এতে তারা তত কামিয়াব হবে, হবে সফল।

আমি এই সুযোগে আপনাদেরকে একটি ছোট গল্প-কাহিনী পরিবেশন করতে চাই যদ্দ্বারা আমার কথা সম্ভবত আপনারা ভালভাবে বুঝতে পারবেন। কথিত আছে, আওরঙ্গযেব আলমগীরের দরবারে একজন বহুরূপী আসত। সে বিভিন্ন রকম বেশ পাল্টে আসত। আওরঙ্গযের ছিলেন বহুমুখী অভিজ্ঞতার অধিকারী বুদ্ধিমান। সুবিশাল ও সুবিস্তৃত একটি দেশের ছিলেন তিনি শাসক। তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেলতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেন, আমি জানি তুমি অমুক, তোমাকে আমি চিনে ফেলেছি। সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত। এরপর সে অন্য বেশ ধরে আসত। এরপরও বাদশাহ তাকে চিনে ফেলতেন এবং বলতেন, আমি জানি তুমি অমুক, তমুকের বেশ পাল্টে এসেছ। এভাবে বহুরূপীর সব কৌশলই মাঠে মারা যেত। শেষাবধি আর না পেরে সে কিছু দিনের জন্য নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করল। অনেক দিন যাবত সে সম্রাটের সামনে আসা থেকে বিরত থাকল। দু' বছর পর শহরে লোকের মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ল, কোন একজন বিখ্যাত বুযূর্গের আগমন ঘটেছে এবং তিনি অমুক পাহাড়ের চূড়ায় নির্জনে সাধনারত। বর্তমানে তিনি চিল্লায় আছেন। খুব কষ্টে-সৃষ্টে লোকে তাঁর সাক্ষাত পায়। সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যাঁর সালাম কিংবা নযরানা তিনি কবুল করেন এবং যাকে তিনি সাক্ষাত দান করেন। তিনি একেবারে একাগ্র মনে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত ও দুনিয়ার সংস্রবমুক্ত।

সম্রাট ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে-ছানী (রা)-র চিন্তানুকারী ও সুন্নাহ্‌র কঠোর অনুসারী। অত সহজেই তিনি কারোর প্রতি ভক্তি গদগদচিত্ত হবার মত লোক ছিলেন না। তার প্রতি ও তিনি সঙ্গত কারণেই আদৌ ভ্রূক্ষেপ করলেন না। দরবারের সদস্যবর্গ কয়েকবার আরয করেন জাঁহাপনার সেখানে তাশরিফ নেবার জন্য এবং উক্ত বুযুর্গের যিয়ারত লাভ করে দু'আ নেবার জন্য।

সম্রাট ব্যাপরটা পাশ কাটিয়ে যান। দু' চারবার অনুরুদ্ধ হবার পর একবার সম্রাট বললেন, ঠিক আছে ভাই, চলো গিয়ে দেখি। আর গিয়ে দেখতেই বা দোষ কি! উক্ত বুযুর্গ যদি আল্লাহ্র কোন মুখলিস বান্দা হন এবং তিনি যদি নির্জন সাধনায় মগ্ন থাকেন তাহলে তার যিয়ারত লাভে উপকারই হবে। সম্রাট গেলেন, অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বসলেন এবং নযরানা পেশ ও দু'আর দরখাস্ত করলেন। কিন্তু দরবেশ এ নযরানা গ্রহণ করতে তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। সম্রাট এরপর বিদায় নিতে উদ্যত হতেই দরবেশ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সম্রাটকে কুর্নিশ করলেন। অতঃপর সালাম পেশের পর দরবেশ বললেন ঃ জাঁহাপনা! এবার আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমি সেই বহুরূপী। কয়েকবার আপনার দরবারে গিয়েছি, কিন্তু প্রতিবারই আমার সকল জারিজুরি সম্রাটের সামনে ফাঁস হয়ে গেছে। সম্রাট স্বীকার করলেন এবং বললেন, তোমার কথা ঠিক বটে, তবে তোমায় আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু বলতো দেখি, আমি যখন তোমাকে এত বড় বিরাট অংকের নযরানা পেশ করলাম তুমি তা ফিরিয়ে দিলে! রহস্যটা কি? সে বলল, জাঁহাপনা! আমি যাঁদের বেশ ধরেছিলাম—এটা তাঁদের চরিত্র ও আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমি যখন তাঁদের বেশ ধরলাম এবং তাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করলাম তখন আমার শরম লাগতে লাগল, আমি যাঁদের ভূমিকায় অবতরণ করেছি তাঁদের রীতি নয় কোন বাদশাহ কিংবা সম্রাটের দান গ্রহণ করা। আর এজন্যই আমি তা গ্রহণ করিনি। এ ঘটনা মন-মস্তিষ্কে আঘাত দেয়, একজন বহুরূপী যেখানে একথা বলতে পারে সেখানে চিন্তাশীল ও বিবেচক মানুষের পক্ষে, যারা লেকদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত জানিয়ে থাকেন তারা যদি আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামের দাওয়াত কবুল করে তার মেযাজ কবুল না করেন তা হলে নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। আমি এ কাহিনী নেহাৎ গল্পচ্ছলে বলিনি, একটি বাস্তব ও প্রকৃত সত্য একটু সহজবোধ্য উপায়ে মনের পর্দায় গেঁথে দেবার জন্য শুনিয়েছি।

আমরা দ্বীনের দা'ঈ হই আর মুবাল্লিগ হই অথবা ইসলামের মুখপাত্র হই কিংবা ব্যাখ্যাতা, আমাদের একথা সম্মুখে রাখা দরকার, আমরা এ দ্বীন ও দাওয়াত আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালাম থেকে গ্রহণ করেছি। আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালাম যদি এ দাওয়াত নিয়ে না আসতেন তাহলে আমরা এর পরশ পেতাম না। কুরআন শরীফে এসেছে, জান্নাতীদেরকে যখন পরকালে পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং তারা যখন বেহেশত গিয়ে পৌছবে তখন তারা বলবে ঃ

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا ـ

"শোকর ও হাম্‌দ সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে এখানে এনে পৌঁছিয়েছেন আর আল্লাহ্‌ যদি আমাদেরকে এখান অবধি না পৌঁছে দিতেন তাহলে আমরা এখান পৌঁছুতে পারতাম না।" এখানে হেদায়েত শব্দের অর্থ পৌঁছান। এরপর আমি এক বিরাট সত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।

আমরা যে এখান পর্যন্ত পৌঁছেছি, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পথ ধরে নয়, অভিজ্ঞতার পথ ধরে নয়, আশরাকিয়াত, আত্মহনন, কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদার পথ ধরে নয়, বিজ্ঞান ও দর্শনের পথ ধরেও আমরা এ অবধি পৌঁছাই নি। প্রথমে তো তারা সংক্ষিপ্তাকারে বলেছেন وماكنالنهتدى لولا ان هدانا الله। "আমরা এখানে পৌঁছতে পারতাম না যদি না আল্লাহ্‌ আমাদেরকে এখানে পৌঁছিয়ে দিতেন।" কিন্তু আল্লাহ্‌র পৌঁছানোর একটা পন্থা থাকে, তরীকা থাকে, থাকে একটা মাধ্যম। তাঁর মাধ্যম কি? لقد جاءت رسل ربنا بالحق - "আমাদের প্রভু ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল এসেছেন সত্য নিয়ে।" মোদ্দা কথা, আল্লাহ্‌র দূত তথা রাসূল যদি সত্য নিয়ে না আসতেন তাহলে আমরা অন্ধকারে হাতড়ে মরতাম, দরজায় দরজায় ঠোকা খেয়ে ফিরতাম। আজ বেহেশতে না হয়ে আমাদের স্থান হত অন্য কোনখানে!

যা-ই হোক, আমাদের এ কথা ভোলা উচিত হবে না, যে জিনিস আমাদেরকে এর যোগ্য বানিয়েছে তা বিজ্ঞ পণ্ডিত, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লোকদের থেকে লব্ধ কোন জিনিষ নয়। এ পয়গম্বরদের কাছ থেকে পাওয়া, আর এর কোন মাধ্যম নবুওত, রিসালত এবং আর বাহক আম্বিয়া-ই-কিরাম ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারেন না। আমরা তা কবুল করেছি বলেই না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এসব নি'য়ামত ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য ও গৌরবান্বিত হবার যোগ্য হয়েছি এবং অন্যদের পর্যন্ত তা পৌঁছে দিয়েছি।

এখন আমাদের দেখতে হবে, নবুওয়তের মেযাজ কি? নবুওয়তের জন্য কোন্‌ বস্তু আন্দোলক হয়ে থাকে? নবীর চিন্তা-ভাবনা আন্দায কি হয়? এজন্য আপনাদের সামনে আমি তিনটি জিনিস এ মুহূর্তে পেশ করছি।

প্রথম কথা, নবীর দাওয়াত, চেষ্টা-সাধনা, তাঁর বাণী ও কর্মের আন্দোলক হয় রিযা-ই-ইলাহী তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রেরণা। এ ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোন জিনিস থাকে না। তাও থাকে যে, তাঁর দাওয়াত ও চেষ্টা-সাধনার ফলে কি মিলল। এই প্রেরণা এমন এক নাঙ্গা তলোয়ার যা প্রতিটি জিনিসই কেটে দু' ভাগ করে দেয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া তাঁদের আর কিছু কাম্য থাকে না। আমার

মালিক (আল্লাহ্) আমার ওপর সন্তুষ্ট, ব্যস! আর কিছুর দরকার নেই, সবই পেয়ে গেছি আমি। তায়েফ-এর যে দু'আ ও মুনাজাত উচ্চারিত হয়েছিল তার প্রাণ বস্তুর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন এবং তায়েফের দৃশ্য আপনি সামনে রাখুন। সে দৃশ্য কি ছিল? হুযুর (সা.) বড় আশা নিয়ে বিশ্বাসে বুক বেঁধে তায়েফ গমন করছেন। তায়েফের এ সফর সহজ ছিল না। দুরূহ দুর্গম রাস্তা। পাহাড়ের উচ্চতা ও খচ্চরের সওয়ারী, আর একজন মাত্র সফর সঙ্গী (যায়দ ইবনে হারিছা)। তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর কি হলো? সেখানকার সর্দার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আওয়ারা কিসিমের লোক লেলিয়ে দিল। তারা হযরতের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল এবং এত পাথর বর্ষণ করেছিল যে, ঝরা রক্ত জমাট বাঁধার কারণে জুতা মোবারক খোলা যাচ্ছিল না তাঁর কদম মোবারক থেকে। কদম মোবারক রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। সে সময় হযরতের পায়ে এত আঘাত লাগে নি যতটা লেগেছিল তাঁর হৃদয় মানসে। কি প্রত্যাশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, আর কি হলো। এখানে তো কেউ কথাই শুনতে চায় না। এ অবস্থায় তিনি নিম্নোক্ত দ'আ করেছিলেন। এ থেকে আপনারা জানতে পারবেন আল্লাহ্র রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির মূল্য কত! তিনি বললেন ঃ

اللهم اشكو ضعف فو قى وقلة حيلتى وهوانى على الناس - رب المستضعفين الى من تكلنى الى بعيد يتجهمنى اوا لى عدو ملكته امرى -

আমি এর তরজমা শুনিয়ে দিচ্ছি, "পরওয়াদিগারে আলম! আমি আমার দুর্বলতা সম্পর্কে তোমাকে ফরিয়াদ জানাই, আমার অসহায়ত্ব ও নিঃস্বতা তোমার দরবারে পেশ করি; লোকের চোখে আমার অসম্মান, অসহায়ত্ব ও আশ্রয়হীনতা সম্পর্কে আমি তোমাকেই অভিযোগ পেশ করি। ওহে দুর্বলের প্রভু! তুমি আমাকে কার নিকট সোপর্দ করছ? এমন অপরিচিতের হাতে কি আমাকে তুলে দিতে চাও যে আমার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করে অথবা এমন কোন দুশমনের হাতে যার হাতে তুমি আমার সকল নিয়ন্ত্রণ ভার তুলে দিয়েছ?"

এখন দেখুন, এখানে নবীর মেযাজ ও প্রকৃতি স্বীয় পরিপূর্ণতা ও শান-শওকতের সঙ্গে দেদীপ্যমান হচ্ছে। ওপরে যে শব্দগুলো উদ্ধৃত করা হলো তারপর বলা হচ্ছে ঃ

ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى غير الى عافيتك وهى اوسع لى -

"আর তুমি যদি আমার প্রতি নারায না হও তাহলে আমি কোন কিছুর পরওয়া করি না। অবশ্য এতটুকু আমি অবশ্যই নিবেদন করব, যেহেতু আমি একজন মানুষ তো বটে! আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।" প্রথম যে জিনিস আল্লাহ্‌র একজন নবীর মেযাজের ভিত্তি হয় তা হলো রিযা-ই-ইলাহী তথা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। তাঁরা পয়গাম পৌঁছিয়ে থাকেন (আর এটাই তাঁদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত)। তারা যখন জেনে যান আমরা আল্লাহ্‌র পয়গাম মানব সমাজের নিকট পৌঁছে দিয়েছি এবং আমাদের প্রভু প্রতিপালক আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন তখন তাঁরা ফলাফল ও পরিণামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে যান।

এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হযরত নূহ আলায়হিস সালামের ঘটনা। لبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما হযরত নূহ (আ.) পঞ্চাশ কম হাযার বছর ধরে তাঁর কওমকে দ্বীনের পথে, ধর্মের পথে, আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিভাবে তিনি দাওয়াত দেন? দাওয়াত দিতে গিয়ে দিন-রাত তিনি একাকার করে ফেলেন। সূরা নূহ-এর সেই আয়াত পড়ুন ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا- ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا -

"(নূহ) বললেনঃ প্রভু পরওয়ারদিগারে আলম। আমি আমার কওমকে রাত্রিকালে দাওয়াত জানিয়েছি, জানিয়েছি দিনের বেলায়; এরপর প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, দাওয়াত দিয়েছি প্রচ্ছন্নভাবে গোপনীয়তার সঙ্গে।"

[সূরা নূহ ঃ ৫ ও ৯ আয়াত]

এত সব কিছু করার পরও ফলাফল কি দাঁড়াল?

মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁর হাতে ঈমান আনল (যাদেরকে হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়)। কিন্তু এর জন্য তাঁর চিত্ত বিমর্ষ নয়, কোন অভিযোগও নেই তাঁর। আমার যে কাজ ছিল আমি তা করেছি, আমি আমার প্রভুকে খুশী করেছি। সামনের কাজ! সে তো আল্লাহ্‌র।

তাহলে পয়লা কথা দাঁড়াল, দ্বীনের প্রতিটি কর্মের পেছনে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া চাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আল্লাহ্‌র এই সন্তুষ্টির বিনিময়ে যদি দুনিয়ার তাবৎ সাম্রাজ্য আমার হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে, আসলে সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়নি, বরং হস্তগত হয়েছে আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিনিময়ে যদি সপ্ত মহাদেশের রাজত্বও মিলে যায় তাহলে বুঝতে হবে আসলে সপ্ত মহাদেশের রাজত্ব আমরা পাইনি, বরং তা খুইয়েছি। এজন্য আমি হযরত হুসায়ন (রা.)-এর

কৃতিত্বপূর্ণ অবদানকে এক বিরাট গৌরবজনক অবদান হিসাবেই মনে করি। একে আমি একেবারেই ব্যর্থ মনে করি না। তিনি একটি নজীর কায়েম করে গেছেন, অন্যায় ও ভুলের বিরুদ্ধে (তা তার ওপর এর লেবেল লাগানো হোক কিংবা না হোক) যদি কেউ সংগ্রাম করে, চেষ্টা ও সাধনা চালায়, তাহলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হবে। যদি হযরত হুসায়ন (রা.)-এর এই গৌরবময় কৃতিত্বের অস্তিত্ব না থাকত তাহলে পরবর্তীকালে অনেক বেশী অসুবিধা দেখা দিত। দেখা যাচ্ছে, কোথাও খোলাখুলিভাবে ও প্রকাশ্যে দ্বীন পয়মাল করা হচ্ছে, ইসলামকে যবাহ্ করা হচ্ছে, ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করা হচ্ছে অথবা ধর্মের বিকৃতি সাধন করা হচ্ছে, তথাপিও তার বিরুদ্ধে কোন সরব প্রতিবাদ ওঠানো যেত না। যুক্তি দেখান হত, ইসলামের সোনালী যুগে এর কোন নজীর নেই।

পার্থক্য তো বিরাট, ইতিহাসেরও বিরাট ব্যবধান আর ব্যক্তিত্বেরও বিরাট ফারাক! কিন্তু একই ব্যাপার বালাকোটের শহীদ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (র.)-এর ক্ষেত্রে যে, আজ পৃথিবীর কোন একটি ক্ষুদ্র অংশে ও তাঁদের কিংবা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত জামা'আতের হুকুমত কিংবা শাসন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্‌র শোকর এবং এজন্য আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। আমারও তাঁর খান্দানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এবং (বর্তমান গ্রন্থের লেখক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী শহীদ-ই-বালাকেট হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ একই খান্দানের)। আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাঁর নাম কিংবা খ্যাতি সম্বল করে আমরা কোন ফায়দা লুটিনি। আমাদের পরিবারের লোকেরা চাকুরী করে, কাজ করে, পরিশ্রমের কাজ। সাধারণ মুসলমানদের মতই থাকে। গদিনশীন হবার কোন প্রশ্ন নেই, তেমনি প্রশ্ন নেই দরগার খাদেম কিংবা সেবায়েতগিরি নিয়ে। এমনও নয় যে, তাঁরা কোন সাম্রাজ্য কায়েম করে গেছেন আর আমরা খান্দানী সূত্রে তার থেকে ফায়দা লুটছি! এসব সত্ত্বেও আমরা খুশী ও তৃপ্ত, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং আল্লাহ্‌র সামনে মস্তক তাঁদের উন্নত।

سودا قمار عشق میں خسرو سے کو هکن

بازی اگر چه لے نه سکا سر تو کهو سکا

প্রেমের জুয়ায় পাথর চূর্ণকারী মেতেছে খসরুর সাথে

বাজী জিততে না পারলেও মাথা তো পেরেছে দিতে।

আম্বিয়া আলাহিসমুস্ সালামের সামনে প্রশ্ন থাকে কেবল একটাই আর তা হলো, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রশ্ন, রেযামন্দীর প্রশ্ন; প্রতিটি বিষয়েই তাঁরা ভাবেন, এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট কিনা? উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া কিংবা দণ্ডমুণ্ডের মালিক অথবা রাজসিংহাসন লাভ করা, এসবই আল্লাহ্‌র ইনাম, এগুলো তার

নিজস্ব সময়ে ও যথাযথ শর্ত সহকারে মিলে থাকে। এর ভেতর কোনটিই তাঁদের কাম্য কিংবা লক্ষ্য নয়। অনন্তর আপনিই দেখুন, কুরআন মজীদে এক স্থানে আছে ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ط

"এই পারলৌকিক আবাস আমরা কেবল তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট করে রাখব যারা দুনিয়ার বুকে (গর্বে) উন্নত মস্তকের অধিকারী হতে চায়না, চায় না ফাসাদ সৃষ্টি করতে। আর শুভ পরিণতি একমাত্র মুত্তাকীদের জন্যই।" [সূরা কাসাস ঃ আয়াত-৮৩]

কিন্তু আল্লাহ্ অন্যত্রই আবার বলছেন ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা হতবল হয়ো না, তোমরা চিন্তিত হয়ো না, পরিণামে তোমরাই উন্নত হবে এই শর্তে, তোমরা মুমিন হবে।" [সূরা আল্-ইমরান ঃ ১৩৯] উল্লিখিত আয়াত দুটোর মধ্যে এখন কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে? এর পরিষ্কার অর্থ এই, তোমরা উন্নতি ও বুলন্দী (علو) চাইবে না, আমি তোমাদেরকে বুলন্দী দেব, উন্নত করব। অনন্তর আঁ-হযরত (সা.), সাহাবাই-কিরাম কেউই বুলন্দী চাননি এবং বিনয়, ত্যাগ ও উৎসর্গের মনোভাব নিয়ে কাজ করেছেন। আল্লাহ্ পাকের যতটা মঞ্জুর ছিল তাঁদেরকে ততটাই বুলন্দী দান করেছেন। প্রথম কথা হলো, কাম্য হবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে গিয়ে যদি আমাদেরকে সারা দুনিয়ার কল্যাণ ও স্বার্থ চিন্তা থেকে হাত ধুতে হয়, জাগতিক ও বৈষয়িক লাভ বর্জন করতে হয় তাহলে সেইটাই কামিয়াবী ও সাফল্য। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গোটা পৃথিবীর রাজত্বও যদি মিলে যায় তাহলে সেটাই ব্যর্থতা। এটাই নবী প্রকৃতি, নববী মেযাজ যা কোন লৌকিকতা কিংবা পরিকল্পনা ছাড়াই পয়গাম্বর ও তাঁর সত্যিকার অনুসারীদের ভেতর সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআন শরীফে এই বিষয়টিকেই এভাবে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

"যেদিন না সম্পদ কোন ফায়দা দেবে, না সন্তান-সন্ততিই কোন উপকার দর্শাবে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ আল্লাহ্র সমীপে পবিত্র ও সুস্থ মন-মানস নিয়ে হাযির হতে পারে (তবে সে পরিত্রাণ পাবে)"[১] তার ভেতর আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন আন্দোলন কিংবা প্রেরণাদাতা, অন্য কোন শক্তি, অন্য অভিপ্রায় কিংবা অভিলাষ যেন না থাকে।

---

১.আশ-শুআরা, ৮৯-৯০ আয়াত;

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিম্নোক্ত শব্দসমষ্টির মাধ্যমে প্রশংসা করা হয়েছে ঃ

اذ جاء ربه بقلب سليم -

"আর স্মরণ কর, যখন সে (ইবরাহীম) তাঁর প্রভু সমীপে নির্দোষ ও সুস্থ মন নিয়ে হাযির হলো।"[১] মন-মানসকে সুস্থ ও নির্দোষ মন-মানস বানাবার জন্য সর্বদা চেষ্ট চালাতে হবে। অব্যাহত রাখতে হবে সে প্রয়াস। নিজের মন-মানসকে সব সময় আত্মজিজ্ঞসা ও আত্মসমীক্ষার সম্মুখীন রাখতে হবে। দেখতে হবে তার ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, বস্তুগত স্বার্থ, বুলন্দী ও সমুন্নতির কোন প্রেরণা কাজ করছে না তো! ইকবাল ঠিকই বলেছেন ঃ

براهمی نظر پیدا ذرا مشکل سے هوتی ہے
هرس سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہیں تصویریں -

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

ان الشيطان يجرى من المؤمن مجرى الدم -

"শয়তান মু'মিনের দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় এভাবে চলাচল করে যেভাবে চলাচল করে রক্ত।" হযরত আমীর-ই কবীর সাইয়েদ 'আলী হামদানী (র.)-এর দাওয়াত এই সুস্থ ও নিষ্কলুষ মন-মানসিকতার দাওয়াত ছিল, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও ইহসান-এর সারাংশ এবং আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা–যারা মানুষের মন-মানস ও আত্মার চিকিৎসা করতেন, তাঁদের কাজও ছিল এটাই, সুস্থ মন-মানসিকতা সৃষ্টি হোক। তাঁরা চাইতেন, তাদের নিকট যারা উঠাবসা করেন তাঁরা এই সুস্থ ও নির্দোষ মন-মানসিকতার অধিকারী হোক! তাদের ভেতর থেকে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, সম্পদ-প্রীতি ও পদমর্যাদার প্রতি লোভ এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি সেই প্রেম ও আকর্ষণ (যা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধি-বিধান পালনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে) বেরিয়ে যাক!

দ্বিতীয় বিষয়, আম্বিয়া-ই-কিরাম (ও আম্বিয়া-ই-কিরাম-এর প্রতিনিধিবৃন্দ) দ্বীনের তা'লীম ও আল্লাহর হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয় থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোনরূপ রদবদলের আশ্রয় নেন না। তাঁরা যেভাবে এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে পেয়ে থাকেন ঠিক তেমনি বিন্দুমাত্র কমবেশী না করে তাঁরা সেগুলো আল্লাহর বান্দাদেরকে পৌঁছিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ذهنی (বুদ্ধিবৃত্তিক) উৎকোচ গ্রহণও করেন না, উৎকোচ দেনও না কাউকে। কেউ মানুক আর না-ই মানুক, কেউ তাঁদের কাছে আসুক আর না-ই আসুক, তাঁরা তাঁদের কথা ঠিক সেই আন্দাজেই বলে থাকেন যেই আন্দাজ ও

১. সূরা আস-সাফফাত, ৮৪ আয়াত।

পদ্ধতিতে আল্লাহপাক তাঁদেরকে সেই কথা শিখিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। যেমন ধরুন, এমন হলো, কাফিররা এসে মুসলমানদের নিকট প্রস্তাব পেশ করল, এসো, আমরা নিম্নোক্ত উপায়ে আমাদের পারস্পরিক আদর্শগত বিরোধগুলো মিটিয়ে ফেলি। তোমরা কিছু দিন আমাদের মূর্তিগুলোকে প্রণতি জানাবে, পূজো করবে, আমরাও কিছু দিন তোমাদের নির্ধারিত ইবাদতগুলো পালন করব। আল্লাহর পয়গম্বর জওয়াব দেনঃ কখনো নয়।

لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ - وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ -

"না আমি তোমাদের উপাস্য দেবদেবীগুলোর পূজো করব, আর না তোমরাই আমার প্রতিপালক প্রভুর ইবাদতকারী।' [সূরা কাফিরুন ঃ ২-৩], তায়েফের ছকীফ গোত্র চেয়েছিল, কুরায়শদের " হুবল" মূর্তির সমপর্যায়ের বড় মূর্তি "লাত"-কে যেন না ভাঙা হয় এবং কিছুকাল যেন তাদেরকে এটির পূজো চালিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। প্রথমে তারা এজন্য এক বছর সময় চেয়েছিল। রাসূল (সা.)-এর অসম্মতিদৃষ্টে অতঃপর ছ' মাস, কিন্তু আঁ-হযরত (সা.) তারপরও রাজী না হওয়ায় তারা অন্তত এক মাস সময় দেবার আবেদন জানায়। শেষাবধি একদিনের আবেদনও প্রত্যাখাত হয়। এরপর হযরত মুগীর ইবনে শু'বা (রা.)-কে পাঠানো হয়। তিনি গিয়ে উক্ত মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেন। তারা আবার বলল, আমরা ইসলাম কবুল করছি, কিন্তু আমাদের নামায মাফ করে দিতে হবে। তিনি বললেন, لاخير فى دين لاركوع فيه এমন দ্বীনে আছেই বা কি যে দ্বীনের ভেতর রুকু-সিজদা নেই।

আরও একটি বিষয় হলো তাঁরা কোন প্রকার আপোস কিংবা সমঝোতা করতেন না। তাঁরা সেই শব্দও সেই ভাষাই ব্যবহার করতেন যা তাঁদের পয়গাম ও রিসালত কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পারলৌকিক জীবনের দিকে পরিষ্কার ভাষায় দাওয়াত দেন, বেহেশত ও দোযখের কথা তুলে ধরেন এবং তাদের প্রতি ঈমান বিল-গায়ব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের দাবী জানান। তাঁদের যুগেও বিভিন্ন দর্শনের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দল ও গ্রুপে নির্দিষ্ট পরিভাষার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দল ও গ্রুপের নির্দিষ্ট পরিভাষা থাকে। আম্বিয়া-ই কিরাম সেসব সম্পর্কে অনবহিত থাকেন না। তাঁদের যুগের প্রচলিত ছাঁচ থাকে, প্রচলিত সে ছাঁচ তাঁরা ব্যবহার করেন না। সাফ্ সাফ কথা বলেন ঃ আল্লাহ্র ওপর ঈমান আন এবং তাঁর গুণাবলী, তাঁর কর্মসমূহ, ফেরেশতাকুল, তকদীর, হাশর-নশর, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন—এসবের ওপর ঈমান আন। যদি ঈমান আন, তাহলে জান্নাত মিলবে তোমাদের। একবারও বলেন না, তোমরা

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে, হুকুমত পাবে। সব সময় এটাই বলতেন, তোমরা জান্নাত পাবে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মিলবে, আল্লাহ্ তোমাদের ওপর রাযী থাকবেন, সন্তুষ্ট হবেন। কুরআন ও হাদীসের কোথাও আমি পাই না, দ্বীনের দাওয়াত কবুল করলে দুনিয়ার বুকে সমুন্নতি লাভ করবে, ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হবে। যদি কোথাও হুকুমত, শান্তি, নিরাপত্তা ও হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তার ধরন এই ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ـ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

“তোমাদের ভেতর যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে অন্য কিছুর শরীক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো ফাসিক।” [সূরা নূর ঃ ৫৫ আয়াত]

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُو الزَّكٰوةَ ـ

“যাদেরকে আমি পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।” [সূরা হজ্জ ঃ ৪১ আয়াত]

অর্থাৎ এখানে ইকামাতু’স-সালাত ও যাকাত আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, উপায় কিংবা মাধ্যম নয় যে, এ পথ দিয়েই হুকুমতে ইলাহিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, বরং হুকুমতে ইলাহিয়ার মাধ্যমে আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তারপরই কেবল সে সবের (সালাত ও যাকাত ব্যবস্থার) প্রচলন করতে হবে। মোটকথা এই যে, আম্বিয়া-ই-কিরাম দ্বীনের মকসুদ (ঈপ্সিত বস্তু), সূচনা, হাকীকত ও আকীদাগুলোর ব্যাপারে অত্যন্ত ঈর্ষাকাতরই নন, বরং সীমাতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণও হয়ে থাকেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁরা এতটুকু বিকৃতি কিংবা পরিবর্তন সইতে পারেন না।

মদীনাবাসীরা যখন বায়আতে আকাবায় জিজ্ঞেস করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াব, আপনাকে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা দেব, বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূল (সা)-এর জন্য এ উত্তর দেয়া খুবই সহজ ছিল, আরে ভাই! আমরা আসব, তোমরা আমার পাশে এসে দাঁড়াবে, পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। ব্যস! আমরা বিরাট এক বাদশাহী গড়ে তুলব, আমাদের মিলিত প্রচেষ্টায় বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে। আজ তোমরা বিচ্ছিন্ন। তোমাদের মাঝে নেই একতা, নেই সংহতি। আমাদের কারণে সেই ঐক্য ও সংহতি ফিরে আসবে তোমাদের মাঝে। এখন তোমরা দুর্বল, যখন শক্তি ফিরে আসবে—রাসূল (সা.) এসব কিছুই বলেন নি। কেবল বলেছিলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র রেযামন্দী লাভ করবে।

এর আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

জাবালা বিন আয়হাম বিরাট একজন আরব দলপতি। সিরিয়ার অন্তর্গত গাসসানী রাজ্যের নরপতি। সাবেক বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদ প্রভৃতির ন্যায় এ রাজ্য। মুসলমান হলো জাবালা। সেই সঙ্গে মুসলমান হলো তার হাজার হাজার প্রজা ও সঙ্গী অনুচরবৃন্দ। একবার মক্কায় আগমন ঘটল তার। এসে সে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে গেল। সে সময় এক আরব বেদুঈন তাওয়াফ করছিল। তাওয়াফ করবার সময় জাবালার শাহী পোশাক চাদর ঝুলছিল এবং মাটি দিয়ে গড়িয়ে চলছিল। দৈবক্রমে আরব বেদুঈনের পা গিয়ে পড়ে জাবালার চাদরের ওপর। ফলে তার শরীর থেকে চাদর খসে পড়ে এবং দেহ তার নগ্ন হয়ে পড়ে। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে সে বেদুঈনকে এত সজোরে থাপ্পড় মারে যে, তাতে বেদুঈনের নাকের ডগার হাড় ভেঙে যায়। বেদুঈন পাল্টা আঘাত হানার সাহস সঞ্চয় করতে না পেরে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করল জাবালার বিরুদ্ধে। বিচারে তিনি জাবালাকে দোষী সাব্যস্ত করে জাবালা থেকে আঘাতের বদলা (কিসাস) নেবার নির্দেশ দিলেন বেদুঈনকে। লোকেরা জানাল, এতে সে অপমানিত বোধ করবে, এমন কি সে মুসলমান নাও থাকতে পারে। হযরত উমর ফারূক (রা.) এর জবাবে বললেন ঃ কুছ পরোয়া নেই (আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে)! এতে জাবালা বলল ঃ আমি এমন ধর্মে থাকতে রাজী নই যেখানে আমার অসম্মান হয়। এই বলে সে চলে গেল। এতদ্সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.)-এর চেহারায় চিন্তা কিংবা উদ্বেগের এতটুকু ছাপ দেখা গেল না। কে গেল আর কে থাকল তাতে কিছু যায় না! কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা আল্লাহ্র হুকুম নড়চড় করব না।

হযরত উসামা (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সুপারিশ পেশ করলেন, অমুক সম্মানী গোত্রের জনৈক মহিলা চুরি করেছে। তিনি যেন তার শাস্তি বিধান না করেন। রাসূল (সা.) বললেন ঃ

لَوْاَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ـ

"আল্লাহ্ না করুন, যদি মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কাটতাম।" তিনি এও বললেন ঃ আল্লাহ্র ঘোষিত শাস্তির ক্ষেত্রে তুমি সুপারিশ করতে এসেছ? এতটুকু বলতেই হযরত উসামা (রা.) সমঝে গেলেন; আর কিছু বললেন না। অপরাধিনীর নির্ধারিত বিধান কার্যকর হলো।

এখানে আরও একটি বিষয়, আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম এভাবে দ্বীনকে তার যথার্থ স্থানে পৌঁছে দিতেন এবং সে সব পরিভাষাই প্রয়োগ করতেন যা পয়গাম্বরদের দাওয়াত ও আসমানী গ্রন্থগুলোতে এসেছে, বরং এ ক্ষেত্রে তাঁরা শব্দ পর্যন্ত হেফাজত করতেন। তাঁরা দ্বীনের এমন ব্যাখা করতেন না যদ্দারা ধারণা হয়, বহুলোকই তো লেখাপড়া জানা, মেধাবী ও প্রতিভাবান, এ ব্যাখ্যা শুনে ছুটে চলে আসবে। না, তাঁরা তা করতেন না, বরং তাঁরা যে জিনিস যেভাবে পেয়ে থাকেন সে জিনিস ঠিক সেভাবেই তাদের সামনে রেখে দেন; তবে অবশ্যই হিকমত তথা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। এক্ষেত্রে তাঁরা এ আয়াতের মর্মানুযায়ী আমল করেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

"তোমার প্রভু প্রতিপালকের পথের দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাও হিকমত ও সর্বোত্তম উপদেশের সঙ্গে।" [সূরা নাহল ঃ ১২৫ আয়াত]

কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা এ বিপদ ডেকে আনতেন না, মানুষের মেধা অন্য এক খাতে প্রবাহিত হোক। এরই নাম নববী মেযাজ, নবী প্রকৃতি, আর একমাত্র এ কারণেই আল্লাহ্র ফযল ও করমের পর এই দ্বীন অদ্যাবধি এজন্য নিরাপদ ও সংরক্ষিত রয়েছে, মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি যুগে উলামা-ই-রাব্বানী-এর হেফাজত করে চলেছেন। তাঁরা (উলামা-এ রব্বানী)-এর প্রাণসত্তারও হেফাজত করেছেন, এর বিভিন্ন ধাপ ও স্তরেরও হেফাজত করেছেন এভাবে যে, দ্বীন ইসলামের ভেতর যেই হুকুম ও যেই রুকন-এর যে মর্যাদা ও অবস্থান তা যেন বাকী থাকে। যেখানকার যে জিনিস তা যেন সেখানেই রাখা হয় ঃ ইবাদতের জায়গায় ইবাদত, ফরযের জায়গায় ফরয তথা অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের জায়গায় অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য, আরকান-আহকামের জায়গায় আরকান-আহকাম, ঈমানের

জায়গায় ঈমান আর আখিরাতের জায়গায় আখিরাত। তাঁরা কখনই দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য পেতে দেননি। এরই ফলে আমরা মুসলমানেরা বেআমল গোনাহগার ও দুর্বল ঈমানের হলেও এই দ্বীন (ইসলাম) নিরাপদ ও সুরক্ষিত। অদ্যাবধি এ দ্বীন বিকৃত হয় নি, হতে পারে নি। এর বিপরীতে আমরা কি দেখতে পাই? খ্রিস্টানদের কথাই ধরি না কেন? গির্জার অধিপতি ও বাইবেলের ব্যাখ্যাতাগণ তাদের স্ব স্ব যুগে কতক আধুনিক মতবাদ ও দর্শন বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করেন। বাইবেলের ভেতর যেগুলো ঢোকানো যায় নি সেগুলো এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কিংবা টীকা-ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। ফল দাঁড়াল, মতবাদ ও দর্শনের পরিবর্তনের সঙ্গে বাইবেলের অস্তিত্বই নড়বড়ে, সন্দেহযুক্ত ও অবিশ্বস্ত হয়ে যায়। বাইবেলের ব্যাখ্যায় তারা লিখল, পৃথিবী চ্যাপ্টা। কেননা পৃথিবী চ্যাপ্টা না হয়ে যদি গোল হয় তাহলে কিয়ামতের দিন সবাই আল্লাহকে কিভাবে দেখবে? পরবর্তীকালে বাইবেলের এ ব্যাখ্যা ভুল প্রমাণিত হয় এবং পৃথিবীর যে গোলাকার তা সবাই মেনে নেয়। এর প্রভাব গিয়ে পড়ল বাইবেলের ওপর, তার সত্যতার ওপর, এমন কি তা যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং আল্লাহ্‌র কালাম—এ বিশ্বাসের ওপরও তা প্রভাব ফেলল।

"শেষ কথা হলো পারলৌকিক জীবন বিশ্বাসের সংরক্ষণ ও তার প্রচার-প্রসার। এটি হলো আম্বিয়া-ই-কিরামের দাওয়াতের বুনিয়াদী বিষয়। যে লোক আম্বিয়াই-ই-কিরামের বাণী ও অবস্থানসমূহ নিয়ে অধ্যয়নের ভেতর জীবন অতিবাহিত করেন এবং তাঁদের বাণীর যথার্থ আনন্দ-সুখ উপভোগ করেন, তাঁরা পরিষ্কার অনুভব করেন, আখেরাত যেন নিত্যই তাঁদের চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে এবং তার ছবি (নি'য়ামত ও মুসীবত, সৌভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণসহ) তাঁদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁরা সদা-সর্বদা জান্নাতের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও জাহান্নামের ব্যাপারে প্রচণ্ড ভীতির মাঝে কাল কাটান। বিষয়টি তাঁদের জন্য একেবারে পর্যবেক্ষণ ও চাক্ষুষ ঘটনার মত যা তাঁদের বুদ্ধি-বিবেক, উপলব্ধি, অনুভূতি ও চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

"আখেরাতের ওপর ঈমান ও সেখানকার প্রাপ্তব্য চিরন্তন সৌভাগ্য ও অবিনশ্বর দুর্ভাগ্য এবং সে সমস্ত নি'য়ামত (যা আল্লাহ পাক তদীয় নেক বান্দাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন) ও আযাব (যা নাফরমান কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে) সদা-সর্বদা চোখের সামনে থাকা—এই ছিল আম্বিয়া-ই-কিরামের দাওয়াত ও উপদেশের আসল প্রেরণাদায়ক শক্তি। এটাই তাঁদেরকে পেরেশান করতে থাকত, রাতের ঘুম কেড়ে নিত, জীবনের আরাম, শান্তি ও পবিত্র

অনুভূতিকে নষ্ট করে দিত এবং কোন অবস্থাতেই তা তাঁদেরকে শান্তি ও স্থিরতার মাঝে থাকতে দিত না। চোখের সামনে বিরাজিত অন্যায়-অনাচার, পাপ ও অবস্থার অবনতি ও পরিবেশের খারাপ দিকগুলোর চরম ও মারাত্মক রূপ অবলোকনের ক্ষেত্রে ও (যে সব দেখে তাঁরা কষ্ট অনুভব করতেন)। তাঁদের দিল ও দিমাগের ওপর সর্বাধিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ও তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অনুপ্রেরণাদানকারী শক্তি ছিল এই আখিরাতের চিন্তা। আর তাঁরা একেই দাওয়া ও তাবলীগের আসল ভিত্তি এবং তাঁদের ভীতি ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের মৌলিক কারণ বলে অভিহিত করতেন।[১]

এরপর আমি আবার আগের কথাই বলতে চাই, এই যে দ্বীন আমরা পেয়েছি তা বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে পাইনি, লেখক কিংবা গ্রন্থকারদের থেকেও পাইনি, পাইনি আমরা চিন্তাবিদদের কাছ থেকে। রাজনীতিবিদদের থেকেও আমরা এ দ্বীন পাইনি, বিজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিকদের থেকেও না। এ দ্বীন আমরা পেয়েছি পয়গম্বরদের থেকে। এজন্য আমাদের প্রতিটি বিষয়েই দেখতে হবে, এই মুহূর্তেও এখানে যদি পয়গম্বর থাকতেন তাহলে তিনি কী বলতেন। যদি নবী হতেন তাহলে কি ভাষায় কথা বলতেন, কোন জিনিসের দাওয়াত দিতেন, তাঁর দাওয়াতে কোন্ বস্তুর পরিমাণ কি এবং কতটা থাকত। আশা করি যারা সত্য-সন্ধানী, যারা দ্বীনের সন্ধানী কেবল তারা একেই মানদণ্ড বানাবেন এবং সর্বদা এটিই সামনে রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا -

"(তারাই রাহমান ও রহীম আল্লাহ্র বান্দা) যাদেরকে তাদের প্রভু প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা বোঝানো হলে বধির ও অন্ধ হয়ে যায় না (বরং বুঝতে চেষ্ট করে)। [সূরা আল-ফুরকান]

আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাক আমাদের ও আপনাদের সবাইকে তওফীক দিন, তিনি আমাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন! যখন তাঁর সামনে আমরা হাযির হব তিনি যেন আমাদেরকে সফলকাম করেন। আমাদের সামনে যেন সেই আয়াত মুবারক থাকে যে আয়াত দ্বারা আমি এ মাহফিলের উদ্বোধন করেছিলাম।

---

১. এই অংশটুকু মওলানা নদভীর বক্তৃতায় এড়িয়ে গিয়েছিল। منصب نبوت اور اس کی بلند مقام حاملین নাম তাঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে এখানে সংযোজন করা হয়েছে। এতে বক্তৃতার বিষয়বস্তু আরও ব্যাপকতা ও পূর্ণতা পেয়েছে।

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ج فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ
وُجُوْهُهُمْ قف اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ -
وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"সেদিন কতক মুখমণ্ডল শুভ্রোজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ হবে কৃষ্ণকায় মসীলিপ্ত; অতএব যাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণকায় মসীলপ্ত, (তাদেরকে বলা হবে) 'ঈমান আনার পর তোমরা কি কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এখন তোমাদের কুফরীর কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদন ভোগ কর।' আর যাদের মুখমণ্ডল হবে শুভ্র সমুজ্জ্বল তারা আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়াতলে অবস্থান করবে, অবস্থান করবে সেখানে তারা চিরদিন।" [সূরা আল্-ইমরান ঃ ১০৬-৭ আয়াত]

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অন্তভূর্ক্ত কর যাদের সম্পর্কে তুমি বলেছ ঃ

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"আর যাদের মুখমণ্ডল হবে শুভ্র সমুজ্জ্বল, তাদের অবস্থান আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়াতলে এবং সেখানেই থাকবে তারা চিরদিন।"

[সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৭ আয়াত]

# ঈমান ও তার মূল্য

[৩১শে অক্টোবর জোহর নামায বাদ ঈদগাহ ময়দান মসজিদে তিব্বতী মুহাজিরদের একটি সমাবেশে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়][১]

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِنْ ۢ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ -

"অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ পুরুষ অথবা নারীর কর্ম বিফল করিনা; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ থেকে উৎখাত হয়েছে, যারা আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এটা পুরস্কার; আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌রই নিকট।" [সূরা আলে-ইমরান, ১৯৫. আয়াত]

প্রিয় ভায়েরা আমার!

অত্যন্ত খুশীর বিষয় আমি আমার মুহাজির ভাইদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হবার সুযোগ পাচ্ছি। এ সাক্ষাত সমস্ত রাজনীতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উদ্দেশ্য থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর মুহব্বত ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার কারণেই। আর এ ধরনের সুযোগ খুব কমই ভাগ্যে জোটে।

---

১. এ সমাবেশের ইন্তেজাম করেন মৌলভী ওয়ালিয়ুল্লাহ শামু নদভী, মৌলভী ইসমাতুল্লাহ বাবা নদভী, হাজী মুহাম্মদ উছমান বাট ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধব। শ্রীনগরে বিরাট সংখ্যক তিব্বতী মুহাজির বাস করেন। চীন কর্তৃক তিব্বত অধিকৃত হবার পর সেখানকার মুসলমানদের ঈমান-আমান মারাত্মক হুমকির সম্মখীন হলে এসব মুহাজির দেশ ত্যাগ করে কাশ্মীরে আগমন করেন।

ভাইয়েরা আমার!

দেশ কেন দেশ হয় আর ফারসী ভাষার জনৈক কবিই বা কেন বলেন ঃ

خاك وطن از ملك سليمان خوشتر

خارو طن از سنبل وريحان خوشتر

সুলায়মানের রাজত্বের চেয়েও দেশের মাটি অনেক ভাল,
স্বদেশের কাটা রায়হান ও সুম্বুলের চেয়েও সুন্দরতর।

এর কারণ, দেশ হলো প্রিয় ও পরিচিত বস্তুসামগ্রীর মিলিত নাম। যে সব বস্তু মানুষের প্রিয় তার সব কিছুর একত্রে সমাবেশ ঘটে একটি দেশে। এখানে অতিবাহিত হয় তার শৈশব, অতিবাহিত হয় তার কৈশোর ও যৌবন। এখানেই তার জন্ম, এর অলি-গলিতেই হয় তার পদচারণা। এখানকার বাগ-বাগিচা ও গলি-খুপচিতে সে খেলে থাকে। আর প্রতিটি অণু-পরমাণু ও পত্র-পুষ্পের সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত সে। আর সে এ সবকে ভালবাসে। এর মাটিতে ঘুমিয়ে থাকেন, সমাহিত হন তার পূর্বপুরুষ। স্বদেশ-স্বভূঁইয়ের সঙ্গে বিদেশ-বিভূঁইয়ের এটাই পার্থক্য যে, স্বদেশে ভালবাসার উপকরণ ও প্রেম-প্রীতির কেন্দ্র বিরাট সংখ্যায় সমাবেশ ঘটে। এজন্য হযরত বেলাল (রা.) যখন মক্কা মু'আজ্জমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে গিয়েছিলেন সেখানে ছিল তাঁর বন্ধু মাহবুবে রাব্বুল আলামীন (হযরত মুহাম্মদ), আল্লাহ তাঁকে এত সম্মান দান করেছিলেন যে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মসজিদে নব্বীর মুয়াযযিন বানিয়ে দেন। সেই বেলালও কখনো কখনো জন্মভূমির কথা স্মরণ করে গেয়ে উঠতেন ঃ

الانيت شعرى هل ابيتن ليلة -

بوادو حو لى اذ خرو جليل -

"হায়! আমার জীবনে কখনো এমন রাতও কি ফিরে আসবে যে, আমি এমন এক উপত্যকায় রাত কাটাব যার চতুষ্পার্শ্বে থাকবে ঘাস-পাতা।"

স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় মক্কা থেকে রওনা হবার মুহূর্তে বায়তুল্লাহর দিকে চোখ তুলে বলেছিলেন ঃ আমি কখনোই তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না কিন্তু এখানকার লোক আমায় এখানে থাকতে দিচ্ছে না, বের করে দিচ্ছে আমাকে। তাছাড়া এখানে স্বীয় দ্বীন ও ধর্মের ওপর টিকে থাকা মুশকিল।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র বান্দাহরা দ্বীনের খাতিরে ধর্মের খাতিরে এমন প্রিয় যে স্বদেশভূমি তাকেও বিদায় সালাম জানিয়েছিলেন। অনেক লোক তাদের সারা জীবনের সঞ্চয়, তামাম জীবনের কামাই-পুঁজি পরিত্যাগ করেছিলেন বিদায় জানিয়ে দিলেন প্রাণপ্রিয় সন্তান-সন্ততিকেও। হযরত আবু সালামা (রা.) যখন হিজরত করবার জন্য বের হলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন জীবনসঙ্গিনী হযরত উম্মু সালামা (যিনি পররবর্তীকালে উম্মুল মু'মিনীন হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন)। উম্মু সালমা (রা.)-এর কবীলা বনু আল-মুগীরার লোকেরা হযরত আবু সালামা (রা.)-এর উটের রশি টেনে ধরে বলল ঃ কোথায় চলেছ? তুমি তোমার ধর্ম বদলেছ ভাল কথা। কিন্তু আমাদের বংশের এ কন্যা রত্নটিকে তুমি কিভাবে নিয়ে যেতে পার? না, সে তুমি পারবে না। হযরত আবু সালামা (রা.) বললেনঃ আচ্ছা, আমি যদি তাকে রেখে যাই তাহলে তোমরা আমাকে যেতে দেবে ত? তারা তাদের সম্মতি প্রকাশ করল। আবু সালামা (রা.) স্ত্রীকে সালাম জানিয়ে এবং স্ত্রী ও সন্তানকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে নিজে রওনা হলেন। যাবার সময় বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে গেলাম। আমি আমার ঈমান বাঁচাবার জন্য যাচ্ছি। তোমাদের চেয়ে ঈমান আমার বেশী প্রিয়। স্ত্রীও তাঁকে খুশী হয়ে বিদায় দিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্‌র মঞ্জুর হলে আবার আমাদের দেখা হবে। হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর কোলে তখন বাচ্চা। এ সময় আবু সালামা (রা.)-এর কবীলা বনু আসাদের লোকেরা এসে বলল ঃ আমরা আমাদের গোত্রের ছেলেকে তার মা'র কোলে থাকতে দেব না-এই বলে মা'সুম ছেলেটিকে তারা তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই দুঃখজনক ঘটনার পর হযরত উম্মু সালামা (রা.) প্রতিদিন সেখানে গিয়ে স্বামী ও সন্তান শোকে কাঁদতেন এবং সেদিনের বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করতেন। এক বছর কেটে গেল এভাবেই। শেষাবধি তাঁর গোত্রের একজন মহান ও সজ্জন ব্যক্তি হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর শোকে ও দুঃখে ব্যথিত হন এবং বলে ওঠেন ঃ কতদিন এই মূক মহিলা এখানে এসে কাঁদবে, চোখের পানি ফেলবে আর তার স্বামীর স্মৃতিচারণ করবে? এ কী জুলুম আর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। অবশেষে একজন সহৃদয় আল্লাহর শরীফ বান্দা[১] প্রস্তুত হলেন এবং হযরত উম্মু সালামা (রা.)-কে বললেন ঃ বোন, তুমি সুস্থ হও। আমি তোমাকে মদিনায় পৌঁছে দেব। ইতিমধ্যে বনু আসাদের দিলেও দয়ার উদ্রেক হলো এবং শিশুকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল। উম্মু সালামা (রা.) বলেন ঃ লোকটি এত শরীফ ছিলেন যে,

১. উছমান ইবন তালহা যিনি পরে কা'বার কুঞ্জীরক্ষক হয়েছিলেন।

আমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি আগে আগে নেমে গিয়ে দূরে সরে দাঁড়াতেন। সারা পথে আমার দিকে তিনি চোখ তুলে তাকান নি।[১]

এরপর হযরত সুহায়ব রূমীর ঘটনা স্মরণ করুন। তিনি ছিলেন মক্কার একজন বিখ্যাত কারিগর ও হস্তশিল্পী। তিনি যখন মদীনা পানে চললেন, অমনি কাফিররা এসে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল। তারা বললঃ সুহায়ব! কোথায় যাচ্ছ তুমি? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ 'ভাই আমি আমার দ্বীন ও ঈমান বাঁচাতে যাচ্ছি, যেখানে গিয়ে স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌র নাম নিতে পারব সেখানে যাচ্ছি। তারা বললঃ ঠিক আছে, তুমি মদীনায় যেতে পার। কিন্তু আমাদের শহর থেকে সারা জীবন যে কামাই-উপার্জন করলে, সে সব নিয়ে যাবে কোন্ অধিকারে? না, তা হবে না। এসব আমাদের ধন-সম্পদ, এখানে থেকে তুমি লাভ করেছ, কামাই করেছ। তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু এর একটি পয়সাও আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে দেব না। সুহায়ব (রা.) বললেন ঃ ভাল কথা! রইল এসব মাল। আমি ঝুলি উজাড় করে সব তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। এবার তোমরা খুশী হলেত? তারা রাজী হলে তিনি বললেন ঃ নিয়ে যাও সব। এই বলে সারা জীবনের পুঁজি তিনি তাদের হাতে তুলে দিয়ে হৃষ্ট চিত্তে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে করতে সেখান থেকে চলে গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুহায়ব বিরাট কামাই করেছে। তার ক্ষতি হয়নি এতটুকুও।[২]

আপনারা সবাই জানেন, দ্বীন ও ঈমানের জন্য প্রথম যুগের লোকেরা জীবন দিয়েছে। আর এতো জানা কথা, জীবনের চেয়ে বেশী দামী ও মূল্যবান আর কিছু নেই। এর পর তারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছে, ধন-সম্পদ ছেড়েছে এবং অনেক লোক রাজ্যপাটও ছেড়েছে। আল্লাহ্‌র এমন বান্দাও গুজরে গেছেন যাদের নাম পরবর্তী সুলতান কিংবা বাদশাহ ঘোষণা করা হয়েছে। যারা ছিলেন শাহযাদা, তাদের রাজ্য ছিল, ছিল রাজত্ব। কিন্তু তাদের অন্তর পরিতৃপ্ত ছিল না। তারা মনে করতেন, রাজ্য চালাতে গিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করতে হয়। আখিরাত তথা পারলৌকিক জীবনের যে প্রস্তুতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে তা এখানে থেকে হবার নয়। হযরত ইব্‌রাহীম ইবন আদহামের নামও আপনারা শুনে থাকবেন। তিনিও এমনটিই ছিলেন। আরও কয়েকজন বুযুর্গ এমন ছিলেন। রুকুনুদ্দীন আলাউদ্দৌলা সিমনানি সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীও ইরানে রিয়াসত ও সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। তিনি সে সবে পদাঘাত করে চলে আসেন এবং

১. সীরাতে ইবনে কাছীর, ২য় খণ্ড, ২১৫-১৭;৩.
২. ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা

আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। তারা বললেনঃ আমরা আল্লাহ্র মা'রিফাত (পরিচয়) লাভ করতে চাই এবং তাঁর রেযামন্দির জন্য আমরা জীবনে বাজী ধরব।

ভাইয়েরা আমার!

আপনারা আপনাদের স্বদেশভূমি ছেড়েছেন। আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই। আসলে আল্লাহ দেখতে চান, আমার বান্দা কি জিনিসের বিনিময়ে কি ছাড়ল! ছাড়ার মত দুনিয়ায় তো বহু জিনিসই আছে। আমরা আপনারা সকলেই প্রত্যহ সকাল-সাঁঝে দেয়া-নেয়ার কাজ করি। উদাহরণত আপনি বাজারে গেলেন কিছু সওদা করলেন। বিনিময়ে তরকারি নিলেন। আপনি দাম দিলেন, কাপড় খরিদ করলেন। অফিসে গিয়ে কাজ করে আসলেন, নিয়ে আসলেন বেতন। মোটকথা ছেড়ে আসা ও গ্রহণ করা, অপর কথায় দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা মানুষের জীবনের নিত্যকার বিষয়। এখানে দেখার বিষয়, আপনি কি ছাড়লেন এবং কার জন্য ছাড়লেন? আল্লাহ পাক এটাই দেখেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল (আ.)-কে মক্কার বিজন প্রান্তরে ছেড়ে চলতে লাগলেন। হযরত হাজেরা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আমাদেরকে কিসের ভিত্তিতে ছেড়ে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) উত্তরে জানালেন ঃ আল্লাহ্র নির্দেশে। হযরত হাজেরা বললেন ঃ তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই আমাদের। আপনি যদি আল্লাহ্র নির্দেশে আমাদেরকে রেখে যান তাহলে আমাদের কোন ভয় নেই। আপনারা দেখুন, আল্লাহ্ তাঁদের এ আমলকে কিভাবে কবুল করেছেন। সারা দুনিয়া সেখানে গিয়ে হাযির হয় আর কত আগ্রহ ভরে যায়! উড়ে যেতে চায়। তাদের মন চায় ঃ আহা! দুটো পাখা যদি পেতাম আর মুহূর্তেই যদি সেখানে পৌঁছে যেতে পারতাম! হযরত ইবরাহীম 'আলায়হিস্ সালাম নিজের ঘর-বাড়ি, স্বদেশভূমি ছেড়ে হযরত হাজেরাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা হাজারো লাখো মানুষকে সেখানে নিয়ে যান, তাদেরকে দৌড়ান, ঘোরাফেরা করান। হযরত হাজেরা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্য পানির সন্ধানে সাফা থেকে মারওয়া ও মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত দৌড়েছিলেন। আজ আল্লাহ্ তা'আলা যুগের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি নেতাকে সেখানে নিয়ে দৌড়ান এবং বলেন ঃ হাজেরার এই আমল পছন্দ করেছি আমি। অতএব, তার স্মরণে তোমরাও দৌড়াও, ঠিক সেইভাবেই দ্রুত দৌড়াবে সেখানে হাজেরা দ্রুত দৌড়েছিল, আর হাজেরা যেখানে ধীরে চলেছিল, তোমরাও সেখানে ধীরে চলবে। আপনাদের ভেতর যারা সেখানে গিয়েছেন তারা এ দৃশ্য দেখেছেন।

ভাইয়েরা আমার!

আসলে দেখতে হবে আমাদের, আমরা কি জিনিস ছাড়লাম এবং কার জন্য ছাড়লাম। কি ছাড়লাম তার গুরুত্ব ততটা নয়, যতটা বেশী গুরুত্ব কার জন্য ছাড়লাম। এর গুরুত্ব খুবই বেশী। আমার মুহব্বতে ছেড়েছে, আমার নামের ওপর ছেড়েছে, ব্যস! আল্লাহ্ এটাই পসন্দ করেন, ভালবাসেন। যদি কেউ রাজসিংহাসনও পরিত্যাগ করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হয় অন্যবিধ (যেমন সম্রাট ৮ম এডওয়ার্ড মিসেস সিম্পসন নামের জনৈকা আমেরিকান মহিলার প্রেমে বৃটিশ রাজসিংহাসন ছেড়েছিলেন। —অনুবাদক) আল্লাহ্র নিকট তার কানাকড়ির মূল্য নেই। কিন্তু আপনি যদি একটি পয়সাও ছেড়ে থাকেন এবং তা আল্লাহ্র নামে ছেড়ে থাকেন, আল্লাহ্র মুহব্বতে ছেড়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্র কাছে তার মূল্য আছে, কদর আছে। আসল দেখার বিষয়, আপনারা আপনাদের দেশ ছেড়েছেন কিসের জন্য? আমরা যতদূর জানি, আপনারা আপনাদের দেশ ছেড়েছেন নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য। আর ঈমান এমনই এক বস্তু, মানুষ যদি দূর থেকেও বুঝতে পারে, ঈমানের জন্য বিপদ অপেক্ষা করছে তাহলে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠবে। হাদীসে এসেছে, তিনটি বিষয় এমন যে, যার ভেতরেই এ তিনটির সমাবেশ ঘটবে, ঈমানের সমস্ত গুণই তার ভেতর জমা হলো। তার ভেতর একটি হলো,

من يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف فى النار -

"যে ব্যক্তি কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তনকে এমনভাবে অপছন্দ করবে যেমন অপছন্দ করে মানুষ আগুনের মাঝে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।"

টরেন্টো (কানাডা)-তে ভারতীয়, পাকিস্তানী ও আরব মুসলমানদের এক সমাবেশে বক্তৃতা[১] করতে গিয়ে আমি তাদেরকে বলেছিলাম ঃ দেখুন, ভাইয়েরা আমার! যদি তোমরা জেনে থাক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে এখানে ইসলামের ওপর টিকে থাকা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের ঈমান বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন, তাহলে আমি পরিষ্কার বলছি এবং ফতওয়া দিচ্ছি, তোমাদের যদি হেঁটেও স্বদেশে গিয়ে পৌঁছতে হয় তবুও তোমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। সমস্ত চাকুরী-বাকুরী, সকল পদ-পদমর্যাদা, সব প্রমোশন ও আয়-উন্নতি পেছনে ঠেলে তোমরা যে কোন মুসলিম দেশে চলে যাও

১. এ বক্তৃতা "নঈ দুনিয়া আমেরিকা মে সাফ সাফ বাতে" বিধ্বস্ত মানবতা নামক বক্তৃতা সংকলনে পাওয়া যাবে।

এবং এখনই বেরিয়ে পড়। এতে কোনই সন্দেহ নেই, আমরা মুসলমান, আমার প্রিয়ভাজনেরা তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত নই। আমাদের ভয়, আমাদের পুত্র-প্রৌত্র ও দৌহিত্ররা ইসলামের ওপর কায়েম থাকতে পারবে কিনা–এই নিয়ে। যদি তোমাদের ভয় হয় এবং তোমরা আশংকা কর, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের সন্তানদের সন্তান-সন্ততি খোদা-না-খাস্তা মুরতাদ হয়ে যাবে, ইসলাম থেকে সরে যাবে, তাহলে তোমাদের পক্ষে সেখানে থাকা হারাম। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ـ

"যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, "তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, "দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।" তারা বলে, "দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে?"

একটু এগিয়েই আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ـ

"ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর কত নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল!"

[সূরা নিসা ঃ ৯৭ আয়াত]

আল্লাহ্র শোক্র, আমার সে কথাকে আজও তারা স্মরণ রেখেছে। সেখান থেকে লোক আসে, বলে ঃ আপনার সেই বক্তৃতা আজও আমাদের কানে বাজছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আফ্রিকায় আমরা মোটরে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। লোকে টেপ রেকর্ডার চালু করল। টেপ থেকে আপনার বক্তৃতা ভেসে আসছিল আর আপনি বলছিলেন ঃ যদি এখানে তোমাদের সন্তান-সন্ততির ও ভবিষ্যত বংশধরদের পক্ষে ইসলামের ওপর কায়েম থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তোমাদের জন্য এই ভূখণ্ডে থাকা একদিনের জন্যও জায়েয নয়, তা তোমাদের ওপর আসমান থেকে স্বর্ণবৃষ্টিই ঝরুক কিংবা মাটি ফুঁড়েই তা বেরিয়ে আসুক!

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে, যদি তারা দুনিয়ায় বেঁচে না থাকেন, বেহেশতে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা দান করুন! আর জীবিত থাকলে আল্লাহ তাদের জীবনে বরকত দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা তোমাদের ঈমান বাঁচাবার জন্য এত বড় কুরবানী দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের হিজরতকে এমনভাবে কবুল করেছিলেন যে, সেই নামে স্থায়ী পঞ্জিকাই কায়েম করে দিয়েছেন। এটাও এক আকস্মিক ঘটনা, কাল ছিল ১৪০২ হিজরীর পহেলা দিবস। এ সালের পয়লা দিন মুহাজিরদের মাঝে কাটাবার সুযোগ পেলাম যে সাল শুরু হয় হিজরত থেকে। আমার পরামর্শ দেবার সাধ জাগে, আপনারা একটি ব্লাক বোর্ড তৈরি করুন। তার ওপর উর্দু কিংবা তিব্বতী হরফে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখুন, "আমরা আমাদের স্বদেশভূমি ত্যাগ করেছিলাম কেন? আমরা কেন তিব্বতকে বিদায়ী সালাম জানিয়েছিলাম?" একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যার নজরই এর ওপর পড়বে সেই মনে করবে, আমাদের দেশ তো আমাদের কেটে খাচ্ছিল না! এতটা খারাপও ছিল না যে, সেখানে তিষ্ঠানো যেত না! আমরা আমাদের দেশ ছেড়েছিলাম ঈমানের খাতিরে। জিজ্ঞাসার চিহ্ন তার হৃদয়ের মণিকোঠায় জাগরূক থাকুক আর নিজেকেই সে জিজ্ঞাসা করুক, "কেন তুমি তোমার দেশ, তোমার জন্মভূমি ছেড়েছিলে?" তার মন ও মগজ এর উত্তর দিক, আমরা হিজরত করেছিলাম নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য, নিজের শিশু-সন্তান, স্ত্রী-পুত্র, পৌত্র-দৌহিত্র ও তাদের বংশধরদের ঈমান বাঁচাবার জন্য। আপনারা কখনোই একথা ভুলবেন না। মানুষ সাধারণত অল্প দিনেই ভুলে যায়। অনেকেই ভুলে গেছে, আমাদের বাপ-দাদা এখানে কেন এসেছিলেন আর কেই-বা তাদের আসতে বাধ্য করেছিল। এর পর তারা একই রঙে রঞ্জিত হয়। খানাপিনা ও রুটি-রুযীর ধান্ধায় লেগে যায়। এক সময় দেখা যায়, তাদের নামাযের কথাও ভুল হয়ে গেছে। নামাযের সময় হয়ে ওঠে না অনেকের। ধর্মীয় শিক্ষার ধারাবাহিকতাও যায় খতম হয়ে। আল্লাহ্র স্মরণও ভুল হয়ে যায়। শেষাবধি তারা স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। আমি চাই, এমন কিছু করা হোক যা দেখে আপনারা সব সময় সতর্ক হতে পারেন। তা আপনাদের কাঁটার ন্যায় ফুটবে এবং যা আপনাদের কোন সময় গাফিল হতে দেবে না অথবা আপনারা মাঝে মাঝে সমাবেশের আয়োজন করুন এবং সেখানে আপনারা পরস্পরকে একথা স্মরণ করিয়ে দিন। আমি অবশ্য একথা বলছি না, এটাই একমাত্র পন্থা। কিছু লিখে

দেওয়ালে সেঁটে দিন। কিছু দিন পর এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর দরকার পড়বে আরেকটা নতুন কিছুর। এরপর সেটাও আবার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হবে। এরপর দরকার পড়বে তৃতীয় কিছুর। দেওয়ালে নয়, আপনারা বরং আপনাদের মনের পর্দায় লিখে নিন, "আমরা তিব্বত কেন ছেড়েছিলাম? আমরা আমাদের প্রিয় স্বদেশ ও বাসভূমি কেন ছেড়েছিলাম?" সব কিছু বরদাশ্‌ত করুন কিন্তু ঈমানের ক্ষতি বরদাশ্‌ত করবেন না যার জন্য আপনারা আপনাদের দেশ ছেড়েছিলেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শোনে নিবিষ্ট চিত্তে।" [সূরা কাফ, ৩৭ আয়াত]

# দাওয়াত ও দাওয়াতের হিকমত[1]

[১৯৮১ সালের ২রা নভেম্বর মুতাবিক ৪ঠা মুহাররম, ১৪০২ হিজরীর সকাল ১০টা জম্মু ও কাশ্মীর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সদর দফতরে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সমাগতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই ছিলেন উলামায়ে কিরাম, শিক্ষক, অধ্যাপক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও চিন্তাশীল সুধী।]

খুতবার পর!

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং ওদের সঙ্গে আলোচনা কর সদ্ভাবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎ পথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত।" [সূরা নহল ঃ ১২৫ আয়াত]

সুধীমণ্ডলি!

আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'ইযযত-এর সম্বোধন তাঁর আখেরী নবী (সা.)-এর মাধ্যমে আখেরী উম্মতের জন্য। কেননা এই উম্মতের পর আর কোন উম্মত নেই। পঠিত আয়াতটি সূরা নহলের শেষ রুকূ-র যার ভেতর দাওয়াত ও ইরশাদের তরীকা ও পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ঐশী ফরমান, "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সুদপদেশ দ্বারা।"

হিকমত দ্বারা বোঝায় জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, ব্যবহারিক রীতিনীতি, সুকৌশল, সত্যিকার ও বিশুদ্ধ কথাকে পরিষ্কারভাবে মানুষের মনের মর্মমূলে গেঁথে দেবার তরীকা বা পন্থা যেন অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোসকামিতা কিংবা সুযোগ-সন্ধানী মানসিকতার বিন্দুমাত্র নামগন্ধও না থাকতে পারে। রাজনীতির কোন ভূমিকা না থাকে যেন। কেননা রাজনীতি আলাদা জিনিস এবং হিকমত ও সদুপদেশ আলাদা।

---

১. যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

স্বীয় যুগের আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও মাহবুব বান্দা মূসা আলায়হি'স সালামকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে সে যুগের আল্লাহ্‌র সবচেয়ে ক্রোধে নিপতিত জালিম ফেরাউনের নিকট গিয়ে তাকে দাওয়াত জানাবার। কিন্তু তাঁকে ব্যবহারিক রীতিনীতি অনুসরণ ও নম্র ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ঃ

اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى -

"তোমরা দু'জনে (মূসা ও হারূন) ফেরাউনের নিকটে যাও; সে বিদ্রোহ করেছে।" [সূরা ত্বাহা ঃ ৪৩ আয়াত]

এই বিদ্রোহী ও সীমা অতিক্রমকারীর সঙ্গেও দাওয়াতের কি তরীকা অবলম্বন করতে হবে?

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا -

"তোমরা উভয়ে তার সঙ্গে নম্র ভাষায় কথা বলবে।" [সূরা ত্বাহা ঃ ৪৪ আয়াত]

কথা হবে পাকাপোক্ত ও সত্য, কিন্তু কথা বলার ধরন হবে ব্যবহারিক রীতিনীতি মাফিক কোমল ও মিষ্টি মধুর।

لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى -

"সম্ভবত সে (ফেরাউন) উপদেশে কান দেবে অথবা (আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে) ভীত হবে।" [সূরা তাহা, ৪৪ আয়াত]

যাতে করে সে উপদেশ গ্রহণ করে অথবা ব্যবহারিক আচরণদৃষ্টে ও শিষ্টাচারমূলক কথা শুনে তার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং সে তার অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন, অনাচার, অরাজকতা ও কুফরী থেকে বিরত হয়। আর যদি ভাল কথা বলার ধরন হয় খারাপ তাহলে তা ফলপ্রসূ হয় না। কবি সত্যই বলেছেন ঃ

کہتے ہیں وہ بھلے کی ولیکن بری طرح -

"সে কথা ভালো বলে বটে, কিন্তু বলে খারাপভাবে।"

ভালো কথা ভালভাবে বলার নামই উত্তম ব্যবহারিক রীতি ও হিকমত। যদি প্রতিপক্ষকে সওয়াল-জওয়াবও করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও ব্যবহারিক রীতি অনুসরণ করা উচিত। বিতর্ক ও পরস্পরে বাদানুবাদের ক্ষেত্রেও তার প্রতি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ ঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

"আর সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হও।"

[সূরা নহল, ১২৫ আয়াত]

যাতে করে শ্রোতা ও দর্শক দাওয়াত প্রদানকারীর (দা'ঈর) যুক্তি উপস্থাপনের পন্থাদৃষ্টে প্রভাবিত হতে পারে, চাই কি প্রতিপক্ষের ওপর এর কোন প্রভাব না-ই পড়ুক। যদি আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক সর্বোত্তম পন্থায় হয় আর প্রতিপক্ষ যদি হয় সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী সৎ স্বভাবের, তাহলে সে নিজেও প্রভাবিত হবে। আর তা যদি নাও হয় তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতার ওপর উত্তম আলোচনার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। এটাই ঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

"ইবরাহীম ছিল এক সম্প্রদায়ের প্রতীক; সে ছিল আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" [সূরা নাহল, ১২০ আয়াত]

আয়াতের হাকীকত থেকে প্রতীয়মান হয়, তাঁকে যুক্তি ও প্রমাণপঞ্জী উপস্থাপনার তরীকা ও পন্থা, ব্যবহারিক রীতিনীতি, হিকমত ও সদুপদেশ ও সর্বোত্তম বিবাদ-বিতর্ক সত্ত্বেও

حَنِيفًا مُسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

(একনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। [সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৭ আয়াত] খেতাব দান করা হয়েছে। আর তা এজন্য যে, তাঁর দাওয়াতের ভেতর হিকমত ছিল, আপোসকামিতা ছিল না; সারল্য ছিল, কিন্তু রাজনীতি ছিল না। অতএব, একজন মু'মিন মুসলমানকেও এই তাবলীগী পদ্ধতি অবলম্বন ও অনুসরণ করা আবশ্যক। আকীদার ইসলাহ তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের সংস্কার ও সংশোধনের জন্যেও اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ - এর কর্মপন্থা গ্রহণ করাই উপকারী ও ফলপ্রসূ। কথা যতই জরুরী ও অপরিহার্য হোক না কেন, দা'ঈর সামনে এটাই লক্ষ্য থাকতে হবে, আমাকে রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। তার ভেতর থাকতে হবে স্নেহ-ভালবাসা ও বিনয়-নম্রতা। কঠোরতা, রুক্ষতা, উগ্রতা ও বদমেযাজীর কারণে রোগী অভিজ্ঞ বিখ্যাত চিকিৎসক ও হেকীমের নিকট যেতেও ভয় পায়। রোগ-ব্যধির চিকিৎসার ব্যাপারটাই আলাদা। উম্মাহ নিম্নোক্ত পয়গাম লাভ করে ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি (বিশেষভাবে) সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" [সূরা তওবাহ, ১২৮ আয়াত]

এ আয়াতের ওপর আমল করা তাঁর একজন উম্মতের ওপরও অপরিহার্য। তারা (উম্মতে মুহাম্মদী) যেন অপর মানুষকে কার্যকর হিকমত, মুহব্বত ও প্রীতির সঙ্গে দাওয়াত দিয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে-সুজিয়ে 'আকীদার ইসলাহ্‌র জন্য কাছে টানেন এবং উদ্বুদ্ধ করেন। আঁ-হযরত (সা.)-এর তাবলীগী চিন্তা-ভাবনা ও অন্তর্জ্বালার অবস্থা কিরূপ ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ـ

"ওরা এই বাণী বিশ্বাস না করলে ওদের পেছনে পেছনে ঘুরে সম্ভবত তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।" [সূরা কাহ্‌ফ, ৬ আয়াত]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ـ

"ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে।" [সূরা শু'আরা, ৩ আয়াত]

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এরও অন্তরের ব্যথাভরা কামনা ছিল, প্রত্যেক মানুষ তার মালিক মুখতার (আল্লাহ্)-এর আস্তানায় তাদের মস্তক ঝুঁকিয়ে দিক এবং কেউ যেন তাঁর দরজা থেকে মাহরূম ফিরে না যায়। হযরত আলী (কা)-কে তিনি বলেন ঃ

لان يهدى الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ـ

"দুর্লভ লাল উটের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান তোমার জন্য যদি একজন মানুষও তোমার মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।"

মুবাল্লিগকেও একজন দরদমন্দ ও বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত রোগীর কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে চিকিৎসা করতে হবে। হেকীম কিংবা চিকিৎসকের লক্ষ্য থাকবে রোগীকে মেরে ফেলা নয়, বরং তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তোলা। মুবাল্লিগকে তাওহীদী আকীদার কথা একেবারে স্পষ্ট করে বলতে হবে এবং শিরক সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে, ঔষধ মাফিক যেন পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়। যদি ঔষধ বেশি শক্তিশালী কিংবা পরিমাণ ও মাত্রায় বেশী হয় অথবা সব ডোজ যদি একবারেই রোগীকে খাইয়ে দেয়া হয় কিংবা ঔষধ রোগীর সহ্য শক্তির তুলনায় যদি বেশী হয়, তাহলে রোগী বাঁচবে না, নির্ঘাত মারা যাবে। বিষয়টি আমি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে গল্পের মাধ্যমে পেশ করতে চাই যাতে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সবার জন্য অধিক বোধগম্য হয়।

দেখুন, আল্লাহ্‌র যেসব বান্দাহ্‌র দিলে ইশ্‌কে ইলাহীর আগুন লেগেছিল তারাও কিভাবে হিকমতের সঙ্গে কাজ করেছেন।

শায়খ জামালুদ্দীন ইরানী কোথাও যাচ্ছিলেন। তাতারীরা মুসলিম সালতানাতগুলোকে ধ্বংসের চূড়ান্ত করে ছেড়েছিল। ঘটনাচক্রে ঠিক সেদিনই তুগলক তায়মুর নামক জনৈক তাতারী শাহ্‌যাদা শিকারের উদ্দেশে বাইরে বেরিয়েছিলেন। এই শাহ্‌যাদা ছিলেন তাতারীদের চুগতাঈ শাখার যুবরাজ যারা ইরানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করছিলেন। শাহ্‌যাদার শিকারের ক্ষেত্রে শায়খ জামালুদ্দীন আকস্মিকভাবেই ঢুকে পড়েন। পাহারাদার তাঁকে পাকড়াও করে শাহ্‌যাদার সামনে হাযির করে। শাহ্‌যাদা এই ফকীরবেশী মুসলমান, তাও আবার ইরানীকে দেখে (সে সময় তাতারীরা ইরানীদেরকে খুবই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখত) যাত্রা অশুভ বলে মনে করেন এবং অত্যন্ত কুপিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ বল, এই কুকুর ভাল না তুমি? শাহ্‌যাদা অত্যন্ত ক্রোধভরে কথা বলছিলেন। শায়খ জামালুদ্দীন তার উত্তর দেন অত্যন্ত ভাব-গম্ভীর স্বরে ও বিবেচক ভঙ্গীতে। তিনি বলেন ঃ এর অকাট্য ফয়সালা দেবার মওকা এটা নয়। শাহ্‌যাদা বললেন ঃ তাহলে এর উপযোগী মওকা কখন আসবে? শায়খ বললেনঃ আমার অন্তিম মুহূর্তে অর্থাৎ আমার মৃত্যুর মুহূর্তে এটা জানা যাবে। আমি যদি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা যিনি একক ও অংশীহীন, তাঁর সঠিক পরিচয় ও স্বীকৃতির ওপর শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি তাহলে আমি আপনার কুকুরের চেয়ে উত্তম বলে প্রমাণিত হব। এর অন্যথা হলে এই কুকুরটিই আমার চেয়ে উত্তম ও ভাগ্যবান বিবেচিত হবে।

শায়খ-এর উত্তর শাহ্‌যাদার মনের বদ্ধ কপাটে আঘাত হানে। শাহ্‌যাদা শায়খকে বলেন ঃ তুমি যখন শুনবে, আমি সিংহাসনে সমাসীন হয়েছি ঠিক সে সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে। শাহ্‌যাদার যুবরাজ থাকাকালীন যুগেই শায়খ জামালুদ্দীন-এর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। তিনি তাঁর পুত্র (শায়খ রশীদুদ্দীন)-কে কাছে ডেকে বলেন ঃ আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার কাঁধে যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, আমি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারলাম না। আমি আশা করছি, তুমি তা পূর্ণ করতে পারবে। এই বলে তিনি সকল ঘটনা বিবৃত করলেন।

শায়খ জামালুদ্দীনের ওফাতের পর যুবরাজ সিংহাসনে বসতেই শায়খপুত্র তাঁর পিতার ওসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) মাফিক রওনা হলেন। শাহী মহলের বহিঃফটকে সিপাহীরা তাঁকে বাধা দেয় এবং দরজা থেকে ফিরিয়ে দেয়। তিনি নিকটেই এক গাছের ছায়ায় জায়নামায বিছান এবং সুবহে সাদিকে ফজরের আযান দেন। বাদশাহ্‌র ঘুম ভেঙে যায় আযানে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ছিন্ন বেশধারী আলখাল্লা পরিহিত একটি লোক মহলের বাইরে বসে আছে। সেই

আওয়াজ হেঁকেছে যার ফলে বাদশাহ্‌র ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। বাদশাহ্‌ রেগে গিয়ে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। সিপাহীরা তক্ষুণি গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে এল। বাদশাহ্‌র জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি তাঁর পিতার সালাম পেশ করে বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমার পিতার শেষ বিদায় ঈমানের সঙ্গেই হয়েছে। আশা করি আপনার কৃত প্রশ্নের উত্তর এর ভেতরে আপনি পেয়ে গেছেন, এই বলে তিনি বাদশাহকে তার যুবরাজ থাকাকালীন শিকার ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন। বাদশাহ্‌র মনের ওপর এ ছিল দ্বিতীয় আঘাত। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ইসলাম গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে সাম্রাজ্যের উযীর-ই-আজমকে ডেকে পাঠান এবং তাকে এ ঘটনা বিবৃত করেন। উযীর উত্তরে জানান, আমি তো জাঁহাপনা অনেক আগেই মুসলমান হয়ে গেছি। এতদিন তা প্রকাশ করিনি। আর এভাবেই ইরানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই চুগতাঈ তাতারী শাখা রাজ্যের পারিষদবর্গ ও সেনাবাহিনী সমেত ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেন।[১]

এভাবে একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা কিভাবে ইরানী তাতারী সাম্রাজ্যে ইসলামের প্রসার ঘটান যে, গোটা তাতারী জাতিগোষ্ঠীই মুসলমান হয়ে যায়।

এই ধরনেরই আরেকটি ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি।

মওলানা ইয়াহইয়া 'আলী সাহেব ছিলেন হযরত মাওলানা বিলায়েত আলী সাদিকপুরীর[২] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সীমান্তের মুজাহিদদেরকে সাহায্য দেবার অভিযোগে (যারা হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর শাহাদত লাভের পর তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন) ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফাঁসীর দণ্ড প্রদান করা হয়। তাঁকে আম্বালা জেলের একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কুঠরীতে আলো-বাতাস প্রবেশের কোন রাস্তা ছিল না। সেদিন ছিল ভীষণ গরম। জেল কর্মকর্তা কারাগার পরিদর্শনে এসে এ অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারেন, এমতাবস্থায় তো তিনি মারা যাবেন। এখনও মোকদ্দমা চলছে। তিনি কুঠরীর দরজা খোলা রাখার নির্দেশ দেন এবং সেখানে সান্ত্রী মোতায়েন করেন। গুর্খা কিংবা শিখদেরকেই সাধারণত সান্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হতো। এসব সান্ত্রী ডিউটিতে এসে হাযির হলেই তিনি হযরত য়ূসুফ (আ.)-এর ভাষায় তাদেরকে সম্বোধন করতেন ঃ

১. এ ঘটনা ইরানী ঐতিহাসিকগণ ও প্রোফেসর আর্নল্ড তাঁর Preaching of Islam নামক গ্রন্থে শব্দের সামান্য তারতম্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। আলোচক তাঁর 'তারীখ-ই দাওয়াত ও আযীমত' (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম খণ্ড) নামে কিছু কাল আগে প্রকাশিত হয়েছে। —(অনুবাদক)-এর ১ম খণ্ডে তা উদ্ধৃত করেছেন।

২. মাওলানা বিলায়েত আলী ছিলেন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ـ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ـ اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ـ اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ ـ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

"হে কারাসঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতগুলো নামের ইবাদত করছ যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ করেন অন্য কারুর ইবাদত না করতে। এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"

[সূরা য়ূসুফ, ৩৯-৪০ আয়াত]

তিনি এ আয়াতের তেলাওয়াত করতেন, করতেন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আর তা শুনে এসব পাহারাদারের চোখ ফেটে পানি বের হতো এবং তারা নীরব ও নিথর হয়ে যেত। যখন তাদের ডিউটি অন্যত্র বদলে দেয়া হতো তখন তারা তোষামোদ করত যেন তাদের ডিউটি এখানেই রাখা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তাদের ভেতরে কত আল্লাহ্র বান্দার মনে তওহীদের বীজ উপ্ত হয়েছে এবং ঈমান লাভের সুযোগ ঘটেছে।

ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটেছে মওলবী মুহাম্মদ জা'ফর (থানেশ্বরী)-এর বেলায়। তাঁকে দ্বীপান্তর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তথাপি তাঁর চেহারায় উদ্বেগ কিংবা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। ইংরেজ দর্শকরা এতদ্দৃষ্টে বিস্মিত হয়ে বলত, "ব্যাপার কি?" তিনি বলতেন, "এ মৃত্যু মৃত্যু নয়, এর নাম শাহাদত। আর শাহাদত এমনই এক নিয়ামত যার মুকাবিলায় তামাম দুনিয়ার সাম্রাজ্যেরও এক কানাকড়ির মূল্য নেই।" সেখানেও তিনি হিকমতের সঙ্গে তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্ব আনজাম দিতেন। জেলে থাকাকালে ও পোর্ট ব্লেয়ার-এও তিনি ও তাঁর সঙ্গিগণ তাওহীদের দাওয়াত দিতেন, তাবলীগ করতেন। এর ফলে আল্লাহ্র বহু বান্দার হেদায়েত নসীব হয়।

মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী (র.)-এর নিকট এক রাত্রে জনৈক কুখ্যাত ও দাগী আসামীর বিছানা নিয়ে আসা হয়। সে যখন মাওলানার ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ, মুনাজাত ও আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটির অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, অমনি সে তওবা করল তার অতীত পাপ থেকে এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুযারে পরিণত হলো। জেলে বিশজনের মত আল্লাহ্র বান্দা হেদায়েতে প্রাপ্ত হয় এবং তাদের জীবনের গতিধারাই পাল্টে যায়।

এমনিভাবে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের মধ্যে যখন অন্তরের জ্বালা ও মস্তিষ্কের আলো এসে দেখা দেবে এবং এ দুটো যখন পরস্পরে মিলিত হয়ে কাজ করবে তখন ফলাফল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। একজন শিকারী যখন জন্তু শিকার করতে গিয়ে হিকমতের আশ্রয় নেয় তখন একজন মুবাল্লিগও তার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হিকমত অবলম্বন করবেন। কেননা তার উদ্দেশ্য আরও মহৎ। শির্‌ক হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি। এর চিকিৎসাও হিকমতের সঙ্গে করা আবশ্যক। কথা বলার ভঙ্গী হবে কোমল ও মোলায়েম, কিন্তু কথা হবে খাঁটি ও নির্ভেজাল যাতে করে শ্রোতা যদি অন্তরঙ্গ হয় তাহলে চিকিৎসার প্রতিক্রিয়া যথাসত্বর দেখা দেবে। শির্‌ক সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ -

"আল্লাহ্ পাক একমাত্র শির্‌ক ব্যতীত আর সমস্ত গোনাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন।" [সূরা নিসা ঃ ১১৬ আয়াত]

কল্পনা পূজা ও সৃষ্ট জীবের পূজার হাত থেকে মানুষকে টেনে বের করবার জন্য যতখানি কোমল ব্যবহার করা দরকার করতে হবে। একটি গোটা শহর, একটি গোটা দেশকে হিকমতের সঙ্গেই কেবল আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়ে আসা যেতে পারে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন শুনতে পেলেন, সা'দ বিন'উবাদা (রা.) আবূ সুফিয়ানকে দেখে বলেছেন ঃ

اليم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم اذل الله قريشا -

(আজ সংগ্রামের দিন, আজ কা'বা প্রাঙ্গণে অবাধে রক্ত বইয়ে দেবার দিন, আল্লাহ্ পাক আজ কুরায়শদেরকে অপমানিত করেছেন) অমনি তিনি বলে উঠলেন ঃ না, সা'দ মিথ্যা বলেছে ঃ

اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا ويعظم الله الكعبة-

(আজ দয়া প্রদর্শনের দিন, আজ আল্লাহ্ কুরায়শদেরকে সম্মানিত করবেন এবং কা'বার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন) আর এই বলে তিনি সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর ঝাণ্ডা কেড়ে নিয়ে তা তাঁর পুত্রের হাতে তুলে দিলেন। পিতার পরিবর্তে পুত্র ইসলামী ঝাণ্ডা বইবার গৌরব লাভ করলেন। এই কর্মকৌশলদৃষ্টে আবূ সুফিয়ানের অন্তররাজ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আঁ-হযরত (সা.) যখন তার ঘরকে নিরাপদ বাসগৃহরূপে ঘোষণা দিলেন, তখন আবূ সুফিয়ানের শত্রুতা প্রেম ও বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হলো। এর থেকেই হিকমতের পরিমাপ করুন। আবূ সুফিয়ানকে যখন এবংবিধ সম্মানে সম্মানিত করা হলো তখন তাঁর

ঘৃণার আগুন নিভল এবং অন্তরের বদ্ধ দরজা খুলল। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, আমাদের বুযূর্গগণ যে পথ দিয়েই গেছেন তাওহীদের তাবলীগ, শির্ক ও বিদ'আত পরহেয করবার ওয়াজ করতে করতে গেছেন। আমাদের সেই কাফেলা যেখান দিয়েই অতিক্রম করেছে সেখানেই তাওহীদের বায়ু প্রবাহিত হয়েছে। হযরত সাইয়েদ আলী হামদানী, সাইয়েদ আবদুর রহমান বুলবুল শাহ প্রমুখ (র.) কাশ্মীরের নয়নাভিরাম পুষ্পোদ্যান ও মনোমুগ্ধকর ঝর্ণার প্রাচুর্য ও মন মাতানো সবুজ বৃক্ষশোভিত উপত্যকার সৌন্দর্য অবলাকনের জন্য আসেন নি, বরং তাঁরা ঊষর ধূসর মরু ও পার্বত্য এলাকা, কাঁটা ও ঝোপঝাড়ে পূর্ণ প্রান্তর ও উপত্যকারাজি অতিক্রম করে কেবল সত্যের কালেমা (কালেমা-ই-হক)-এর প্রচার ও প্রসার ব্যাপদেশেই এসেছিলেন যার নতীজায় আপনারা কাশ্মীরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাওহীদের অনুসারী হিসেবে আজ দেখতে পাচ্ছেন। আমি এ কথাগুলোই আর একটু বিস্তৃতি সহকারে জামে মসজিদের বক্তৃতায় বলেছিলাম। পত্রিকায় বেরিয়েছে, আমি নাকি সমস্ত কাশ্মীরীকেই মুশরিক বলেছি। ভাল, কোনরূপ বাছ-বিচার না করে এ ধরনের ঢালাও মন্তব্য করার কি অধিকার ছিল আর আমি মুসলমানদেরকে এক বাক্যে কিভাবে কাফির বলতে পারি? । আমার গোটা বক্তৃতাই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাওহীদের দাওয়াতে ভালোবাসা সৃষ্টি করুন। যে সমস্ত মতভেদ ও মতপার্থক্য রয়েছে—দাওয়াতের ভেতর সেসব টেনে আনবেন না। মতপার্থক্যগত বিষয়ে কোন একটিকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া আলাদা ব্যাপার। জ্ঞানের জগতে মতভেদ ও মতপার্থক্যের সুযোগ সব সময়ই রয়েছে। এসব পরে দেখা যাবে। আমাদের পয়লা বিবেচ্য বিষয় হলো তাওহীদ। আল্লাহ্র সামনে আমাদের মাথা নোয়াতে হবে। জ্ঞানগত ও পুঁথিগত মতপার্থক্য এর পরবর্তী বিষয়। বুযূর্গদের কাজ হলো সর্বত্র তাওহীদকে ছড়িয়ে দেয়া এবং শির্ক ও বিদ'আত দূরীভূত করা। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) তাঁর যুগের তরীকতের একজন বিখ্যাত বুর্যূগ ছিলেন। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। একজন আহলে হাদীস 'আলিম তাঁর হাতে বায়'আত ও মুরীদ হন এবং সালাতে রফা'য়াদায়ন (দুই হাত ওঠানো) পরিত্যাগ করেন। মাওলানা বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে বললেন ঃ আপনি যদি বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনার মত পাল্টে থাকেন এবং রফায়াদায়ন ছেড়ে থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তা না করে যদি আমার জন্য আপনি ছেড়ে থাকেন, তাহলে (জেনে রাখুন) আমি আপনাকে একটি সুন্নত পরিত্যাগের জন্য বলতে পারি না।

আপনাকে দেখতে হবে, আল্লাহ্র মাখলূক (সৃষ্ট জীব) কোথায় চলেছে? আর সবচে' বড় কথা হলো কুরআন ও হাদীসের তাবলীগ। আর এটাই দাওয়াত ও তাবলীগের মোদ্দা কথা হওয়া উচিত। মাযহাবী বৈশিষ্ট্য এর পরের বিষয়। মুসলমান সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু দ্বীনের জযবা ও প্রেরণা তা নেই যা পূর্বে ছিল। সাধারণ মুসলমানদের ওপর যদি কোন বিপদ দেখা দেয় তাহলে সবাই তার জন্য বুক পেতে দিন। খেয়াল রাখবেন কারো মনে আঘাত না লাগে, কেউ যেন কষ্ট না পায়। সব সময় উদার মন ও মানসিকতার প্রমাণ দিন। ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ ছড়াবেন না।

সাদিকপুরী ও গযনবী খান্দান ছিলেন উলামা-ই-আহলে হাদীস। মাওলানা বিলায়েত 'আলী, মাওলানা আহমাদ উল্লাহ, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী, মাওলানা আবদুর রহীম, মাওলানা সাইয়েদ আবদুল্লাহ গযনবী, মাওলানা আবদুল জব্বার গযনবীর মত দ্বীনদার ও আল্লাহ্প্রেমিক হযরত, যাঁদের চেহারা থেকে নূর ঝরে পড়ত, যাঁদের দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হতো, এসব খান্দানেরই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁরা সারা হিন্দুস্তান জুড়ে কিভাবে ওয়াজ-নসীহত ও হিকমত এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে যুক্তি ও প্রমাণপঞ্জীর সাহায্যে লোকের ঈমান ও আকীদার সংশোধন করেছিলেন।

অমৃতসরে নদওয়ার জলসা হচ্ছিল। হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত সব উলামায়ে কিরাম এতে শরীক ছিলেন। যুগটা ছিল আল্লামা শিবলী নু'মানী (রা.)-র। জনাব সদর ইয়ার জঙ্গ মওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীর মুখে শুনেছি, সকালে মওলানা আবদুল জব্বার সাহেব গযনবীর দরসে কুরআন হতো। বেশীর ভাগ তিনি ফারসীতে দরস দিতেন। একবার মওলানা শিবলী শরীক হন এবং মওলানা শেরওয়ানীকে বলেন ঃ যে সময় মওলানা আবদুল জব্বার আল্লাহ্র নাম নিতেন তখন দেহ ও মনের ভেতর এক ধরনের বিজলিবৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হতো এবং দিল্ চাইত তাঁর কদম মুবারকের ওপর মস্তক রেখে দিই।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)-এর খান্দান ছিল হিন্দুস্তানের ওপর এক বিরাট রহমতস্বরূপ। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রচলন ঘটিয়েছেন এবং শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করেছেন। কুরআনুল করীম তরজমা করবার কারণে তাঁদের ভীষণ বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্র বান্দারা কবে ও কখন দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে হকচকিয়েছেন? এ খান্দানেই শাহ আবদুল আযীয, শাহ আবদুর কাদির, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ ইসমাঈল, শাহ ইসহাক (র.)-এর মত উলামা-ই রব্বানী ও মুজাহিদীনে ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন। মওলানা ইসমাঈল

শহীদ (র.)-এর কেবল একটি ওয়াজেই এক জলসায় বিশজনের মত দেহজীবী মহিলা নেককার ও সতী-সাধ্বী রমণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার কিতাব 'কারওয়ানে ঈমান ও 'আযীমত' দেখুন।

বক্তৃতার শেষে জমঈয়তের প্রচার সম্পাদক সূফী মুহাম্মদ মুসলিম সাহেব ইকবালের যে কবিতা পাঠ করেছিলেন সেই কবিতার মাধ্যমে আমি আমার বক্তৃতার সমাপ্তি টানতে চাই। কেননা উক্ত কবিতার ভেতর বক্তৃতার রূহ এসে গেছে।

نگہ بلند، سخن دلنواز، جاں پرسوز

یہی ہے رخت سفر، میر کارواں کیلئے

"উন্নত দৃষ্টি, চিত্তের আনন্দদায়ক ভাষা ও হৃদয়োত্তাপ-এগুলো হলো সফরের উপকরণ কাফেলা সর্দারের জন্য।"

# আল্লাহর সাহায্যের পূর্বশর্ত ও ইসলামের সাহায্যের সোজা রাস্তা

[১৯৮১ সালের ৪ঠা নভেম্বর রোজ বুধবার তারিখে বিকেল ৪টায় আনজুমান-ই-নুসরাতু'ল-ইসলাম হলে লেখকের সম্মানে যে বিদায়ী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীনগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলিম-উলামা ও চিন্তাবিদদের সম্মুখে ভাষণটি প্রদান করা হয়।]

বা'দ হাম্‌দ সালাত ও খুতবা-ই- মাসনূনা!

জনাব সদ্‌রে আন্‌জুমান ও সদরে ইজলাস, উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ ও প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলি!

শ্রীনগরে এক সপ্তাহের অবস্থান অদ্যকার এ অনুষ্ঠানে শেষ হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি, এটা কেবল এক বিরাট সুযোগই নয়, বরং রীতিমত এক মহাসুযোগ। আমি পৃথিবীর বেশীর ভাগ বড় বড় দেশেই গিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি এমনই এক হতভাগা মুসাফির যার ক্ষেত্রে ইকবালের এই কবিতাংশটি অত্যন্ত সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে ঃ

تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں -

সফরে হোক বা ঘরে- কোথাও নেই এই পথিকের অবসর।

মুসলিম বিশ্বের যেখানেই আমি গিয়েছি সেখান থেকে হাসি-খুশী হয়ে ও পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসার পরিবর্তে এক রাশ চিন্তা নিয়ে ফিরে এসেছি। আমার ভাগ্যটাই এমনি। জানি না এটা আমার বর্ধিত তীক্ষ্ণ অনুভূতির কারণে, নাকি এজন্যে যে, আমি যেখানেই যাই সেখানে আমি আমার ইতিহাস অধ্যয়ন ভুলতে পারি না বলে। ইসলামের ইতিহাসে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেসব আমার চোখের সামনে থাকে এবং সে সব থেকে যে ফলাফল বের করা যায় আমার মস্তিষ্ক তা থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পায় না। স্বয়ং কুরআন মজীদ তাদের নিন্দা করেছে যারা চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা সত্ত্বেও তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ -

"আসমান ও যমীনে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে যার পাশ দিয়ে লোকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় আর তা থেকে তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না।"

[সূরা য়ূসুফ ঃ ১০৫ আয়াত]

আমি নিজেকে অত্যন্ত খোশনসীব মনে করতাম যদি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানানো হতো এবং আপনাদের সন্তোষ ও শান্তি বাড়িয়ে দেয়া যেত। আল্লাহ আপনাদেরকে যে সুন্দর ভূখণ্ড দান করেছেন, যে সম্পদ দিয়ে ভরে দিয়েছেন, যে সব প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনাদেরকে এখানে দান করেছেন, খুবই আনন্দের কথা হতো যদি আমি আপনাদেরকে বলতে পারতাম, আপনাদেরকে এসবের জন্য মুবারকবাদ! আপনারা নিশ্চিত থাকুন, চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু আমি তা বলতে পারলাম না। এর একটা বড় কারণ হলো কুরআন মজীদ সম্পর্কে আমার এক-আধটু পড়াশোনা। কুরআন মজীদ আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে পড়েছি যে, তা একটা জীবন্ত গ্রন্থ এবং সজীব চিত্র কিংবা দর্পণ যার ভেতর যে কেউ স্ব চেহারা দেখতে পারেন। যে কোন জাতিগোষ্ঠী ও তার সূরত দেখতে পারেন, দেখতে পারেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, সাম্রাজ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্থান-পতনের পরিণতিও এ গ্রন্থের ভেতর। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

"আমি তোমাদের নিকট এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যার ভেতর রয়েছে তোমাদের আলোচনা; তারপরও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না?"

[সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ১০ আয়াত]

ذكركم - এর তরজমা ও তফসীর করেছেন আরও অনেক মুফাস্‌সির عزكم ও شرفكم অর্থাৎ তোমাদের সম্মান ও তোমাদের মর্যাদা। কিন্তু এর পরিবর্তিত অর্থ হবে, এর ভেতর তোমাদের আলোচনা রয়েছে অর্থাৎ فيه حديثكم মোটকথা কুরআন মজীদে আমল, আমলের প্রতিদান ও বিনিময়ের বর্ণনা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিদান ও প্রতিশোধের বিধান পুরোপুরি বিদ্যমান। কুরআন মজীদ পরিষ্কার ঘোষণা করেছে ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ط مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ ـ

"তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে।" [সূরা নিসা ঃ ১২৩ আয়াত]

"মুসলমানরা! না তোমাদের ওপর কিছু নির্ভরশীল ও সীমাবদ্ধ আর না কিতাবীদের ওপর (যাদের বড় বড় দাবী রয়েছে–আমাদের আইন-কানুন তুলনাহীন)। আল্লাহ্‌র কানুন হলো ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ ـ

"কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে।" কমজোরির, অসতর্কতার, অলসতার, গাদ্দারী ও অবিশ্বস্ততার, বিশৃংখলার, মতভেদ ও মতানৈক্যের, কর্মহীনতার, বিত্ত ও সম্পদ পূজার, ক্ষমতা পূজার—সবার জন্য আল্লাহ্‌র এখানে একই পরিণতি, একই প্রতিদান অপেক্ষা করছে যার ভেতর কোন ব্যতিক্রম, রেয়ায়েত কিংবা পক্ষপাতিত্ব নেই। একথা কুরআন মজীদের কোথাও প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে, আবার কোথাও পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভেতর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর, সাম্রাজ্যের, বড় প্রবল পরাক্রমশালী শাসকদের আলোচনাও রয়েছে এবং দুর্বল লোকদের আলোচনাও রয়েছে এতে। এতেও আয়াত বর্তমান রয়েছে ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا ط وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ـ

"যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হতো তাদরেকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প ও যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।" [সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৭ আয়াত]

ঠিক এভাবেই অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَنُرِيْدُاَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْافِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ـ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ـ

"সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, ইচ্ছা করলাম তাদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা সেই শ্রেণীটি থেকে ওরা আশংকা করত।"

[সূরা কাসাস ঃ ৫–৬ আয়াত]

কুরআন মজীদ পৃথিবীর তাবৎ জাতিগোষ্ঠী, ঐতিহাসিক যুগ-যমানা জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়, বিভিন্ন যিন্দেগীর নানা ধরন ও নানান কিসিমের একটি জীবন্ত চিত্র ও প্রোজ্জ্বল স্বচ্ছ নির্মল দর্পণ। যার ইচ্ছা—তা ব্যক্তিই হোক কিংবা ব্যক্তির সমষ্টি জাতিগোষ্ঠী, জামা'আত হোক কিংবা আঞ্জুমান, বংশ কিংবা গোত্রের ভেতর স্বীয় চেহারা দেখে নিক এবং আপন স্থান নির্ধারণ করুক এবং নিজেদের সম্পর্কে তারা নিজেরাই ফয়সালা করে নিক, আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে। আল্লাহ্র সঙ্গে কারো কোন বিশেষ সম্পর্ক কিংবা আত্মীয়তা নেই। তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ -

"য়াহূদী ও খ্রিস্টান বলে, 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয়'; বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন'? না, তোমরা মানুষ তাদের মত যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা মায়িদা ঃ ১৮ আয়াত]

সরব ও উচ্চ স্বরে বলেছে, চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে য়াহূদী ও খ্রিস্টানেরা, আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। আমরা উন্নত সম্প্রদায়, আমরা সাধারণ মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর, আমরা আল্লাহ্র বংশধর, তাঁরই সন্তান, প্রিয় সন্তান। এর জওয়াবে আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে আল্লাহ্র প্রচলিত বিধান তোমাদের ক্ষেত্রে কি করে চলছে? সে বিধান তোমাদেরকে এতটুকু পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন কিংবা খাতির করে না কেন? তোমরাও আর পাঁচজনের মতই সাধারণ মানুষ।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ ও বন্ধুগণ!

আমি আপনাদের আন্তরিকতা ও ভালবাসা, আপনাদের প্রদত্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি। আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাই না। কিন্তু তার অর্থ এও মনে করি না, আমি আপনাদেরকে পরিতৃপ্ত করি এবং কিছু প্রশংসার ফুলঝুরি ছড়িয়ে চলে যাই। যখন কেউ কাউকে ভালবাসে তখন সে তার বন্ধুর বিপদ দেখলে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে, তার চেহারার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, চেহারার কুঞ্চন কিংবা সামান্যতম ভাঁজও তার সজাগ চোখ এড়িয়ে যায় না। তার নাড়ির স্পন্দন দেখে। সব সময় তার চেহারার প্রতি লক্ষ্য রাখে, আল্লাহ না করুন, সেখানে কষ্ট কিংবা দুশ্চিন্তার কোন ছাপ তো নেই! আমি আপনাদের সামনে

আরয করতে চাই, আপনারা খুবই নাযুক যুগ অতিক্রম করছেন। এই বাস্তব অবস্থাটি তুলে ধরবার জন্য আঞ্জুমান নুসরাতুল-ইসলাম থেকে উত্তম কোন প্লাটফরম আমি দেখছি না। এতে ইসলামেরই সাহায্য করা হবে। আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ আমাদের দু'আ লাভের হকদার। তাঁরা আমাদের জন্য এমন একটি মারকায কায়েম করেছেন যেখানে বসে ও যার মাধ্যমে আমরা ইসলামের সাহায্য করতে পারি। কিন্তু মনে রাখবেন, ইসলামের সাহায্য করার কাজটি খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং আপনাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি, কোন জামাত (দল), কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব কোন সম্মানিত বুযুর্গ এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না।

সুধীমণ্ডলি ও বন্ধুগণ!

হযরত 'আমর ইবনু'ল আস (রা.) যখন মিসর জয় করেন তখন পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল উন্নতি ও বিকাশের উত্তুঙ্গে। সবুজ ও শ্যামলিমার দিক দিয়ে মিসর ছিল কাশ্মীরের অনুরূপ। হযরত 'আমর (রা.) যে ভূখণ্ড জয় করেন তা সৌন্দর্য, খনিজ, পশু ও মানবীয় সম্পদে ছিল ভরপুর। একজন বিজয়ী সেনানায়কের পক্ষে যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি পাবার কথা তিনি তা পাননি। তিনি তো রসূল করীম (সা.)-এর সুহবত ও সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। কুরআন মজীদের চিন্তা, দূরদর্শিতা ও নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্যের বরকতই তাঁর চোখকেই নয়, তাঁর মন ও মগজকেও করেছিল আলোকিত। আল্লাহ পাক তাঁকে মু'মিনের অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন এবং ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি থেকে এক কদম বেশী সাহাবিয়াতের অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন। তিনি আরব মুসলমানদের লক্ষ্য করে যারা ছিল এদেশের বিজেতা ও শাসক- এমন একটি মূলবান কথা বলেছিলেন যা সোনালী আঁখরে লিখে রাখার মত। তিনি বলেছিলেন ঃ انتم فى رباط دائم। দেখ এবং মনে রেখ, এখানকার উর্বর ভূখণ্ড, চিত্তাকর্ষক পরিবেশ ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, এখানকার সম্পদ ও সংস্কৃতি তোমাদেরকে যেন তাঁর ভেতর ডুবিয়ে না ফেলে এবং তোমরা যেন এ ভূখণ্ডে হারিয়ে না যাও। তোমরা যেন নিজেকে খুঁজে পাও, বাস্তব ও প্রকৃত সত্য খুঁজে পাও। আর তা কি? তা হচ্ছে ঃ انتم فى رباط دائم তোমরা সদা-সর্বদা একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ঘাঁটির পাহারায় নিয়োজিত আছ। তোমরা এটা মনে করো না, তোমরা কিবতী (মিসরের আদি অধিবাসী কিবতী সম্প্রদায়)-দেরকে পরাজিত করেছ এবং রোম সাম্রাজ্যের সর্বোত্তম এলাকা তোমাদের কব্জায় এসে গেছে। জাযীরাতুল আরব একেবারে কাছে এবং এখানে সার্বিক ব্যবস্থাপনা তোমরা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছ। এ

ব্যাপারে তোমরা যেন প্রতারিত না হও। انتم فى رباط دائم। তোমরা এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছ যে, চোখ বুজেছ কি মরেছ। এখানে সব সময় তোমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। তোমরা একটি পয়গামের বার্তাবাহী, তোমরা একটি দাওয়াত নিয়ে এসেছ; তোমরা একটি সীরাত, একটি জীবনাদর্শ ও জীবন-চরিত নিয়ে এসেছ। যদি দাওয়াতের ক্ষেত্রে তোমরা কোনরূপ অলসতা কিংবা গাফিলতির আশ্রয় নাও তাহলে তোমরা মারা পড়বে। তোমরা যদি নিজেদের সীরাত ও জীবনাদর্শ হারিয়ে ফেল যা তোমরা আরব থেকে বয়ে এনেছিলে, যা তোমরা নবীর কোল থেকে ও মারকায-ই-রিসালত মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নিয়ে এসেছিলে, তাহলে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে। যদি কখনো তোমরা মনে কর রুটি-রুযী কামাই করবার জন্য তোমরা এখানে এসেছ, তোমরা এখানকার উর্বর ভূখণ্ড থেকে, এখানকার শ্যামল সবুজ সৌন্দর্যের সমারোহ থেকে লাভবান হতে এখানে এসেছ, তোমরা যদি এখানকার আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মাঝে ডুবে যাও, আর তোমরা যদি এতটুকু অলসতার প্রশ্রয় দাও, তবে তোমাদেরকে কেউ করুণা দেখাবে না, তোমরা এভাবে বাঁচতে পারবে না।

আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে যে কথা একজন আরব সৈনিক, যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ছিলেন না, বলেছিলেন—সেই একই কথা যা আজও প্রযোজ্য। আজ বড় বড় মুসলিম দেশের ক্ষেত্রেও সেই কথা প্রযোজ্য, انتم فى رباط دائم-এর যিম্মাদারী আপনার, এ দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির। যে মুহূর্তে আরব উপদ্বীপ (জযীরাতুল আরবে) নও-মুসলিমদের ভেতর মুরতাদ হবার হিড়িক পড়ে গেল তখনও এ দায়িত্ব ছিল সবার। কিন্তু এ কথাও সত্য, দায়িত্বানুভূতি সবার এক নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকে আর এ পার্থক্যই একজন মানুষকে বড় করে তোলে এবং খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত করে, চিরস্থায়ী ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন মুসলিম জাহানের খলীফা। তিনি গর্জে উঠলেন ঃ انقص الدين وانا حى। দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর আমি বেঁচে থাকব? না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। কোন আপোষ নেই, সমঝোতা নেই। ধিক আমার জীবনে! যদি আমার সামনে ইসলামী শরীয়তের ওপর কাঁচি চালানো হয়, ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ ও হুকুম-আহকাম (বিধি-বিধান)-কে কাট-ছাঁট করা হয় এই বলে, নামায ঠিক আছে বটে, হজ্জও পালন করা চলে, রোজা! আচ্ছা তাও না হয় মেনে নেয়া গেল। কিন্তু যাকাত! না, ওটা মানা যাবে না। এভাবে দ্বীনের বিকৃতি সাধন করা হবে- আমারই জীবিতাবস্থায়! না, এ হতে পারে না। তাঁর ভেতর জিদ চাপল আর তারই প্রকাশ ঘটল উল্লিখিত ভাষায়। তিনি যুগের হাওয়া পাল্টে দিলেন, ইতিহাসের ধারা দিলেন বদলে। একজন মানুষের প্রখর

ইসলামী চেতনাবোধ ও জিদ, একজন মানুষের দায়িত্বানুভূতি পর্বতপ্রমাণ সমস্যার জটাজাল ছিন্নভিন্ন করে দিল। সে ইতিহাস বড় দীর্ঘ। রিদ্দার ঘটনা ও তার বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত রয়েছে। এখানে যে কথাটি আসল তা হলো হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কথা ঃ আমি বেঁচে থাকব আর দ্বীনের ওপর আঘাত নেমে আসবে? তা হয় না, হতে পারে না। রসূল আকরাম (সা.)-এর কাছ থেকে যে অবস্থায় দ্বীন আমি পেয়েছিলাম, সেই অবস্থায় দ্বীন থাকবে। সেখান থেকে একটি শব্দের , একটি বর্ণের হেরফের হতে আমি দেব না। কার্যত তিনি তাই করে দেখিয়েছিলেন।

সুধীমণ্ডলি!

আপনারা উলামায়ে কিরাম, শিক্ষিত সম্প্রদায়, জাতির নেতৃস্থানীয় আপনারাই। আপনাদের ভেতর বড় বড় বক্তা ও বাগ্মী রয়েছেন, আপনারা বিভিন্ন আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা এবং সে সবের স্তম্ভস্বরূপ। কাশ্মীরের আপনারা হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কসদৃশ। আপনাদের ফয়সালাই যে কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হিসাবে গণ্য হবে। আমার প্রথম কথা হলো, এই ভূখণ্ডে যেন ইসলাম কায়েম থাকে, আর এটা আপনাদের অপরিহার্য দায়িত্ব। কাল হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনবেন আর বরকতময় আল্লাহ বিচারাসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। রাসূল (সা.) আপনাদের পরিহিত কাপড়ের আঁচল কিংবা জামার কলার টেনে ধরে জিজ্ঞেস করবেন ঃ আল্লাহ পাক এই ভূখণ্ডকে ইসলামরূপ সম্পদ দানে ধন্য করেছিলেন। আওলিয়া-ই-কিরামকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদেরকে বিপদের মাঝে ঠেলে দিয়ে এই উপত্যকায় এসে পৌঁছেন, আল্লাহ্র কালাম ও পয়গাম সেখানকার অধিবাসীদেরকে পৌঁছান। এরপর আমরা ইসলামের রোপিত এই চারাটিকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে তুলি এবং শীঘ্রই তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। আর সেই বৃক্ষটি কয়েক শ' বছর সবুজ শ্যামল ও ফলবান বৃক্ষের আকারে ছায়া বিস্তার করে চলে। হাজার হাজার মসজিদ নির্মিত হয়, শত শত মাদরাসা ও খানকাহ কায়েম হয়, জলীলু'ল-কদর উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীন জন্ম লাভ করে। কিন্তু তোমাদের এতটুকু অলসতায় ও অসর্তকায় অথবা তোমাদের অনৈক্য ও বিশৃংখলার কারণে কিংবা তোমাদের অদূরদর্শিতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির ফলে ইসলামের এই বসন্ত কানন শীতেল ঋতুর শিকার হলো।

আমি স্পেনে গিয়েছি। সেখানে থেকে অন্তরে এক বিরাট আঘাত নিয়ে ফিরে এসেছি। আল্লাহই জানেন, কোন ভুলের কারণে সেই মানবপূর্ণ ভূখণ্ড, আওলিয়া ও আইম্মায়ে কিরামের কেন্দ্র ইসলাম থেকে মাহরূম হয়ে গেল! ইকবালের ভাষায় আজ তার অবস্থা হলো এই ঃ

اہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں -

"হায়! কয়েক শতাব্দী যাবত তোমার আকাশ-বাতাস, পাহাড়-প্রান্তর আযানশূন্য।"

ইতিহাস আমাদের বলে, ভুল এবং ভুলের শাস্তির ভেতর পরিমিতিবোধ থাকা জরুরী নয়, জরুরী নয় আনুপাতিক হার থাকার। কখনো দেখা যায়, ভুল ছোট কিন্তু তার শাস্তির বহর হয় বেশ বিরাট। এর কারণ অন্যবিধ হতে পারে। কতক সময় দেখা যায়, একটি ছোট সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে আর তার পরিণতিতে ভুগতে হয়েছে এক বছর নয়, শত শত বছর ধরে। পৃথিবীর বহু জাতিগোষ্ঠী ও দল ভুল করেছে এবং কোন বিশেষ মুহূর্তে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, আর তার শাস্তিতো ভোগ করেছে শতবর্ষব্যাপী। আপনারা স্পেনে ইসলামের অবনতির ইতিহাস ও তার কারণগুলো খুঁজে দেখুন, আপনারা জানতে পারবেন, আরব গোত্রগুলোর পারস্পরিক শত্রুতা, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও অনৈক্য অর্থাৎ রবী'আ ও মুদার, 'আদনানী ও কাহতানী এবং হেজাযী ও য়ামানীদের মতানৈক্যই ছিল এর বড় কারণ। যারা স্পেনের ইসলাম ও মুসলমানদের অবনতির কারণগুলো পর্যালোচনা করেছেন তারা বলেছেন, এর বড় কারণ হলো আদনান গোত্রের ও হেজাযী লোকেরা চাইত, স্পেনে ক্ষমতার বাগডোর থাকবে তাদের হাতে। তারা কখানো ইসলামের তাবলীগ ও প্রচার-প্রসারের দিকে এতটুকু মনোযোগ দেয় নি। তারা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে সরে গেছে যেখান থেকে মুসলিম রাষ্ট্র দূরপ্রতীচ্য (মরক্কো) ছিল নিকটবর্তী, উত্তর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা তারা করে নি। তারা নির্মাণ-শৈলী ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও মেধা ব্যয় করেছে, কিন্তু ইসলামের দৃঢ়তা বিধান, ইসলামকে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তররাজ্যে ঠাঁই করে দেবার এতটুকু প্রয়াস তারা নেয়নি। তারা আজ যারা প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, তারা আল-হামরা কেল্লা তৈরি করেছে, তারা কর্ডোভা মসজিদও বানিয়েছে, স্থাপত্য শিল্পে সারা বিশ্বে যার নমুনা মেলা ভার। কিন্তু এর পরিবর্তে তাদের আশেপাশের লোকদেরকে ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত করে তোলার দরকার ছিল, দরকার ছিল সম্মুখে অগ্রসর হবারও এবং য়ুরোপের দিকে অগ্রাভিযানের। কিন্তু তা না করে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি, সূক্ষ্ম শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্মাণ কর্মে লেগে গেল। কবিতা ও কাব্য-চর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ল। কোন কোন সময় ভুল খুব বড় ও সুদূরপ্রসারী পরিণাম ডেকে আনে। কখনো কোন জাতিগোষ্ঠী বিরাট বড় জুলুম করেছে। জুলুমদৃষ্টে যে কেউ বলত, পতনের আর বড় বেশী দেরী নেই, সিংহাসন গেল বলে। কিন্তু তা হয়নি, অথচ

একজন বিধবার আর্তনাদ ও কাতর চীৎকার এবং একজন য়াতীমের যন্ত্রণা-কাতর ফরিয়াদ সাম্রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টির কারণ হয়েছে।

পয়লা কথা হলো, যে কোন মূল্যে এখানে ইসলাম টিকিয়ে রাখতে হবে। এ আপনাদের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা আপনাদের জন্যও ভাল, মুসলিম বিশ্বের জন্যও ভাল আর ভাল হিন্দুস্তানের জন্যও। হিন্দুস্তানের অবস্থার দাবীও তাই, আপনারা আপনাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে টিকে থাকুন। হিন্দুস্তানে কেবল তখনই সত্যিকার ভারসাম্য কায়েম হবে, দেশ তখনই সম্মান পাবে এবং সু-সংহতি লাভ করবে যখন এখানে আপনারা নিজস্ব বৈশিষ্ট, নিজস্ব পয়গাম, নিজেদের শান্তিপ্রিয়তা, মানবপ্রীতি, গঠনমূলক মানসিকতা ও মেধাগত যোগ্যতা নিয়ে বেঁচে থাকবেন। যখন কোন সমস্যা এসে দেখা দেবে তখন আপনাদের বিচার্য বিষয় হবে, এ ভূখণ্ডের ইসলামী জীবনেবোধ ও বিশ্বাসের ওপর এর কি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পড়বে। কেবল এই নয়, এখানকার ইসলামী সভ্যতা, সমাজ জীবন ও এখানকার ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো যেন টিকে থাকে তাও আপনাদের দেখতে হবে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যা আমি দেখতে পাচ্ছি—আকীদার বিশুদ্ধতা রক্ষা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাওহীদী সম্পর্ক স্থাপন এবং তিনি ভিন্ন অপর কারুর সামনে মাথা নত না করবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ। এক্ষেত্রে যদি কোন প্রকার ঘাটতি ঘটে তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ঘাটতি দেখা দেবে। কুরআন মজীদে পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে, উম্মাহ কিংবা যে সম্প্রদায়ের তাওহীদী বিশ্বসের পার্থক্য দেখা দেবে তার শক্তির মাঝেও পার্থক্য এসে দেখা দেবে। শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হলো তাওহীদী 'আকীদা-বিশ্বাস।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ط وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ -

"আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র শরীক করেছে যার সপক্ষে কোন সনদ পাঠান নি। জাহান্নাম তাদের আবাস; কত নিকৃষ্ট জালিমদের আবাসস্থল!" [সূরা আল-ইমরান ঃ ১৫১ আয়াত]

এবং আরও বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ -

"যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা অর্পিত হবে; আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" [সূরা আ'রাফ ঃ ১৫২ আয়াত]

শির্ক দুর্বলতার কারণ সব সময় ছিল এবং থাকবে। سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছেন। বিষের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য, বিষ প্রতিষেধক (ترياق)-এর ভেতর রয়েছে আর এক ধরনের বৈশিষ্ট্য। পানির ভেতর রয়েছে একরূপ বৈশিষ্ট্য, আগুনের মধ্যে রয়েছে আর এক বৈশিষ্ট্য। আর তাওহীদের মধ্যে রয়েছে শক্তি, নির্ভয় ও ভীতিহীনতার বৈশিষ্ট্য। এজন্যই সবচে' বড় প্রয়োজন আকাইদের বিশুদ্ধতার। আল্লাহ্র সঙ্গে ইবরাহীমী, মুহাম্মদী ও কুরআনী তা'লীম মুতাবিক তাওহীদের সম্পর্ক সুস্থির করা দরকার। অতঃপর এ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। কারণ শয়তান সব সময় ওঁৎ পেতে থাকে আর সে সব সময় সুযোগ বুঝে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর চোর সেখানেই যায় যেখানে সম্পদ থাকে। আপনাদের কাছে তাওহীদ ও ঈমানরূপী সম্পদ রয়েছে, সেজন্য আপনারা বিপদমুক্ত নন। যারা এর সম্পদ ও নিয়ামত থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য কোন বিপদ নেই। আল্লাহ্র ফযলে আপনাদের কাছে এ নিয়ামত রয়েছে। আপনারা এ সম্পদ বাইরে থেকেও পেয়েছেন, ভেতর থেকেও পেয়েছেন। সেই নিয়ামত এখন এ ভূখণ্ডের অখণ্ড অংশে পরিণত হয়ে গেছে, এখানকার ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছে, পরিণত হয়েছে এখানকার জীবনের অংশে। কিন্তু এজন্য নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত বোধ করা উচিত হবে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টিকে আমি ভয় পাই তা হলো অনৈক্য ও বিশৃংখলা। এর ভেতরেও আল্লাহ পাক দুর্বলতার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন ঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبُوْا رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে; আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"

[সূরা আনফাল ঃ ৪৬ আয়াত]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, দেখ, পরস্পরে তোমরা লড়াই-ঝগড়া করো না; অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে, তোমাদের অটুট সংহতি লোপ পাবে। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য নিঃসন্দেহে জীবনের আলামত ও প্রয়োজন মাফিক এটা

হওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলে প্রতিটি মহল্লায় এক একটি পতাকা, প্রতিটি ঘরে ঘরে এক একটি ঝাণ্ডা, প্রতিটি জায়গায় এক একটি আঞ্জুমান হওয়া ঠিক নয়।

তৃতীয় কথা হলো, অধিকাংশ দুর্বলতার মধ্যে ও আকছার ভুলের ভেতর যে জিনিসটি পাওয়া যায় তা হলো, পার্থিব জগতের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা, সীমাতিরিক্ত সম্পদপ্রীতি। আমি কোন শেষ কথা বলছি না, কোন সাক্ষ্যও দিচ্ছি না। কিন্তু একথা অবশ্যই বলছি, দুনিয়ার ভালবাসা, টাকা-পয়সার প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণও অনেক বড় দুর্বলতার কারণ। যেখান থেকেই সম্পদ আসুক–আসতে দাও, যেভাবে আসে আসুক, যেভাবে মর্যাদা লাভ ঘটে ঘটুক, যে কোন উপায় ক্ষমতা লাভ করা যায় তা করা যাক, যেভাবে পদোন্নতি ঘটে ঘটুক, পদ লাভের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে হয় হোক, এসব আমার চাই-ই। কোনক্রমেই তা হাতছাড়া হতে দেয়া যাবে না, এ ধরনের মানসিকতা বড় মারাত্মক। আমি এ দ্বারা এ বলছি না, এগুলো সামাজিক স্বার্থের অনুকূল অথবা প্রতিকূল। তবে একথা অবশ্যই বলব–এগুলো ব্যাধির এক বিরাট বড় আলামত। এগুলোকেও বেশ ভয় করা দরকার।

চতুর্থত সংস্কৃতির খারাপ দিকগুলো, অপব্যয় ও অপচয়, প্রথা পূজা ও এসবের প্রতি বাড়াবাড়ি, সীমাতিরিক্ততা, গর্ব ও অহংকার—কুরআনুল করীম যেগুলো شرف ও بطر শব্দে অভিহিত করেছে।

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ -

"যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, তোমরা যেসবসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।" [সূরা সাবা ঃ ৩৪ আয়াত]

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ابَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ج فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً ط وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ -

"কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের দম্ভ করত! এগুলোই তো ওদের ঘরবাড়ী; ওদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।" [সূরা কাসাস ঃ ৫৮ আয়াত]

সংস্কৃতির অপব্যয়গুলো কমিয়ে দিন। এতদিন যেভাবে বিয়ে-শাদীতে হয়ে এসেছে, যেভাবে শাহী ঠাট-বাঁটের সঙ্গে ও টাকা-পয়সার দেদার লুটিয়ে আসা হয়েছে, আর সেভাবে নয়। এখন আর তার সময় নেই। একটু চোখ খুলুন, সময়টাকে জানতে চেষ্টা করুন এবং দরিদ্র মানুষের কথা একটু ভাবুন যারা কপর্দকশূন্য।

আরেকটি বিষয় হলো, চরিত্রে দৃঢ়তা থাকতে হবে। মানুষ যেন পারদের মত না হয়ে যায় যার কোন সময় স্থিরতা নেই; কখনো এদিকে আবার কখনো ওদিকে, কোন কিছুতেই স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা নেই। জাতিগোষ্ঠীর জন্য এও এক বিরাট মারাত্মক ব্যাধি। আপন চরিত্র ও কর্মাদর্শে দৃঢ়তা ও সংহতি সৃষ্টি করুন। একথা সাধারণভাবে আমি সমস্ত ভারতীয় মুসলমানকেই বলছি। আর কেবল অনারবদেরকেই বলছি না, আরবদেরকেও বলি। আলহামদু লিল্লাহ! যে সব বক্তৃতায় আমি আরবদেরকেও সম্বোধন করেছি, সেখানে এর সাক্ষ্য মিলবে। এসব বক্তৃতা একটি সংকলন গ্রন্থ হিসাবে العرب والاسلام। নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকারে মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে আপনারা তা দেখতে পারেন। এগুলো সাধারণ রোগ, প্রাচ্যের, এশিয়ার, বিশেষভাবে আমাদের মুসলমানদের।

তা আরেকটি জিনিস হলো, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা দূর করতে হবে, এক হতে হবে এবং তৃতীয় কথা হলো, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও সম্পদ-প্রীতির ওপর কিছুটা বাধা-নিষেধ আরোপ করা উচিত, এর মুখে লাগাম পরানো উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে, আর আমি মনে করি, মু'জিযাগুলের মধ্যে এও এক মুজিয়া যেগুলো হাদীসাকারে ও নবী করীম (সা.)-এর ইরশাদ আকারে সুরক্ষিত الدنيا رأس كل خطيئة। "দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা সব পাপের মূল কেন্দ্রবিন্দু—সমস্ত ভ্রান্তির গোড়া।" আপনারা দেখতে পাবেন, অমুক দুঃখজনক ঘটনা কেন ঘটল? কেন সে বিশ্বাসঘাতকতা করল, গাদ্দারী করল? সে তার জাতিকে বিকিয়ে দিল কেন? কেন সে তার দেশকে বিকিয়ে দিল? কেনই বা বিকিয়ে দিল সে তার সচেতন বিবেককে? এসবের গোড়ায় যে উত্তর মিলবে এক কথায় তা হলো দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা—এ ছাড়া আর কিছু নয়।

মুসলমানদের একটি সাধারণ দুর্বলতার দিকে আমি অঙ্গুলি সংকেত করতে চাই! এ দুর্বলতা কোন কোন এলাকায় (কতেক বিশেষ কারণে) অধিক পরিমাণেই পাওয়া যায়। আর তা হলো প্রয়োজনাতিরিক্ত আবেগ ও আতিশয্য। এ দুর্বলতা যেখানে ও যখনই ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং দলীয় ও আঞ্চলিক

স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় তা বড় বড় বিপদ ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ দ্বারা অসাধু উদ্দেশ্যবাদীরা অবৈধ ফায়দা লোটে। কতক নাদান দোস্তও অজ্ঞতাবশে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ইতিহাসের কতকগুলো জাতির বিপর্যয় ও দুঃখ-কষ্টের কারণও ছিল এই আবেগাতিশয্য উত্তেজনাপ্রবণতা ও মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব গ্রহণ। জনৈক কবি ঠিকই বলেছেন ঃ

چواز قومے یکے بےدانشی کرد
نه که راغرتے مانده مه را

কোন দলে কেউ যদি নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করে তবে এর পরিণাম থেকে কেউ রক্ষা পায় না।

অতঃপর এই নির্বুদ্ধিতা যদি দু' একজনের দ্বারা না হয়ে একটি বিরাট দল কিংবা জনসাধারণ কর্তৃক হয় তাহলে তা আরও ভয়াবহ, অপমানজনক, সুদূরপ্রসারী ফলাফল ও পরিণতির কারণ হয়। এই বাস্তব সত্যকেই প্রখ্যাত ও বিজ্ঞ আরব কবি মুতানাব্বী তাঁর কবিতায় বর্ণনা করেছেন ঃ

وخرم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمه العقاب ـ

"যে ভুল কোন জাতির নির্বোধেরা করেছে, তার ফলে গমের সঙ্গে এর পোকাও পেষাই হয়ে গেছে এবং ভুলের সঙ্গে জড়িত নয় এমন লোকদেরকেও সেই ভুলের মাশুল যোগাতে হয়েছে।"

যে সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠী দুনিয়ার বুকে বিরাট বড় কৃতিত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে অথবা ইতিহাসে যারা সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা কিংবা জনক হিসাবে অভিহিত হয়েছেন অথবা যারা সত্য-সুন্দর ধর্ম ও জীবন-দর্শনের পতাকা সমুন্নত করেছেন, স্বাভাবিক তথা প্রকৃতিগতভাবেই তারা সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, বিবেচনাসম্পন্ন ও উদারচিত্ত এবং একই সঙ্গে বীর বাহাদুর ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন। আর প্রথম দিককার মুসলমানরা তো এর সর্বোত্তম নমুনা ছিলেন! আমি একবার এক মজলিসে বলেছিলাম ঃ আমি এই কেবলই যখন এই শহরে প্রবেশ করছিলাম তখন দেখতে গেলাম, আমার কারের সামনে সামনে একটি ট্যাংকার যাচ্ছে। ট্যাংকারের পেছনে পরিষ্কার গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে, Highly imflameable অর্থাৎ অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। আমি বললাম, এটি পেট্রোলের পরিচয়জ্ঞাপক হতে পারে, বারুদের পরিচয় হতে পারে, কোনো জ্বালানি পদার্থের পরিচয়জ্ঞাপক হতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের পরিচয় তো হতে পারে না, সামান্য ছেঁদো কথায় জ্বলে উঠবে, হয়ে পড়বে উত্তেজিত এবং পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে কোনরূপ পরওয়া না করেই যা চাইবে করে

বসবে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক কিংবা সামঞ্জস্য থাকবে না—সরিষার পাহাড় নির্মাণ করবে (যার কোন স্থায়িত্ব নেই) এবং দোস্ত-দুশমন, দোষী ও নির্দোষ, সবল-দুর্বল, শিশু ও বৃদ্ধের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না! আবেগাতিশয্যের ও ঝোঁকের মাতালে কিছু করে ফেলা এক ধরনের বিপজ্জনক ব্যাধি যার চিকিৎসা করা তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন। আমাদের নেতৃবৃন্দ, দ্বীনের দা'ঈ, তা'লীম ও তরবিয়ত, ইসলাহ ও তাবলীগের কাজ যাঁরা করছেন, সত্বর তাঁদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।[১]

মহাত্মন!

আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমার কাশ্মীর অবস্থান ও আমার নগণ্য বক্তৃতার সমাপ্তি এমন একটি স্থানে এবং এমন একটি কেন্দ্র থেকে হচ্ছে যেখানে ইসলামের সাহায্য ও সহায়তা করবার জন্য একটি সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত, আন্তরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, বিশেষ করে আল্লাহ্‌র এক একনিষ্ঠ বান্দা মওলানা রসুল শাহ ইসলামের সাহায্যের ভিত্তি রেখেছেন। আল্লাহ পাক রোপিত এই বৃক্ষকে কবুল করেছেন, ফলবান করেছেন এবং করেছেন ছায়াদার।

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ - تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ ۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا -

"(সৎ বাক্যের তুলনা) উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায় যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রতিটি মওসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।" [সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৫ আয়াত]

এ বৃক্ষ আগেও ফল দান করেছে এবং এখন ফল দিচ্ছে আর আল্লাহ্‌র মঞ্জুর হলে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাশা, ভবিষ্যতেও এ বৃক্ষ ফল দিতে থাকবে। একে মযবুত করুন।

এই সঙ্গে আমি আমার বিনীত নিবেদন শেষ করছি। আশা করছি, আমার এ কথাগুলো আপনাদের মন ও মস্তিষ্কে অবশ্যই সংরক্ষিত থাকবে এবং সেসব লোকের স্মৃতিতে অবশ্যই থাকবে যারা এক্ষেত্রে কিছু করতে পারেন। তারা দুর্বলতার কারণগুলোর অপনোদন ঘটিয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য টেনে নামাতে ও তা ডেকে আনবার উপকরণ ও শর্তসমূহ পূরণ করতে এবং সে সব উপকরণ সংগ্রহের প্রয়াস নিন যাতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সাহায্য নেমে আসে।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِنْۢ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের ওপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া কেউ এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মু'মিনগণ আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করুক।"

[সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬০ আয়াত]

এই কথাগুলোর সঙ্গে আমি আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের জন্য, বিশেষ করে মওলানা মুহাম্মদ ফারূক, তাঁর সঙ্গী-সাথী, বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমার আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই দু'আ করছি, আর আপনারাও দু'আ করুন, আমার এই হাযিরার কোন একটি বাক্য যেন কবুল হয়, আল্লাহ্র নিকট এখনাকার কোন একটি পদক্ষেপও যেন কবুল হয়! এখানে যে সাত-আট দিন কাটালাম, তার ভেতরকার আরাম-বিশ্রাম ও চলাফেরা, এর অতিবাহিত মুহূর্তগুলোর ভেতর থেকে কোন একটি জিনিসও যেন কবুল হয় এবং আমার এখানে আসা কতকটা হলেও যেন সার্থক হয়, কল্যাণকর হয় এবং আমি আমার এই উপস্থিতির জন্য আল্লাহর নিকট যেন লজ্জিত না হই, আমি কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম আর কি করে আসলাম।

# ইলমের স্থান, মর্যাদা ও আলিমের দায়িত্ব-কর্তব্য

[নিম্নোক্ত ভাষণটি ১৯৮১ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখ কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানেই লেখককে সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করা হয়।]

জনাব চ্যান্সেলর (বি. কে. নেহরু, গভর্নর কাশ্মীর), প্রো-চ্যান্সেলর (শেখ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ, কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী), ভাইস চ্যান্সেলর (ড. ওয়াহীদ উদ্দীন মালিক), বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী, সুধীবৃন্দ ও মু'আয্যায হাযিরীন!

আমার বিশ্বাস, ইল্ম (জ্ঞান) একটি একক সত্তা যা ভাগ করা যায় না, করা যায় না বণ্টন। একে প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকের ভেতর ভাগ করা ঠিক নয়। আল্লামা ইকবাল যেমন বলেছেন ঃ

دلیل کم نظری قصہ جدید وقدیم -

'ইল্ম তথা জ্ঞানকে আমি এমন এক সত্য মনে করি যা আল্লাহ্‌র সেই দ্বীন যা কোন দেশ কিংবা জাতির মালিকানাধীন নয় আর এটা হওয়া উচিতও নয়। ইল্‌মের আধিক্যের মধ্যেও আমি একত্ব দেখতে পাই। সেই একত্ব হলো সত্যবাদিতা, সত্যানুসন্ধান, জ্ঞানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং তা পাবার আনন্দ। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি জনাব চ্যান্সেলর ও ভাইস-চ্যান্সেলর ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁরা তাঁদের শিক্ষা বিষয়ক সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে এমন একজন লোককে বাছাই করেছেন যার সম্পর্ক প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমি জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য-সাহিত্য-দর্শন—কোন ক্ষেত্রেই এ নীতির সমর্থক নই, যে তার য়ুনিফর্ম পরে আসবে সেই কেবল জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী। আর এটা মেনে নেয়া হয়েছে, যার শরীরে এই য়ুনিফর্ম থাকবে না কিংবা নেই, তার সঙ্গে না কথা বলা যায়, আর না তার কথাই শোনা চলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কাব্য ও সাহিত্যের ময়দানেও একই অবস্থা। যারা সাহিত্যের

পসরা সাজিয়ে বসবে না, সেখানে সাহিত্যের সাইন বোর্ড টাঙাবে না এবং আদবের (সাহিত্যের) য়ূনিফর্ম পরিধান করে সাহিত্য আসরে আসবে না তারাই বে-আদব (অ-সাহিত্যিক)। সাধারণ গণমানুষ ঐ সব জন্মগত কবি-সাহিত্যিকদের অপরাধ কখনো ক্ষমা করে নি যাদের দেহে সেই য়ূনিফর্ম দেখা যায় না কিংবা দুর্ভাগ্যজনকভাবে যাদের য়ূনিফর্মের ভাণ্ডার থেকে কোন য়ূনিফর্ম জোটে নি। আমি ইল্‌ম-এর পুনঃস্বাস্থ্য লাভোন্মুখিতা ও জ্ঞানের সজীবতার সমর্থক যার ভেতর আল্লাহ্‌র রাহনুমাঈ প্রতিটি যুগেই শামিল ছিল। যদি আন্তরিকতা থাকে, থাকে নিষ্ঠা ও সত্যিকার কামনা, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কার্পণ্যের কোন আশংকা নেই। তিনি অকৃপণ হস্তে দান করবেন।

মহাত্মন!

এ রকম একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ বিদ্যাপীঠের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে যা গগনস্পর্শী হিমালয় পর্বতের একটি শ্যামল-সবুজ সৌন্দর্য ঘেরা উপত্যকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই আমার সেই ঘটনা মনে আসছে যখন আরবের একটি শুষ্ক এলাকায় একটি পর্বতোপরি, যা না ছিল সমুন্নত আর না ছিল শ্যামল-সবুজ[১], প্রায় চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল এযার সেই "লওহ ও কলম"-এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যার ওপর রয়েছে জ্ঞান ও সভ্যতার, গবেষণা ও পর্যলোচনারও সৃষ্টিশীল রচনার বুনিয়াদ এবং যা ব্যতিরেকে এই মহান শিক্ষায়তনের জন্ম হতো না, এই বিস্তৃত গ্রন্থাগারের যার কারণে বিশ্বের সৌন্দর্য ও জীবনের মূল্য কদর উপলব্ধ হচ্ছে। এ দ্বারা আমি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার ঘটনাকেই বোঝাতে চাইছি, ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই আগস্টের কাছাকাছি সময়ে আরবের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর মক্কার নিকটবর্তী হেরা গুহায় যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তার শব্দগুলো ছিল এরূপ ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

---

১. আলোচক এখানে বলেছেন, সেই ভূখণ্ড ও সেই পাহাড় ছিল লতা-গুল্মহীন রুক্ষ, কিন্তু হাফীজ জলন্ধীর কী সুন্দরই না বলেছেন ঃ

نہ یہاں پر گھاس اگتی ہے نہ یہاں پر پھول کھلتے ہیں
مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں

"এখানে ঘাস মাটি ভেদ করে না, ফুলের কলিও ফোটে না এখানে, তথাপি আসমান নত শিরে এ ভূখণ্ডের সাথে মিলিত হয়।"

"পড় তোমার প্রভু প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক'[১] থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"

[সূরা আলাক, ১-৫ আয়াত]

বিশ্বস্রষ্টা তাঁর ওহীর এই প্রথম কিস্তিতে ও রহমতের বারিধারার প্রথম ছিটায়ও এই মূল সত্যের ঘোষণা প্রদানকে বিলম্ব কিংবা মুলতবী করে দেয়া হয়নি, 'ইল্‌ম তথা জ্ঞানের ভাগ কলমের সঙ্গে সম্পর্কিত। হেরা গুহার সেই একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার মাঝে, যেখানে একজন নিরক্ষর নবী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে দুনিয়াবাসীর হেদায়েতের জন্য পয়গাম নিতে গিয়েছিলেন এবং যাঁর অবস্থা ছিল, যিনি কলম চালনা করবার শিক্ষা নিজে শেখেন নি, লেখাপড়া সম্পর্কে যিনি আদৌ অবগত ছিলেন না। দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও এর নজীর মিলবে কি? মহত্ত্ব ও সমুন্নতির কল্পনাও কি ঠাঁই পাবে যে, এই নিরক্ষর নবীর ওপর একটি অক্ষরজ্ঞানহীন উম্মাহ্ ও একটি লেখাপড়ার জ্ঞানশূন্য ভূখণ্ডের মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো দূরের কথা, অক্ষর পরিচয়েরও যেখানে আম প্রচলন ছিল না) প্রথমবার ওহী নাযিল হচ্ছে 'ইকরা' দ্বারা যিনি নিজে লেখাপড়া জানতেন না। তাঁর ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে এবং এর ভেতর তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে 'পড়'। এর ভেতর তাঁকে ইঙ্গিতে বলে দেয়া হচ্ছে, আপনাকে যে 'উম্মাহ' দেয়া হচ্ছে তারা কেবল শিক্ষার্থীই হবে না, বরং তারা হবে জগদ্‌গুরু ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদাতা। তারা হবে বিশ্বের জ্ঞানের প্রচারক। আপনার ভাগ্যে যে যুগ পড়েছে সে যুগ নিরক্ষরতার যুগ হবে না, সে বন্য-বর্বরতার যুগ হবে না, সে যুগ মূর্খতার যুগ হবে না, জ্ঞানের সঙ্গে দুশমনীর যুগও সেটা হবে না; সে যুগ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ, হবে বুদ্ধিমত্তার যুগ, দর্শনের যুগ, নির্মাণের যুগ, মানুষকে ভালবাসার যুগ, সে যুগ হবে উন্নতি ও প্রগতির যুগ।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (সেই প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন)। সে যুগের বড় ভ্রান্তি ছিল এই, স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বিধায় জ্ঞান-বিজ্ঞান সোজা-সরল রাস্তা থাকে সরে গিয়েছিল। সেই ছিন্ন সম্পর্ক এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যখন

---

১. علق – সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। তফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন রক্তপিণ্ড। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানিগণ মাতৃগর্ভে মনুষ্য ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় বলেন, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বাণু মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা গর্ভ ধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। এই সম্পৃক্তি না ঘটলে গর্ভ ধারণ স্থায়ী হয় না। এই কারণে বর্তমান 'আলাক' শব্দের অনুবাদ করা হয় এমন কিছু যা লেগে থাকে।

জ্ঞানকে স্মরণ করা হয়েছে, তাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে তখন তারই সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে, জ্ঞানের আরম্ভ ও উদ্বোধন হতে হবে "প্রভু- প্রতিপালক" (রব)-এর নাম দিয়ে। আর তা এজন্য যে, মানুষের জ্ঞান–সে তো আল্লাহ্রই দেয়া, আল্লাহ্রই সৃষ্টি তা এবং তাঁরই নির্দেশনায় ও নির্দেশিত পথে এ জ্ঞান-সমান্তরালভাবে ও ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নতি করতে পারে। এ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক ও বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা যা আমাদের এ পৃথিবীবাসী নিজ কানে শুনেছিল, যা কেউ কল্পনা করতে পারত না। যদি তৎকালীন পৃথিবীর সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের দাওয়াত দেওয়া হতো যে, আপনারা অনুমান করুন, যে ওয়াহী নাযিল হতে যাচ্ছে, তার সূচনা কোন্ বস্তুর মাধ্যমে হতে পারে? তার ভেতর কোন্ সে জিনিস যাকে অগ্রাধিকার দান করা যেতে পারে? তবে সেক্ষেত্রে আমি যতটুকু বুঝি তাদের ভেতর একজন লোকও যারা সেই নিরক্ষর জাতিগোষ্ঠী, তাদের মেযাজ ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল, একথা বলতে পারত না, তা 'পড়' শব্দ দ্বারা সূচনা করা হবে।

এ ছিল এক বিপ্লবাত্মক দাওয়াত, জ্ঞানের সফর শুরু করতে হবে সেই মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর নির্দেশনাধীনে–আর তা এজন্য যে, এ সফর বড় দীর্ঘ, জটিল ও বিপদে পরিপূর্ণ। এখানে দিনে-দুপুরে কাফেলা লুট হয়, পদে পদে ভীতিপূর্ণ গভীর খাদ রয়েছে এখানে, রয়েছে গভীর নদী, প্রতি পদে রয়েছে সাপ ও বিচ্ছু। এজন্য এ পথে চলতে গেলে এমন একজন পরিপূর্ণ 'রাহবর'-এর প্রয়োজন যিনি এ পথের গভীর খাদ-খন্দক, প্রতিটি চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। আর প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পরিপূর্ণ রাহ্বর একমাত্র আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা–কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য নয়। গাড়ির সঙ্গে ঘোড়া জুড়বার নাম যে জ্ঞান, তা মানুষের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সে জ্ঞানও মানুষের উদ্দেশ্য হতে পারে না যদ্দারা কেবল পুতুল খেলাই চলে আর তাও কোন জ্ঞান নয় যা দিয়ে কেবল মানুষের মন ভোলানো যায়। একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেবার নাম জ্ঞান নয়, এক জাতির সঙ্গে অপর জাতিকে সংঘর্ষে জড়িয়ে দেবার নাম জ্ঞান নয়, কেবল উদরপূর্তি করা যায় কিভাবে তা শেখাবার নাম জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান কেবল ভাষার ব্যবহার শেখায় তাও কোন জ্ঞান নয়, বরং

اقرأباسم ربك الذى خلق - خلق الانسان من علق - اقرأوربك
الاكرم - الذى علم بالقلم - علم الانسان مالم يعلم -

"পড়, তোমার প্রতিপালক বড়ই মহিমান্বিত"; তিনি তোমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে, তোমাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে, কিভাবে অজ্ঞ ও অপরিচিত থাকতে পারেন?

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ। আপনারা কল্পনা করুন, মর্যাদা এর চেয়ে বেশী আর কে বৃদ্ধি করেছেন যে, হেরা গুহার সেই প্রথম ওহীও কলমকে বিস্মৃত হয় নি। সেই কলম যা সম্ভবত হাজার খুঁজলেও মক্কার কোন ঘর থেকে বেরিয়ে আসত না। আপনি যদি তালাশে বের হতেন—জানা নেই, হয়তো কোন ওয়ারাকা বিন নওফল[1] অথবা কোন 'কাতিব'[2] এর ঘরে পেতেন যিনি অনারব দেশ থেকে কিছুটা লেখাপড়া শিখে এসেছেন।

এরপর এক বিরাট বিপ্লবাত্মক ও অবিনশ্বর মূল সত্য তুলে ধরেছেন, জ্ঞানের কোন শেষ নেই। عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ মানুষকে শিখিয়েছেন এমন জ্ঞান যা সে আগে জানত না। বিজ্ঞান কি? টেকনোলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যা কি? মানুষ আজ চাঁদে যাচ্ছে। মহাশূন্য আমরা অতিক্রম করেছি। দুনিয়া আজ আমাদের মুঠোয়। এসব যদি عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-এর ভ্রূভঙ্গ ইঙ্গিত না হয় তাহলে তা আর কি হতে পারে?

মহাত্মন!

আপনারা আমাকে অনুমতি দিন জ্ঞানের উপত্যকার নগণ্য একজন মুসাফির হিসাবে কিছু পরামর্শ, কিছু অভিজ্ঞতার বিবরণ আপনাদের খেদমতে পেশ করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পয়লা কাজ হলো চরিত্র গঠন। ভার্সিটি এমন সব চরিত্র গড়ে তুলুক যা স্বীয় বিবেককে, আল্লামা ইকবালের ভাষায়, এক মুঠো বালির বিনিময়ে বিকিয়ে না দেয়। আজকের দর্শন ও নীতিশাস্ত্র মনে করে এ বাজারে সব কিছুর মূল্যই নিরূপিত ও নির্ধারিত রয়েছে। কোন জিনিস যদি স্বল্প মূল্যে খরিদ করা না যায় তাহলে বেশী দামে তা খরিদ করা হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সাফল্য ও সার্থকতা এই, সে চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখবে। সে এমন জ্ঞানী মানুষ সৃষ্টি করবে যে কখনই তার বিবেক বিক্রয় করে না, করতে পারে না। দুনিয়ার কোন শক্তি, কোন ধ্বংসাত্মক ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী দর্শন, কোন ভ্রান্ত দাওয়াত ও আন্দোলন কোন মূল্যেই যেন তাকে খরিদ করতে না পারে। ইকবালের ভাষায় ঃ সে যেন বলতে পারে পরিপূর্ণ আস্থা ও গর্বের সঙ্গে

کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں -
غلام طغرل وسنجر نہیں میں

১. নবী যুগের একজন আরব মনীষী যিনি তওরাত ও ইনজীলের বিরাট আলিম ছিলেন এবং হিব্রু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

২. আরবে লেখাপড়া জানা লোককে 'কাতিব' বলা হতো।

جمشید جہاں بینی مری فطرت ھے لیکن -
کسی جمشید کا ساغر نہیں میں

"দয়া তোমার, প্রতিভাশূন্য নই আমি, কোন তুগরিল ও সনজরের গোলাম নই আমি। পৃথিবী চষে বেড়ানো আমর স্বভাব, তবে কোন জমশীদের খেদমতগার নই আমি।"

দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যেন এমন সব যুবক বের হয় যারা নিজেদের জীবন ন্যায় ও সত্যের জন্য এবং 'ইল্‌ম ও হেদায়েতের জন্য কুরবানী দিতে তৈরি থাকে যারা কারুর জন্য ক্ষুধার্ত থাকতে যেন সেরূপ আনন্দ পায় যেমন আনন্দ পায় কেউ উদরপূর্তি করে খাবার ও ভোজনোৎসবের ভেতর। যাদের খুইয়ে দেবার ভেতর যে তৃপ্তি লাভ ঘটে যা কোন সময় কোন বস্তু লাভের ভেতর ঘটে না। যারা নিজেদের যৌবনের সর্বোত্তম সামর্থ্য, মস্তিষ্কের সর্বোত্তম যোগ্যতা এবং নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম উপহার যদ্দারা তাদের ঝুলি ভর্তি করে দেয়া হয়েছে, মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যয় করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এটা দেখতে হবে, সেগুলো উন্নত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক কতটা সংখ্যক তৈরি করতে পারছে! আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, এখন কোন দেশের কিংবা রাষ্ট্রের পক্ষে এতে গর্বের কিছু নেই যে, সেখানে বহু বড় ভার্সিটি রয়েছে। এ ধরনের সংকীর্ণতা এখন খুবই পুরনো হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, আগ্রহ, অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে, ইল্‌ম ও আখলাকের প্রসারের ক্ষেত্রে এবং অসৎ কর্ম, বদ আখলাকী, বর্বরতা ও পশুত্ব, বিত্ত-সম্পদ ও শক্তি পূজাকে রুখবার জন্য কতজন মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে! আপন জাতিগোষ্ঠী আত্মসচেতন, সভ্য ও বিবেকবান জাতিগোষ্ঠী হিসাবে গড়বার জন্য কত সংখ্যক যুবক বর্তমান আছে যারা নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও অগ্রগতি থেকে চক্ষু বন্ধ রেখে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদেরকে ওয়াক্‌ফ করে! প্রকৃত মাপকাঠি হলো কতজন যুবক এমন আছে যারা দুনিয়ার সমস্ত আরাম-আয়েশ ও উন্নতি থেকে নিজেদের চোখ ফিরিয়ে রেখে কোন নির্জন কোণে বসে জ্ঞানের চর্চা করছে, করছে গঠনমূলক কোন কাজ।

বাস্তব সত্য হলো, সাহিত্য, কাব্য, সূক্ষ্ম শিল্প চর্চা, বিজ্ঞান ও দর্শন, রচনা ও সংকলন- সব কিছুর উদ্দেশ্য হলো, দেশ ও জাতির মধ্যে একটি নতুন জীবন ও প্রাণ স্পন্দন সৃষ্টি হোক এবং তা যেন মরীচিকা কিংবা হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা অগ্নিশিখার মত না হয়। এ মুহূর্তে আমি এ সত্যের একজন মুখপাত্র ডক্টর

মুহম্মদ ইকবালের সেই কবিতা পাঠ করব যা তিনি যদিও কোন সাহিত্যিক কিংবা কবিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন সমভাবে সবার প্রতি প্রযোজ্য ঃ

اے اهل نظر ذوق نظرخوب هے ليكن۔
جوش كى حقيقت كونه ديكهےوه نظر كيا
مقصود هنر سوز حيات ابدى هے
يه ايك نفس يادونفس مثل شرركيا
شاعر كى نوا هو كه مغنى كا نفسى هو۔
جس سے چمن افسرده هو وه باد سحر كيا

হে দৃষ্টিমান! দৃষ্টিদক্ষতা আছে বটে, তবে কোন বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য না দেখতে পেলে সেই দৃষ্টিই বা কী লাভের?

উদ্দেশ্য হলো চিরন্তন জীবনের জ্ঞান লাভ,
একটা বা দুটো স্ফুলিঙ্গ কণা দিয়ে কী লাভ?
কবির কণ্ঠ হোক বা গায়কীর আওয়াজ
বাগান যদি নির্জীব হয়ে পড়ে তবে ভোরের হাওয়ায় কী লাভ?

সুধীমণ্ডলি!

পরিশেষে আমি আমার সেসব ভাইকে কিছু বলতে চাই যারা এখান থেকে সনদ নিয়ে যাচ্ছেন অথবা সেসব খোশনসীব বন্ধুদের যারা জ্ঞানের এই কুসুম কাননে বিনীত পদচারণায় মত্ত। আমি আমার কথা বলতে গিয়ে (তা কিছু নীরস ও গম্ভীর প্রকৃতির হবে) একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর আশ্রয় নেব যা সম্ভবত আপনাদের কানের স্বাদ পরিবর্তনেও সাহায্য করবে।

কথিত আছে, একবার কতিপয় ছাত্র চিত্ত-বিনোদন ও খেলাধুলার নিমিত্ত একটি নৌকায় সওয়ার হয়। তারা ছিল আনন্দোৎফুল্ল। সময়টা ছিল সুন্দর ও আনন্দদায়ক। মৃদুমন্দ হিমেল বাতাস বইছিল। তেমন কোন কাজও ছিল না। অতএব, এসব নবীন ছাত্র আর কতক্ষণই বা নিশ্চুপ থাকতে পারে! মূর্খ মাঝি ছিল তাদের চিত্তাকর্ষণের বেশ ভাল মাধ্যম। চৌকস ও বাকপটু এক তরুণ মাঝি সম্বোধন করে বলল ঃ

"চাচা মিঞা! আপনি লেখাপড়া কি শিখেছেন?"

উত্তরে মাঝি বলল, "জী! লেখাপড়া আমি কিছুই শিখি নি।"

ছেলেটি ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আরে! আপনি বিজ্ঞান পড়েন নি?"

মাঝি বলল, "আমি তো ওর নামও শুনি নি!"

অপর একজন ছাত্র বলল, "জিওমেট্রি ও বীজগণিত সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই জানেন?"

মাঝি ঃ এসব নাম আমি এই নতুন শুনলাম হুযুর!

এবার তৃতীয় ছেলেটি ফোঁড়ন কাটল, "যা-ই হোক, আপনি ভূগোল ও ইতিহাস নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন?"

মাঝি বলল, "স্যার! আপনি শহরের নাম কইলেন, না কোন মানুষের নাম কইলেন, কিছুই বুঝলাম না!"

মাঝির এই উত্তরে ছেলেরা আর হাসি সম্বরণ করতে পারল না। তারা হো হো শব্দে হেসে উঠল। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল,

"চাচা মিঞা! আপনার বয়স কত হবে?"

মাঝিঃ এই বছর চল্লিশেক হবে!

ছেলেটি বলল ঃ আপনি আপনার জীবনের অর্ধেকটাই মাটি করলেন, কিছুই লেখাপড়া শিখলেন না?

মাঝি বেচারা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগল এবং অপরাধীর মত নীরব হয়ে রইল। এরপর মজা দেখুন। নৌকা কূল থেকে কিছু দূর অগ্রসর হতেই মেঘ ক্রমান্বয়ে ভারী হয়ে উঠল এবং ঝড় উঠল। নদীর বুকে শুরু হলো ঢেউয়ের দাপাদাপি। সব কিছু গ্রাস করবার মতলব নিয়ে একটার পর একটা উত্তাল তরঙ্গ ছুটে আসতে লাগল। নৌকার তখন টাল-মাটাল অবস্থা। এই এখন ডোবে, তখন ডোবে অবস্থা আর কি! নদীর বুকে ছেলেগুলোর এ ছিল পয়লা ভ্রমণ বিধায় এ ধরনের অভিজ্ঞতাও তাদের এই প্রথম। বাঁচবার সকল আশা-ভরসাই গেল তাদের খতম হয়ে। হতাশায় তাদের চেহারা গেল বিবর্ণ হয়ে।

এবার মূর্খ মাঝির পালা। সে বেশ গম্ভীর স্বরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়েরা! এবার তোমরা বল দেখি, কি কি লেখাপড়া তোমরা শিখেছ?" ছেলেগুলো কিন্তু এই সোজা সরল মাঝির প্রশ্ন আদৌ বুঝতে পারে নি। তারা স্কুল-কলেজে অধীত বিদ্যার এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করতে শুরু করল। ফিরিস্তি শেষ হতেই মাঝি মুচকি হেসে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে, সব কিছুই তো পড়েছ, শিখেছও অনেক। কিন্তু সাঁতারটাও কি শিখেছ? আল্লাহ্ না করুন, যদি নৌকা ডুবে যায় তাহলে কূলে পৌঁছবে কী করে?"

ছেলেদের ভেতর কেউই সাঁতার জানত না। তারা খুবই দুঃখের সঙ্গে জওয়াব দিল, "চাচাজান! এই একটা বিদ্যাই কেবল আমরা শিখি নি। এটাই কেবল আমাদের অজানা রয়ে গেছে।"

ছেলেদের উত্তরে মাঝি জোরে হেসে উঠল এবং বলল. "মিঞা! আমি তো আমার অর্ধেক জীবন খুইয়েছি, কিন্তু তোমরা তা দেখছি জীবনের গোটাটাই বরবাদ করেছ। কেননা আজকের এই মহাতুফানে তোমাদের ঐ লেখাপড়া কোনই কাজ দেবে না। আজ কেবল সাঁতার, হ্যাঁ, কেবল সাঁতার জ্ঞানই তোমাদের জীবন বাঁচাতে পারত, অথচ তাই তোমরা জান না!"[১]

আজও পৃথিবীর বড় বড় উন্নত দেশের যারা বাহ্যত দুনিয়ার কিসমতের মালিক সেজে বসে আছে, অবস্থা এই যে, জীবন নৌকা তাদের পানির ওপর ভাসছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ খুনী হাঙ্গরের ন্যায় মুখ ব্যাদন করে অগ্রসর হচ্ছে। উপকূলভাগ দূরে কিন্তু বিপদ নিকটবর্তী। নৌকার সম্মানিত ও যোগ্য আরোহীরা সব কিছুই জানে, জানে না কেবল নৌ-চালনা বিদ্যা ও সন্তরণ জ্ঞান। অন্য কথায়, তারা সব কিছু শিখেছে, কিন্তু ভাল মানুষ, শরীফ ও ভদ্র, আল্লাহ্র পরিচয়ে পরিচিত মানব দরদী ও মানব প্রেমিক মানুষের মত জীবন যাপনের শাস্ত্রই কেবল সে শেখেনি। আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতায় এরূপ নাযুক অবস্থা এবং এই অত্যাশ্চর্য ও বিরল বৈপরীত্যের ছবি এঁকেছেন—বিংশ শতাব্দীর সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিই কেবল নয়, সমাজও যার শিকার ঃ

ڈھونڈ ھنے والا ستاروں کی گذرگاھوں کا۔
اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا
اپنی حکمت کے خم وپیچ میں الجھا ایسا۔
اج تگ فیصلہ نفع وضرر نہ کرسکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا۔
زندگی کی شب تاریگ سحر کر نہ سکا

"নক্ষত্রপুঞ্জের যাত্রা পথের অনুসন্ধানী, স্বীয় চিন্তার জগতে ভ্রমণ করতে পারল না।

"স্বীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল মার-প্যাঁচে এমনই আটকে গেছে যে, অদ্যাবধি সে লাভ-ক্ষতির ফয়সালা করতে পারল না;

---

১. লেখকের منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین নামহ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

"যারা সূর্য শিখাকেও বন্দী করেছিল, জীবনের অন্ধকার রাত্রি তারা অতিক্রম করতে পারল না।"

ভদ্রোচিত মনুষ্য জীবন অতিবাহিত করবার মৌলিক শাস্ত্র, আল্লাহ-ভীতি, মানবপ্রেম, আত্মসংযমের সাহস ও যোগ্যতা, ব্যক্তিস্বার্থের ওপর সামাজিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দানের অভ্যাস, মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা, মানুষের জান-মাল ও ইয্যত-আব্রু হেফাজত করবার প্রেরণা, অধিকার দানের দাবী ওঠার সঙ্গে দায়িত্ব সম্পাদনার প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান, কমজোর ও মজলুম মানুষের প্রতি সমর্থন ঘোষণা ও তাদের হেফাজত এবং জালিম ও সবলের সঙ্গে লড়াইয়ে নামার উৎসাহ সে সব মানুষের সঙ্গে যাদের নিকট বিত্ত-সম্পদ ও পদমর্যাদা ব্যতিরেকে আর কোন সম্পদ নেই, নিষ্কম্প ও ভীতিহীনতা সর্বক্ষেত্রে, এমন কি আপনজন ও আপন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হলেও সত্য কথা বলার মত সাহসকিতা, আপন ও পরের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির পাল্লা আঁকড়ে ধরা, কোন বিজ্ঞ ও অদৃশ্য শক্তির তত্ত্বাবধানের প্রতিনিধিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর সামনে জওয়াবদিহির অনুভূতি ও হিসাব-নিকাশের আশংকা, এগুলোই সঠিক, মনোরম, নিরাপদ ও কামিয়াব যিন্দেগী অতিবাহিত করবার বুনিয়াদী শর্ত এবং একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ, একটি শক্তিশালী, নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সম্মানজনক রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রয়োজন ও তার নিরপত্তার গ্যারান্টি। এর শিক্ষা ও এর জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বপ্রথম দায়িত্ব এবং এর অর্জন শিক্ষিত বংশধর ও রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের পয়লা কর্তব্য। আমাদেকে এ সকল ক্ষেত্রে দেখতে হবে, এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের পূর্ণতা সাধনে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা সফল ও সার্থক এবং এর সনদপ্রাপ্ত সুধী ও মনীষীবৃন্দ কতটা মুবারকবাদের যোগ্য আর ভবিষ্যতে এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলে আমরা কিরূপ দৃঢ়সংকল্প এবং এজন্য আমরা কি ব্যবস্থার কথা ভেবে রেখেছি।

পরিশেষে আমি আবার আপনাদের সম্মান, আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রেরণার জন্য শুকরিয়া আদায় করছি যা আপনারা এ পদক্ষেপ গ্রহণের মাঝ দিয়ে প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

# পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশে

[১৯৭৮-সালের ৬ই জুলাই থেকে ২৮শ জুলাই পর্যন্ত প্রায় মাসব্যাপী পাকিস্তান সফরকালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে দেয়া সম্বর্ধনা সভায় মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর ভাষণ]

# বিশ্ব মুসলিম কাফেলার মহান মুসাফির

[১৯৭৮ ইং-এর জুলাই মাসে পাকিস্তানের করাচীতে মক্কাভিত্তিক বিশ্ব ইসলামী সংস্থা রাবেতা আলম আল-ইসলামীর প্রথম এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনে ভারত থেকে আমন্ত্রিতদের অন্যতম ছিলেন মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী। সম্মেলন শেষে পাকিস্তান জাতীয় ঐকজোট (পি. এন. এ.)-র সেক্রেটারী জেনারেল ও কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী প্রফেসর আবদুল গফুর মাওলানার সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাবেতা সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। এ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মাওলানার সারগর্ভ ভাষণটি এখানে আমরা পাঠকবর্গের খিদমতে পেশ করছি।]

## হৃদয় থেকে হৃদয়ে

হাম্‌দ ও সালাতের পর।

সুধীমণ্ডলি! মওসুমের অবিরাম বর্ষণ উপেক্ষা করে আজকের এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আস্থা ও ভালবাসার যে স্নিগ্ধ পরশ আপনারা আমাকে উপহার দিয়েছেন সেজন্য আপনাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। মানুষের জীবনে কখনো এমন দুর্লভ মুহূর্তও আসে যখন হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ ও ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য মনে হয় অপ্রতুল ও কিঞ্চিৎকর। লেখার জগতে আমি নবাগত নই। বক্তৃতার মঞ্চেও অনভ্যস্ত নই। তবু আমাকে অসংকোচে স্বীকার করতে হচ্ছে, আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে তেমনি এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আমি আচ্ছন্ন। কেননা জাতির মেধা ও হৃদয় এখানে সমবেত। সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্যাস এখানে উপস্থিত। আর তাদেরই সম্বোধন করে আমি কথা বলছি। এমন সময় ইচ্ছা হয় হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে যাক হৃদয়ের কাছে আর চলুক নীরব ভাব বিনিময়। কিন্তু তা বুঝি সম্ভব নয়! কেননা মানুষের বিজ্ঞান আজো এতটা উন্নতি লাভ করেনি যাতে আমার আওয়াজের সাথে হৃদয়ের স্পন্দনও আপনাদের কাছে অর্থময় হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সজীব হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহ্ প্রেমিকদের পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

এ ভাব-বিহ্বলতার কারণে হয়ত আমি আমার বক্তব্য সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাদের সামনে পেশ করতে পারব না। তবে আশা করি, হৃদয়ের দরদ ও আকুতি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারব।

প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভাষা নির্ধারণের ব্যাপারে গতকালও এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলাম। ভাবছিলাম উর্দুকেই অগ্রাধিকার দেব। কেননা ইসলামী উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ ভাষা বোঝে এবং এ ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সাথে সাথে বিবেক আমাকে সতর্ক করল। আমার নবী আমার কুরআনের ভাষা আরবীকে আমি কি কৈফিয়ত দেব? তাছাড়া রাবেতার দাফতরিক ভাষা হচ্ছে আরবী। আর রাবেতার মঞ্চে দাঁড়িয়েই আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে আরবীকেই আমি বক্তৃতার ভাষা হিসাবে গ্রহণ করলাম। তবে সেই আরবী বক্তৃতার শুরুতে উর্দু কবিতার একটি পংক্তিও আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। আপনাদের উপস্থিতিধন্য আজকের এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে ইচ্ছা হয় সেই কবিতাটি আবার বলি ঃ

লাখনৌর স্বনামধন্য কবি আমীর মিনাঈ কী সুন্দরই না বলেছেন ঃ

"আমীর ! মজলিস গুলযার করে বন্ধুরা জড়ো হয়েছে। এই সুযোগে তুমি তোমার হৃদয়ের ব্যথা উজাড় করে দাও। এ প্রাণবন্ত মজলিস হয়ত আর পাবে না।"

উপস্থিত সুধীবৃন্দ! ঐশী জীবন-দর্শনের আলোকে দুনিয়ার বুকে ইনসাফ, শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জিহাদী পতাকাবাহী উম্মাহ হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ভাগ্য নির্ধারণের একটি নাযুক মুহূর্তে এসেছিল সেদিন যেদিন উছমানী সাল্তানাতের জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা হতে যাচ্ছিল। মূলত উছমানী সাল্তানাতের ভাগ্য নির্ধারণের সাথে সাথে গোটা ইসলামী উম্মাহ্‌র ভাগ্যও সেদিন নির্ধারিত হয়েছিল। কেননা উম্মাহর ভাগ্যের সাথে তার জীবন-দর্শনের ভাগ্যও জড়িত থাকে। কোনটিই শূন্যে অস্তিত্ব লাভ করে না। মোটকথা, সময় ও ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশ্ব জাতিবর্গের মুকাবিলায় ইসলামী উম্মাহ তার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে কতটা সক্ষম হবে সে প্রশ্নের ফয়সালা একবার হয়েছিল উছমানী সালতানাতের বেদনাদায়ক মৃত্যুর দিনে। ইতিহাসের এক অনুরাগী পাঠক হিসাবে আমার বিশ্বাস, ইসলামী উম্মাহর ভাগ্য নির্ধারণের তেমনি আরেকটি মুহূর্তে আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত।

## সময়ের সন্ধিক্ষণে পাকিস্তান

পাকিস্তান আজ তার চলার পথের এক জটিলতম বাঁকে এসে উপনীত হয়েছে। ভাগ্যলিপিকার কলম হাতে এখন নির্দেশের অপেক্ষায়। জাতির জীবনে এমন অনেক মুহূর্তে আসে যে, দেখার চোখ থাকলে আমরা অবশ্যই দেখতে পেতাম ভাগ্যলিপিকার ঐশী ফয়সালার অপেক্ষায় কলম ধরে বসে আছে। আর আল্লাহ্‌র ফয়সালা নির্ভর করে জাতির চিন্তা ও কর্মের ওপর। সর্বশক্তিমান আল্লাহ

অবশ্য কারো মুখাপেক্ষী নন। তবে এটাই তাঁর চিরন্তন বিধান। জীবন গড়ার সংগ্রামে জাতির নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, অবিচলতা ও যোগ্যতার বিচারেই আল্লাহ্ পাক সে জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যত নির্ধারণ করে থাকেন। ভাগ্যের কতক অংশ পরিবর্তনশীল। চিন্তা ও কর্মের বিচারে এবং সময়ের ধারায় তার রদবদল হতে থাকে। আকায়েদ শাস্ত্রের ভাষায় এর নাম তকদীরে মু'আল্লাক—ঝুলন্ত তকদীর। দেখার মত চোখ যদি থাকে আর থাকে কুরআনের সুগভীর জ্ঞান, তাহলে সুস্পষ্টরূপেই এটা উপলব্ধি করা সম্ভব, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতির জীবনে এমন নাযুক মুহূর্তও আসে যখন ভাগ্যলিপিকার কলম ধরে বসে থাকেন আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায়। তখনকার একেকটি মুহূর্ত একেকটি শতাব্দী সমতুল্য এবং সেই মুহূর্তের একটি মাত্র বিচ্যুতি ভরাডুবি ঘটাতে পারে গোটা জাতির, জাতিসত্তার ও তার জীবন ভেলার। সুদূর অতীতে কোন পারস্য কবি বলে গেছেনঃ

"পায়ে বিঁধল কাঁটা, তুলতে গিয়ে হারালাম কাফেলার আভাস। ক্ষণিকের অসতর্কতা ভোগান্তি আনল শতাব্দীর।"

কবি তাঁর স্বভাব প্রতিভা, প্রখর মেধা ও সুদূরপ্রসারী কল্পনা শক্তির বদৌলতে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করে বসেন, তার কলমের কালি বেয়ে ঝরে পড়ে এমন সব রহস্যময় তত্ত্ব-কথা যার বাস্তব ও যথার্থ প্রয়োগ ক্ষেত্রই হয়ত তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে কোন কবির পক্ষেও সম্ভব হয় না তার বক্তব্যের সঠিক মূল্যায়ন। বহু শতাব্দী পর হয়ত আসে সে সময় যখন মানুষের চোখে সে কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, হয়ে ওঠে বিপ্লব, শক্তি ও আদর্শের উৎস। কাফেলার কোন মুসাফির পায়ের কাঁটা তুলতে গিয়ে কাফেলা হারিয়ে মরুভূমিতে নিসংগ হয়ে পড়েছিল—এমন একটি বাস্তব ঘটনা চোখে দেখে কবি তাঁর এই অমর কবিতা লিখেছিলেন এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। কল্পনার জগতে কবি নিশ্চয়ই কাফেলার কোন মুসাফিরের ক্ষণিক অসতর্কতা অবলোকন করেছিলেন। কিন্তু কোন্ সে কাফেলা আর কেই বা সেই মুসাফির? আমার মতে কবির কল্পনার সেই কাফেলা আর তার পিছিয়ে পড়া মুসাফির কিছুতেই পেতে পারে না এই অমর কবিতার উপহার। কবি হয়ত স্বপ্নেও ভাবেন নি, পৃথিবীর মানচিত্রে কোনদিন একটি দেশের জন্ম হবে, একটি শক্তির উন্মেষ ঘটবে। এক মুসাফির এসে শরীক হবে ইসলামী উম্মাহর জীবন কাফেলার পথ চলার যার নাম হবে পাকিস্তান। সে মুসাফিরের পায়ে লাগবে কোন ফাঁস (সে ফাঁসগুলো বিশেষভাবে আমি চিহ্নিত করব না; কেননা তা এই অমর কবিতার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে, তার অনবদ্য শিল্পরূপকে ধূলি মলিন করবে। সুতরাং তা নির্ণয়ের ভার রইল আপনাদের ওপর), আর সে ফাঁস খোলার জন্য থামতে গিয়ে মুসাফির পিছিয়ে পড়বে,

উম্মাহ্‌র জীবন কাফেলা থেকে। কবির কল্পনায় হয়ত এসব কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু সত্য, পাকিস্তান নামের এই মুসাফিরের গলায়ই শোভা পাবে সুদূর অতীতের নাম-না-জানা পারস্য কবির এই কাব্য-হার।

## ইসলামী কাফেলার মহান মুসাফির

ইসলামী উম্মাহ্‌র জীবন কাফেলায় পাকিস্তান এক মহান অভিযাত্রী। কাফেলার প্রথম সারির এক মুসাফিরের পায়ে কাঁটা বিঁধেছে কিংবা পথের কোন লতাগুল্মের ফাঁসে জড়িয়ে গেছে। এ জড়ানো ফাঁস খুলতে গিয়ে মুসাফির যদি অহেতুক বিলম্ব করে কিংবা ঢলে পড়ে নিদ্রার কোলে, তাহলে আশংকা, মুসাফির কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়বে আর হয়ে পড়বে ছত্রভংগ। এই মুহূর্তে আপনাদের ভুল ও নির্ভুল উভয় সিদ্ধান্তেরই প্রভাব পড়বে উম্মাহর ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে। আপনাদের সামান্যতম বিচ্যুতি গোটা ইসলামী উম্মাহ্‌র ভাগ্য বিপর্যয় ঘটাতে পারে। একটি মাত্র ভুল সিদ্ধান্তেই দু'এক শতাব্দীর জন্য উম্মাহ্‌র ভাগ্যের দুয়ারে ঝুলিয়ে দিতে পারে আরেকটি তালা, সেই সাথে হারিয়ে যেতে পারে সে তালা খোলার চাবি। উছমানী সালতানাতের বিলুপ্তির ফয়সালা ছিল তেমনি এক ভুল সিদ্ধান্ত। সুতরাং মনে রাখতে হবে, আপনারা আজ দাঁড়িয়ে আছেন এমন এক নাযুকতম স্থানে যেখানে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন সর্বাধিক। দুঃখের বিষয়, রাজনীতির অংগনে কুরবানী (আত্মত্যাগ) শব্দটির এত বেশী অপব্যবহার ঘটেছে যে, বর্তমান শব্দটি তার অন্তর্নিহিত ভাব ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। উম্মাহ্‌র জীবনে কুরবানী শব্দটি এক সময় ছিল শক্তি, আবেগ ও উদ্দীপনার এক অফুরন্ত উৎস। শ্রোতার দেহে অন্তরে এক সময় তা শিহরণ জাগাত। রক্তের কণায় কণায় আগুন ধরিয়ে দিত। কিন্তু কোন সেবামূলক কাজে একদিনের বেতন দানের মত সাধারণ ক্ষেত্রেও আজ আমরা কুরবানী শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে কুরবানী এমন এক পূত-পবিত্র আমল যার স্রোতধারা বিলীন হয় ইবরাহিমী কুরবানীর সাগরগর্ভে গিয়ে। ইবরাহিমী কুরবানীর সাথেই হলো তার ঐতিহাসিক যোগসূত্র। প্রতিটি জিনিসেরই বংশসূত্র রয়েছে। মসজিদের বংশ-সূত্রের গোড়ায় রয়েছে হযরত ইব্‌রাহীমী (আ.) নির্মিত আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফ। কাজেই যে মসজিদের বংশসূত্র ইবরাহিমী মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত নয় তা 'আল্লাহর ঘর' নাম পাওয়ার যোগ্য নয়, তা হলো মসজিদে যিরার, অকল্যাণের আঁখড়া। অনুরূপ যে বিদ্যাঙ্গনের বংশসূত্র মসজিদে নব্বীর 'সুফ্‌ফার' সাথে সম্পৃক্ত নয় তা 'ইল্‌মের লালন ক্ষেত্র নয়, তা হলো অজ্ঞতা ও মূর্খতার উর্বর ভূমি। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি বলতে চাই, যে কুরবানী ইবরাহীমী আবেগ প্রেম এবং ইসমাইলী আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের স্নিগ্ধতামণ্ডিত নয়, তা কুরবানী নাম গ্রহণের যোগ্য নয়।

## তিন প্রকার কুরবানী

উম্মাহ্‌র খিদমতে আপনাদেরকে আজ তিন প্রকার কুরবানী পেশ করতে হবে। আর প্রতিটি কুরবানীর জন্য আমাদের ইতিহাসে বিদ্যমান রয়েছেন একেকজন আদর্শ পুরুষ। প্রথম কুরবানীর দৃষ্টান্ত হলো ইয়ারমুকের মাঠে বিজয় লাভের পূর্ব মুহূর্তে সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কুরবানী। দ্বিতীয় প্রকার কুরবানীর দৃষ্টান্ত হলো উম্মতের বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের মহান লক্ষ্যে হযরত মু'আবিয়া (রা.)-র মুকাবিলায় হযরত হাসান (রা.)-র অনুপম কুরবানী। তৃতীয় প্রকার কুরবানীর দৃষ্টান্ত হলো উম্মাহকে ইসলামী চরিত্র ও নৈতিকতার পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশে স্বজন ও পরিবারের স্বার্থ বিসর্জন ও নিজের বিলাসী জীবনে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে প্রদত্ত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কুরবানী। এই ত্রিমুখী কুরবানীই হলো পাকিস্তানের কাছে আজ ইসলামী উম্মাহ্‌র দাবী।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কুরবানী আমাদের শিক্ষা দেয়, রণাঙ্গণে বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তেও সেনাপতিকে বরখাস্ত করা হলে অম্লান বদনেই তাকে মেনে নিতে হবে সে নির্দেশ। বরখাস্তের মুহূর্তে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের সেই অবিস্মরণীয় বক্তব্য অত্যন্ত গর্বের সাথে আজো ধারণ করে আছে ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস। অকুঞ্চিত ললাটে স্বর্গীয় প্রশান্তি নিয়ে সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.) বলেছিলেন, "আমার এ লড়াই ওমরের সন্তুষ্টির জন্য হলে এখন থেকে আর লড়ব না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হলে ওমরের এ নির্দেশের কারণে বিন্দু মাত্র ভাটা পড়বে না আমার জিহাদী জযবায়।" অবাক বিস্ময়ে দুনিয়ার জাতিবর্গ প্রত্যক্ষ করল আল্লাহ্‌র এ সাচ্চা প্রেমিক বান্দা আল্লাহ্‌র জন্যই লড়েছিলেন। তাই তাঁর জিহাদের গতি যেন হলো আরো তীব্র! শাহাদাতের জযবা হলো আরো উদ্দীপ্ত। পৃথিবীর ইতিহাস কি এর কোন নজীর পেশ করতে পারে? যুদ্ধের ময়দানে যে সেনাপতির উপস্থিতিই ছিল বিজয়ের প্রতীক, যাঁর একেকটি নির্দেশ মুজাহিদদের মনে সৃষ্টি করত উদ্দীপনার নতুন জোয়ার, আল্লাহ্‌র রসূল যাঁর মাথায় তুলে দিয়েছিলেন সায়ফুল্লাহ্‌র তাজ, তাঁর নামে ঠিক সেই মুহূর্তে মদীনা থেকে এল বরখাস্তের ফরমান যখন তিনি ইয়ারমুকের মাঠে রোমকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে বিভোর। ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে মুজাহিদরা শুনল, এখন থেকে খালিদ ইবন ওয়ালীদ আর ফওজের সিপাহসালার নন। কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালীদের মনে কোন ভাবান্তর নেই। নতুন সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দাকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে স্থির প্রত্যয়ের সাথে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ শাহাদতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমান উদ্দীপনায় লড়াই করে যাব আমি। কেননা আমার লড়াই আল্লাহ্‌র জন্য। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসে বলীয়ান

হযরত ওমরের মহান ব্যক্তিত্বের সামনেও ইতিহাসকে শ্রদ্ধাবনত হতে হয়েছে। আল্লাহ্র এ মহান বান্দা মুসলিম উম্মাহ্র অনাগত ভবিষ্যতের জন্য একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনের জন্য এমন বিপদসংকুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আমার মতে যুদ্ধের ইতিহাসে আর কখনো এমন ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ইসলামী উম্মাহ্র অন্তরে এ বিশ্বাস তিনি আরো দৃঢ়মূল করতে চেয়েছিলেন, আল্লাহ্র সাহায্যই মুসলমানের বিজয়ের পূর্ব শর্ত। ব্যক্তির প্রশ্ন এখানে গৌণ।

**জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিন**

আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় আরেকটি কুরবানী হলো জাতীয় স্বার্থের মুকাবিলায় ব্যক্তি, দল ও শ্রেণী স্বার্থকে বিসর্জন দান, এমন কি আমি এতদূর বলব, জাতীয় প্রয়োজনের নামে যে (অবাস্তব) পথ ও পন্থা আমরা গ্রহণ করেছি তার মুকাবিলায়ও (বাস্তব) জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা উম্মাহর কল্যাণের জন্যই দল ও জামাতের অস্তিত্ব অর্থাৎ উম্মাহ্র জন্যই দল, দলের জন্য উম্মাহ্ নয়। ভারতীয় জামাতে ইসলামীর আমীর মাওলানা ইউসূফ সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন। ভারতে মুসলিম পরামর্শ মজলিসের (مجلس مشاورت) প্লাটফরম থেকে বার বার আমি একথা বলেছি এবং এখনো আমি সেই একই বিশ্বাস পোষণ করি, উম্মাহর স্বার্থে প্রয়োজন হলে এক মুহূর্তে আমাদের সকলকে নিজ নিজ দলীয় ও শ্রেণীগত পরিচয় মুছে ফেলতে হবে এবং অন্যের অপেক্ষা না করে আমাকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। খালিদ ইবনে ওয়ালীদের জীবনেতিহাস আমাদের সে শিক্ষাই দেয়।

অনেক নামী-দামী ঐতিহাসিকও হযরত হাসান (রা)-এর কুরবানী ও আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তব বিচারে তা ছিল যে কোন আত্মত্যাগের তুলনায় মহীয়ান! তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নির্দ্বিধায় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত, হযরত হাসানের জন্য বিজয় ছিল শুধু সময়ের প্রশ্নমাত্র। কেননা তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম দৌহিত্র। হযরত আলী (রা.)-এর হাজার হাজার অনুগামীর তরবারি তাঁর সপক্ষে ছিল খাপমুক্ত। এছাড়া মুসলিম উম্মাহর আবেগানুকূল্য ছিল তাঁর অনুকূলে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মনোনীত খলীফায়ে রাশেদ। তাঁর হাতে বায়'আত অনুষ্ঠানও যথারীতি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখলেন, বর্তমান পরিস্থিতি উম্মাহর জন্য কল্যাণকর নয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই মহান পিতার অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় হয়ে গেছে শুধু গোলযোগ দমনের পেছনে। তাই মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে

দাঁড়ালেন তিনি। পক্ষান্তরে কুরবানীর ইতিহাসে তাঁরই প্রিয়তম অনুজ হযরত হুসায়নের কর্মকাণ্ডও ছিল এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর ছিল স্বতন্ত্র ইজতিহাদ। আমার মতে উভয়ের ইজতিহাদই ছিল নির্ভুল ও বাস্তবোচিত।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় উভয়ের ইজতিহাদে কোন বৈপরীত্য নেই। ঐতিহাসিক কার্যকারণ বর্ণনার এটা উপযুক্ত স্থান নয়। তবু আমি জোর দিয়েই একথা বলব, সময় ও পরিস্থিতি পরিবর্তনে সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন অপরিহার্য এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিচারে উভয়ের সিদ্ধান্তই ছিল নির্ভুল। ঈমান ও ইখলাসের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলায় তাঁরা উভয়ে ছিলেন অকুতোভয়। মুহূর্তের জন্য একথা আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত নই, দুর্বলতা কিংবা চাপের মুখে হযরত হাসান (রা.) খেলাফত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তো স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন।

"আমার এ পুত্র নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন। হয়ত বা আল্লাহ পাক তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুই বিবদমান দলের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেবেন।" [বুখারী]

এবার শুনুন হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীযের আত্মত্যাগ ও কুরবানীর কথা। রাজপরিবারের তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সদস্য। মদীনা অঞ্চলের প্রশাসক থাকাকালে তাঁর উন্নত রুচিশীলতা, কেতাদুরস্ত চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছেদ مشية العمرية বা 'ওমর স্টাইল' নামে অভিজাত মহলে ছিল সুপরিচিত। যুব সমাজে ওমর স্টাইলের ছিল সযত্ন চর্চা। বাজারের সেরা কাপড়ও এই বলে তিনি ফিরিয়ে দিতেন, এমন খসখসে কাপড় পরা সম্ভব নয়। কিন্তু খেলাফতের গুরুভার অর্পিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর জীবন ও চরিত্রে দেখা দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এক জরুরী নির্দেশ বলে নিজের ও স্বজনদের যাবতীয় জায়গীর ফিরিয়ে দিলেন বায়তুল মালে। বাজার থেকে একবার সবচেয়ে সস্তা কাপড় খরিদ করা হলো, কিন্তু তাও তিনি ফিরিয়ে দিলেন এই বলে, অত দামী কাপড় পরা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। এই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে তাঁর বিলাসী জীবনের খাদেম কেঁদে ফেলল। তার মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন সবচেয়ে দামী কাপড়ও তাঁর রুচি বিচারে নিম্নমানের বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। ঝুপড়িবাসী কোন দরবেশের পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব নয় এমনি সাধারণ পর্যায়ে নেমে এসেছিল তাঁর জীবনযাত্রার মান। সরকারী সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সর্তকতার অবস্থা ছিল, একবার জনৈক সাক্ষাতকারী আলোচনার ফাঁকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা শুরু করতেই তিনি সরকারী বাতি নিভিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত কুপি আনিয়ে নিলেন। কেননা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সরকারী বাতি ও তেল

ব্যবহার তাঁর মতে ছিল অন্যায়। এখানে কয়েকটি মাত্র নমুনা পেশ করা হলো। মূলত খেলাফত-পরবর্তী তাঁর গোটা জীবনই ছিল ত্যাগ ও করবানীর অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। এ মহান আদর্শেই আজ অনুপ্রাণিত হতে হবে পাকিস্তানের প্রতিটি ঈমানদার ও বিবেকবান ব্যক্তিকে।

### ইসলামী উম্মাহর ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্ন

জানি না এটা আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ না কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা! তবু আমি উপস্থিত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেই বলব, এ সভায় এমন কেউ নেই যিনি আমার মত এত বেশি ও এত নিকট থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌র অবস্থা অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। এটা আমার জন্য যেমন সৌভাগ্য, তেমনি দুর্ভাগ্যও বটে। সৌভাগ্য এজন্য, আমি আমার দেহের সব ক'টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছি। পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্য এজন্য, আমার দেখা ইসলামী বিশ্ব আমার হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে সৃষ্টি করেছে এক সুগভীর ক্ষত, আর প্রতিনিয়ত সেখান থেকে ক্ষরণ হচ্ছে টাটকা রক্তের।

আমার দীর্ঘ জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ও অধ্যয়নের নির্যাস হিসাবে বলছি, আজ প্রশ্ন দল, সংগঠন ও ক্ষুদ্র স্বার্থের নয়, আজ প্রশ্ন হলো ইসলামী উম্মাহ্‌র জীবন-মরণের, ভবিষ্যত ভাগ্য নির্ধারণের। হতে পারে ইবাদতসমূহের বাহ্যাকৃতি আজো অবিকৃত আছে। আদান-প্রদান ও লেনদেন সম্পর্কিত বেশ কিছু বিধি-বিধান আজো পালিত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশ্ব রাজনীতির পাল্লায় ইসলামী উম্মাহ আজ কোন ভার সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। বায়তুল মুক্কাদাস, ফিলিস্তীন, লেবানন ও তুর্কী-সাইপ্রাসসহ দেশে দেশে ঝরছে মুসলিম রক্ত। দলিত লুণ্ঠিত হচ্ছে আমাদের অধিকার। সাহসটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে আমাদের। উছমানী সালতানাতের মর্মান্তিক বিলুপ্তির পর ইসলামী উম্মাহর কোন দেশ, গোষ্ঠী বা শাসক পরিবারই ইসলামী উম্মাহর কোন ইস্যুর ওপর স্বাধীন মতামত পেশ করার এবং তা বাস্তবায়িত করার মত রাজনৈতিক অবস্থানে উপনীত হতে পারেনি। মরহুম ফয়সল অবশ্য কিছুটা সাহস দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সে 'পেয়ালা' গেছে ভেঙে আর 'সাকী'-ও হয়েছেন গত। ইসলামী বিশ্বে আজ এমন একটি দেশও নেই যার অসমর্থন, অসন্তুষ্টি কিংবা প্রতিবাদ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বৃহৎ শক্তিকে মুহূর্তের জন্য হলেও দ্বিধান্বিত করতে পারে। আপনারা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে পরিস্থিতির মুকাবিলা করুন। হিম্মত ও নির্ভীকতার সাথে সময়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন

সাহায্য প্রদত্ত হলে তার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করুন। যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হলে দল ও মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাকে এগিয়ে যাওয়ার এবং জাতীয় অঙ্গনে অবদান রাখার সুযোগ দিন। এটাই ঈমান, ইখলাস ও দেশপ্রেমের দাবী। মুসলিম উম্মাহর এ ভাগ্যরেখাগুলো সামনে রাখুন, এগুলো নিছক দেয়ালের লিখন নয়—তকদীরের সিদ্ধান্তমালা। আপনার সামান্য ভ্রান্তি, বিচ্যুতি, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা, আঞ্চলিক, ভাষাভিত্তিক কিংবা শ্রেণীভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার মত ঘৃণ্য মানসিকতা ইসলামী উম্মাহর জন্য বয়ে আনতে পারে ধ্বংসের ঝড়। আমি আবার বলছি, জাতীয় স্বার্থকে সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলুন। প্রয়োজনে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো কিছু দিনের জন্য হলেও বাক্সবন্দী করে রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় আলোচনা উসকে দিয়ে কাদা-ছোঁড়াছুড়ির অর্থ হলো আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করা। আমার স্থির বিশ্বাস, দু' একটি ধর্মীয় সংগঠন তাদের জন্মলগ্ন থেকে এই সর্তকতা অবলম্বন করলে তাদের চলার পথ আজ এতটা কন্টকাকীর্ণ হতো না। পদে পদে তাদের আন্দোলন হতো না ক্ষতিগ্রস্ত। তবে এও ঠিক, কোন মানবীয় প্রচেষ্টাই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আর মানুষ তার 'ইল্‌ম ও 'আকল তথা জ্ঞান ও বুদ্ধির গণ্ডিতেই আবর্তিত হয়ে থাকে।

### প্রয়োজন এক মু'তাসিমের

আমি আশা করি আমার বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মর্ম আপনারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এতটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর কাছে আমার আকুল প্রার্থনা, ইসলামী বিশ্ব ও বিশ্বমানবতার জন্য আপনারা হবেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত; ন্যায়, ইনসাফ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পৃষ্ঠপোষক। আপনারা হবেন ঈমান ও নৈতিকতার সেই মহাবলে বলীয়ান যা বাতিলের বিষ দাঁত দেবে ভেঙে। পৃথিবীর কোন সুদূর অঞ্চলের কোন অত্যাচারীর সাহস হবে না জুলুম অত্যাচারের থাবা বিস্তার করতে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, শত্রুর হাতে নির্যাতিতা মুসলিম মহিলার আর্ত চিৎকার وامعتصماه (কোথায় খলীফা মু'তাসিম) শুনে বাগদাদ থেকে ঝড়ের বেগে খলীফা মু'তাসিম ছুটে এসেছিলেন মজলুমের সাহায্যে আজকের মুসলিম উম্মাহর আর্তচিৎকার শুনে ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে যে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর, সেই সিংহপ্রাণ মু'তাসিমের অপেক্ষায়-ই প্রহর গুণছে ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষু ইসলামী জাহান। জানি না, আপনাদের মধ্যেই হয়ত ঘুমিয়ে আছে সেই মু'তাসিম।

আপনারা জেগে উঠুন। কা'বা ঘরের জন্য যেমন প্রয়োজন একজন সম্মানিত ইমামের, শরীয়তের জন্য যেমন প্রয়োজন প্রজ্ঞাবান আলিমের, ইসলামী বিশ্বের জন্য ঠিক তেমনি প্রয়োজন সত্যপন্থী, ন্যায়প্রেমিক ও মানবদরদী এক জামাতের, যাদের পুণ্য স্পর্শে ইসলামী জাহান আবার ফিরে পাবে প্রাণ। এ পর্যন্তই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সকলকে এই কষ্ট স্বীকারের জন্য ধন্যবাদ। প্রফেসর আবদুল গফুর সাহেবের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি এই সুন্দর সুযোগটুকু আমাকে দিয়েছেন। আমি নিজে কিংবা আমার পাকিস্তানী বন্ধুমহল চেষ্টা করেও হয়ত এত সহজে এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ্ পাক সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন!

# জাতীয় ঐক্য ও দাবী

[হামর্দদ ন্যশনাল ফাউন্ডেশনের সভাপতি হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ সাহেবের উদ্যোগে করাচী ইন্টারকন হোটেলে ১৩ ই জুলাই অনুষ্ঠিত 'হামর্দদ সন্ধ্যা' প্রদত্ত ভাষণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ সাহেব পরিচিতিমূলক স্বাগত ভাষণ দান করেন এবং অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাবেতার সদস্য মাওলানা জামাল মিঞা সাহেব। উক্ত মার্জিত সুধী মাহফিলে সমাজের সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। আগ্রহী শ্রোতাদের একাংশ এ বক্তৃতা শোনার জন্য দূরদূরান্ত সফর করে এসেছিলেন।]

হামদ ও সালাতের পর!

## ঐক্য শব্দের আকর্ষণ শক্তি

উপস্থিত সুধীমণ্ডলি! মান্যবর হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ সাহেবের প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কেননা তিনি আমাকে এক মনোরম পরিবেশে, মার্জিত সমাবেশে কথা বলার ও মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। এক নবাগতকে (যার অবস্থানের মেয়াদ খুবই সীমিত এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে যার পরিচয়ের সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ) সে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নির্বাচিত এই সমাবেশে কথা বলার সুযোগ করে দেয়া বাস্তবিকই একটা বড় ধরনের অনুগ্রহ। অবশ্য ভাব ও ভাবনার উচ্ছ্বাস, আবেগের উদ্বেলতা ও কৃতজ্ঞ চিত্তের বিহ্বলতার মাঝেও আমার এ অনুভূতি রয়েছে যে, এ সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আগন্তুক মেহমানের পবিত্রতম দায়িত্ব। আল্লাহ্ আমাকে সে তাওফীক দান করুন!

বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাকীম সাহেব যে প্রজ্ঞা ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা না করে উপায় নেই। দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ, পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহ-অবিশ্বাসের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ও সমস্যার হাজারো কাঁটাবন পাড়ি দিয়ে নতুন সমস্যার আবর্তে নিক্ষিপ্ত একটি দেশের ভবিষ্যত পথ-নির্দেশনার জন্য এমন একটি বিষয় নির্বাচন সত্যি প্রশংসনীয় প্রজ্ঞা ও বাস্তববোধের পরিচায়ক।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় শব্দসম্ভারে 'ঐক্য' হলো শ্রুতিমধুর এক প্রিয়তম শব্দ যার উচ্চারণেও হৃদয়ে জাগায় এক অপূর্ব আবেগ শিহরণ। ঐক্যের প্রতি রয়েছে মানুষের সহজাত প্রেম। কেননা এটা তার হৃদয়ের আকুতি, তার বিবেকের দাবী,

তার সৃষ্টিকর্তার পছন্দ। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে বাস করতে হবে মানুষের দুনিয়ায়। নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে সে। সেই প্রতিভার পরশে সাজাবে পৃথিবীর বাগিচা। সে বাগিচার ফলে-ফুলে, রসে-গন্ধে ভরে উঠবে তার জীবন। আর সেজন্য প্রয়োজন একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার পারস্পরিক ঐক্য সংঘটনের।

## ঐক্যে ঐক্যে সংঘাত

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস বলে এ পর্যন্ত সকল মানবীয় ঐক্য নির্মাণের তুলনায় ধ্বংসের ভূমিকাই পালন করেছে বেশী অর্থাৎ ঐক্য তার স্বভাব, প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত চাহিদার বিপরীত কর্মই করেছে। ঐক্যের অন্তর্নিহিত মর্ম ছিল পারস্পরিক প্রেম ও সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনা এবং বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু পরিবর্তে দেখা দিল ঐক্যের সাথে ঐক্যের সংঘাত। সভ্যতার সাথে পাশবিকতার কিংবা শক্তির সাথে শক্তির সংঘাত খুবই স্বাভাবিক। ঐক্যের সাথে তো ঐক্যের সংঘাত বাঁধার কথা নয়। কিন্তু সংকোচ হলেও মানুষকে তার সুদীর্ঘ ইতিহাসের এ কলংক স্বীকার করতেই হবে।

এমন হওয়ার কারণ কি? কারণ হলো বুনিয়াদ বা ভিত্তির গলদ। কেননা সব জিনিসেরই ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার বুনিয়াদের প্রকৃতির ওপর। ঐক্যের বুনিয়াদ কি? বর্তমান পৃথিবীতে কোন্ বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যাবতীয় ঐক্য-আঁতাত? নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে ঐক্য হলে, শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসা কোন ঐক্যের বুনিয়াদ হলে সে ঐক্য-আঁতাত তার বিপক্ষ কোন শক্তিকেই বরদাশ্‌ত করতে রাজি হবে না মুহূর্তের জন্যও। কেননা এক খাপে দু'টি তরবারি কিংবা এক গুহায় দুই সিংহের সহাবস্থান সম্ভব নয়, সম্ভব নয় একটি মড়া নিয়ে দু'টি ক্ষুধার্ত কুকুরের আপোষ বা সমঝোতা। মানব সভ্যতার ইতিহাস, জাতি ও ধর্মের ইতিহাস মূলত হিংসা, হানাহানি, হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠনের ইতিহাস। যুগে যুগে রয়েছে কত লহুর দরিয়া, তৈরি হয়েছে মানুষের মাথার খুলির হাজার মিনার। ধ্বংস হয়েছে একের পর এক জাতি। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেছে দেশের পর দেশ। ধুলায় মিশে গেছে কত সমৃদ্ধ নগর, সভ্যতা! ইতিহাস দর্শনের আলোকে সভ্যতার এ ধ্বংসযজ্ঞের কার্যকারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, গোড়াতে এমন এক ঐক্যের গোড়া পত্তন হয়েছিল যার যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল ক্ষুদ্রতর বা দুর্বলতর ঐক্য-আঁতাত।

## নিছক শব্দের কোন তাৎপর্য নেই

মানব জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীতরূপেই এটা প্রমাণ করে দিয়েছে, নিছক ঐক্য মানব জাতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ও কল্যাণপ্রসূ নয়। প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে ঐক্যের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বুনিয়াদ কি।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঐক্যের প্রথম সূত্রপাত হয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। অতঃপর তা ব্যাপ্তি লাভ করে গোত্রীয় ঐক্যে, জাতীয় ঐক্যে ও আঞ্চলিক ঐক্যে। আর একটু প্রগতিশীল পৃথিবীতে মানুষের মুখের ভাষাকে কেন্দ্র করে জন্ম নিল ভাষাভিত্তিক ঐক্য। পৃথিবী যখন আরো এগিয়ে গেল তখন সৃষ্টি হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ঐক্য। এত সব ঐক্যের ভিড়ে সাংস্কৃতিক ঐক্যই হতে পারত মানবতার সর্বোত্তম ভরসাস্থল। কেননা নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের সাথে সংস্কৃতি ও সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। সংস্কৃতি ও সভ্যতার অর্থ হলো পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ঘটিয়ে মানুষ মানুষকে উপলব্ধি করবে, জাতিতে জাতিতে মিলন ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে। সহানুভূতি, শুভ কামনা ও বন্ধুত্বের সেতু-বন্ধন রচিত হবে, একে অন্যের ভাষা, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল, আগ্রহী ও সমঝদার। এক কথায় সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে গড়ে উঠবে সুনিবিড় সখ্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদের ওপর যে ঐক্য তাতে তো আগ্রাসনবাদী মনোভাবের কথা কল্পনাও করা যেতে পারে না, মানুষ হয়ে মানুষকে অপমানিত করা তো তার লক্ষ্য হতে পারে না, হতে পারে না অপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনাশ তার কাম্য। প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্ববিরোধ ও বৈপরীত্যের আধার। মানব চরিত্রের রহস্য উদ্ধার তাই এক কঠিন ব্যাপার। বর্তমানের উন্নত মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানও এর সমাধান দিতে পারে নি। কেননা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আরেকটি মানুষ এবং তার দাবী ও চাহিদার রূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন। এমন সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে নির্ধারণ করে বসে যা হাজারো মানুষের জন্য হয় ধ্বংসের কারণ। অনেক সময় অন্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে ওঠে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রাসাদ। হিংসার লেলিহান শিখা, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা ও আদিম পৈশাচিকতার মধ্যেই যে জীবন দর্শন খুঁজে পায় তার পূর্ণতা ও সফলতা, মানুষকে হত্যা করা এবং মানবতাকে অপমানিত করাই যে জীবন দর্শনের মূল কথা, সে নারকীয় জীবন দর্শনের কোন প্রতিকার আমাদের জন্য নেই।

## ঐক্যে ঐক্যে সংঘাত

এসব কৃত্রিম ও ভংগুর ঐক্যের মুকাবিলায় ইসলাম বিশ্ব-মানবতাকে ডাক দিয়েছে দুটি বাস্তব বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক সার্বজনীন ঐক্যের। সে ঐক্য

হবে কল্যাণ ও পবিত্রতার সফলতম ঐক্য। ইতিবাচক ও গঠনমূলক জীবন সভ্যতার সার্থক ঐক্য। ইসলাম-প্রদর্শিত সে ঐক্যের প্রথম বুনিয়াদ হলো মানব ঐক্য। দ্বিতীয় বুনিয়াদ হলো ঈমানী ঐক্য অর্থাৎ মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, নেই ভাষা, বর্ণ ও বংশের শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা পৃথিবীর সব মানুষ এক আদমের সন্তান এবং একই স্রষ্টার সৃষ্টি। বিদায় হজ্জের অভিভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত ই'জাযপূর্ণ ভাষায় মানব ঐক্যের যে অনুপম ঘোষণা দিয়েছেন---মানুষে মানুষে ঐক্যের এর চেয়ে বড় সনদ ও ঘোষণা আর হতে পারে না। তিনি এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের রব (সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক) একজনই এবং তোমাদের আদি পিতাও একজন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রত্যেক মানুষ উপরিউক্ত দুটি ঐক্যের ধারক ও বাহক। একই আদি মানব থেকে দৈহিক অস্তিত্ব লাভ করেছে জাতি, দেশ, কাল, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ। একই আদি মানবে গিয়ে লীন হয়েছে সকলের বংশধারা। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র নবী আদি পিতা হযরত আদম। অনুরূপভাবে তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকও এক ও অভিন্ন। এ দুটি সংক্ষিপ্ততম বাক্যে এমন এক মানব ঐক্যের ঘোষণা বিধৃত হয়েছে যে, তার তুলনায় ব্যাপকতর, গভীরতর ও তার তুলনায় আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য ঐক্য ঘোষণা আর হতে পারে না। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এ দু'টি ঐক্যই প্রত্যেক মানুষকে অপরের সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করে রেখেছে। মানব জাতির পিতৃপুরুষ অভিন্ন আর মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও রিযিকদাতা সত্তাও একক, অভিন্ন। সুতরাং দু'টি সূত্রে মানুষ একে অপরের ভাই ঃ পিতার সূত্রে ও স্রষ্টার সূত্রে। পিতৃসম্পর্কটি যেহেতু সার্বজনীন, সহজবোধ্য ও সর্বজনস্বীকৃত, সেহেতু পিতৃসম্পর্কের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় হজ্জে প্রদত্ত মানব ঐক্যের এ ঘোষণা ছিল গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে প্রদত্ত বিশ্বনবীর এক বিশ্বজনীন ঘোষণা।

### ঐক্যের নতুন ধারা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে সূচিত হলো ঐক্যের এক নতুন ধারা। এ ঐক্যের বুনিয়াদ হলো আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস, মানবতার প্রতি সহানুভূতি এবং ন্যায়, সাম্য ও মানব সেবার প্রেরণা।

মদীনা তাইয়্যেবায় যখন ঐ পুণ্য জামাতের গোড়া পত্তন হচ্ছিল তখন সংখ্যায় ও শক্তিতে তা ছিল এক ক্ষুদ্র জামাত। মক্কা থেকে বিতাড়িত মুহাজিরদেরকে মদীনার আনসারদের সাথে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা হলো। কেননা মুহাজিরগণ ছিলেন জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত। তাদের না ছিল কোন বাড়ি-ঘর, না ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই। এ ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সম্পর্ক

যার বুনিয়াদ ছিল 'আকীদা ও বিশ্বাস এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর। আপনাদের মধ্যে যারা সীরাত ও নবী-চরিত সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন তারা ভালো করেই জানেন, সাংস্কৃতিক ঐক্য কিংবা সামাজিক ঐক্য এ সম্পর্কের বুনিয়াদ ছিল না। ভাষার মিল থাকলেও মক্কা-মদীনার ভাষায় শব্দ-চয়ন ও বাচনভংগিতে এত বেশী অমিল বিদ্যমান ছিল যে, উভয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্য তা ছিল যথেষ্ট। একথা আপনাদের অজানা নয়, সামান্য ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে একই ভাষার মাঝে দেখা দেয় বিরাট তারতম্য এবং এর ফলে এমন তিক্ত সাম্প্রদায়িক পরস্থিতির উদ্ভব ঘটে যা শুধু দু'টি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যেই কল্পনা করা সম্ভব। আমার মনে হয় এ সম্পর্কে খুব কম দেশেরই পাকিস্তানের মত তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মক্কা-মদীনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে সাদৃশ্য ও অভিন্নতার যে ধারণা পোষণ করা হয় তা ঠিক নয়। সীরাত সম্পর্কিত সর্বশেষ গবেষণা এ কথাই প্রমাণ করে, মক্কা-মদীনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় যথেষ্ট অমিল বিদ্যমান ছিল। মক্কার কোরেশ রক্তে ছিল অতিমাত্রায় শ্রেষ্ঠত্ববোধ। আপনারা নিশ্চয় জানেন বদর যুদ্ধের শুরুতে কোরেশের তিন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ওতবা, শায়বা ও রবীআ মুসলমানদেরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। তাদের মুকাবিলায় মাঠে নেমেছিলেন মদীনার তিন আনসারী সাহাবা। কিন্তু কোরেশ পক্ষ এই অজুহাতে তাঁদের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করল, তোমরা ভদ্রলোক বটে, তবে আমাদের সমকক্ষ যারা তাদের পাঠাও। এ থেকেই কোরেশদের গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া মদীনার সমাজ-সংস্কৃতিতে য়াহূদীদেরও ছিল বিরাট আধিপত্য। য়াহূদীদের ছিল নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি, সমগ্র আরব উপদ্বীপে শিক্ষা-দীক্ষায় য়াহূদীরাই ছিল একমাত্র উন্নত জাতি। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত লেখাপড়া করত। অন্যদের তারা উম্মী বলে আখ্যায়িত করত। কুরআনুল কারীমে তাদের মন্তব্য এভাবে উল্লিখিত হয়েছে," এরা মূর্খের দল। এদের সাথে কোন আচরণই আমাদের জন্য অপরাধ নয়।" অন্যান্য জাতি সম্পর্কে এখনও য়াহূদীরা অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত শব্দ হলো (অসভ্য) ভিন জাতি।

সীরাতের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন আপনাকে এ ধারণাই দেবে, ভাষার মিল ও এক পর্যায় বংশধারার অভিন্নতা সত্ত্বেও মক্ক-মদীনার সমাজ ব্যবস্থায় ছিল দুস্তর

ব্যবধান যা সচরাচর দুটি ভিন্ন দেশের ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাতেই পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই মদীনায় হিজরত কালে এ আশংকা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, দু'টি ভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে লালিত মুসলমানগণ হয়ত একে অন্যের সাথে দুধ চিনির মত মিশে গিয়ে একটি অভিন্ন স্বভাব গ্রহণ করতে পারবে না (হাকীম সাহেবের প্রতি সৌজন্যবশত চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষায় বলছি) যেমনটি বিভিন্ন উপাদানে তৈরী আপনাদের হালুয়ার বেলায় ঘটে থাকে। এ আশংকা বিদ্যমান ছিল, আনসার ও মুহাজিরদের সংমিশ্রণে মদীনায় যে ইসলামী হালুয়া তৈরি হচ্ছিল তাতে উপাদান দুটি তাদের ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিলীন করে একে অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে হয়ত মিশে যেতে পারবে না। আর এ কথা হাকীম সাহেবের চেয়ে ভালো আর কে জানবে, হালুয়ার উপাদানগুলো নতুন ও সম্মিলিত ক্রিয়া গ্রহণ না করে যদি নিজস্ব গুণ বজায় রাখে তবে তা উপকারী হতে পারে না কিছুতেই।

সমস্যা শুধু আনসার-মুহাজির মিলনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, খোদ আনসাররাও ছিল চিরশত্রু বিবদমান দু'টি বড় গোত্রে বিভক্ত। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সর্বশেষ ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল হিজরতের মাত্র পাঁচ বছর আগে। উভয় গোত্রের কবিদের হাতেই রচিত হয়েছিল বীর যোদ্ধাদের বীরত্ব-গাঁথা, যা গোত্রীয় মজলিসে পঠিত হতো বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে। গোত্রদ্বয়ের ইসলাম গ্রহণের পরও সুযোগ পেলেই য়াহূদীরা পুরনো শত্রুতা নতুন করে চাঙ্গা করার চেষ্টা করত এবং গোত্রীয় কবিদের রচিত জ্বালাময়ী কবিতা আবৃত্তি করে নিভে যাওয়া আগুন ফের উসকে দেয়ার প্রয়াস চালাত। সীরাতের বর্ণনায় দেখা যায়, য়াহূদীদের কারসাজিতেই একবার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় উন্মুক্ত তরবারি হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করেছিল। সংবাদ পেয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ঈমান ও ইসলামী প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের সুশীতল বারি সিঞ্চনে জাহেলী ক্রোধের প্রজ্বলিত আগুন নিভে গেল।

মোটকথা, একটি নতুন শক্তির অভ্যুদয়ের পরিবর্তে একটি নবতর বিশৃংখলা জন্ম নেয়ার আশংকাই ছিল বেশি এবং তার পর্যাপ্ত উপাদানও সেখানে ছিল বিদ্যমান যে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া একা য়াহূদীদের অস্তিত্বই ছিল অরাজকতা সৃষ্টির যথেষ্ট উপাদান। দুনিয়ার খুব কম জাতিই

য়াহূদীদের মত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের যোগ্যতা রাখে। আজো পর্যন্ত তাদের এ জাতীয় যোগ্যতা অটুট রয়েছে। সুতরাং মদীনায় আনসার-মুহাজির কিংবা আওস-খাযরাজের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের এই জাতীয় যোগ্যতা কাজে লাগানোটাই ছিল স্বাভাবিক। মক্কার অর্থনৈতিক জীবনধারা ছিল বাণিজ্যনির্ভর। পক্ষান্তরে মদীনার জীবনধারা ছিল কৃষিনির্ভর। উভয় অঞ্চলের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যই ছিল এ ভিন্নতার কারণ। উভয় অঞ্চলের পারিবারিক জীবনও ছিল বেশ স্বতন্ত্র। হযরত ওমর (রা.) তাঁর এক বর্ণনায় সেদিকে ইঙ্গিতও করেছেন।

### বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের ঐক্য

দুটি বিপরীতধর্মী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এমন সুসংহত ও সফল প্রচেষ্টা ইতোপূর্বে আর কখনো হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। নিছক বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পৃথিবীকে চরম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার মহান লক্ষ্যে ঐশী তত্ত্বাবধানে উত্থিত হচ্ছিল এক নতুন শক্তি।

### সংখ্যায় ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে মহান

এই যে ক্ষুদ্র ভ্রাতৃ সংগঠনটি জন্ম নিচ্ছিল, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কি ছিল? লোকজন কি ছিল? কুরআনুল কারীমে আমরা তার নিখুঁত চিত্র দেখতে পাই। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

"স্মরণ করো সেদিনের কথা যখন পৃথিবীতে তোমরা সংখ্যায় ছিলে মুষ্টিমেয়, শক্তিতে ছিলে দুর্বল। তোমরা সদা শংকিত থাকতে, শত্রু বুঝি-বা তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে!"

এই ছিল বাস্তব পরিস্থিতি। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কি মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিল এই নগণ্য দুর্বল মুসলিম জামাতকে। এ সম্পর্কিত আয়াতটি যতই আমি তিলাওয়াত করি ততই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে আমার হৃদয়। এ নতুন ভ্রাতৃগোষ্ঠীর ও ঐক্য সংগঠনের দায়িত্ব কি ছিল? কেমন কন্টকাকীর্ণ ও সংকটাপন্ন ছিল তার চলার পথ? আর আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের সে কর্তব্যের গুরুত্ব ছিল কত অপরিসীম! আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "হে আনসার ও মুহাজিরবৃন্দ! যদি তোমরা উদ্যোগী হয়ে এই নবতর ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন না কর

এবং তা দৃঢ়করণে যত্নবান না হও তবে পৃথিবী তলিয়ে যাবে ব্যাপক অনাচার ও অরাজকতায়।"

আলোচ্য আয়াতের শব্দ ক'টি সত্যি সত্যি আমাকে হতবুদ্ধি করে দেয়। কি শক্তিই বা ছিল এ ক্ষুদ্র দলটির! বত্রিশটি দাঁতের মাঝে অসহায় একটি জিহ্বা কিংবা মহাসাগরের বুকে ক্ষুদ্র বিন্দুর চেয়ে বেশী কিছু তো নয়! আনসার-মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলোইবা! কিন্তু মানব সভ্যতার গতিধারায় প্রভাব বিস্তারে কতটুকু সামর্থ্য আছে আর পৃথিবীব্যাপী অনাচার ও অরাজকতার মহাসয়লাব রোধ করা কি করে সম্ভব তার পক্ষে!

কিন্তু এ ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা আল্লাহ্ পাক যে মহান কাজ সমাধা করার ইচ্ছা করেছিলেন এবং মানব সভ্যতা ও পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য এ ঐক্য প্রয়াসের যে মহাপ্রয়োজন ছিল সে কারণেই তাকে এ অনন্য মর্যাদা ও খেতাবে বিভূষিত করা হয়েছে।

ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এ জামাতের অন্তর্নিহিত উদ্যম ও প্রেরণা, মানবতার প্রতি তাঁদের দরদ ও মর্ম বেদনা, তাঁদের বিনিদ্র রাতের আহাজারি ও কর্মচঞ্চল দিনের উৎকণ্ঠা, মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো ও হিদায়াতের পথে পরিচালিত করার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা ও কাতরতা, সর্বোপরি আল্লাহ্র পথে জীবন সম্পদ, সন্তান ও প্রাণসহ সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিযোগিতার জীবন অনুপম কাহিনী যাঁদের আছে, আর যাঁদের অটল বিশ্বাস আছে আল্লাহ্ পাকের সর্বময় ক্ষমতা ও কুদরতের ওপর, তাঁদের পক্ষেই শুধু সম্ভব আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করা। অন্যথায় সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মহাঅবক্ষয়ের পরিবেশে একথা বুঝতে পারা খুবই কঠিন, কী কারণে এমন একটি অসহায়, দুর্বল ও ক্ষুদ্র দলকে বসানো হচ্ছে এত বড় মর্যাদার আসনে! তোমরা যদি উদ্যোগী হয়ে এই নবতর ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন না করো এবং তা দৃঢ়করণে যত্নবান না হও, তবে ভয়াবহ গোলযোগ ও বিশৃংখলার লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে মানুষের এই পৃথিবীকে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস পড়ুন। দেখতে পাবেন ধ্বংসের কী ভয়াবহ আগুনে জ্বলছিল গোটা পৃথিবী! শক্তির মদমত্ততায় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের উন্মাদনায় ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকায় অন্ধ মানুষের হাতে কী মুমূর্ষু দশা ঘটেছিল মানব সভ্যতার। সে সম্পর্কে একটি নিখুঁত ও জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল তাঁর এক কবিতায়ঃ

"আলেকজান্ডার ও চেংগীয খাঁর রক্তাক্ত হাতে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পৃথিবীর নাযুক দেহ। শোন বন্ধু! বিশ্ব ইতিহাসের এ পাঠ চিরন্তন! শক্তির মদমত্ততা অতি ভয়ংকর। এ সর্বপ্লাবী ঢলের মুখে জ্ঞান, শিল্প ও বুদ্ধি-বিবেক সব ভেসে যায় খড়কুটার মত।"

## ক্ষুদ্র এক ভ্রাতৃগোষ্ঠীর কাঁধে বিশ্বের দায়িত্ব

শক্তির সে মদমত্ততা পৃথিবীর যে সর্বনাশ করেছিল তার প্রতিকারের মহান ব্রত নিয়ে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশ অংকুরিত হলো এক নতুন চারা গাছ। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হলো এক নতুন ভ্রাতৃসংগঠন। গোড়াপত্তন হলো এক নতুন ঐক্যের আর তার কাঁধে অর্পিত হলো বিশ্বমানবতার হিফাজত ও সংরক্ষণের মহাদায়িত্ব। إلا تفعلوه। যদি দৃঢ়তার সাথে ঐক্য স্থাপন ও তার বিকাশ সাধনে ব্রতী না হও, সে ঐক্যের প্রতি যদি অনুগত ও একনিষ্ঠ না হও, যদি না হও মানবতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, মানবতার স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ নিয়েই যদি তোমরা মেতে ওঠো, তবে মনে রেখো, মানব সভ্যতার এ আবাসভূমি ভেঙে যাবে অনাচার ও পাপাচারের সয়লাবে, ধ্বংস ও অকল্যাণ ছাড়া মানবতার ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না তখন। এ বিপ্লবী আয়াত যখনই আমি পড়ি তখনই বিহ্বলতায় কেঁপে ওঠে আমার হৃদয়—আমার সমগ্র আত্মা! সাগরবক্ষে বিন্দুর মত ক্ষুদ্র অসহায় ও দুর্বল এক জামাতকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করছে ঃ গোটা বিশ্বের দায়িত্ব বুঝে নাও। সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের স্নিগ্ধ পরশে মুমূর্ষু মানবতাকে বাঁচিয়ে তোল। অন্যথায় মানবতার মৃত্যু এবং বিশ্ব ও বিশ্বজগতের ধ্বংস অনিবার্য। ঐক্যবদ্ধ অপশক্তিগুলো তখন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে মানবতার লাশ। এগুলো কল্যাণের ঐক্য নয়, ধ্বংসের ঐক্য। মানবতাকে রক্ষার ঐক্য নয়, মানবতাকে শতধা বিভক্ত করার ঐক্য। একটি ঐক্যের জীবন ও সফলতা নির্ভর করে আরেকটি ঐক্যের মৃত্যু ও মর্মান্তিক পরিণতির ওপর। এক জনগোষ্ঠীর জৌলুস ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে আর সব জনগোষ্ঠীর সর্বনাশের ওপর। সে ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। ঐক্যের নামে পৃথিবীতে আজও চলছে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা, বিভেদ-অনৈক্যের আত্মঘাতী মহড়া। যে কোন দেশ, যে কোন সংগঠন, দর্শন বা ইজম সম্পর্কে আপনি জানতে চাইবেন–খুব সরল ভাষায় আপনাকে উত্তর দেয়া হবে, "এটা আমাদের ঐক্য প্রচেষ্টা।" কিন্তু কোন ঐক্যই অপর ঐক্যকে এক মুহূর্তের জন্য বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। প্রতিটি ঐক্যের

লক্ষ্য অন্য সব ঐক্যের সমূলে ধ্বংস সাধন। সুতরাং যদি কোন ঐক্য প্রয়াস মানবতার জন্য কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনতে পারে তবে তা হলো ইসলাম নির্দেশিত বিশ্বজনীন ঐক্য আর সে ঐক্যের বুনিয়াদ হলো দুটি ঃ মানব ঐক্য ও ঈমানী ঐক্য।

### ভাষাভিত্তিক ঐক্যের ধ্বংসাত্মক পরিণতি

এই নিষ্পাপ জিহ্বা ফুল ঝরায়, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন ঘটায়, প্রেমের গান শোনায়, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি ও মিলন সেতু রচনা করে। এ ভাষা—যার উৎপত্তি হয়েছিল হৃদয়ের গভীর প্রদেশ থেকে ভালোবাসার নির্মল ধারা প্রবাহিত করার জন্য, দূরকে নিকট ও নিকটকে নিকটতর করার জন্য—সে ভাষায় বেদীমূলেই বলি হয়েছে নিষ্পাপ অসহায় কত মানুষ, অথচ তাদের মুখেও ছিল একটা ভাষা। সে ভাষায় ছিল হাসি-কান্না, ছিল প্রেম ও অনুরাগ। তথাকথিত ভাষাভিত্তিক ঐক্য মানুষকে প্ররোচিত করেছে মানুষেরই বুকে হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়তে। ভাষাকে যখন ঐক্যের বুনিয়াদ করা হয়েছে—যার অনুকূলে আল্লাহ্র তরফ থেকে কোন সনদ নাযিল করা হয়নি—তখন এই নিষ্পাপ ভাষাই হয়েছে সমস্ত অকল্যাণ ও ধ্বংসের বাহন। এ ভাষাই তখন রূপ নিয়েছে এমন এক অপশক্তির যা নবী-রাসূলদের সকল মেহনত ও দুনিয়ার সকল সংস্কার প্রচেষ্টাকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে এক মুহূর্তে। হাজার বছরের সাধনায় সঞ্চিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদভাণ্ডার এই ভাষা। সে ভাষাভিত্তিক ঐক্য পৃথিবীর বুকে এমন সব কাণ্ড ঘটিয়েছে যে, মানুষকে তা ভেবে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। আর আপনাদের তো এ তিক্ত অভিজ্ঞতা একবার হয়েছে। আমার মতে পাকিস্তান এখনো শংকামুক্ত নয়। যে কোন ধূর্ত ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ভাষার স্লোগানকে ঐক্যের নামে ব্যবহার করে আবার ছড়িয়ে দিতে পারে জাহেলী যুগের বীজ। ভাষাভিত্তিক ঐক্য আবারো ব্যবহৃত হতে পারে রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়াররূপে। মানুষের মুখের ভাষা আজ চেংগীয খানের তরবারির মত ধ্বংসলীলা ঘটাতে পারে পৃথিবীর যে কোন দেশে।

### সভ্যতা নামে সৃষ্ট ঐক্যের পরিণতি

সে সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য হলো মানুষকে মানুষ বানানো, মানুষের মধ্যে নিজের খুঁত ও দুর্বলতার অনুভূতি জাগ্রত করা, অন্যের গুণাবলী ও প্রতিভার

স্বীকৃতি দানে উদ্বুদ্ধ করা, যে সভ্যতার প্রেরণায় মানুষ সৌন্দর্যের পূজায় সুন্দরের সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করে, শিল্পের অনুসরণ করে শিল্পীর গলায় ফুলের মালা পরায়, একগুচ্ছ কবিতার জন্য হৃদয় উজাড় করে দেয় এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলে সংগীতের মূর্ছনায়, সে সভ্যতার মর্মবাণী হলো, দেশ-কালের উর্ধ্বে মানুষ সত্য। সুতরাং এক মানুষের সকল অবদান গোটা মানবতার সম্পদ, সবার তাতে রয়েছে সমান অধিকার, সে সভ্যতাই আল্লাহ্-রাসূলের পথ-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়ে রূপ ধারণ করে চরম পাশবিকতার। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, সভ্যতার বিরুদ্ধে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংস্কৃতি কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগীন উঁচিয়ে। "ঐক্যই কল্যাণ, ঐক্যই প্রগতি"--এ ভেল্কির জারিজুরি আজ ফাঁস হয়ে গেছে। ঐক্যের বুনিয়াদ যদি ঈমান ও ভ্রাতৃত্ব ছাড়া অন্য কিছু হয় তবে মানবতার জন্য সে ঐক্য আশীর্বাদ নয়—অভিশাপ, কল্যাণের উৎস নয়—ধ্বংসের বাহন। পৃথিবী বারবার এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

### দু' দু'টি বিশ্বযুদ্ধের কারণ

আপনাদের অনেকেই হয়ত ১৯১৪ ও ১৯৩৯-এর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন। আর অনেকে হয়ত শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন। এসব যুদ্ধ, এসব হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ কিসের জন্য? মানবতার কোন্ কল্যাণের জন্য দু' দু'টি বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা পৃথিবীকে ভোগ করতে হয়েছিল? সে কি অন্যায়ের সাথে ন্যায়ের বিরোধের পরিণতি, না স্বার্থের সাথে স্বার্থের সংঘাতের ফল? প্রতিটি যুদ্ধ ও প্রতিটি ধ্বংসের পেছনেই সক্রিয় রয়েছে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের উন্মাদনা, দেশ জয় ও লুণ্ঠনের উদগ্র লালসা। পৃথিবীতে যত অনাচার, যত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তাতে কোন দেশ ও জাতির বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। সংঘাত শুধু এখানে, আমাদের নেতৃত্ব ও খবরদারিতে হতে হবে সব কিছু। পৃথিবীর বর্তমান ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থায় দোষের কিছু নেই, তবে অমুক জাতির অমুক দেশের আধিপত্য ও ইজারাদারি খতম করতে হবে। তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আমাদের উপনিবেশ। কেননা পৃথিবীতে আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথাই ধরুন। কোন্ সে মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল পৃথিবীব্যাপী এমন ভয়াবহ একটি ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে? জার্মান জাতি দেখল বিশ্ব বাজারে, বিশ্বের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে ও বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ-ভাণ্ডারে বৃটিশেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। বৃটিশ আধিপত্য উৎখাত

করে যে কোন মূল্যে জার্মান জাতির একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে হবে বিশ্বের বুকে। আমাদের উপমহাদেশের রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতাও অভিন্ন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র জনসমাবেশে সুস্পষ্ট ভাষায় আমি একথা বলেছি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় গেড়ে বসা দুর্নীতি, অনাচার ও অবক্ষয়ের ব্যাপারে আজকের রাজনৈতিক দলগুলোর কোন মাথা ব্যথা নেই। মুখে স্বীকার না করলেও প্রত্যেকের দাবী, শুধু আমাদের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে চলুক সব কিছু। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, যে কোন রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করুন, দেখবেন ক্ষমতার হাত বদলই শুধু হয়েছে, অবস্থার গুণগত কোন পরিবর্তনই হয়নি। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছাড়া মৌলিক কোন মতবিরোধ নেই, নৈতিকতাভিত্তিক কোন মতানৈক্য নেই।

আরেকটু ওপরের ( ? ) দিকে দৃষ্টি দিন। ইউরোপীয় জাতিবর্গ একে অন্যের বিরুদ্ধে একাধিকবার যেসব নারকীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোতে ন্যায়-অন্যায় ও নীতিবোধের বালাই ছিল না, ছিল না মানব জাতির কল্যাণ-অকল্যাণ বা জীবন দর্শনের প্রশ্ন, এমন কি ছিল না খ্রিস্টবাদ অখ্রিস্টবাদের দ্বন্দ্বও। সব কিছুর মূলে ছিল একটি মাত্র অহমিকা—গোটা পৃথিবীকে আমাদের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। মাফ করবেন, আমাদের তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও একই ধারায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত। মানবীয় শক্তি ও প্রতিভার অপচয় হচ্ছে, কিন্তু তাতে কারো কোন মর্মবেদনা নেই। যুবসমাজ তলিয়ে যাচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়ের অতলান্তে, (ঔপনিবেশিক) শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিচ্ছে গোটা জাতির মেরুদণ্ড, কিন্তু সেজন্য কারো কোন উৎকণ্ঠা নেই, বরং সবটুকু মেধা, শক্তি, সময়, শ্রম ব্যয় হচ্ছে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে।

### পাকিস্তানের সমস্যা

পাকিস্তান আজ তাঁর নিজ ভূখণ্ডেই শুধু ঐক্যের দাবিদার নয়, বরং সারা বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে পাকিস্তান হলো ইসলামী ঐক্যের সংগঠন ও মুখপাত্র। কিন্তু আপনারা যদি এ মহান দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান, আপনাদের দেশে যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ভাষার দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক সংকট কিংবা আঞ্চলিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ফিৎনা, আর মনে করুন, আপনাদের কারো মনে উথলে উঠল ইসলাম-পূর্ব সংস্কৃতির প্রেম, শুরু হলো সেই সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন, তবে অবধারিতভাবেই ধরে নিতে হবে, পাকিস্তানের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে

উঠেছে। কেননা এদেশের বিভিন্নমুখী ধারা-প্রকৃতির জনসমষ্টিকে সংযুক্তকারী মাধ্যম হলো ঈমানী ঐক্য, বিশ্বাসের মিল ও ইসলামী একতা। এক্ষেত্রে যদি কৃত্রিম ঐক্যের দাবী মাথা চাড়া দেয়, যদি মানুষের গড়া বিভিন্ন নামের প্রতিমার বন্দনা শুরু হয়, তবে প্রতি মুহূর্তেই পাকিস্তানের জন্য রয়েছে সমূহ আশংকা। তাই কবি ইকবালের ভাষায় বলছি ঃ বর্ণ-বংশের প্রতিমাগুলো গুঁড়িয়ে দাও, মিশে যাও অভিন্ন জাতি-সত্তায়, ভেদাভেদ তুলে দাও ইরান, তুরান ও আফগানের। তুরস্কের জিয়া গোকল্প-এর তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ও কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে মধ্যএশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। ইরানেও মাঝে মধ্যে ইসলাম-পূর্ব যুগের পারসিক সভ্যতা কবর খুঁড়ে বের করে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনাদের পাকিস্তানেও যদি অনুরূপ কোন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে তবে তা হবে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আমি আবারো আরয করব, একমাত্র ঈমানী ঐক্য বা ইসলামী ঐক্যই হলো আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল। অন্য কোন ঐক্য যদি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে সক্ষম হয় তবে শাব্দিক অর্থেই দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে, শক্তিতে শক্তিতে সংঘাত বাধবে এবং জাহেলী যুগের যে অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করেছিল সাম্য ও মৈত্রীর ইসলাম, সে অভিশাপ আবার নেমে আসবে আমাদের জাতীয় জীবনে। সম্ভবত অন্য কোন বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এতটা তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন নি, যতটা করেছেন জাহেলী যুগের সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছিলেন বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি। ওহীর মাধ্যমে সকল গুপ্ত রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্বই ছিল তাঁর অন্তর্জগতে উদ্ভাসিত। কাজেই জাতিসমূহের ইতিহাস ও পরিণতি ছিল তাঁর নখদর্পণে। আর তাই সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকেই তিনি মনে করতেন একটি জাতির ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ। তাই নবীর যবান থেকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ تَقْرٰى عَلَيْكُمْ بِقَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاغْضُوْهُ بِهَنِّ اَبِيْهِ وَلَا تَكْنُوْا ـ

তোমাদের সামনে কেউ যদি জাহেলী সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ায়, কোন গোত্র, দেশ, জাতি বা ভাষার দোহাই দেয় কিংবা অন্য কোন জাতির প্রতি অপমানজনক উক্তি করে, গোত্রীয় ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে, আকারে ইঙ্গিতে নয়, বরং সরাসরি তাকে আক্রমণ করে কথা বলে, তোমাদের ভাষায়

বাছাই করা কঠিনতম শব্দগুলো তার জন্য প্রয়োগ করো। কেননা তার ঐশীপ্রদত্ত অন্তর্দপণে পরিষ্কারভাবেই এটা প্রতিভাত হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা এমন এক মহাঅভিশাপ যা মুহূর্তে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় হাজার বছরের সমস্ত সাধনায় গড়ে ওঠা জ্ঞান, সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। নিষ্ফল করে দেয় আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হাজার রাতের রোনাজারী, নিঃস্বার্থ ও বিদগ্ধ সমাজ সংস্কারকদের দীর্ঘ জীবনের সংগ্রাম সাধনা। সাম্প্রদায়িকতা হলো এক প্রচণ্ড ঝড়, মুহূর্তে যা অন্ধকার করে দেয় গোটা দুনিয়া। আপনাদের সবার কাছে আমি আমার সতর্কবাণী পৌঁছে দিতে চাই। এদেশের জন্য বিপজ্জনক কিছু যদি থেকে থাকে তবে তা হচ্ছে মৃত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক আন্দোলন। আমি শুধু একা পাকিস্তানের কথাই বলছি না, মিসর, ইরানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের বেলায়ও এই সতর্কবাণী প্রযোজ্য। কাজেই ইসলামী ঐক্যকে সুদৃঢ় করাই হচ্ছে আজকের ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। ইসলামী ঐক্যই ইসলামী উম্মাহ্‌কে দিতে পারে নিরাপত্তার নিশ্চিয়তা, দিতে পারে বিনির্মাণ ও সৃষ্টির সোনালী ইঙ্গিত। কেননা এ ঐক্যই শুধু মানুষে সৃষ্টি করে সম্প্রীতির বন্ধন, হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটায় স্বর্গীয় মিলন। অনেক আগেই আমাদেরকে আল্লাহ্ পাক এ নিয়ামত দান করেছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا۔

"স্মরণ করো আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহকে, যখন তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, ছিলে এক অন্যের খুন পিয়াসী, তখন আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে অন্তরে প্রীতির সৃষ্টি করলেন। তোমরা তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।" এমন ভাই ভাই হলে যে, বিস্ময়ে মানুষ থ হয়ে গেল! সীরাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় আপনি দেখতে পাবেন সে মহান ভ্রাতৃত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত। হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা.)-র ভাই আবূ 'উমায়রকে হাত-পা বেঁধে বন্দী করা হচ্ছিল। হযরত মুস'আব সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখে বললেন, কষে বাঁধ একে। বড় ধরনের আসামী। মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায় করা যাবে। বিস্ময়ে বিমূঢ় আবূ 'উমায়র তার সহোদর মুস'আবের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ তুমি না আমার মায়ের পেটের ভাই! দ্বিধাহীন চিত্তে স্থির প্রত্যয়ের সাথে হযরত মুস'আব উত্তর দিলেন ঃ না, তুমি আমার ভাই নও। আমার ভাই তো ইনি যিনি তোমাকে

বাঁধছেন। বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ও ঐক্য এমনি মহান ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেছিল ইসলাম ও ঈমানের আলোকস্নাত মদীনার সেই পুণ্য সমাজ। এর বিপরীতে ভাষাভিত্তিক ঐক্যের অবস্থা আপনাদের জানা আছে। একই ভাষাভাষীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কত ঠুনকো। ভাষা কি তাদের মাঝে ন্যূনতম সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল? মানুষকে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে কোন মহত্তম জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছিল কিংবা সৃষ্টি করেছিল মানবতার কল্যাণে ব্রতী হওয়ার প্রেরণা? ভিন্ন ভাষীদের সাথে স্বার্থের সংঘাতে ঐক্যবদ্ধ লোকগুলো পরবর্তীতে নিজেরা কি আর দুধ চিনির মত সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে? নিজের জানমাল ও ইয্যত-আব্রুর মত অন্যের ইয্যত-আব্রুও কি একই দৃষ্টিতে দেখতে শেখে? দার্শনিক কবি ইকবাল কী সুন্দরই না বলেছেন ঃ ভাষার ঐক্যের চেয়ে হৃদয়ের ঐক্যই উত্তম! ভাষা হলেই কিছু কাজ হয় না, মনও এক হতে হয়। আর হৃদয়ে হৃদয়ে ঐক্য, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব এবং জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি ভাষার কর্ম নয়। ভাষা শুধু পারে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করতে, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে এক অভিন্ন স্বার্থে সাময়িকভাবে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে।

## আপনারা ইসলামী ঐক্যের পতাকাবাহী

আল্লাহ পাক আপনাদের ইসলামী ঐক্যের নেয়ামত দান করেছেন, সেই সাথে অভিষিক্ত করেছেন সে ঐক্যের প্রতি মানবতাকে আহ্বানের মহামর্যাদায়। ইসলামী ঐক্যের কল্যাণ কত সুদূরপ্রসারী, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বরকত ও সুফল কত ব্যাপক ও গভীর, সে দৃষ্টান্তই আজ পাকিস্তানকে তুলে ধরতে হবে বিশ্বের দরবারে। আপনাদের হাতে সম্পাদিত হতে হবে পাকিস্তানের এমন আদর্শ বিনির্মাণ যে, ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচয় পেতে হলে, ঈমানের আলোকস্নাত মদীনার সেই পুণ্য সমাজের কথা জানতে হলে পাকিস্তানকে দেখেই যেন জানতে পারে বিভিন্ন জাতির শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব পিয়াসী মানুষ। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের বুকে এমন কোন ঐক্য প্রয়াস যেন মাথা তুলতে না পারে যা শিথিল করবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন, ছড়িয়ে দেবে হিংসা ও জিঘাংসার আগুন। আল্লাহ্ না করুন, তেমনটি হলে সমস্যার এমন জটিল আবর্ত সৃষ্টি হবে পাকিস্তানের জন্য যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না কোন ঝানু রাজনীতিবিদদের ঝুলিতে কিংবা প্রতিভাবান কোন জাতীয় নেতার মগজে। বস্তুত এটা হবে আল্লাহ্প্রদত্ত নিয়ামতের অবমাননা। কোন্ আকর্ষণে কিসের ডাকে

মুসলমানরা এখানে এসেছে? কোন্ আলোর ইশারায় পতংগের মত এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশে তারা ঝাঁপ দিয়েছে? সে কি ভাষার টানে কিংবা সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর্ষণে? এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় ও সামাজিক পরিবেশে এত বেশী তফাৎ যা দুটি ভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীতেই হতে পারে। এই সম্মানিত মজলিসের ওপর একটু দৃষ্টি বুলালে আপনি নিজেও সে পার্থক্য টের পাবেন। কিন্তু সব পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের পরও এক অভিন্ন মযবুত বন্ধন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। আর তা হলো ঈমানী ঐক্যের বন্ধন। এই ঈমানী ঐক্যই আপনাদের অস্তিত্বকে সংঘবদ্ধ ও সংহত করতে পারে, পারে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে। সুতরাং এ মহানিয়ামতের গুরুত্ব উপলব্ধি করুন এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে এর আহবায়কের দায়িত্ব পালন করুন। এতেই নিহিত রয়েছে আপনাদের নিজেদের কল্যাণ ও বিভেদ-বিভক্তি-জর্জরিত মানবতার কল্যাণ।

দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এসেও মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে আমার বক্তব্য শুনে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন সেজন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, বিশেষভাবে হাকীম মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। কেননা তাঁর সৌজন্যেই আমরা এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছি।

আল্লাহ্ সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন!

# ইসলামী বিশ্বের অন্তর্বর্তীকাল

[১৮ই জুলাই ইসলামাবাদ হোটেলের সম্মেলন কক্ষে পাকিস্তান ইসলামী আইন গবেষণা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব আনোওয়ারুল হক। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীবর্গ, ইসলামী আইন গবেষণা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও দেশের বিশিষ্ট আলিম ও বুদ্ধিজীবিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন ইসলামী আইন পরিষদের সভাপতি বিচারপতি মুহাম্মদ আফযল।]

হামদ ও সালাতের পর!

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত সুধীবৃন্দ! আজকের এ দুর্লভ মুহূর্তটি আমার জন্য খুবই আনন্দ ও সৌভাগ্যের। কেননা যাদের প্রত্যেকের খিদমতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া, অধ্যয়ন ও চিন্তার নির্যাস পেশ করা ছিল আমার কর্তব্য, তাঁরা নিজেরাই অনুগ্রহ করে এখানে উপস্থিত হওয়ার কষ্ট স্বীকার করেছেন। এটা যেমন আনন্দকর—তেমনি দায়িত্বপূর্ণও। তাই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না, সৌভাগ্যের কথা ভেবে আনন্দিত হব, না দায়িত্বের অনুভূতিতে চিন্তিত হব। যা-ই হোক, এটা আমার মনের বর্তমান মিশ্র অনুভূতি যা নিঃসংকোচে আমি আপনাদের কাছে পেশ করছি।

## মুহূর্তের অসতর্কতা, শতাব্দীর মাশুল

সুধীমণ্ডলি! ইসলামী বিশ্বে আমরা আজ চরম সংকটাপন্ন সময় অতিক্রম করছি। এটা সময়ের এক নাযুক সন্ধিক্ষণ, অন্তর্বর্তী সময়। আর অন্তর্বর্তী সময় স্বভাবতই খুব নাযুক ও সংকটপূর্ণ হয়ে থাকে। ইসলামী বিশ্বের নেতৃবর্গ দেশ ও জাতির মেধা ও মস্তিষ্ক যদি এখন একটি মুহূর্তও বিনষ্ট করে কিংবা খুঁটিনাটি ও সাময়িক স্বার্থ নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ে তবে জীবন যুদ্ধের গতিশীল বিশ্ব কাফেলা আমাদের জন্য থেমে থাকবে না। ইতিহাসও আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না। কালের স্রোতকে পাল্টা স্রোত দিয়েই শুধু ঠেকানো যায়। মাঝদরিয়ায় কোন কিশতি ডুবে গেল বলে স্রোতের গতি স্তব্ধ হয়ে পড়ে না। কেননা স্রোতের গতি সাগরমুখী। আর সময় বড় নিষ্ঠুর। আমার মতে আপনাদের কবি হালী তাঁর নিজস্ব কল্পনার সীমিত পরিমণ্ডলেই বলেছেন, তবে বড় সুন্দর বলেছেন ঃ যাবার আনন্দ পাই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার উদ্দাম নৃত্য দেখে। জাহাজ ডুবল কি তীরে ভিড়ল তাতে কিবা আসে যায়!

## ভাগ্যাহত স্পেনের একটি পয়গাম

বিচারপতি আফযল চীমা সাহেব এই মাত্র তাঁর বক্তৃতায় ভাগ্যাহত স্পেনের কথা উল্লেখ করে আমার হৃদয়ের পুরানো ক্ষত তাজা করে দিয়েছেন। সৌভাগ্য বলুন কিংবা দুর্ভাগ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐ লীলাভূমিতে ভ্রমণের ও তার মর্মন্তুদ ইতিহাস অধ্যয়নের সুযোগ আমার হয়েছিল। বিশ্বাস করুন, দু' একটি দেশ ছাড়া ইসলামী বিশ্বের প্রায় সব ক'টি দেশই কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু আমাদের হারানো স্পেনের রক্ত ভেজা মাটিতে পদার্পণ করা মাত্র আমার ব্যথা-বিহ্বল হৃদয় এক নতুন অনুভূতির পরশ পেল। মনে হলো, এখানকার মৃদুমন্দ পুলক আমায় জড়িয়ে ধরছে, আবেশভরে ললাটে চুমু খাচ্ছে। ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার মুসলিম আত্মাগুলো আমাকে আলিঙ্গন করছে। প্রতিটি ধূলিকণা যেন আমাকে শোনাতে চাচ্ছে এক বিশেষ পয়গাম। মনে হলো ইসলামী বিশ্বের ভবিষ্যত সম্পর্কে সে আমাকে সতর্ক করতে চাচ্ছে। প্রতিটি ধূলিকণা যেন বলছে ঃ দেখো, ইসলামী বিশ্বের আর কোন দেশে যেন এ মর্মন্তুদ নাটকের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আমার কথাগুলো তোমার যিম্মায় আমানত রইল, যতদূর কুলায় ইসলামী বিশ্বের ঘরে ঘরে তা পৌঁছে দিও। কেননা এটা তোমাদের সবুজ উদ্যানের একটি ঝরা ফুলের পয়গাম মনে রেখো, স্পেনের মত আরেকটি রক্তাক্ত অধ্যায় সংযোজনের আঘাত ইসলামের ইতিহাস আর সইতে পারবে না। তাই সে আঘাত ইতিহাস তোমাদের ক্ষমা করবে না। এ কথাগুলো মুখে উচ্চারণ করতেও হৃদয়ের গভীরে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের হারানো ফেরদাউসের পয়গাম। তাই ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি দেশে তা পৌঁছে দেয়া আমার পবিত্র কর্তব্য।

## এক যুগ সন্ধিক্ষণে ইসলামী বিশ্ব

ইসলামী বিশ্ব এখন এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়েছে। পুরানো কাঠামো ভেঙ্গে তার ওপর চলছে এক নতুন অবকাঠামোর বিনির্মাণ। একটা জাতির জীবনে এ সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ই জাতির ভাগ্যে ঘটে পরিবর্তন। নতুন করে লেখা হয় জাতির ভাগ্যলিপি, শুরু হয় নতুন ধারা। তেমনি একটি যুগ সন্ধিক্ষণই অতিক্রম করছে আজকের ইসলামী বিশ্ব। ইসলামী উম্মাহর আমূল ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এ সময় যেমন প্রয়োজন ঈমান ও বিশ্বাসের অবিচল শক্তির, তেমনি প্রয়োজন জীবন ও জগত সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়নের, নির্ভুল বিচার ও চিন্তাশীলতার, সময়োপযোগী পথ-নির্দেশনার, সর্বোপরি উম্মাহর ভবিষ্যত কল্যাণের পথে সীমাহীন আত্মত্যাগ ও কুরবানীর। এ

ছাড়া সময়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশ্ব ইতিহাস অতীত ও বর্তমান যেমন এর জ্বলন্ত সাক্ষী, তেমনি ভবিষ্যতও প্রমাণ করবে এ অমোঘ সত্য। কুদরতের পক্ষ থেকে আজ আমাদের ঈমান ও আকীদার যেমন পরীক্ষা হচ্ছে, তেমনি পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের জাতীয় মেধা, বুদ্ধি ও কর্মকুশলতারও। আমাদেরকে আজ এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সফল রূপায়ণ ঘটাতে হবে। নতুন সমাজের অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। গোটা জাতীয় জীবনের সকল শাখা ও কর্মকাণ্ডকে ঢেলে সাজাতে হবে ইসলামের আলোকে। ইসলামাবাদ হোটেল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত কালকের সম্বর্ধনা সভায় আমি আরয করেছিলাম, আকীদা ও বিশ্বাসরূপে ইসলাম আজো বহাল রয়েছে, কিন্তু তার সংস্কৃতি ও জীবনবোধ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এটা পাশ্চাত্যের এক কুটিল ষড়যন্ত্র। ওরা যখন দেখল, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়। ক্রুসেড যুদ্ধ থেকে শুরু করে স্পেনের মুসলিম নিধন-যজ্ঞসহ বহু ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য জাতিবর্গ এ তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলামী উম্মাহ খুবই সংবেদনশীল। অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তখন তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করল। তাদের নতুন কর্মপন্থা হলো, আকীদা ও বিশ্বাসের সংবেদনশীলতায় খোঁচা না দিয়ে অতি সন্তর্পণে ইসলামী উম্মাহকে ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত করা এবং আধুনিকতা ও প্রগতির নামে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। আমি মনে করি, পাশ্চাত্য তথা ইউরোপীয় জাতিবর্গ তাদের এ পরিকল্পনায় বড় রকমের সফলতাই লাভ করেছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ইসলামী বিশ্বে আকীদা ও বিশ্বাসের বিকৃতি তো ঘটেনি, কিন্তু তাহযীব-তমদ্দুন তথা ইসলামী জীবনধারায় নেমেছে প্রলয়ংকরী ধ্বংস। খ্রিস্ট ধর্মে অবশ্য আকীদা ও বিশ্বাসেরই বিকৃতি ঘটেছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে সেন্ট পল প্রদর্শিত পথে শুরু হয়েছিল খ্রিস্টবাদের নতুনরূপে যাত্রা যার ফলে একত্ববাদের স্থান দখল করে নিল ত্রিত্ববাদ এবং আল্লাহ্‌র নবী ঈসা হয়ে গেলেন খোদার পুত্র। এভাবে প্রতিমাভিত্তিক রোমান সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল একটি আসমানী ধর্মের সকল পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীতে ঘটনা পরিক্রমায় খ্রিস্টবাদের বিকৃতির গতি হয়েছে আরো তীব্র। প্রাচ্যের অলস ও ঘুমকাতর কাফেলার হাতে পড়লে অবশ্য খ্রিস্টবাদের এমন বিকৃত দশা ঘটত না। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিবর্গের অবস্থাই ছিল ভিন্ন। শক্তি তাদের উথলে পড়ছিল এবং অগ্রগতির অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা জেগে উঠেছিল। গোটা জাতির ধমনীতে টগবগ করছিল জীবন যৌবনের তপ্ত খুন। কাজেই অন্যান্য ক্ষেত্রের গতি প্রতিযোগিতার

সাথে তাল রেখে ধর্মের ক্ষেত্রেও বিচ্যুতি, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সমান গতিতে চলছিল। বস্তুত যারা খ্রিস্ট ধর্মের বাহক ছিল এবং যে সকল জাতির সাথে খ্রিস্ট ধর্মের ভাগ্য জড়িত ছিল—তারা ধীর গতিতে মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। ইউরোপের বিশেষ পরিবেশ পরিমণ্ডল তাদের বাধ্য করেছিল বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে এবং অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামে যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে। কাজেই গতি সঞ্চারিত হলো সব কিছুতেই। গতি সঞ্চারিত হলো খ্রিস্ট ধর্মের বিকৃতি ও বিচ্যুতির ক্ষেত্রেও। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে ইসলাম ধর্মে আকীদা ও বিশ্বাসের কোন বিকৃতি ঘটেনি এবং তা সম্ভবও নয়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ হচ্ছেন ইসলামের মুহাফিজ। আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

"আমিই অবতীর্ণ করেছি কুরআন এবং আমিই তার মুহাফিজ।" কিন্তু সংস্কৃতি ও জীবনধারার ক্ষেত্রে এসেছে আমূল পরিবর্তন। কেননা আকীদা, বিশ্বাস, আদর্শ ও কর্মসূচী শূন্যে অবস্থান করে না। তার জন্য চাই অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ, চাই স্বাধীন গতি ও নিজস্ব উপকরণ। সর্বোপরি চাই আদর্শভিত্তিক সমাজ সংগঠনের পর্যাপ্ত সুযোগ। আর ঠিক এ জায়গাটিতেই আঘাত করেছে আমাদের শত্রু অর্থাৎ আকীদা ও বিশ্বাসের সফল প্রয়োগের জন্য এবং তার সফলরূপে মহান ইসলামী নৈতিকতা ও জীবনধারার বিকাশ ঘটানোর জন্য যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন তা থেকে সুকৌশলে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে ইসলামী বিশ্বকে। ফলে অবিকৃত আকীদা ও বিশ্বাস ধারণ করেও ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুন থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে আজকের ইসলামী বিশ্ব। সেই ফাঁকে ইউরোপ অত্যন্ত সফলতার সাথে চাপিয়ে দিয়েছে তাদের তাহযীব ও তমদ্দুন।

## ইসলামের জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন

স্বভাবগত দিক থেকে, বংশগত দিক থেকে, কর্মপন্থার দিক থেকে আমার আত্মার সম্পর্ক সেই আদর্শ ও আদর্শবাদী দলের সাথে যারা মাটির কোলে বসে নীরবে মুনাজাত করার চেয়ে ঘোড়ায় চড়ে আকাশের অসীমতায় তকবীর ধ্বনি ছড়িয়ে দিতেই অধিক ভালোবাসে। আমি আমার পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র.), তাঁর সিংহ-হৃদয়, আত্মত্যাগী মুজাহিদ ও সাথী দলের কথা বলছি, অকাতরে যাঁরা প্রাণ বিলিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র পথে, ইসলামী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জিহাদে। ইসলামী ইতিহাসের নিকট অতীতে এমন দুঃসাহসী, অকুতোভয়, পূর্ণাঙ্গ ও নিবেদিতপ্রাণ দ্বিতীয় কোন মুজাহিদ দল বা সংগঠনের

সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই পুণ্য দলের সাথে সম্পর্কের সূত্রে আমি বিশ্বাস করি, ইসলামের জন্য ক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে স্বাধীন পরিবেশের, মুক্ত সমাজের। আমি আরো বিশ্বাস করি, আল্লাহ্‌র এ ফরমান প্রথম দিনের মত আজো তেমনি অমোঘ সত্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত এক অমোঘ সত্যরূপেই তা বিদ্যমান থাকবে।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ -

"এরা এমন লোক, যদি পৃথিবীর বুকে আমি তাদের প্রতিষ্ঠা দিই, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাতের বিধান চালু করবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

ভেবে দেখুন, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আবেদন, অনুরোধ ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে 'আদেশ' ও 'নিষেধ' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছে। আরবী ভাষার শব্দসম্ভার এতটা অকিঞ্চিতকর নয় যে, 'আদেশ' ও 'নিষেধ' শব্দ দুটি ছাড়া অনুনয় ও বিনয়সূচক কোন শব্দই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা সত্ত্বেও বেছে বেছে কেবল 'আদেশ' ও 'নিষেধ' শব্দ দুটিই ব্যবহার করা হয়েছে সর্বত্র। আর আদেশ ও নিষেধের জন্য প্রয়োজন শক্তি, প্রয়োজন ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা, যার ফলে আমরা আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সাথে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারব। নির্ভয়ে বলতে পারব, এটা ন্যায় কিংবা অন্যায়, এটা করতে হবে আর এটা করা চলবে না। এমন করলে ভালো হতো, আমরা অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে—এগুলো আদেশ ও নিষেধের ভাষা নয়। তাবলীগ ও আবেদনের ভাষা যথাস্থানে অবশ্যই প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌ই হচ্ছে ইসলামের মানদণ্ড। আর কুরআন-সুন্নাহ্‌র শব্দ হলো আদেশ ও নিষেধ। সুতরাং মুসলমানদেরকে শক্তি, ক্ষমতা ও নির্ভরতার এমন স্তরে অবশ্যই উন্নীত হতে হবে যেখান থেকে আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞা জারি করা সম্ভব। মানব স্বভাব তোষামোদে প্রীত ও তুষ্ট হয় সত্য, কিন্তু আল-কুরআনের ভাষায় সালাত কায়েম করা, যাকাতের বিধান চালু করা, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মত উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া মানবগোষ্ঠীর সার্বিক সংশোধন ও পূর্ণ শুদ্ধি কিছুতেই সম্ভব নয়।

### তবে শাখার ওপরই সব নির্ভর করে

যদিও আমার সম্পর্ক ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জিহাদে জীবন উৎসর্গকারী সেই মুজাহিদ দলের সাথে, যদিও আমি শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী, তবু আমি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করব, গাছের যে

শাখায় আমরা আমাদের নীড় রচনা করব সে শাখার ধারণ ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে নীড় রচনার সাধনায় আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতা। শাখা তরতাজা ও মযবুত থাকলে তবেই প্রশ্ন আসে নীড়টি কি ধরনের হবে—বুলবুলির হবে, না বাবুই পাখির হবে। শাখাই যদি না থাকে কিংবা ভেঙে গিয়ে থাকে, তখন নীড় কী ধরনের হবে সে প্রশ্নই অবান্তর।

যে শাখার ওপর আমরা আমাদের নীড় রচনা করতে চাই, তা হলো আমাদের বিদ্যমান সমাজ ও চলমান সমাজ জীবন। শহরের জনস্রোত, হাট-বাজারের দোকানদার-খরিদ্দার, কলকারখানার মালিক-শ্রমিক, কৃষিজীবী, পেশাজীবী, শিক্ষাজীবী ও বুদ্ধিজীবী—এক কথায় সর্বস্তরের মানুষ হলো সেই সমাজের বাসিন্দা। এরাই হলো সমাজ জীবনের স্পন্দন, নগর সভ্যতার প্রাণ-চাঞ্চল্য। এরাই হলো দেশের মূল প্রাণশক্তি। সুতরাং আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে সমাজ জীবনের গতি-প্রকৃতি কি? সমাজ-বাসিন্দাদের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি কি? তাদের রুচি ও অনুভূতি কোন্ মুখী? নীড় রচনা ও তার ভার বহনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাদের মধ্যে কি পরিমাণ রয়েছে? কোনো নিরাপদ ভূখণ্ডের ওপর যত সুউচ্চ ইমারত ইচ্ছে হয় তৈরি করুন। কিন্তু গাছের কোন শাখায় নীড় রচনা করার মুহূর্তে আপনাকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে ওপরের প্রশ্নগুলো তলিয়ে দেখতে হবে। শাখা যদি শুকনো ও দুর্বল হয়, শাখা যদি নীড়ের ভার বহনে অক্ষম হয়, শাখা যদি বিদ্রোহ করে বসে তবে আমাদের সুদীর্ঘ সাধনা, সযত্ন প্রয়াস সবই নিরর্থক। মোট কথা, সব কিছু নির্ভর করে সমাজের গতি-প্রকৃতি ও ধারণ ক্ষমতার ওপর। সমাজ জীবনের দাবী কি? বিশ্বাস ও নৈতিকতার বিচারে সমাজ কোন্ স্তরের? জীবনের মৌলিক বিষয়াদি, মূলনীতিমালা ও মানবতার প্রাথমিক শর্তগুলো সেখানো রয়েছে কিনা।

অথচ আজকের সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র হলো, অন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ ও প্রবৃত্তির গোলামী তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। ডাঙায় তোলা মাছ যেমন ছটফট করে, আমাদের বর্তমান সমাজও সংস্কার ও সংশোধনের আহ্বানে, আল্লাহভীতি ও সৎ জীবন যাপনের ডাকে এবং অশ্লীলতা ও পাপাচার বর্জনের চাপ প্রয়োগে ডাঙায় তোলা শ্বাসরুদ্ধ মাছের মত ছটফট শুরু করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে হযরত লূত (আ.)-এর কওমের কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবীর সেরা কথাশিল্পী ও অলংকারশাস্ত্রবিদকেও শ্রদ্ধাবনত হতে হয় আল-কুরআনের অলৌকিক বর্ণনাশৈলীর সামনে। একটি বিকৃত রুচির পচন ধরা সমাজের মনোভাব ও অনুভূতি কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আল-কুরআন ঃ

اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ

"তোমাদের বস্তি থেকে লূতের অনুসারীদের বের করে দাও; ওদেরকে ভালো লোক মনে হচ্ছে।"

গোটা সমাজ যেন চিৎকার জুড়ে দিল এবং লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বলে উঠল, "অত ভাল লোক দিয়ে আমাদের কাজ নেই। সাধুদের স্থান নেই এ সমাজে। বের করে দাও ওদের। আমরা তো পংকিলতায় আকণ্ঠ ডুবে আছি। পংকিলতার জীব আমরা, এতেই আমরা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। সুতরাং পবিত্রতা ও সাধুতার যে ঢল নেমেছে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।"

সমাজের এহেন রুচি বিকৃতি ও সমাজ জীবনের এহেন পাপাচারমুখী ধারা-প্রকৃতি উপেক্ষা করে বৃহত্তর সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোন কোণায় বসে কাগজের পৃষ্ঠায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার যত সুন্দর ও নিখুঁত চিত্রই আঁকা হোক না কেন, সেই সমাজে তার সফল প্রয়োগ কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং নীড় রচনার পূর্বেই আপনাকে ভেবে দেখতে হবে শাখার অবস্থা। যদি ডাল কাটার জন্য হাজার কুড়াল উদ্যত হয় আর তাতে নীড় রচনা করতে উদ্যোগী হয় মাত্র দু'একজন লোক, তবে যত যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী তারা হোক, উপকরণ ও সরঞ্জাম তাদের হাতে যত পর্যাপ্তই হোক, হাজার জনের কুঠারাঘাতের মুকাবিলা তাদের নীড় রচনার এ প্রচেষ্টা তথা সমাজ সংস্কারের এ গঠনমূলক তৎপরতা সফলতার মুখ দেখবে না কোনদিন। কিছু লোক দেওয়াল গাঁথার কাজে নিয়োজিত আর কিছু লোক দেওয়াল ভাঙার কাজে তৎপর, এরূপ ক্ষেত্রে কোন ইমারত তৈরি হতে পারে না।

### সমাজ হলো ক্ষেত্র

সমাজকে মনে করা যেতে পারে জমি বা ভূখণ্ড। জমি যদি উপযোগী হয় তবে তাকে উদ্দিষ্ট কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু সমাজ যদি কুরআনের ভাষায় অপসৃয়মাণ ও স্থানান্তরগামী বালুটিলার মত হয়, এমন যে, বাতাস এল, বালু উড়িয়ে নিয়ে গেল। আজ দেখা গেল উঁচু টিলা, হঠাৎ মরুবাতাস এসে তা সমতলে পরিণত করে দিল। সমাজের অবস্থা এমন চলমান বালুর ন্যায় হলে যে কোন চতুর ও ধূর্ত লোক সে সমাজকে বিপথগামী করতে পারে অতি সহজে। খড়-কুটার মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে যে কোন দিকে। কেননা সে সমাজের বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না, বরং বাতিল শক্তি, ভ্রান্ত আন্দোলন, ভুল দর্শন ও মতবাদের সহজ শিকারে পরিণত হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

আজ বাস্তব অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে, মুসলিম বিশ্বের কোথাও এমন একটি ইসলামী সমাজ নেই যার ওপর পূর্ণ ভরসা করে আপনি ইসলামী বিধান প্রবর্তনের দুরূহ কাজে এগুতে পারেন। সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলি! হয়ত সকলে আমার সাথে একমত হবেন না, তবু আমি জামাল আবদুন নাসেরের কথা বলতে চাই। এই সেদিনের কথা, মিসরে জামাল আবদুন নাসেরের ক্ষমতার তখন স্বর্ণযুগ। অবস্থা দেখে মনে হতো, মিসরে বুঝি এমন একটিও প্রাণী নেই যার নাসেরের সাথে কোন বিষয়ে দ্বিমত আছে। গোটা মিসর যেন নাসেরের নামে মাতোয়ারা। উষ্ণ করতালি আর গগনবিদারী জয়ধ্বনিতে লক্ষ জনতা ভেঙে পড়ত নাসেরের গাড়ীর পেছনে। এমনি সর্বপ্লাবী ছিল তার জনপ্রিয়তা। মনে হতো দেবতার আসনে বসিয়ে বন্দনা করতে পারলেই বুঝি মিসরীয়দের মন ভরে! কিছুদিন পর যখন মিসরবাসীদের মোহ ভঙ্গ হলো—দেখা গেল সব ফাঁকা, সব অন্তঃসারশূন্য। এখন তো মুখ না ভেংচিয়ে কেউ তার নাম উচ্চারণ করতেও রাযী নয়। মুসলিম বিশ্বে চলমান বালুটিলার ন্যায় এমন সমাজের আরো অসংখ্য নযীর রয়েছে, যে কোন সুচতুর ব্যক্তি তার ছলনা দিয়ে সেখানকার বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলকে এমন মোহগ্রস্ত করে ফেলতে পারে যে, তার পানে লুটিয়ে পড়তেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না কেউ। এ অবস্থা খুবই বিপজ্জনক ও ভয়াবহ।

### ইসলামী শরীয়তের আশু বাস্তবায়ন চাই

ইসলামী আইন প্রণয়ন ও শরীয়ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে মোবারক উদ্যোগ-আয়োজন বর্তমানে আপনাদের দেশে চলছে, সে ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা আদৌ আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। এমন ভুল ধারণা করার অনুমতি আমি আপনাদের দেব না। কেননা এ মহান প্রচেষ্টার পথে মুহূর্তের বাধা সৃষ্টিকেও আমি মনে করি জঘন্যতম অপরাধ। আমার উদ্দেশ্য শুধু এ বাস্তবতাকে তুলে ধরা, সমাজ ও তার জীবনধারার ওপরই নির্ভর করে যে কোন প্রচেষ্টার সফলতা।

সমাজ যদি আমাদের পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়, ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দ, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রেডিও-টেলিভিশন, মোটকথা সকল প্রচার মাধ্যমে যদি আমরা একযোগে প্রচেষ্টা চালাই এবং পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অভিরুচি ও অনুভূতি-উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটিয়ে যদি আমরা সমাজ জীবনের সর্বত্র সততা, আল্লাহভীতি, ভাবতন্ময়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করতে পারি, পারি যাবতীয় প্রলোভন ও নৈতিকতার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে, তখন এ সমাজের ওপর যে কোন কঠিন বোঝা চাপানো যেতে পারে। ইসলামী খিলাফতের গুরুভারও তখন সে

বহন করতে পারবে স্বচ্ছন্দে। এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, সমাজ সংশোধনের কাজে সমাজের বুকে প্রভাব সৃষ্টিকারী সব ক'টি শক্তি যদি একযোগে সহযোগিতার ভিত্তিতে কিছু সময় নিয়োজিত থাকে, তবে ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ লালিত স্বপ্নও বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে, অথচ বর্তমান অবস্থা হলো, দেশের সব ক'টি প্রচার মাধ্যম তাদেরই হাতের মুঠোয় এবং সমাজ জীবন তাদেরই নিয়ন্ত্রণে যাদের সম্পর্কে আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

"যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটাতে চায়, পরকালে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ্ই জানেন; তোমরা জানো না।"

(বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তর পরিসরে) এ আয়াতটি এক জীবন্ত মু'জিযা। (কারণ আয়াতের ব্যাপক অর্থ আজ বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে) আয়াত অবতরণ কালে মদীনার সীমিত সমাজ পরিসরে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। মজলিসে মজলিসে তার সরস আলোচনা হচ্ছিল। অবশ্যই ঘটনাটি হৃদয়বিদারক ছিল। কিন্তু আয়াতের ব্যাপকতা ছিল আরো অধিক যুগ ও শতাব্দীর সীমানা পেরিয়ে, ইতিহাস ও ভূগোলের ব্যবধান ডিঙ্গিয়ে এ আয়াত আরো ব্যাপক প্রেক্ষাপট, আরো গভীর ভাব ও মর্মের অনুসন্ধান করছিল। আজ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি আয়াতের ব্যাপক তাফসীর।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -

"যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটাতে চায়"। আধুনিক যুগের পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, গল্প-উপন্যাস তথা নগ্ন সাহিত্য, ছায়াছবি ও ব্লু ফিল্মের ছড়াছড়ি। এসব যে আলোচ্য আয়াতের শুধু তাফসীরই নয়, বরং বাস্তব চিত্রও তুলে ধরেছে বিশ শতকের মানুষের কাছে যা কল্পনা করাও অতীতের অন্য কোন সময় ছিল সুকঠিন। মদীনার সে পরিবেশে লোকেরা হয়ত বা ঈমান বিল-গায়বের আশ্রয় নিয়েছিল কিংবা বিশেষ কোন ঘটনার সাথে আয়াতের সামঞ্জস্য খুঁজে নিয়েছিল। কিন্তু দুনিয়ার সকল শয়তানী শক্তি আজ যেভাবে ان تشيع الفاحشة। তথা অশ্লীলতার প্রচার-প্রসারে আদাজল খেয়ে লেগেছে তা কি পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিল?

## ধীরগামী কচ্ছপ ঘুমিয়ে দ্রুতগামী খরগোশ কর্মে

বন্ধুরা! শৈশবে আমরা সকলে কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতার মজাদার কাহিনী পড়েছিলাম। দ্রুতগামী অথচ অলস খরগোশ কিছু দূর গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, পক্ষান্তরে ধীরগামী অথচ পরিশ্রমী ও কর্মনিষ্ঠ কচ্ছপ বিরামহীনভাবে পথ চলে প্রতিযোগিতায় জিতে গেল। এতো হলো কাহিনীর খরগোশ বনাম কচ্ছপ প্রতিযোগিতা। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজও প্রতিদ্বন্দ্বিতা খরগোশ কচ্ছপেই চলছে, তবে ধীরগামিতা সত্ত্বেও কচ্ছপ ঘুমিয়ে আছে, পক্ষান্তরে বিস্ময়কর দ্রুতগামিতা সত্ত্বেও খরগোশ জাগ্রত ও কর্মতৎপর। পৃথিবীর ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলো হচ্ছে আধুনিক যুগের সেই খরগোশ আর আমাদের অবস্থা ঘুমন্ত কচ্ছপের চেয়েও করুণ। বর্তমান বিশ্বের কল্যাণকামী ও ধ্বংসপ্রয়াসী শক্তিগুলোর মাঝে তুলনা করে দেখুন, সর্বত্র আপনি দেখতে পাবেন খরগোশ কচ্ছপের এ আধুনিক প্রতিযোগিতা।

নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে মানবতার ধ্বংস তরান্বিত করার অপপ্রয়াসে পৃথিবীর সকল অপশক্তি আজ একযোগে মাঠে নেমেছে। প্রচার মাধ্যমসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, উপায়-উপকরণ আজ তাদের দখলে। ফলে অবলীলাক্রমেই তারা চালিয়ে দিতে পারে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত বলে, আলোকে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলো বলে। অপরদিকে ছিটেফোঁটা কল্যাণ ও গঠনমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো ভুগছে সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের দৈন্যে। তাদের না আছে মানুষকে আকর্ষণ করার কোন সম্মোহন শক্তি আর না আছে সিদ্ধান্ত প্রয়োগ ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কোন ক্ষমতা।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আজ অত্যধিক গুরুতর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ ভুল ধারণা মানুষের মনে আজ শিকড় গেড়ে বসেছে, সমষ্টি ও সংগঠনই আজকের সমাজের মূল প্রয়োজন। ব্যক্তি এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা আধুনিক যুগ হচ্ছে সংগঠনের যুগ। সংঘবদ্ধতার যুগ। সমাজ-দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান ও পৌর বিজ্ঞানের নামে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার এমনই প্রচার করা হয়েছে যে, ব্যক্তির প্রশ্ন মানুষের চোখে এখন একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে। সবার মগজে একথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, স্বস্থানে কতক ব্যক্তি যত অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্তই হোক, অনেক ব্যক্তি যখন একত্র হবে এবং তাদের সমন্বয়ে একটি সংগঠন জন্মলাভ করবে, তখন সংগঠনের সুবাদে তা হবে কল্যাণকর ও ফলপ্রদ। যুক্তিটা কতকটা যেন এ ধরনের, কাষ্ঠখণ্ড নিম্নমানের হোক কিংবা ঘুণে ধরা

হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা সব কাষ্ঠখণ্ড একত্র করে যখন নৌকা বা জাহাজ তৈরি হবে তখন সমন্বয়ের বদৌলতে তা হয়ে যাবে দোষমুক্ত ও নিখুঁত। প্রতিটি কাষ্ঠখণ্ডের স্বতন্ত্র দোষ বিলীন হয়ে যাবে সমষ্টির গুণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ডাকাতরা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকবে, ততক্ষণ তারা ডাকাতরূপে গণ্য হবে। কিন্তু সেই ডাকাতরা যদি দলবদ্ধ হয়ে সংগঠন তৈরি করে নেয় তখন তারা হবে ভক্ষকের পরিবর্তে রক্ষক। চোরেরা যদি কোন সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তবে তারা লাভ করবে চৌকিদারের মর্যাদা। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেই চোর। এ অদ্ভুত যুক্তি কিছুতেই আমি হজম করতে পারি না। একজন ডাকাতকে ডাকাত বলা হলে এক শ' জন ডাকাতের সংঘবদ্ধ দলকে কেন ডাকাত বলা হবে না? কী গুণগত পরিবর্তন এসেছে তাদের মধ্যে? সংঘবদ্ধ ডাকাতদল তো নাগরিক জীবন ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অধিক হুমকিরই কারণ হবে।

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর অবস্থাও অভিন্ন। ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার সরকারগুলোর কথাই ধরুন কিংবা প্রাচ্যের সরকারগুলোর প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। চরিত্রহীন, নৈতিকতাবর্জিত, স্বার্থান্ধ ও অর্থলোলুপ কিছু লোক একজোট হয়ে একটি সামাজিক ব্যবস্থা ও কাঠামো তৈরি করেছে এবং সেই সমাজ ব্যবস্থা ও কাঠামোর মাধ্যমে গোটা জাতির ভাগ্য নির্ধারণের মালিক মোখ্‌তার সেজে বসেছে!

## ইসলামের তূণীরে একটি মূল্যবান তীর

এদেশে আপনাদের সামনে আল্লাহ্ পাক এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। এদেশের বাসিন্দাদের অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে, দেশের সমাজ কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তন করা উচিত। সেই সাথে দেশ শাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাও ইসলামী শরীয়তের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত। এটা অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ ও বরকতপূর্ণ অনুভূতি এবং তা এদেশবাসীর প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ। আমি বিশ্বাস করি, এটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের বিশেষ ইচ্ছা ও ফয়সালা এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এদেশ অর্জিত হয়েছিল। সে কারণেই আল্লাহ্ পাক আরেকবার আপনাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দিয়েছেন। সুতরাং আমার আন্তরিক পরামর্শ, আল্লাহ্র দেয়া এ সুবর্ণ সুযোগকে নিয়ামতরূপে গ্রহণ করুন এবং গোটা জাতি এক দেহ হয়ে ইসলামী উম্মাহর কল্যাণে এর সদ্ব্যবহার করুন।

সেই সাথে আমি সুধীমণ্ডলীর সতর্ক দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই, তূণীর থেকে তীর নিক্ষিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই তীরের কার্যকারিতা সম্পর্কে মানুষের মনে সুধারণা বিদ্যমান থাকে, তার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে এবং মানুষের মনে ভীতিও সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু ধনুক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে শুধু বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা—অন্য কিছু নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, শরীয়ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী হচ্ছে ইসলামের তূণীরে একটি মূল্যবান তীর। আর ইসলামী শরীয়ত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন আমার দৃষ্টিতে শুধু কতেক দণ্ডবিধি জারি করাই নয়, বরং শরীয়ত ব্যবস্থা প্রবর্তন কথাটি খুবই ব্যাপক অর্থ বহন করে। এজন্যই কোন দেশের সার্বিক অবস্থা, দেশবাসীর উদ্দেশ্য ও মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত না হয়ে সমর্থনসূচক বক্তব্য প্রদানে সম্মত নই।

মোটকথা, বিশ্ববাসীকে এতদিন এক কথাই বলা হয়েছে, ইসলামের তূণীরে 'শরীয়ত ব্যবস্থা' নামক একটি তীর রয়েছে যা ব্যবহার করা হলে বিশ্বমানবতার জন্য খুলে যাবে সৌভাগ্যের দুয়ার। অজস্র ধারায় নেমে আসবে কল্যাণ ও বরকত। এ তীর যতদিন তূণীরে রক্ষিত আছে, ততদিন শত্রুর মুখ ও কলম নিশ্চুপ থাকবে। আমাদের কৈফিয়ত দেয়ার অবকাশ থাকবে, কোথাও তো শরীয়ত ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রবর্তন হচ্ছে না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটছে না। সুতরাং কী করে কল্যাণ ও বরকতের আশা করা যেতে পারে? কিন্তু ধনুক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর কৈফিয়তের আর কোন অবকাশ থাকে না। আরো মনে রাখতে হবে, এ মূল্যবান তীর একবারই শুধু ব্যবহার করা যেতে পারে। ইতিহাসের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাদের বলছি, এ তীর বারংবার ব্যবহারযোগ্য নয়। এ তীর একবার নিক্ষেপ করে পুনরায় তূণীরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং মনে রাখতে হবে, বিষয়টি যেমন খুবই নাযুক, তেমনি সময়টিও খুবই সংকটপূর্ণ। এমন এক মহতী অনুষ্ঠানে যেখানে দেশের প্রধান বিচারপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ, বিশিষ্ট আলিম ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন, পূর্ণ দায়িত্বের সাথে আরয করছি, শুধু পাকিস্তানের ইতিহাসেই নয়, বরং গোটা ইসলামী বিশ্বের ইতিহাসে আজ খুবই নাযুক ও সংবেদনশীল এক মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনা যেমন থাকে তেমনি থাকে ব্যর্থতার সমূহ আশংকাও। বস্তুত সফল ও ব্যর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমষ্টিই হচ্ছে মানব জীবন। সমস্যাসংকুল জীবনের বন্ধুর পথে মানুষ হোঁচট খায়, আবার সামলে নেয়। পড়ে গিয়ে আবার

উঠে দাঁড়ায়। এভাবেই নির্দিষ্ট একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে জীবন। ব্যক্তির জীবনে এটা যেমন সত্য তেমনি জাতির জীবনেও তা অমোঘ সত্য। ইতিহাসের অতল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মুখে জাতির 'প্রাণতরী' একবার তলিয়ে যায়, আবার ওপরে ভেসে ওঠে। এটাই প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধান। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা জাতির ব্যর্থতা ততটা ক্ষতিকর নয়, যতটা ক্ষতিকর আগামী দিনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। সুতরাং আপনাদেরকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে ভেবে দেখতে হবে, যে মহান পদক্ষেপ আপনারা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সে গুরুভার বহন করার যোগ্যতা এবং তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানানোর মনোভাব রয়েছে কিনা। এজন্যই বারবার অত্যন্ত জোর দিয়ে আমি একথা বলছি, সমাজ সংস্কারের কাজ ব্যাপক পর্যায়ে শুরু হওয়া উচিত। মসজিদের মিম্বর থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যালারী থেকে, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অংগন থেকে, রেডিও-টেলিভিশনসহ সরকারী-বেসরকারী সকল প্রচার মাধ্যম থেকে, এমন কি রাজনৈতিক বক্তৃতার মঞ্চ থেকেও একযোগে শুরু হতে হবে সে উদ্যোগ। কেননা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি শিকড় গেড়ে বসে থাকে ঘুষ-দুর্নীতি, জুলুম-অবিচার, মানুষের হৃদয় যদি হয়ে যায় পাষাণ, যদি লোপ পেয়ে যায় সহমর্মিতা, সহানুভূতি, হিতাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ কামনার মত সদগুণাবলী, তবে বুঝতে হবে এ জাতির জন্য (এবং তার পরিণতিতে গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্য) অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ দুর্যোগ।

### স্পেন থেকে কেনো বিতাড়িত হলাম

স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তিসহ বড় কারণ ছিল ইসলামের প্রতি তাদের উপেক্ষার আচরণ। বস্তুত চরিত্র, আদর্শ ও শিক্ষার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তারা কখনই সচেষ্ট হয়নি। ফলে তাদের প্রভাবক্ষেত্র উত্তর দিকে সম্প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে এসেছে দক্ষিণে। খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে তারা কাছে টেনে নেয়নি। ইসলামের সুমহান আদর্শ ও চরিত্র তাদের সামনে তুলে ধরেনি। ইউরোপের কেন্দ্রস্থলের দিকে তারা নযর দেয়নি এবং নিজেদের সমাজ ও পরিবেশের সংস্কার সংশোধন সম্পর্কেও যত্নবান হয়নি। তারা বরং ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল মনোরম সৌধ নির্মাণে ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে। রসশাস্ত্র তথা ললিতকলা, কাব্য ও সঙ্গীত চর্চায় তারা ছিল মশগুল। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তারা ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের শিকার। রবীআ, মুদার, ইয়ামানী ও হিজাযী ইত্যাদি গোত্রীয় কোন্দল ছিল তুঙ্গে।

ভাষা সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক ও বর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কিংবা সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে এমন কাল ব্যাধি যা একটা জাতিকে দ্রুত ঠেলে দেয় নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। তাই আল-কুরআন আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছে ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এক বংশের লোকেরা অন্য বংশের লোকদের উপহাস করো না। হতে পারে এরা ওদের চেয়েও উত্তম, বিশেষত মেয়েরা যেন অন্য মেয়েদের সমালোচনা না করে। হতে পারে এরা ওদের চেয়ে উত্তম এবং নিজেদের দোষারোপ করো না এবং একে অপরের জন্য মন্দ নাম ব্যবহার করো না।"

স্রষ্টার পক্ষ থেকে এ পরামর্শ ব্যক্তিপর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়। দেশ, সমাজ ও জাতির জন্যও একথা প্রযোজ্য। এসব ধ্বংসাত্মক ব্যাধি কত শত জাতির পতন ঘটিয়েছে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তার কোন ইয়ত্তা নেই। পাকিস্তানে হিজরতকারী আমার ভারতীয় বন্ধুদের আমি বলেছিলাম, আপনারা নতুন দেশে যাচ্ছেন, ভালো কথা; কিন্তু মন থেকে আপনারদের এ অহংবোধ অবশ্যই দূর করতে হবে, আমরা হলাম মূল ভাষাভাষী, আমাদের রয়েছে স্বতন্ত্র কৃষ্টি ও লোকাচার। আমাদের আচরণই হচ্ছে সভ্যতার মাপকাঠি। এসব ঘৃণ্য অহমিকা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন এবং সেখানকার আদি বাসিন্দাদের সাথে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিলে মিশে একাকার হয়ে যান।

বিশ্বদরবারে নিজের ভাবমূর্তি সমুন্নত করা ও ইসলামী উম্মাহর কল্যাণে কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা পাকিস্তানের পক্ষে তখনই সম্ভব যখন এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে ভাষা-বর্ণ ও আঞ্চলিক বিভেদ ও ভেদাভেদমুক্ত এক আদর্শ সমাজ। এই সাম্প্রদায়িক বিষই ছড়িয়ে পড়েছিল স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে। ফলে খ্রিস্টবাদের যে খড়্গ তাদের মাথার ওপর ঝুলছিল সে কথা বিস্মৃত হয়ে তারা লিপ্ত হলো বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও গোত্রীয় প্রাধান্য কায়েমের প্রতিযোগিতায় এবং গোত্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায়। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, এ ধরনের আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড পাকিস্তানের মাটিতে যেন কোন অবকাশ খুঁজে না পায়। এমন বিশিষ্ট মজলিস ও এমন শোভনীয় পরিবেশ হয়ত আমি আর পাব না, তাই হৃদয়ের সবটুকু ব্যথা ও দরদ ঢেলে দিয়ে আপনাদের খিদমতে এ

হিতাকাঙ্ক্ষামূলক পরামর্শ পেশ করছি। সর্বশক্তি দিয়ে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা প্রতিরোধ করুন। তবে শক্তি প্রয়োগ কিংবা কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ, তা প্রতিরোধের পন্থা নয়। আফযাল চীমা সাহেবের সুরে সুর মিলিয়ে বলব, ইসলামী ঐক্য, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শুধু আমরা পারি সাম্প্রদায়িকতার কবর রচনা করতে। আমি আবার বলব, ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু যেন অন্তত পাকিস্তানের মাটিতে শিকড় গাড়তে না পারে।

আমি মনে করি, সারা বিশ্ব আজ দুটি মাত্র শিবিরে বিভক্ত। ইসলামী শিবির এবং কুফরী ও ধর্মহীন শিবির। এ ব্যাপারে কারো চিন্তায় সামান্যতম বিচ্যুতি কিংবা কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ থাকলে আমি আল-কুরআনের সেই ঐশী ঘোষণা আবার আপনাদের শুনিয়ে দেব যা অবতীর্ণ হয়েছিল মদীনার উদীয়মান ইসলামী সমাজের উদ্দেশে। মদীনার বুকে যে নতুন ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তন হচ্ছিল তা একদিকে যেমন আনসার মুহাজির তথা স্থানীয় ও বহিরাগত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, তেমনি অন্যদিকে খোদ স্থানীয় আনসাররাও ছিল আওস-খাযরাজ—দুই প্রতিপক্ষ গোত্রে বিভক্ত। আনসার মুহাজিরদের মাঝে রেষারেষি ও তিক্ততার ইতিহাস অতটা দীর্ঘ ছিল না, যতটা ছিল দুই আনসার গোত্র—আওস ও খাযরাজের মাঝে। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তারা। সে যুদ্ধের জের তখনো অব্যাহত ছিল। উভয়ের চোখ ছিল রক্তবর্ণ। সামান্য একটি উসকানিমূলক কবিতা আবৃত্তিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত প্রতিশোধের দাবানল।

**একবারের ঘটনা :** আওস খাযরাজের কোন এক যৌথ মজলিসে জনৈক শঠ য়াহূদী এসে উদ্দীপনাময় উসকানিমূলক কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। সাথে সাথেই পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। অসি কোষমুক্ত হওয়াই বাকি ছিল শুধু। সংবাদ পাওয়া মাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং উভয় পক্ষকে ইসলামের একতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী শোনালেন। ফলে হঠাৎ উসকে-ওঠা প্রতিহিংসার আগুন আবার নিভে গেল।

মদীনার সেই নবগঠিত শিশুসমাজের বিপক্ষে ছিল গোটা বিশ্ব ও বিশ্বের সকল আগ্রাসী শক্তি। একদিকে হচ্ছে বায়যন্টাইন ও সাসানী সাম্রাজ্যদ্বয়। দূরবর্তী হিন্দুস্তান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল। অন্যদিকে এসবের বিপক্ষে ছড়িয়েছিল মাত্র হাজার কয়েক লোকের একটি ক্ষুদ্র সমষ্টি, বিন্দুর মত একটি সংগঠন, একটি ঐক্য, যার সম্পর্কে অতগুলো বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার কথা কল্পনা করা অতি বড় স্বপ্নবিলাসীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না-তাকেই কিনা

সতর্কবাণী দেয়া হচ্ছে এই বলে, তোমরা যদি তোমাদের ঐক্যে অবিচল না থাক, তোমরা যদি তোমাদের ভ্রাতৃত্ব মযবুত না কর, যদি তোমাদের মধ্যে এ বিষয়ে দেখা দেয় সামান্যতম অবহেলা, তাহলে তার পরিণতি হবে পৃথিবীর বুকে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও সীমাহীন অন্যায়ের বিস্তার।

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

একটু বিবেচনা করে দেখুন, সার্বিক মানবতার ভাগ্য পরিবর্তনে কোন অবদান রাখার যোগ্যতা নবগঠিত এ সমাজটির ছিল কি? তবু এ ক্ষুদ্র সংগঠন, এ ক্ষুদ্রতম ঐক্য ছিল মুমূর্ষু মানবতার শেষ আশা-ভরসা। মদীনার সে ক্ষুদ্র সমাজই ছিল মানবতার মূলধন। এজন্যই তাদের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে ঐশী হুশিয়ারী সংকেত, তোমাদের যদি ঘটে সামান্যতম বিচ্যুতি, আর তার ফলে তোমাদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বে ধরে ফাটল, তবে তার পরিণতিতে তোমরাই যে শুধু ধ্বংস হবে তা নয়, বরং

تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

পৃথিবীতে দেখা দেবে চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। পৃথিবী পরিণত হবে জ্বলন্ত এক নরককুণ্ডে। আমিও আপনাদের বলছি—আল্লাহ্ না করুন—পাকিস্তানের বুকে যদি এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রতি মুহূর্তে সে আশংকা বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে মনে রাখুন, ধ্বংসের হাত থেকে পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই। আল্লাহ্ না করুন, পাকিস্তানের মাটিতে ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবে পৃথিবীর আর কোন দেশে আল্লাহ্‌র কোন বান্দা ইসলামী শরীয়তের সপক্ষে আওয়াজ তোলার সুযোগ পাবে না কোনদিন।

আমি স্থির বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, পাশ্চাত্য জগতসহ গোটা অমুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি এখন সেসব দেশের প্রতি নিবদ্ধ, যেখানে ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তনের দাবী ও আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। এ পরীক্ষা ব্যর্থ হলে শত্রুদের পথ নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে। তাই আমি আবারো আরয করব, আপনাদের সামনে এখন খুবই নাযুক ও সংবেদনশীল মুহূর্ত। এখন আপনাদের করণীয় হলো পূর্ণ উদ্যম ও শক্তি, মেধা ও বুদ্ধি, মনোবল ও সাহসিকতা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর মনোভাব নিয়ে সকল বিভেদ ও বিভক্তি মুছে ফেলে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়া। আপনাদেরকে আজ ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে পাকিস্তানের স্বার্থ এবং আরো উর্ধ্বে উঠে ইসলামের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে হবে। উপরিউক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে পারলে দেখবেন বিশ শতকের ইসলামী ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। এক

স্বর্ণযুগের হবে উদ্বোধন। পাকিস্তানের পাক ভূমিতে জন্মলাভ করবে এমন এক আদর্শ সমাজ, যা দেখতে সারা বিশ্ব থেকে শুধু পর্যটকরাই নয়, দলে দলে গবেষক ও পর্যবেক্ষকরাও ছুটে আসবেন আপনাদের দেশে, আর ফিরে যাবে আত্মার সজীবতা ও হৃদয়ের প্রশান্তি নিয়ে। স্বদেশবাসীদের কাছে তারা বলবেন সেই সোনালী সমাজের গল্প—পাকিস্তানের পাক ভূমিতে আমরা দেখে এসেছি এমন এক আদর্শ সমাজ, যেখানে পাপ নেই, পংকিলতা নেই, লোভ নেই, লালসা নেই, নেই হিংসা ও বিদ্বেষ। সেখানে আছে পুণ্যের স্নিগ্ধতা, আছে আত্মার তৃপ্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তি, আছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও সমবেদনা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেখানে অজস্র ধারায় বর্ষিত হয় কল্যাণ ও বরকত এবং করুণা ও রহমত। পৃথিবীতে স্বর্গ যদি দেখবে তবে চল পাকিস্তানের পাক ভূমিতে।

তবে এদিকেও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এটা বরফ গলানোর মত সহজ কর্ম নয়, নয় ভোজবাজির মত এক রাতেই ঘটে যাবার বিষয়। তাহলে তো বেশ মজাই হতো, বরং সাধনা, নিরলস প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও কুরবানীর বিশাল ধু ধু প্রান্তর পাড়ি দিয়েই শুধু পৌছানো যেতে পারে স্বপ্নের সেই সবুজ জান্নাতে। আর তার ওপরই নির্ভর করবে ইসলামের ভবিষ্যত অগ্রগতি ও আপনাদের দেশের ভাগ্যের।

পরিশেষে যাঁরা এমন একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন তাঁদের জন্য রইল আমার হৃদয়ের শুভ কামনা ও কল্যাণ প্রার্থনা এবং তাঁদের জন্যও যাঁরা এখানে আসার কষ্ট স্বীকার করে আমাকে বাধিত করেছেন।

# আলিম ও সুধী সমাজের দায়িত্ব

[২২ জুলাই ৭৮ ইং ফয়সলাবাদ জামে মসজিদে প্রদত্ত ভাষণ। দেশের বিশিষ্ট উলামা, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকবৃন্দ ও সাহিত্য, সংবাদপত্র, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামী আইন গবেষণা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য মাওলানা মুফতী সাইয়াহুদ্দীন কাকাখীল স্বাগত ভাষণ দান করেন।]

হাম্দ ও সালাতের পর

শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কিরাম ও দেশের বিভিন্ন মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকবৃন্দ!

আপনাদের খিদমতে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য পেশ করার পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক কথা পেশ করতে চাই।

## আলিম ও সুধী সমাজের দায়িত্ব

বর্তমান সময়ে দেশের আলিম সমাজ, শিক্ষিত শ্রেণীর দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের শীর্ষ পর্যায়ের মেধাবী, চিন্তাশীল ও সুগভীর ধর্মীয় প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ যখন কোন আন্দোলন ও সংস্কার প্রচেষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট হন তখন সে আন্দোলন লাভ করে এক ব্যাপক, গভীর ও মযবুত বুনিয়াদ। সে আন্দোলন ও সংস্কার প্রচেষ্টা সম্পর্কে তখন এ আশাবাদ ব্যক্ত করা চলে, তা ভুল পথে পরিচালিত হবে না, সেখানে সাময়িক উত্তেজনা ও হুজুগের প্রাধান্য হবে না এবং তাতে সাধারণ জনতাসুলভ বাচালতা স্থান পাবে না, বরং এক মহান লক্ষ্যের পানে তা এগিয়ে যাবে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপে অবিচল গতিতে।

বর্তমান সময়ে ইসলামী বিশ্বে আলিম সমাজ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ইসলামী সংগঠনগুলোর দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সব যুগেই সমাজ ও জাতির হাল ধরার দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত ছিল। তবে বর্তমান সমস্যাসংকুল ও সংকটাপন্ন সময়ের প্রেক্ষাপটে উপরিউক্ত দায়িত্বের পরিধি নিঃসন্দেহে অনেক বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিকূল ঝড়-ঝাপটায় বিপর্যস্ত উম্মাহকে আজ তাদের সঠিক পথ-নির্দেশনা দিতে

হবে। দ্বীনী আন্দোলন ও সংস্কার প্রয়াসগুলোকে বিচ্যুতি ও সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে যেন সেগুলো সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়ে বুদবুদের মত মিলিয়ে না যায়, বরং সেগুলোর শিকড় যেন প্রবিষ্ট হয় দ্বীন ও শরীয়তের গভীরে।

### মুসলিম শাসনামলে 'আলিম সমাজের অবদান

উমাইয়া ও আব্বাসী খিলাফতকালে ইসলামী উম্মাহ্র বরেণ্য 'আলিম ও মুজতাহিদগণ পৃষ্ঠপোষকতা না করলে ইসলাম আজ একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত জীবনবিধানরূপে বিদ্যমান থাকত না। দেশবিজয়ী বীরদের ভাগ্যেই সাধারণত ইতিহাসের প্রশংসা ও সুখ্যাতি জুটে থাকে। ইসলামী উম্মাহ্র বরেণ্য সেনাপতিবৃন্দ তথা তারিক বিন যিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, 'উকবা বিন নাফে', মূসা বিন নুসায়র প্রমুখের নাম ও কীর্তি ইতিহাসের পাতায় সূর্যালোকের মতই দেদীপ্যমান। কিন্তু বিজিত এলাকায় ইসলামের বুনিয়াদ মযবুত করার কাজে ও আল্লাহর বিধান জারির ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির কাজে যাঁরা নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন, ইসলামী শরীয়ত ও ফিকাহ্র আলোকে উদ্ভূত সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান পেশ করার জন্য নিরলস দিন ও বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন, সময় ও পরিস্থিতির আলোকে শাসকবর্গকে পথ ও পন্থা বাতলিয়েছেন, তাঁদের অবদান ও কুরবানীর কথা ইতিহাসের পাতায় খুব কমই স্থান পেয়েছে। অথচ এটা ধ্রুব সত্য, ইমাম, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসগণ যদি সে যুগে তাঁদের মেহনত ও সাধনায় সামান্যতম কার্পণ্য করতেন, দেশবিজয়ী তরবারির পেছনে পেছনে তাঁদের অসামান্য জ্ঞান ও মনীষা যদি আলো বিকিরণ না করত, দেশ পরিচালনাকারীদের পেছনে তাঁদের মেধা ও মস্তিষ্ক যদি সজাগ ও সক্রিয় না হতো, তাহলে দেশ বিজয়ের সকল প্রচেষ্টাই হতো অর্থহীন, এমন কি বিজিত অঞ্চলগুলোই তখন হয়ে উঠত ইসলামী উম্মাহ্র গলার ফাঁস আর আজ ইতিহাসের গতিধারাই হতো ভিন্ন।

### মুসলমানদের পরাস্তকারী ইসলামের হাতে হলো পরাস্ত

উদাহরণস্বরূপ বর্বর তাতার জাতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্বর তাতারীরা এক সময় ইসলামী উম্মাহ্কে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। অপ্রতিরোধ্য তাতারী সয়লাবের মুখে খড়কুটার ন্যায় ভেসে গিয়েছিল গোটা ইসলামী বিশ্ব। ভেঙে পড়েছিল তাহ্যীব ও তমদ্দুনের মেরুদণ্ড। তখনকার দুনিয়ায় মুসলমানদের মত হীন ও অপদস্থ আর কেউ ছিল না। বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত সে যুগের ভাস্কর্যসমূহে দেখা যায় ঃ ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে কোন

মুসলমানের দাড়ি আর কোন তাতারী সৈনিক হাঁকাচ্ছে সে ঘোড়া। দুনিয়ার আর সব জাতি তাদের চোখে মর্যাদার অধিকারী ছিল, কিন্তু মুসলমানদের কোন ইয্যত ছিল না তাদের কাছে; বিশেষত মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনীষার প্রাণকেন্দ্ররূপে পরিচিত অঞ্চলগুলোই ছিল তাতারী নির্যাতনের অধিক শিকার। কিন্তু ইতিহাসের চমকপ্রদ ঘটনা হলো, যে তাতারীদের হাতে নির্মমভাবে লুণ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র ইয্‌যত, সেই বর্বর তাতারীরাই একদিন লুটিয়ে পড়ল ইসলামের পদপ্রান্তে। মুসলমানদের তলোয়ার যাদের পরাজিত করতে পারেনি, ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনীষা তাদের জয় করে নিল অবলীলাক্রমে। এভাবে ইতিহাসের বুকে আরেকবার প্রমাণিত হলো, মুসলমানরা রক্ষা করেনি ইসলামকে, বরং ইসলামই মুসলমানদের রক্ষা করেছে বারবার। কিন্তু কিভাবে সম্ভব হয়েছিল ইতিহাসের সেই চমকপ্রদ পট পরিবর্তন? ব্যাপার হলো, তাতারীদের কাছে কোন জ্ঞানভাণ্ডার ছিল না, ছিল না কোন পরিশীলিত সভ্যতা, কোন সুবিন্যস্ত আইন ও বিধিমালা। উপজাতীয় জীবনে প্রচলিত কতিপয় সাদা-মাটা অলিখিত আইন-কানুনই ছিল তাদের মূলধন। সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে তারা ছিল রিক্তহস্ত। ফলে তারা প্রয়োজন অনুভব করল মুসলিম 'উলামা ও বিদ্বান-মনীষীদের সাহায্য গ্রহণের। তাতারীদের দরবারে মুসলিম 'আলিমদের আসন গ্রহণের পর বিজেতাদের অন্তরে বিজিত জাতির অতুলনীয় জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মনীষা, মেধা, প্রতিভা, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃত তাদের মোহিত করল। ফলে জাতিগতভাবেই তাতারীরা মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমানরা ছিল বুদ্ধিজীবী, তাদের কাছে ছিল মেধা ও প্রতিভার অফুরন্ত উৎস, ছিল উন্নত সভ্যতা ও উদার সংস্কৃতি, আর ছিল আইন প্রণয়নের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং নাগরিক সমস্যা ও জটিলতা নিরসনের প্রখর বুদ্ধি। কাজেই তাতারীরা তাদের সহযোগিতা গ্রহণে বাধ্য হলো।

ইতিহাস দর্শনের এটা এক স্বীকৃত সত্য, যে সামরিক শক্তির পেছনে মেধা ও মস্তিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা থাকে না, আইন প্রণয়নের যোগ্যতা ও সুসংহত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা থাকে না, সে শক্তির বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

## ইসলাম 'ইলমের ধর্ম

আধুনিক যুগে ইসলামী বিশ্বের 'আলিম সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকবৃন্দ, আইনবিদ, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ওপর অর্পিত এক বিরাট দায়িত্ব হলো, বিশ্ব জাতিবর্গের সামনে তাদের একথা তুলে ধরতে হবে যে, অজ্ঞতার অন্ধকার গর্ভ থেকে কিংবা সামরিক শক্তির ছত্রছায়ায় ইসলাম জন্মলাভ করেনি, বরং ইসলামের জন্ম হয়েছে আল্লাহ্‌র পরিচয় থেকে। ওহী তথা ঐশী

বাণী হচ্ছে তার উৎস। সুতরাং ইসলাম যুগের সকল চাহিদা মেটাতে পারে, পারে জীবন্ত সভ্যতার পথ প্রদর্শন করতে; বিচ্যুতি, অবক্ষয় ও ধ্বংসাত্মক পথ থেকে বাঁচাতে। মুসলিম উম্মাহ্র 'আলিম ও বুদ্ধিজীবী সমাজই শুধু ইসলামের এ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারে বিশ্ব জাতিসমূহের দরবারে। এটা এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

কোন ধর্ম কিংবা কোন জাতি সম্পর্কে যদি এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়, জ্ঞান ও 'ইলমের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই তাহলে অস্ত্রের জোরে কোন ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও মেধা ও মননের জগতে সে জাতি তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না কোনদিন। কেননা সে জাতি ও ধর্ম সম্পর্কে বিশ্ব এ ধারণা পোষণ করবে, বেঁচে থাকার জন্য এর প্রয়োজন হলো অজ্ঞতার অন্ধকার। যতক্ষণ আঁধার আছে, ততক্ষণই এর অস্তিত্ব আছে। জ্ঞানের আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এর অস্তিত্ব, যেমন করে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মিলিয়ে যায় আঁধারের অস্তিত্ব। খ্রিস্ট ধর্মের বেলায় তাই ঘটেছিল। জ্ঞানের সাথে খ্রিস্ট ধর্মের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, বরং একটি নির্ভেজাল আত্মিক আন্দোলন ও সামাজিক বিপ্লবরূপে খ্রিস্ট ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে। হযরত 'ঈসা (আ)-র কাল পর্যন্ত তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল এ ধর্মের সহায়ক। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘকাল ধরে মেধাবী, প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা সে লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় খ্রিস্টবাদ ইউরোপে পৌঁছলে জনমনে ব্যাপকভাবে এ ধারণা সৃষ্টি হয়, যুগ ও জীবনের সাথে তাল মেলাতে খ্রিস্টবাদ সক্ষম নয়। কাজেই জীবন থেকে নির্বাসন দিয়ে গীর্জার পরিসরে তাকে আবদ্ধ করা হোক!

## খ্রিস্ট ধর্মে স্বতন্ত্র শরীয়ত ছিল না

ইউরোপ তখন অগ্রগতির পথে দ্রুত ধাবমান। নতুন উদ্যম ও নতুন শক্তিতে গোটা ইউরোপ তখন টগ্‌বগ্‌ করছে। বেঁচে থাকার সুতীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক ব্যাপক কর্মযজ্ঞে। অবস্থা ছিল, মুহূর্তের অসতর্কতা ইউরোপীয় জাতিবর্গের জন্য ডেকে আনতে পারত চরম ভাগ্য বিপর্যয়। ওদিকে খ্রিস্ট ধর্ম তখন সবেমাত্র শৈশব অতিক্রম করছে। সার্বিক বিন্যাস, যুগোপযোগী ব্যাখ্যা, জীবন জিজ্ঞাসার জওয়াব কিংবা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-বিধান কিছুই ছিল না তার কাছে, বরং সামাজিকভাবে আইনের ক্ষেত্রে তা ছিল য়াহূদী ধর্মনির্ভর। য়াহূদী শরীয়তের বিচ্যুতি ও বিকৃতির সংস্কার ও

সংশোধনই ছিল খ্রিস্ট ধর্মের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। হযরত ‘ঈসা (আ.) নিজের কখনো স্বতন্ত্র শরীয়তের ঘোষণা দেন নি, বরং হযরত মূসা (আ.) শরীয়তে আংশিক রদবদলের ঘোষণা দিয়েছিলেন মাত্র। পবিত্র কুরআনের ভাষায় য়াহূদীদের উদ্দেশে হযরত ‘ঈসা (আ)-র বক্তব্য ছিল এরূপ ঃ

“তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ (হারাম)-কৃত কতক বিষয় ও বস্তু বৈধ ও হালাল করার উদ্দেশেই আমার আগমন।”

মোটকথা, য়াহূদী শরীয়তের আংশিক রদবদল ছাড়া স্বতন্ত্র কোন শরীয়ত খ্রিস্ট ধর্মের কাছে ছিল না। মানবতায় প্রেম, মানুষের প্রতি করুণা, নির্যাতিতের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি এবং ভূস্বামীদের শোষণ, হঠকারিতা ও অহংকারের বিরুদ্ধে শান্ত (অহিংস) প্রতিবাদই ছিল খ্রিস্ট ধর্মের মূল শিক্ষা। এইরূপ ও আকৃতি নিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম যখন ইউরোপের কর্মচঞ্চল ভূখণ্ডে ও অগ্রগতির নেশায় বিভোর জাতিবর্গের জীবন প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলো, তখন দিবালোকের মতই এ সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল, পরিবর্তনশীল যুগের, গতিময় সমাজ জীবনের শতধারায় উৎসারিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথে দ্রুত তাল মিলিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে সময় খ্রিস্টান বিদ্বান সমাজের দায়িত্ব ছিল যুগের নিরিখে খ্রিস্ট ধর্মের উপযোগিতা প্রমাণ করা এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে মূলনীতি আহরণ করে যুগ ও সমাজের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা এবং জীবন সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেশ করা। কিন্তু তারা তাদের এ দায়িত্ব পালন করেনি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খ্রিস্ট সমাজে দুটি বিভক্ত শ্রেণীর উদ্ভব হলো। শাসক সম্প্রদায় ‘আকীদা ও বিশ্বাসের সীমা পর্যন্ত খ্রিস্ট ধর্মের অনুগত থাকল, কিন্তু বিধান প্রণয়ন ও রাষ্ট্রশাসনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে নির্বাসন দিল। অন্যদিকে ধর্মপণ্ডিত তথা পুরোহিত সম্প্রদায় এর চরম বিরোধিতা শুরু করল। খুব জোরেশোরে তারা এ ধারণা প্রচার করা শুরু করল, মুক্তি ও পরিত্রাণ পেতে হলে জীবনের কোলাহল বর্জন করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হবে। দাম্পত্য জীবন বিসর্জন দিতে হবে, এমন কি নারীর ছায়াটুকু পর্যন্ত এড়িয়ে চলতে হবে। মূলত উভয় শ্রেণীই উপকারের পরিবর্তে খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষতি সাধন করেছে। তার অন্তিম দশা তরান্বিত করেছে। শাসক সম্প্রদায় ধর্মের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারের সাথে সমাজ রাষ্ট্রকাঠামো গড়ার কাজে লেগে গেল। মানুষকে তারা পরিণত করল শাসকশ্রেণীর দাসদাসীতে, অথচ এসব কর্মকাণ্ড ছিল খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষা ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে মানুষের চোখে খ্রিস্ট ধর্ম হলো বিকৃত। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে সেন্ট পলের যুগ থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এ

ধারা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপ সেই একই পথের যাত্রী। ফলে তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গির্জার সাথে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। রাষ্ট্র ও ধর্ম চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে গেল। এভাবে জীবনের বিস্তৃত অঙ্গন থেকে সংকুচিত হতে হতে খ্রিস্ট ধর্ম আজ এসে ঠেকেছে শেষ বিন্দুতে।

### ইসলামের সাথে 'ইল্‌মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য

আল্লাহ্ পাকের সীমাহীন করুণা হলো, ইসলামী জগত এ ধরনের বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির শিকার হয়নি। কেননা ইসলাম ও ইল্‌মের মাঝে ওঁৎপ্রোত সম্পর্ক ছিল হেরা গুহায় ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, ধর্মের প্রথম ওহী শুরু হয়েছে اِقْرَأْ (পড়) শব্দ দিয়ে। 'উম্মী' নবীর ওপর অবতীর্ণ প্রথম ওহীতেই যে ধর্ম মানুষকে জ্ঞান ও কলমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, মুহূর্তের জন্যও সে ধর্মের সম্পর্ক জ্ঞান ও কলমের সাথে কিভাবে ছিন্ন হতে পারে? জ্ঞান ও ধর্মের মাঝে দূরত্ব ও অপরিচয় ইসলামের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। প্রথম দিন থেকেই 'ইল্‌ম হচ্ছে ইসলামের বিশ্বস্ত সহচর। বদর যুদ্ধের কুরায়শী বন্দীদের মধ্যে যাদের মুক্তিপণ দেয়ার মতো সঙ্গতি ছিল না তাদের বলা হলো, আনসার ও মুহাজিরদের দশ দশজন ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। এতেই প্রমাণিত হয় 'ইল্‌মের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কত গভীর!

### ইসলাম যুগের সহযাত্রী নয়—পথপ্রদর্শক

এই যুগ সন্ধিক্ষণে ইসলামী বিশ্বের 'আলিম সমাজের দায়িত্ব ছিল মুসলিম তরুণ ও যুব সমাজের মনে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে না দেয়া যে, শক্তি ও ক্ষমতার বলেই শুধু ইসলাম টিকে থাকতে পারে, সময়ের বিবর্তন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলাম হচ্ছে মানবতার শৈশব কালের ধর্ম, যখন যুগের চাহিদা ছিল সীমিত এবং জীবনের পরিধি ছিল সংকীর্ণ। সুতরাং বর্তমান সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের যুগে জীবন ও সভ্যতার এ বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্যতা তার নেই।

ইসলামী বিশ্বের 'আলিম সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল সময়ের গর্বিত চ্যালেঞ্জকে বলিষ্ঠ সাহসিকতার সাথে গ্রহণ করা, নিজেদের অতুলনীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা সমস্যা ও ব্যাধির ক্ষেত্র ও কারণ নির্ণয় করা এবং সর্বযুগের সর্বজনীন জীবন বিধান আল-কুরআন ও সুন্নাহ্‌র চিরন্তন বিধিমালার

আলোকে জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নতুন ধারাকে ইসলামের অনুগামী করার চেষ্টায় যত্নবান হওয়া। এ মহাদায়িত্ব পালনে অবহেলা ও বিচ্যুতির প্রাথমিক কুফল হলো ধর্মহীনতা, আর ভয়ংকরতম কুফল ও শেষ পরিণতি হলো ধর্মদ্রোহিতা। ইসলামী বিশ্বের যে কোন দেশে আজ আপনি যাবেন, বেদনাহত চিত্তে উপরিউক্ত দু'টি অবস্থার যে কোন একটি আপনাকে অবশ্যই অবলোকন করতে হবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো—তারুণ্য-গর্বিত যুব সমাজের মনে এ বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, ইসলাম তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখেই যুগ, জীবন ও সভ্যতার সকল চাহিদা মেটাতে পারে, পারে নির্ভুল পথ-নির্দেশনা দিতে। ইসলামই পারে মানব সভ্যতাকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পরিণতি থেকে বাঁচাতে। আমাদের আরো প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম-নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত যে জীবন, যে সমাজ ও যে সভ্যতা—তা মানব জীবন নয়, মানব সমাজ নয়, নয় মানব সভ্যতা।

### ইসলামকে সর্বস্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন

ইসলামী বিশ্বের 'আলিম ও বুদ্ধিজীবী সমাজের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো ইসলামকে দল-উপদল, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি আপনাদের বলছি, ইসলামের স্বার্থে প্রয়োজন হলে সমস্ত দল ও সংগঠন ভেঙে দেয়ার এবং নাম, প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে একাকার হয়ে যাওয়ার মত উদার ও সাহসী মানসিকতা আমাদের অবশ্যই অর্জন করতে হবে। দল ও সংগঠনের স্বার্থের চেয়ে দ্বীন ও উম্মাহর স্বার্থই অধিক প্রিয় হতে হবে। সুনাম ও অবদানের স্বীকৃতি লাভের মোহ আমাদের বর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা ছিল, তাঁর পুণ্য সংস্পর্শে এসে সুনাম ও কীর্তি অর্জনের মোহ সাহাবাদের অন্তর থেকে একেবারেই দূর হয়ে গিয়েছিল।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) কোন এক মজলিসে কথা প্রসঙ্গে বলেন ঃ এক যুদ্ধে আমাদের পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। আমরা তখন পায়ে ন্যাকড়ার পট্টি বেঁধে নিয়েছিলাম যার ফলে সে যুদ্ধের নাম হয়েছিল 'যাতুর-রিকা' (পট্টি বাঁধা পায়ের যুদ্ধ)। একথা বলার পর হঠাৎ তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল ঃ এসব কথা আমি কেন বলছি? এতে আত্মপ্রচারণা হচ্ছে না তো? আমার আমল বাতিল হয়ে গেল নাতো? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক যদি এ কথা বলে বিদায় করে দেন, দুনিয়াতে তো নিজের কীর্তির কথা প্রচার করে বেড়িয়েছ এবং সাহসী যোদ্ধা নামে খ্যাতিও কুড়িয়েছ। ও-ই তো যথেষ্ট, আমার

কাছে আবার কি পেতে এসেছ? বুখারী শরীফের বর্ণনায় তাঁর এ আশংকা ও আক্ষেপের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অনুশোচনার সুরে তিনি বলেছেন ঃ হায়! যদি আমি এ কথা আলোচনা না করতাম! এত সামান্যতেই আল্লাহ্‌র রসূলের সাহাবী আত্মপ্রচারণার আশংকায় অনুতপ্ত হচ্ছিলেন। আর আজ আমাদের সবার চেষ্টা ও সাধনা শুধু, আমার কিংবা আমার দলের প্রোপাগান্ডা হোক।

আপনাদের এ পাঞ্জাবেরই বাসিন্দা ছিলেন গাযী মাহমুদ। ধর্মপাল নামে এক ভদ্রলোক বেশ রসিয়ে কথা বলতে পারতেন। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ মাঝে মাঝে দেখা পত্রিকায় সংবাদ ছাপানো হয় ঃ অমুক বুযূর্গের দস্ত মুবারকে অমুক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে। আসলে এখানে অমুক ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গৌণ, দস্ত মুবারকের প্রচারণাই হলো মুখ্য। আমি এমন অনেককেই দেখেছি, যারা কোন নামকরা লোকের জানাযা পড়ানোর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে সামনে এগিয়ে যান। মনে বড় খায়েশ ঃ আগামীকাল পত্রিকায় যদি ছবিটা এসে যায়! এ ধরনের মানসিকতা খুবই জঘন্য ও ক্ষতিকর। দেখুন! রুগীর মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনদের মনে সুনাম-সুখ্যাতির চিন্তা থাকে না। সবার তখন আন্তরিক কামনা, যেভাবেই হোক রুগী সুস্থ হয়ে উঠুক! তদ্রূপ গোটা ইসলামী বিশ্ব আজ অন্তিম শয্যায় মুমূর্ষু। আপনাদের এ-দেশও হাজারো রোগে জর্জরিত। এ চিন্তা এখন মন থেকে মুছে ফেলুন, সুখ্যাতি কার হবে? আগামী দিনের ইতিহাস কোন্ দল বা সংগঠনের বন্দনা গাইবে? এ তথ্য আজো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে কার নীরব প্রচেষ্টা ছিল অধিক সক্রিয়। কেননা আল্লাহর সেই নিঃস্বার্থ বান্দারা এতই নির্মোহ ও প্রচারবিমুখ ছিলেন যে, ইতিহাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও তাদের সন্ধান খুঁজে পায়নি।

পাকিস্তানে আজ ইসলামী আইন বাস্তবায়ন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতির রূপায়ণ, অপসংস্কৃতির কবল থেকে উদ্ধারের যে জিহাদ শুরু হয়েছে তাতে নিজেকে আপনি একজন সাধারণ সৈনিকরূপে উৎসর্গ করুন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই শুধু কাজ করুন, তাঁর দরবারে আপনার নাম লেখা হবে নূরের হরফে। দুনিয়াতে সুনাম হলেই কি, না হলেই-বা কি! পাকিস্তানে এখন যে সংগ্রাম ও সংঘাত চলছে তা বিশেষ কোন দল বা মতাদর্শের সংঘাত নয়। এ সংঘাত ইসলাম ও গায়র ইসলামের সংঘাত। মনে করুন, একটা মসজিদ তৈরি হচ্ছে, এতে যারাই অংশ নেবে তারাই আজ্‌র, (সওয়াব) পুরস্কার লাভ করবে। কে কতটুকু অংশ নিল, কার নাম আগে এবং কার নাম পরে তা ভেবে দেখার বিষয় নয়। প্রবৃত্তির এই তাকীদকে যতদূর সম্ভব প্রতিহত করুন। সবাই নিজ নিজ

মত ও কর্মপন্থায় অবিচল, মত ও পথ বর্জন করার বা সওদা বাজি করার কথা আমি বলছি না, ইসলামী দাওয়াতের ইসলামী জীবন গড়ে তোলার এক অভিন্ন ক্ষেত্র ও সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরি করুন। তবেই শুধু আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে এদেশে এক আদর্শ ইসলামী সমাজ দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন।

## আত্মত্যাগ ও কুরবানী

আমাদের তৃতীয় কর্তব্য হলো জাতির সামনে আত্মত্যাগ ও কুরবানীর অনন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা। নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে হলেও অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পারস্পরিক কলহ-কোন্দল সযত্নে পরিহার করতে হবে। আমাদের জীবন যত সহজ ও অনাড়ম্বর হবে, ত্যাগ ও কুরবানীর মহত্ত্বে যত মহীয়ান হবে, কর্মের ময়দানে, সংগ্রামের ক্ষেত্রে তার সুফলও হবে তত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। যে কোন মহৎ উদ্যোগ ও পদক্ষেপের জন্যই অন্তঃকলহ হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয়। ধর্মীয় আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতপার্থক্য ও বাদানুবাদের ক্ষেত্র ভিন্ন হওয়া উচিত। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) তাঁর 'মকতূবাতে' মন্তব্য করেছেন ঃ সম্রাট আকবরের ধর্মবিমুখতার মূল কারণ, মোল্লাদেরকে তিনি মোরগ লড়াইয়ের মত তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখেছেন। খুঁটিনাটি মাস'আলা নিয়ে যখন তখন তারা তর্কে নেমে পড়ত এবং প্রয়োজনে পাক্কা দুনিয়াদারদের মতই নিজেদের মুখোশ খুলে ফেলত, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে নিজেকে বাদশাহ্র সামনে তুলে ধরার চেষ্টায় কোমর বেঁধে নেমে পড়ত। আকবর ভাবলেন ঃ এই যদি হয় ধর্মপণ্ডিতদের অবস্থা তবে আমি আমার সভাসদবর্গই-বা খারাপ কিসে? আমাদের মত পাক্কা দুনিয়াদাররাও তো স্বার্থসিদ্ধির জন্য এতটা নীচে নেমে আসতে পারে না যতটা পারে এই আলখেল্লাধারী ধার্মিকরা। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) যখন সংবাদ পেলেন, বাদশাহ জাহাঙ্গীর কিছু সংখ্যক 'আলিমকে পরামর্শের জন্য দরবারে স্থায়ীভাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখন তিনি এই মর্মে নওয়াব সৈয়দ ফরীদকে চিঠি লিখলেন, সাবধান! বাদশাহ যেন অমন কর্ম না করেন! তাঁকে বরং যে কোন একজন খাঁটি দ্বীনদার ও হক্কানী 'আলিম নিয়োগের পরামর্শ দাও। মুজাদ্দিদে আলফেছানী সাহেব তাঁর আল্লাহ্প্রদত্ত ইসলামী দূরদর্শিতার আলোকেই এ পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর অর্থ অবশ্যই এ নয়, সব কিছুতে সব মজলিসে একজন মাত্র 'আলিমই শুধু থাকবেন। আমার বক্তব্য শুধু এই, 'আলিম সমাজের অন্তর্কলহ ও পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এমনি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে দেশ ও জাতির জন্য।

বিপদের আশংকা দেখে সতর্ক করার অধিকার সকলের রয়েছে। বয়স বা পদমর্যাদার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। একটা ছোট্ট শিশু কিংবা একজন সাধারণ মজদুরও একথা বলতে পারে, ঘরের দরজা খোলা রয়েছে, চোর ঢুকতে পারে।

অনুরূপভাবে আমি অধমও আপনাদেরকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করছি। প্রথমত, আধুনিক নব্য শিক্ষিতদের মনে যেন এ ধারণা জন্মলাভের সুযোগ না পায় যে, কুরআন-সুন্নাহ ও সংশ্লিষ্ট ফিকাহ্‌শাস্ত্র বর্তমানের প্রগতিশীল সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। আধুনিক জীবন সমস্যার সমাধান তাতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এ ধারণা খুবই মারাত্মক, এমন কি তা মানুষকে ধর্মদ্রোহিতার পথেও নিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কর্মে ও আচরণে সাধারণ জনতা ও ক্ষমতাসীন মহলের সামনে আপনাদেরকে একথা প্রমাণ করতে হবে, মানুষ হিসাবে আপনাদের স্থান ও মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। আপনাদের অনাড়ম্বর ও মোহমুক্ত জীবন, আপনাদের অল্পে তুষ্টি ও নিঃস্বার্থপরতা জাতির জন্য যেন হতে পারে অনুকরণীয় আদর্শ। গাড়ি, বাড়ি, পদ ও বেতনের লোভ ও ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ যেন আপনাদের বিচ্যুত করতে না পারে জীবনের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথ থেকে। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, জীর্ণ বস্ত্রধারী দরবেশদের পক্ষেই বেশি থেকে বেশি কাজ করা সম্ভব। কেননা ক্ষমতার শীশমহলের অধিবাসী দুনিয়াদারদের মাথা তাদের সামনেই শুধু নত হয়। তবে পাইকারী হারে সবাইকে চাটাই-ঝুড়ির বাসিন্দা হওয়ার পরামর্শ আমি দিচ্ছি না। তবে বাস্তব সত্য এটাই, শীশমহলের লোকেরা এই তাদেরই কেবল সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানায়, যাদের মনে লোভ নেই, মোহ নেই, নেই কোন অভিযোগ ও প্রত্যাশা।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানীর সামনে সমকালীন সম্রাটদের মাথা নত হয়েছিল কেন? কারণ আল্লাহ্‌র এ প্রিয় বান্দা পায়ের ধুলো দেয়ার জন্যও সম্রাটের দরবারমুখো হন নি, সম্রাটের কাছে সুপারিশ পাঠান নি। মুসল্লায় বসে আল্লাহ্‌র সাথে মিতালি করেছেন, প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন, আবার তিরস্কারও করেছেন। আমাদের মহান পূর্বসূরীদের সকলেই এভাবেই জীবন কাটিয়েছেন। ক্ষমতাসীনদের কাছে না ঘেঁষে দূর থেকেই তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা কি করেছেন? প্রশাসনের জন্য সৎ ও যোগ্য লোক সরবরাহ করেছেন। তাঁদের সারা জীবনের নীতি ছিল, দূর থেকে আগুনের তাপ নাও, ক্ষতি নেই; কিন্তু হাত দিতে যেও না, পুড়ে যাবে। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন সমাবেশে,

বিভিন্নভাবে যেসব কথা আমি আরয করেছি তার সারনির্যাস, আমরা আজ এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের সামনে গোটা ইসলামী বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণের মুহূর্ত উপস্থিত। জাতি হিসাবে আমাদেরকে আজ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। আমাদের অযোগ্যতা যেন ইসলামের দুর্নাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। এমন কথা বলার কিংবা লেখার সুযোগ যেন না আসে, 'আলিম সমাজকে দিয়ে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অত্যন্ত বিনয় ও সংকোচের সাথে আমি আপনাদের খিদমতে একথাগুলো আরয করলাম।

আল্লাহ্‌ আমাকে ও আপনাদেরকে তাওফীক দান করুন! আমীন!

# আল্লাহ্‌র এ দুনিয়া বাণিজ্যমেলা নয়

[পাকিস্তান সরকারের ওয়াক্‌ফ্ বিভাগের উদ্যোগে বিভাগীয় সদর দফতর লাহোরে আয়োজিত 'আলিম ও সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ।

বিষয়বস্তু ঃ সমকালীন বিশ্বে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

তারিখ ঃ ২৭ শে জুলাই, ১৯৭৮]

হামদ ও সালাতের পর!

## এ বিশ্ব এক পবিত্র ওয়াক্‌ফ

সম্মানিত 'আলিম সমাজ, ওয়াক্‌ফ্ বিভাগের কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য শ্রোতাবন্ধু!

পাকিস্তান সরকারের ওয়াক্‌ফ্ বিভাগ আমাকে এখানে দাওয়াত করে আমার যে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন সেজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। দাওয়াত পেয়ে আমি ভেবেছিলাম ওয়াক্‌ফ্ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাথে পরিচয়, সদর দফতর পরিদর্শন এবং এর কর্মসূচী ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবগতি লাভই বুঝি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য! কিন্তু এখানে এসে জানতে পেলাম, আজকের এ মহতী অনুষ্ঠানে আমাকে "সমকালীন বিশ্বে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক আলোচনায় যোগ দিতে হবে। প্রথমটায় আমি ভেবেই পেলাম না, এমন একটি দর্শনধর্মী বিষয়বস্তুর সাথে এ প্রতিষ্ঠানের কি সম্পর্ক! কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার অন্তরে এ চিন্তা উদ্ভাসিত হলো, আমাদের এ বিরাট পৃথিবী তো আসলে একটি ওয়াক্‌ফ্ প্রতিষ্ঠান এবং এ ওয়াক্‌ফ্ স্টেটের মুতাওয়াল্লী তথা পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা তাঁদেরই রয়েছে যাঁরা এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ওয়াক্‌ফ্দাতার ইচ্ছা ও পরিকল্পনার প্রতি আন্তরিক আগ্রহী ও পূর্ণ বিশ্বাসী।

আজ অবস্থা হলো এই, পৃথিবী হচ্ছে চরম অব্যবস্থা ও খামখেয়ালীর শিকার এক মজলুম ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি। এই ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লী ও পরিচালকগণ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটেই অবগত নন। সতর্কতার খাতিরেই শুধু এভাবে বলা। নইলে সত্য কথা হলো, এ ওয়াক্‌ফ্ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ আজ ওয়াক্‌ফের বিঘোষিত নীতি ও লক্ষ্যের প্রতিই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত তারা এটাও স্থির করতে পারেননি, মানুষের আবাসভূমি এই বিশ্ব সংসারের স্থপতি কে? এ

পবিত্র ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির দাতা কে? অভিজ্ঞতার আলোকে আপনারা ভালোভাবেই জানেন, সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ্দাতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা জরুরী। অতঃপর জানতে হয় ওয়াক্ফ্দাতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সব শেষে প্রয়োজন এ অনুভূতি জাগ্রত হওয়া, আমরা এ পবিত্র সম্পত্তির আমানতদারমাত্র, এর মালিক মোখতার নই। এই অভিভাবকত্বে নিয়োগ বোঝানোর জন্য কুরআনুল করীমে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ۔

"যে জিনিসের ওপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করো।" প্রতিনিধিত্ব মূলত অভিভাবকত্বেরই আরেক রূপ। কেননা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা পৃথিবীকে সৃষ্টি করে মানব জাতিকে তাতে আবাদ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন ঃ

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

"তিনিই তোমাদের ব্যবহারের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ নীতিগতভাবে তোমরা এর মালিক নও, বরং আমার প্রতিনিধিরূপে আমার আইন ও সন্তুষ্টি মুতাবিক এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার যিম্মাদার মাত্র।

আমরা জানি, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র ওয়াক্ফ্ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কিছু নিয়ম ও বিধি-বিধান থাকে এবং সে নিয়ম ও বিধান মুতাবিকই তা পরিচালিত হয়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেটাও ঐ ধরনের অনেক ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি পরিচালনার একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এর দায়িত্ব হলো ওয়াক্ফ্ সম্পত্তিসমূহের হিফাজত, সংরক্ষণ ও ওয়াক্ফ্দাতাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন। আমি আশা করব, অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনারা বরাবর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার স্বাক্ষর রেখে আসছেন। কিন্তু এ দুর্ভাগা পৃথিবীর কথা ভেবে দেখুন, এ এমন এক পবিত্র ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি, যার তুলনা ওয়াক্ফের ইতিহাসে নেই। (কেননা ওয়াক্ফ্ পদ্ধতির শুরু তো পৃথিবী জন্মের অনেক পরে) এই ভূমণ্ডলীয় গ্রহকে ওয়াক্ফ্ সম্পত্তিরূপে অনেক পূর্বেই আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং যুগে যুগে বিভিন্ন নবীকে আর তাঁদের জাতিকে এর মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছেন। কাজেই এটাও একটা ওয়াক্ফ্ প্রতিষ্ঠান। শেষ যুগে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মতকে এ ওয়াক্ফ্ প্রতিষ্ঠানের শেষ মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয়েছে।

### এ উম্মাহ্ আপনি গজিয়ে ওঠা জংলী ঘাস নয়

পূর্ববর্তী নবীগণের নবুওয়তী দায়িত্ব তাঁদের ব্যক্তিসত্তায় সীমাবদ্ধ ছিল। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য হলো, নবুওয়তের সাথে সাথে এক দায়িত্বশীল উম্মতও তাঁকে দান করা হয়েছে। সুতরাং এ উম্মাহ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোন আগাছা নয়। এ উম্মাহ্ হলো এক মহান আদর্শ ও জীবন দর্শনের বাহক ও প্রচারক। কুরআনুল করীমের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব নির্দেশক শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে এ উম্মাহ্র সম্মানে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ـ

(তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তোমরা উত্থিত।) اخرجت (উত্থিত করা হয়েছে) শব্দের প্রয়োগ এ কথাই প্রমাণ করে, এ উম্মত সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এক বিরাট কল্যাণ ও হিকমত, তা হলো মানবতার সংরক্ষণে জগত সংসারের মহান স্রষ্টার ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশে খলীফাতুল্লাহ্'র গুরু দায়িত্ব পালন। এ মর্মে হাদীস শরীফে আরো স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ـ

(জটিলতা সৃষ্টির জন্য নয়, বরং সহজ সাবলীলতা প্রদানের জন্যই তোমাদের পাঠানো হয়েছে) শব্দ প্রয়োগে একথা বোঝানো হয়েছে, তোমাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তোমাদের নামে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে এবং এক বিশেষ কর্তব্য অর্পণ করে তোমাদের পদমর্যাদা নির্ণীত করে দেয়া হয়েছে। তোমাদের বৈশিষ্ট্য হলো, জটিল পদ্ধতি পরিহার করে সহজ সাবলীল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। কোথাও কোন ক্ষুদ্র ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে (হোক সেটা মসজিদ, এতিমখানা কিংবা অন্য কোন বিষয় সম্পত্তি) সরকার তা রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের ব্যবস্থা করেন, প্রয়োজন হলে সরকার এ কাজে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। প্রতিদিন এ ধরনের কত ঘটনাই তো আপনাদের চোখের সামনে ঘটে থাকে!

### আল্লাহ্র এ দুনিয়া বাণিজ্যমেলা নয়

সে ওয়াক্ফের কী করুণ দশা হতে পারে, যার অভিভাবক ও পরিচালকমণ্ডলী ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছে! আল্লাহ্র ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির

মালিক মোখতার বনে বসেছে। তদুপরি তার আচরণ মালিকসুলভ নয়, শত্রুসুলভ। সত্য কথা বলতে কি, মানুষ যেন আজ এ ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তির সাথে শ্মশানসুলভ আচরণ শুরু করেছে! কোন শ্মশানেরও সম্ভবত এমন করুণ দশা ঘটা সম্ভব নয় যা মানুষের হাতে এই দুর্ভাগা পৃথিবীর ঘটেছে। ইকবালের ভাষায় ঃ

جسے فرنگی مقامروں بنا دیا ہے قمار خانہ۔

ফিরিংগী জুয়াড়ীরা একে জুয়ার আখড়া বানিয়ে ছেড়েছে।

আপনাদের এই শহরের অমর কবি ইউরোপকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠেছিলেন ঃ

خدا کی بستی دکان نہیں۔

আল্লাহ্‌র এ দুনিয়া বাণিজ্য মেলা নয়।

মসজিদকে মদ-জুয়ার আখড়া বানানো কোন মুসলমানের পক্ষেই বরদাশ্‌ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু হাদীসের ভাষায় যে পৃথিবীর সবুজ গালিচা ঢাকা ভূমি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

جعلت لی الارض مسجدا وطهورا۔

গোটা পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদে পরিণত করা হয়েছে।

বিশ্বনবীর সেই প্রিয় মসজিদকে আমাদেরই চোখের সামনে ফিরিংগী জুয়াড়ীরা নরক গুলযার করে রেখেছে।

আমার মনে হচ্ছে আলোচ্য বিষয় নির্ধারণকারিগণ যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এই ক্ষুদ্র ওয়াক্‌ফের সূত্র ধরে এক বিশ্ব ওয়াক্‌ফের প্রতি তারা আমাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সুতরাং আমি মনে করি, আপনাদের এ বিষয়বস্তু নির্ধারণ মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই মুমূর্ষু পৃথিবীর করুণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কী নির্মম আচরণ চলছে। খোদার সাজানো এই জগত সংসারের সাথে। সৃষ্টি ও নির্মাণ ছিল যাদের পবিত্র দায়িত্ব, তারাই আজ মেতে উঠেছে ধ্বংসের মহাউল্লাসে। যাদের উচিত ছিল এটাকে আল্লাহ্‌র দেয়া আমানত মনে করা, তারাই এটাকে মনে করে বসে আছে পৈত্রিক সম্পত্তি। যাদের দায়িত্ব ছিল পৃথিবীর বাসিন্দাদের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধন এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন, তারাই মানুষের আবেগ-অনুভূতির ধ্বংসস্তূপের ওপর মানুষের কংকাল দিয়ে মানুষের কবরের ওপর গড়ে তুলছে তাদের আরাম-আয়েশ

ও বিলাস-ব্যসন ও ঐশ্বর্যের সৌধমালা। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা কি? পৃথিবীতে কোন ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির এমন দূরবস্থা কখনো হয়নি যে দূরবস্থা এ বিশাল ও বৃহত্তম ওয়াকফ সম্পত্তির ঘটেছে ঐ সব অমানুষের হাতে যারা এর স্বঘোষিত অভিভাবক সেজে বসে আছে? কেউ তাদের নিয়োগ করেনি। ওরা ছিনতাইকারী, লুণ্ঠনকারী। গোটা পৃথিবীকে ওরা পরিণত করেছে মহাশ্মশানে। চিতায় জ্বলছে কত লাশ, কত জাতির মৃত শব, আরো জ্বলছে মানবতার গলিত শব। ইকবালের ভাষায় ঃ আজ ষড়যন্ত্র চলছে মানবতার বিরুদ্ধে, নৈতিকতার বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র চলছে কল্যাণ ও সুকৃতির বিরুদ্ধে। এ ষড়যন্ত্র মানব সভ্যতার ভবিষ্যত ধ্বংসের, বরং এ ষড়যন্ত্র মানবতার বর্তমান ধ্বংসের। এ পবিত্র ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি এমন নির্দয়ভাবে বিনষ্ট হচ্ছে যে, গোটা মানব জাতির আজ বুক ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়া উচিত, প্রতিবাদের হুংকারে ফেটে পড়া উচিত।

### ইসলামের আদালতে বিচার দায়ের করুন

এ মহান ওয়াক্ফের প্রতি যে নির্মম আচরণ করা হচ্ছে, এ মহান ওয়াক্ফ্ ধ্বংসের যে আত্মঘাতী আয়োজন চলছে, তাতে গোটা মানব জাতির উচিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। প্রত্যেক আদম সন্তানের উচিত বাদী হয়ে মোকদ্দমা দায়ের করা। কিন্তু কোন আদালতে পেশ করা যায় এ মোকদ্দমা? জাতিসংঘের আদালতে কি আশা করা যায় এ মামলার সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার? আপনাদের ব্যক্তিগত মামলাগুলো নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে জজ কোর্ট-হাই কোর্ট পেরিয়ে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত আপনারা যেতে পারেন। কিন্তু গোটা মানব পরিবারের বিরুদ্ধে এ বিশ্ব জোড়া ষড়যন্ত্রের ফরিয়াদ নিয়ে কোন্ আদালতে আপনি দাঁড়াবেন? ধ্বংসের হতে থেকে এ মহান ওয়াক্ফ্কে রক্ষার জন্য কি উপায় আপনি অবলম্বন করবেন? আইনবিদদের বুদ্ধি নিন, মানবতার কল্যাণকামীদের পরামর্শ নিন, পৃথিবীর কোন্ আদালতে দাখিল করা যেতে পারে এ মোকদ্দমা। মুশকিল হলো আমাদের মামলার আসামী আজ বসে আছে বিচারকের আসনে। যে মামলার আসামী নিজেই বিচারক, সে মামলার কি পরিণতি হতে পারে? দুর্ভাগ্য হলো, খোদ যে বিচারকের বিরুদ্ধেই আজ আমাদের মামলা তা দাখিল করা হচ্ছে তারই বিচারালয়ে। সুতরাং এ মামলার কি পরিণতি হবে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

সর্বাগ্রেই আজ এমন আদলত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে মানবতার এ মামলা রুজু করা সম্ভব। সে আদালত বর্তমান পৃথিবীতে নেই, নেই সেই শক্তি যা আদালতের রায় গ্রহণে আসামীকে বাধ্য করতে পারে। মানবতার এ মামলার ফয়সালা যে আদালত করবে সে আদালতের দুটি অপরিহার্য গুণ থাকতে হবেঃ ইনসাফ আর শক্তি। কোন জ্ঞানীজন কোন গুণীজন কিংবা কোন মানবদরদীর

আদালতে মামলা দায়ের করলে তিনি অবশ্যই ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা করবেন। তাঁর রায় হবে পক্ষপাতশূন্য, অপরাধ হবে চিহ্নিত এবং অপরাধী হবে দণ্ডিত। কিন্তু মানবতার জন্য তা কোন কল্যাণপ্রসূ কাজ হবে না। কেননা অপরাধীর ঘাড়ে দণ্ড চাপিয়ে দেয়ার কোন ক্ষমতা উক্ত আদালতের নেই, মানবতার ফরিয়াদে সাড়া দিতে পারে এমন শক্তি ও ক্ষমতা আজ কোন মুসলিম দেশের নেই। এমন কি নিজ দেশের ভূখণ্ডকে শত্রুর জুলুম ও আগ্রাসন থেকে রক্ষার ন্যূনতম শক্তিটুকুও নেই তাদের। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে তারা নিজেরাই আজ খুনী, আসামীদের, মানবতার আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের বিশ্বস্ত সেবক। মানব বিশ্বের মর্মান্তিক ঘটনা হচ্ছে, যে মহান ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি মানব সম্প্রদায়ের হাতে আমানতরূপে অর্পিত হয়েছিল তাতে চলছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত। পৃথিবীর ইতিহাসে এ বিশ্বাসঘাতকতার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। পৃথিবীর সব কিছুই যেন মায়ের দুধ। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই বন্য আইন এখন পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত।

স্বয়ং আল্লহ্ পাক অতীব গুরুত্বের সাথে এ মহান ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি সৃষ্টি করেছেন। কুরআনুল করীমসহ সকল আসমানী গ্রন্থে বারবার সেকথা আলোচনা করেছেন। একবার বলাই যেখানে যথেষ্ট ছিল, সেখানে বার বার আলোচনা করেছেন এবং বিশদভাবে সব কিছুর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ পৃথিবীকে আমি এভাবে বিস্তৃত করেছি, সবুজ কার্পেট মোড়া জমিনের ওপর টানিয়েছি (নীল) আকাশের চাঁদোয়া, সূর্যকে বানিয়েছি তার ঝুলন্ত প্রদীপ, চাঁদকে বানিয়েছি স্নিগ্ধ আলোর আধার, ক্ষেতে-বাগানে উৎপন্ন করেছি ফল ও ফসল, ছড়িয়ে দিয়েছি নদ-নদী, সৃষ্টি করেছি সাগর-মহাসাগর। এই বিশদ বর্ণনার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরে এই মহান ওয়াক্‌ফের গুরুত্ব জাগরূক করা। আপনার হাতে একখানি কাগজ দিয়ে যদি বলা হয়, এটা এক বড় ধরনের ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তির সনদ, এক মহান উদ্দেশ্য ও কল্যাণের জন্য এ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হচ্ছে, এ ওয়াক্‌ফের আয়তন বিরাট, এতে রয়েছে বড় বড় ইমারত ইত্যাদি, তখন নিশ্চয় আপনার মনে ও চিন্তায় উক্ত ওয়াক্‌ফের গুরুত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি জাগ্রত হবে। পৃথিবীর সৃষ্টি প্রসংগে বিশ্ব-মানবের কাছে আল্লাহ্ পাক যে বিশদ বর্ণনাসম্পত্তির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে? পৃথিবীর বাস্তব চিত্র কি? কোথাও সরাসরি, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে আর কোথাও অবস্থা হলো, উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে প্রচুর, শক্তি ও সম্ভাবনা হচ্ছে অফুরন্ত, কিন্তু এসব কিছু যাদের

কুক্ষিগত তাদের জীবনে নেই কোন আদর্শ, নেই কোন গঠনমূলক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানবরূপী এই পশুদের দিয়ে কি করে সম্ভব মানবতার কোন কল্যাণ সাধন? তাদের হৃদয়ে যে নেই মানবতার প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ, নেই প্রেম-প্রীতি সাম্য, সুনীতি ও মানব সভ্যতার প্রতি সামান্যতম মমত্ববোধ।

## য়াহূদী ও খ্রিস্ট ধর্মে কোন পথ-নির্দেশনা নেই

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলীর সফল বাস্তবায়ন নবী-রাসূলের দ্বারাই শুধু সম্ভব ছিল। কিন্তু অবস্থা আজ, ইসলাম ছাড়া আর সব ধর্ম গোড়াতেই নবীর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে। ফলে তাদের সম্পদভাণ্ডার আজ শূন্য। মানবতার কল্যাণে অবদান রাখার কোন যোগ্যতাই তাদের নেই। খ্রিস্ট ধর্ম তো এখন এতটাই অন্তঃসারশূন্য যে, স্বীয় অনুসারীদের পথ-প্রদর্শন, আধুনিক জীবনের জটিল সব সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচন কিংবা তাদের বিচ্যুতি ও অনাচারের প্রতিরোধ করার যোগ্যতাও তার নেই। কেননা ইতিহাসের নির্মম ঘোষণা হলো, আজকের খ্রিস্ট ধর্ম হযরত ঈসা (আ.)-এর সেই আসমানী ধর্ম নয়। প্রচলিত খ্রিস্ট ধর্ম হচ্ছে সেন্ট পলের আবিষ্কার, হলো খ্রিস্ট ধর্মের বিকৃত রূপ। য়াহূদীবাদের বিকৃতি বহু আগের ইতিহাস। আজকের য়াহূদী ধর্ম কয়েকটি নামসর্বস্ব প্রথা অনুষ্ঠানের নামমাত্র, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তান ও পরিবারকেন্দ্রিক তাদের ধর্ম। সুতরাং গোত্রপ্রীতি হলো তাদের মূল ধর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই, বরং নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সভ্যতার ধ্বংস সাধন হচ্ছে তাদের জাতীয় কর্মসূচী। তারা তো স্পষ্ট ভাষায়ই বলে থাকে, সারা বিশ্বে আমরা অশ্লীলতা ও নগ্নতা ছড়িয়ে দেব, সকল জাতির নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেব, ঐতিহ্য ও সামাজিক ভিত ধ্বসিয়ে দেব, মেধা, মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাদেরকে দেউলিয়া করে ছাড়ব। এভাবে বিশ্বের সকল জাতি দাবার ঘুঁটির মত আমাদের হাতে ব্যবহৃত হবে, আমরা ওদের শোষণ করব, ওরা আমাদের পদচুম্বন করবে। এই হচ্ছে য়াহূদী ধর্মের বাস্তব চিত্র ও চরিত্র।

আজকের পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার পক্ষে সমস্যা-সংকুল জীবন কাফেলার পথ প্রদর্শন করা সম্ভব, মানব সভ্যতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখা সম্ভব। পৃথিবীতে ইসলামের এজন্য প্রয়োজন, বিশ্বের সকল জাতির চরিত্রে আজ ধ্বস নেমেছে, নৈতিক মূল্যবোধে ঘুণ ধরেছে এবং গোটা মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের মহাআয়োজন চলছে। এ মুহূর্তে বিশ্বধর্ম ইসলামই পারে বিপর্যস্ত মানবতার হাত ধরে শান্তি ও মুক্তির চিরসবুজ উদ্যানে নিয়ে যেতে।

হায়, যদি ওরা পৃথিবীটাকে একটা আশ্রম বা এতিমখানাই মনে করত! বিশ্বের জাতিবর্গের সাথে যদি ওরা এতিমসুলভ আচরণই করত তাতে আমাদের কোন আপত্তি হতো না। ইউরোপ যদি গোটা পৃথিবীকে এতিম মনে করে আমাদের প্রতি ন্যূনতম মানবিক আচরণও প্রদর্শন করত তাতেই আমরা কৃতার্থ হতাম। মানবতার জন্য সেটাও হতো অনেক ভালো, অনেক সৌভাগ্য।

## পৃথিবী আজ শিকার ভূমি

কিন্তু না, অতটুকু করুণাও মানবতার ভাগ্যে জোটেনি। মানবতার আবাস ভূমি আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপের শিকার ভূমিতে। ধারালো অস্ত্র হাতে মারণাস্ত্রের বহর নিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র আজ শিকারী দলের সদম্ভ বিচরণ। কোন একটি জাতি, কোন একটি জনগোষ্ঠী আজ রেহাই পাচ্ছে না ওদের শিকার খেলা থেকে ও মরণ ছোবল থেকে। বৃহৎ শক্তিবর্গের চোখে গোটা প্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্ব আজ তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সরবরাহের একক সমৃদ্ধি ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এখান থেকে তারা পেট্রোল শোষণ করে, খনিজ দ্রব্য লুণ্ঠন করে, যুদ্ধের মাঠে শত্রুর মুকাবিলায় নরবলিরূপে এদের ব্যবহার করে, রান্নাঘরের জ্বালানি কাঠের চেয়ে অধিক মূল্য তাদের কাছে আমরা পেতে পারি না। বিশ্বাস করুন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব পানশালা আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি।

ইদানিং ওরা আমাদেরকে উন্নয়নশীল খেতাব দিতে শুরু করেছে। এতদিন তো "অনুন্নত, পশ্চাৎপদ" গালিই দিয়ে এসেছে। অনুন্নত জাতিবর্গের মূল্য তাদের বিচারে এইটুকু, প্রয়োজনে তা উত্তম জ্বালানির কাজ দেয়। বাবুর্চিখানায় আগুন জ্বালার প্রয়োজন হলে এরা প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ করে। তারা মনে করে, সকল জাতির ভাগ্য আজ আমাদের হাতের মুঠোয়, তাই মানুষের সাথে তাদের আচরণ হয়ে পড়েছে হিংস্র পশুসুলভ। এ হিংস্র বর্বরতা প্রতিহত করার এবং এ নারকীয় ধ্বংস-যজ্ঞ ঠেকানোর শক্তি পৃথিবীর কোন জাতির, কোন ধর্মের নেই। সবাই খুইয়ে বসেছে তাদের শক্তি ও যোগ্যতা। ভুলে গেছে জীবনের বাণী, বিস্মৃত হয়েছে অতীত ঐতিহ্য, সবাই আজ হতোদ্যম হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে।

## শেষ ভরসা ইসলাম

উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে মানব কাফেলার এ ডুবন্ত কিশতীর ভবিষ্যত এখন নির্ভর করছে ইসলামের ওপর, মুসলিম উম্মাহর কর্মকাণ্ডের ওপর। আপনাদের ওপর আজ বিরাট দায়িত্ব বর্তেছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। নিজেদের দেশের কথা ভাবুন, সমাজ সংস্কারের কাজে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে

আসুন। সব দেশের ইসলামী সামাজই আজ ব্যাধিগ্রস্ত, মুমূর্ষু। সুতরাং এই মুহূর্তে প্রতিকার ব্যবস্থা একান্ত জরুরী। সমাজ চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে- এটা বড় রোগ নয়; সমাজের স্বভাব ও প্রকৃতিতে পচন ধরেছে এটাই হচ্ছে ভয়ংকর ব্যাধি। একটি সমাজের চারিত্রিক অধঃপতন ততটা ভয়ের কারণ নয়। কেননা তার জন্য রয়েছে অসংখ্য ব্যবস্থা, হাজারো প্রতিষেধক। কিন্তু সমাজের স্বভাব ও প্রকৃতির যখন পচন ধরে, কোন অষুধই তখন আর ক্রিয়া করে না, কোন ব্যবস্থায় ফলদায়ক প্রমাণিত হয় না। সমাজ দেহের নাড়ীর খবর নেয়া তখন জরুরী হয়ে পড়ে।

ওয়াক্‌ফ্ বিভাগের হাতে রয়েছে সমাজ সংস্কারের অফুরন্ত সম্ভাবনাময় এক সুযোগ, এক মোক্ষম হাতিয়ার। আমি মসজিদের ইমাম ও খতীব সাহেবদের কথাই বলছি। সমাজের বুকে তাদের অখণ্ড প্রভাব। জনতার সাথে তাদের সংযোগ সরাসরি। সর্বোপরি তাঁরা ধর্মীয় মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। ওয়াক্‌ফ্ বিভাগ যদি এ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হয়, ইমাম ও খতীবগণ যদি সমাজ জীবনে তাঁদের মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং বিরোধ ও মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলো সযত্ন পরিহার করে সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের মনোসংযোগ কেন্দ্রীভূত করেন, তাহলে দেশ ও জাতির ভাগ্য যেমন পরিবর্তিত হবে তেমনি তা গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্যও হবে বিরাট খেদমত।

ইস্তাম্বুল বিজয়ের ইতিহাস আপনারা জানেন, কনস্টান্টিনোপল যখন মুহাম্মাদ ফাতেহ (বিজয়ী মুহাম্মাদ)-এর হামলার ভয়ে কম্পমান, বিজয়ী বাহিনী যখন নগর প্রাচীর গুঁড়িয়ে শহরে প্রবেশ করছিল তখন ধর্ম পণ্ডিতদের বিবদমান দুই দলে তুমুল তর্ক চলছিল নৈশ ভোজে হযরত 'ঈসা (আলায়হি'স্ সালাম) যে রুটি গ্রহণ করেছিলেন তা কিসের তৈরী ছিল। এক পক্ষ অপর পক্ষকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ছিল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব যুক্তির তীর। তাদের অবস্থা এতটাই বেহাল হয়ে পড়েছিল যে, মুহাম্মদ ফাতেহকে তর্ক সভায় হাযির হয়ে সে মোরগ লড়াই থামাতে হয়েছিল। আমার আশংকা, এ দেশেও না আবার তেমন কোন মতবিরোধপূর্ণ বিষয় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর সেই সুযোগে সংস্কৃতি নামের আগ্রাসী বাহিনী আমাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে বসে। মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিজয়ী বেশে মুসলিম সমাজের গভীরে পৌঁছে গেছে। ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মুমূর্ষু অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। চিন্তার জগতে মুসলিম উম্মাহ ব্যাপক ধর্মদ্রোহিতার শিকার হচ্ছে, অথচ আমরা নিশ্চিন্ত

আয়েশে 'ইলমে গায়বের আলোচনায় মশগুল। এই মুহূর্তেই যেন আমার ফয়সালা করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানব ছিলেন, না অতিমানব! একথা আমি আশা করতে পারিনি, এমন নাযুক ও সংকটময় পরিস্থিতিতে যখন মহাবিপদ সংকেত আমাদের মাথার ওপর ঝুলছে কেউ এ ধরনের অর্থহীন আত্মঘাতী আলোচনায় লিপ্ত হবে। কিন্তু এ দুনিয়ার সব কিছুই সম্ভব। এমন হওয়া বিচিত্র নয়, আমরা আমাদের মেধা, প্রতিভা, শক্তি ও সম্ভাবনা বিনষ্ট করতে থাকব বিরোধপূর্ণ বিষয়ে, খুঁটিনাটি ঝগড়ায়, আর শত্রুর তলোয়ার সেই সুযোগে পৌঁছে যাবে শাহ্‌রগের কাছে। জানি না, আমার এ আবেদন মর্মমূলে কতটা রেখাপাত করবে। আমি আবারো বলছি, আপনারা সংকট উপলব্ধি করুন, আপনাদের এদেশ এখন এক সংযোগ সড়কের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে ইসলামের হিফাজতের জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হোন, সর্বশক্তি নিয়োগ করুন, সকল বিরোধ ও মতপার্থক্য সিন্দুকে আবদ্ধ করুন। ইসলাম রক্ষা পেলে খুঁটিনাটি মতপার্থক্যের মীমাংসা করার ফুরসত পরেও পাওয়া যাবে। তাছাড়া এগুলো মাঠে-ময়দানে আলোচনার বিষয় নয়, শিক্ষাঙ্গনের শান্ত পরিবেশই এর জন্য উপযুক্ত।

অল্প ক'দিন আগে ভারতে বিশেষ মতাদর্শের এক জামাত আয়োজিত সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসংগে আমি বলেছিলাম, মতপার্থক্য চিরদিনই ছিল, এমন কি নামাযের ব্যাপারেও মতপার্থক্য আছে। চার মাযহাবে ও চার মাযহাবের বাইরে রয়েছে কত শত মতদ্বৈধতা! কিন্তু তা নিয়ে কখনো কোন ফ্যাসাদ কিংবা হাঙ্গামা হয়নি, উম্মাহর মাঝে বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়নি। এ অভিশাপ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন আলিমগণ মাদরাসার গণ্ডী পেরিয়ে জনতার সামনে তর্কযুদ্ধের সূচনা করেছেন, চৌরাস্তায় মজলিস গুলযার করেছেন। কোন মাসআলা সম্পর্কে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ও উম্মী জনতার হাতে তা তুলে দেয়াই হচ্ছে আমাদের চরম ভ্রান্তি, অমার্জনীয় অপরাধ। নইলে এসব বিতর্ক তো শুরু থেকেই চলে আসছে, তাতে তো কারো সাথে কারো মনোমালিন্য হয়নি। কেউ কারো মাথা ফাটায় নি, মানুষের জ্ঞানর পরিধি বরং তাতে বৃদ্ধিই পেয়েছে, মেধা ও চিন্তাশক্তি প্রখর হয়েছে, অনুশীলনী ও অনুসন্ধিৎসা ব্যাপকতা লাভ করেছে। একটি জীবন্ত জাতি ও প্রাণবন্ত সমাজের জন্য এটাই স্বাভাবিক, বিভিন্ন বিষয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে, অনুসন্ধান ও গবেষণায় লিপ্ত হবে এবং মজলিসী আলোচনায় কিংবা কলমের ভাষায় মত বিনিময় করবে। পাহারা বসিয়ে তা রোধ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কিন্তু এসব বিষয় যদি উম্মী জনতার মাঝে অনুপ্রবেশ করে, যদি দলীয় বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তা ধারণ করে এমন এক চরম ধ্বংসাত্মক রূপ যা কোন সমৃদ্ধ ও

ঐতিহ্যবাহী জাতির বিপর্যয় ও ভরাডুবির জন্য যথেষ্ট। এগুলো নিছক ফিকহ্‌শাস্ত্রীয় বিষয়, তাত্ত্বিক বিষয়, বিদ্বান সমাজের বিষয়। গ্রন্থাগারের ভাবগম্ভীর পরিবেশে কিংবা শিক্ষাঙ্গনের আলোচনা কক্ষে যত ইচ্ছা সেগুলোর চর্চা ও অনুশীলন করুন, কিন্তু উম্মী জনতার হাতে তা তুলে দেয়া হলে সমাজে আরো অধিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাকে আরো অধিক উৎসাহ যোগাবে। আল্লামা রূমী এর চেয়ে সাধারণ কোন বিষয় সম্পর্কেই বলেছিলেন, "মিলনের সেতুবন্ধন তৈরি করাই তোমার কাজ; সংঘাত ও বিচ্ছেদে ইন্ধন যোগানো তোমার কাজ নয়।"

আপনাদের ওপর আজ যে গুরু দায়িত্ব বর্তেছে তা একেকটি দেশ বা জাতির ভাগ্যের মীমাংসা করতে পারে। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিদ্যালোচনার দুয়ার কেউ বন্ধ করতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তো এ ধারণা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। কেননা আমি আমার স্বভাবে আগাগোড়া একজন ছাত্র। কিন্তু সেগুলোকে রাজনৈতিক ও দলীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার ও হীন স্বার্থোদ্ধারে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার অনুমতি কিছুতেই দেয়া যায় না। এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় হচ্ছে পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করা এবং দেশ ও জাতিকে চিন্তানৈতিক ধর্মদ্রোহিতা থেকে রক্ষা করা।

পাকিস্তান সরকারের ওয়াক্‌ফ্‌ বিভাগ যার সদর দফ্‌তরে বসে আজ আমরা আলোচনা করছি, এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, পারে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। কেননা আল্লাহ্‌র ফযলে আজো জনসাধারণের ওপর 'আলিম সমাজ ও ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। মসজিদের মর্যাদা আজো সমুন্নত রয়েছে মানুষের হৃদয়ে। মসজিদের মিম্বর ও মিহরাব থেকে যে বাণী উচ্চারিত হবে, তা মানুষের হৃদয়ের গভীর প্রদেশে রেখাপাত করবে, অন্তর জগতে ধীরে ধীরে বিপ্লব ঘটাবে। কেননা প্রতিটি মসজিদের মিম্বরই মূলত রাসূল (সা.)-এর প্রতিনিধিত্বকারী। এমন একটি বিপুল সম্ভাবনা ইসলামী উম্মাহর কল্যাণে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে।

আমি আমার বক্তব্যের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। বিদায়ের মুহূর্তে আপনাদের পুনরায় মুবারকবাদ জানাচ্ছি, আপনারা সম্মানিত 'উলামা, ইমাম, খতীব ও দ্বীনদার মুসলমান ভাইদের খিদমতে আমার মনের কথা প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

# ইসলামী বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পন্থা

[১২ই জুলাই ১৯৭৮ইং তারিখে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট অডিটোরিয়ামে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেকে গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনেছিলেন।

স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর ইহ্সান রশীদ এবং বিদায়ী ভাষণ দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রার জনাব ইসমাঈল সা'দ সাহেব।]

হামদ ও সালাতের পর।

### জ্ঞান অর্থ সত্যানুসন্ধান

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রিগণ ও অন্যান্য শ্রোতা!

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি 'বিভাজন'-এর পক্ষপাতী নই। আমার বিশ্বাস, 'ইল্‌ম ও জ্ঞান একটি অবিভাজ্য একক সত্তা যাকে আধুনিক ও প্রাচীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা ঠিক নয়। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

حديث كم نظران قصه قديم وجديد -

আধুনিক ও প্রাচীনের বিভাজন সংকীর্ণ ও অপরিপক্ক দৃষ্টির পরিচায়ক।

'ইল্‌ম ও জ্ঞানকে জাগতিক ও ধর্মীয়—এ দু'ভাগে ভাগ করারও আমি পক্ষপাতী নই। আমি বিশ্বাস করি, জ্ঞান হচ্ছে মানব জাতির সম্মিলিত ও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল যা কোন দেশ বা জাতির একক মালিকানা নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। এমন কি আমি জীবনের প্রতিভাভিত্তিক অন্যান্য উৎসের ক্ষেত্রেও দেশ ও জাতিভিত্তিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক বিভক্তির পক্ষপাতী নই। আমি বিশ্বাস করি, ইল্‌ম একটি 'অবিভাজ্য একক' সাধারণ ব্যবহারে যাকে 'বহু'তে বিভক্ত বলা হয়, আমার সন্ধানী-দৃষ্টিতে সেখানেও একটি 'একক সত্তার' রূপ ধরা পড়ে। 'ইল্‌ম ও জ্ঞানের সে 'অবিভাজ্য ও একক সত্তা'

হচ্ছে সত্য ও সত্যের অন্বেষণ, অনুসন্ধিৎসা ও প্রাপ্তির আনন্দ। আর এসব ক্ষেত্রে কোন দেশ, জাতি বা দল ও গোষ্ঠীর একক মালিকানা হতে পারে না। এটা আমার বিশ্বাস, আমার হৃদয়ের একান্ত অনুভব। তবু আমি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিক শোকরগুযারী করছি। কেননা তাঁরা তাঁদের ছাত্র-সন্তানদের সামনে, ইসলাম উদ্যানের এই প্রস্ফুটিত কলিগুলোর উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করার জন্য এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন যার সম্পর্ক (তা সঠিক হোক কিংবা বেঠিক) হলো প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে। আপনাদের এ দূরদৃষ্টি ও উদারচিত্ততার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আমাকে দিতেই হবে, জ্ঞান ও সত্যের কৃত্রিম বিভাজন আপনাদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও কাব্যকলার ক্ষেত্রে আমি এ নীতিতে বিশ্বাসী নই, যারা বিশেষ কোন উর্দি পরে হাজির হবে তারাই শুধু জ্ঞানী-গুণী বলে স্বীকৃতি পাবেন। আর যাদের গায়ে সে ধরনের কোন উর্দি নেই তাদের গুণীজনদের মজলিসে প্রবেশাধিকারও দেয়া হবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান ও মনীষার জগতে উপরিউক্ত মানসিকতাই বর্তমানে বিদ্যমান। দোকান খুলে সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে কবিতা সন্ধ্যায় আবৃত্তি করে নিজেকে যিনি জাহির না করবেন, কাব্য সাহিত্যের জগতে তার আদর-কদর কোনদিন হবে না, কপালে তার কোন দিন কল্কে জুটবে না। নীরবে নিভৃতে ধুঁকে ধুঁকেই জীবন দিতে হবে তাকে। কত স্বভাবকবি ও প্রতিভাধর শিল্পীকে যে এ ভুলের নির্মম খেসারত দিতে হয়েছে, কে তার ইয়ত্তা রাখে! মোটকথা যদিও আমি ইল্‌ম ও জ্ঞানের বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতায় বিশ্বাসী, যদিও আমার নিবিড় অনুভূতি হলো, ইল্‌ম ও জ্ঞান হচ্ছে চিরনবীন ও চিরনতুন এক একক সত্তা এবং নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততা থাকলে দেশ-কাল-জাতি ও ধর্মভেদে আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহে বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে না। তবুও আমাকে বলতে হচ্ছে, আপনাদের এ পদক্ষেপ খুবই দুঃসাহসিক, বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী। সুতরাং সাধুবাদ লাভের যোগ্য। আমার একান্ত কামনা, আপনাদের এ সাহসী পদক্ষেপ অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করুক, উন্মোচিত করুক সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হোক, আর বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমিগুলোতে ডাকা হোক তাদের, যারা নিষ্ঠার সাথে জ্ঞানার্জন করেছেন, মানব জাতির সঞ্চিত শিল্প-সাহিত্য ও কাব্যের অভ্যন্তর থেকে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন।

### শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

সুধীবৃন্দ! আমি আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্য যে, এখানে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাঙ্গনে সেই তরুণদের সামনে কথা বলার সুযোগ আপনারা

আমাকে দিয়েছেন যারা অদূর ভবিষ্যতে এদেশের, সম্ভবত অপরাপর ইসলামী দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে, যারা ভবিষ্যতে দেশের নেতা ও কর্ণধার হবে কিংবা বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের পরিচালক হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শিক্ষার প্রভাব, ফলাফল ও উপকারিতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট লেখাপড়া করার সুযোগ হয়েছে। তবে এখানে আমি একটি মাত্র উদ্ধৃতি আপনাদের শোনাব। ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকায় সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ শিক্ষাবিদ স্যার পার্সী নিয়েন (Sir Percyneinn) শিক্ষার একটা ব্যাপক অর্থবহ ও প্রাজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় ঃ

"শিক্ষার যে মৌলিক ধারণা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করবে তা এই যে 'শিক্ষা' এমন এক প্রচেষ্টা যা শিশুদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ নিজেদের পছন্দ করা জীবনদর্শন অনুযায়ী নতুন বংশধর তৈরির জন্য ব্যয় করে থাকে। শিক্ষাঙ্গনের দায়িত্ব হলো উপরিউক্ত জীবন থেকে উৎসারিত আত্মিক শক্তিকে শিশু জীবনের প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দেয়া। শিক্ষাঙ্গন ছাত্রকে এমন প্রশিক্ষণ দেবে যা জাতীয় জীবনের ধারা ও উন্নয়ন গতির সাথে সম্পৃক্ত হতে ছাত্রের সহায়ক হবে এবং যার আলোকে ভবিষ্যতের পথে সে তার যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবে" (বিশেষ নিবন্ধ Education।

শিক্ষার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা নির্ধারিণের ক্ষেত্রে যে সব প্রচেষ্টা আমার চোখে পড়েছে সেগুলোর মধ্যে আমার মতে উপরিউক্ত সংজ্ঞাই হচ্ছে ব্যাপকতর ও অধিকতর বাস্তবসম্মত।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? শিক্ষা খাতে একটা জাতি তার মেধা, প্রতিভা ও সম্পদের সিংহ ভাগ এতটা উদারতার সাথে এমন পরিকল্পিতভাবে কেন ব্যয় করে? কি তার উদ্দেশ্য? জাতিকে তার আদর্শ ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা, তার সাংস্কৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা কিংবা তার অভ্যস্ত জীবন ও প্রিয়তম বিষয়গুলো থেকে বিস্মৃত করাই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য? এত ব্যাপক উদ্যোগ ও আয়োজনের সার্থকতা? যুক্তির মাপকাঠিতে কোন জিনিসের প্রিয়-অপ্রিয় হওয়া নির্ধারিত হবে, প্রিয় হওয়ার যোগ্য কিনা আগেভাগেই তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিতে হবে; যুক্তির এ ধরনের খবরদারি কোন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হৃদয় মেনে নিতে পারে না। সুতরাং সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, একটি জাতির কাছে যা কিছু প্রিয়, যে আদর্শ ও বিশ্বাস, যে চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ এবং যে ভাব ও অনুভূতি তাদের সযত্ন লালিত সেগুলো

নতুন বংশধরের কাছে সার্থকভাবে তুলে ধরাই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। দীর্ঘ দিনের সাধনা ও প্রচেষ্টায় পূর্বপুরুষরা যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন, যে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, যে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনে তারা যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন, জানমাল, ইয্যত-আব্রু লুটিয়ে দিয়েছেন, সে সম্পদ, সে ঐতিহ্য পরবর্তীদের হাতে তুলে দেয়া, তাদের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দেয়া এবং স্বভাব ও প্রকৃতিতে তা উৎরে দেয়াই হলো শিক্ষার মহান দায়িত্ব। শিক্ষা খাতে ব্যয়ের বেলায় একটা জাতি এজন্যই এত অকুণ্ঠ, এত দরাজ দিল।

## রাসূলে আরাবীর উম্মতের বিন্যাস বৈশিষ্ট্য

আমি মনে করি, শিক্ষার উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা যথাযথ ও সর্বাঙ্গীন এবং বিশ্বের সকল জাতির নিকটই তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এমন জাতির ক্ষেত্রে যাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ মানব মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, যাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মানুষের হাতে গড়া নয়, যাদের জীবন ও অস্তিত্বের উৎস হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ, ওহীভিত্তিক চিরন্তন ইল্‌ম ও মহাজ্ঞানই যাদের চিন্তা ও অনুভূতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রক, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি হয়ে পড়ে আরো নাযুক ও সংবেদনশীল এবং আরো অধিকতর গুরুত্বের দাবীদার। এমন মহিমান্বিত জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সদ্ব্যবহারের অভাবে কিংবা দেশী-বিদেশী চক্রান্তের ফলে শিক্ষার্থীদের অন্তরে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত দুর্বল করে দেয়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের সন্দিহান করে তোলে, মানসিক দ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমান অবস্থায় নিক্ষেপ করে, আর সে দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা যদি ব্যক্তি জীবনের পরিধি অতিক্রম করে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সংক্রমিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে জাতীয় জীবনে নামে প্রলয়ংকরী ধ্বংস, শিক্ষা যদি জাতির নতুন সম্প্রদায়কে, শিক্ষিত শ্রেণীকে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, চিন্তা ও ভাবধারা এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও সংঘাতমুখী করে তোলে, তবে নিরপেক্ষতা ও সত্যপ্রীতির খাতিরে বলতেই হবে, সে শিক্ষা আলো নয়, আঁধার; সে শিক্ষা কল্যাণ নয়, অভিশাপ; সে শিক্ষা অগ্রগতির মাধ্যম নয়, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার উৎস। কেননা একথা আমি স্বীকার করি না, ইসলাম একটি উত্তরাধিকার সম্পদ বা ঐতিহ্যমাত্র। এজন্যই Legacy of Islam কিংবা Hertiahe of Isalm এর ওপর লিখিত গ্রন্থাবলী আমার চোখে খুব বেশী প্রশংসার যোগ্য নয়। আমার বিশ্বাস, কর্মের জগতে ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন জীবন দর্শন। ইসলাম যুগের সহচর শুধু নয়, যুগের পথ-প্রদর্শকও। ইসলাম শুধু জীবন কাফেলার সাধারণ যাত্রীই নয়, কাফেলার নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়কও। সুতরাং যে

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণামে ব্যক্তি ও জাতি তার ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে পড়ে, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে ধর্মকে মনে করে বসে শিশুর মন ভোলানো ছড়া বা খেলনামাত্র, সে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশ ও জাতির জন্য এক মতিমানা অভিশাপ ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারি না।

## ইসলামী দেশের জন্য বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ

এ মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেও আমার চোখের সামনে ভাসছে গোটা ইসলামী বিশ্বের মানচিত্র। আমার সামনে রয়েছে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র। মাত্র কয়েক মাস আগে সৌদী আরবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন (All World Islamic Education conference)। পাকিস্তান থেকে ইহসান রশীদ সাহেব ও জনাব এ.কে. ব্রোহী সেখানে গিয়েছিলেন। ভারতের পক্ষে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সেখানে আমার পঠিত প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম, "বিষয়টি কোন ইসলামী দেশের হলে তা আরো নাযুক ও জটিল হয়ে পড়ে। কেননা প্রতিটি ইসলামী দেশের জনগোষ্ঠীরই রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় জাতীয় সত্তা, তাদের রয়েছে আলাদা ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ, রয়েছে আলাদা আদর্শ ও জীবনবোধ। পৃথিবীর বুকে এক মহাদায়িত্ব সম্পাদনের কঠিন সংগ্রামে তারা নিয়োজিত। এমন আদর্শবাদী জাতির ও এমন অগ্রণী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা যদি হয় নেতিবাচক, সে শিক্ষা ব্যবস্থার কোলে লালিত তরুণ সম্প্রদায় যদি জাতীয় বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন, তাহলে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপেই সেখানে দেখা দেয় আধুনিক ও রক্ষণশীলের ঝগড়া। এমন এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয় যারা বৃহত্তর সমাজের সাথে নিজেদের খাপ-খাওয়াতে পারে না কিছুতেই। তারা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। তাতে দেখা দেয় নতুন জটিলতা, সৃষ্টি হয় নবতর সমস্যা। এক নতুন প্রতিবন্ধকতা বিঘ্নিত করে জাতীয় জীবনধারাকে।

যে দেশ ও জাতির বিশ্বাস, মতবাদ, ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার বুনিয়াদ হচ্ছে আসমানী ওহী, সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি যদি হয় মানসিক দ্বন্দ্ব-বিশৃঙ্খলা, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং আল্লাহ তাকে যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও পদমর্যাদা দান

করেছেন সেগুলোর প্রতি উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা, তাহলে আমি বলব, সে শিক্ষার নাম জাতীয় সেবা নয়—জাতীয় দুর্দশা।

## ইসলামী রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কর্তব্য

আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে আপনারা আমার বক্তব্য বিচার করবেন। কেননা বিশেষ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা তার কর্তৃপক্ষ আমার বক্তব্যের লক্ষ্য নয়। নিছক একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে আমি বলছি, কোন ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান কর্তব্য হলো, জাতি যে আদর্শ ও মূল্যবোধ, যে বৈশিষ্ট্য ও জীবনধারা, যে ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা এবং যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, সেগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীর মনে আস্থা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়া। সে বিশ্বাস একজন সাধারণ মানুষের, ফুটপাতের বাসিন্দার ও ভাসমান নাগরিকের বিশ্বাস হবে না, সে বিশ্বাস হবে একজন সুশিক্ষিতের, একজন চৌকষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের, যার মন ও মগজ একই সাথে অনুগত ও আশ্বস্ত। কবি ইকবালের ভাষায় ঃ এমন যেন না হয়, " অন্তরে ঈমানদার সে, চিন্তায় কাফির।"

ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব-সংঘাত যেমন বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তেমনি ব্যক্তির জীবনে মনে ও মস্তিষ্কের বিরোধও ডেকে আনে বড় ধরনের বিপর্যয়। সুতরাং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি জাতীয় জীবনে এমন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম দেয় তবে তা দেশ ও জাতির জন্য বিরাট দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

## মন ও মস্তিষ্ক উভয়ের আশ্বস্ত হওয়া অপরিহার্য

আপনারা আমাকে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা' সম্পর্কে আলোচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। আমার মতে ইসলামী রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থী তরুণ সম্প্রদায়ের অন্তরে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়া—যে বিশ্বাসের উৎস হলো জ্ঞান ও অধ্যয়ন এবং আত্মোপলব্ধি ও তুলনামূলক পর্যালোচনা। সে বিশ্বাসের সাথে মস্তিষ্কের আনুগত্য ও শান্তিও থাকতে হবে। কেননা বিশ্বাস যদি ভক্তির পর্যায়েই সীমাবদ্ধ হয়, সে বিশ্বাসে মস্তিষ্ক কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারে না। ফলে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তখন মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির টুঁটি চেপে ধরতে হয়। এতে হৃদয়ের সাথে মস্তিষ্কের ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে ভক্তির শুরু হয় সংঘাত। বিভিন্ন অমুসলিম জাতির ইতিহাস মূলত হৃদয় ও মস্তিষ্কের এবং ভক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সংঘাতেরই ইতিহাস। ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তাদের আপ্রাণ চেষ্টা—জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি

অনুরাগ যেন কখনো জাগ্রত না হয়। কেননা তা হচ্ছে সে ধর্মের মৃত্যুরই নামান্তর। কিন্তু মানব মনের জ্ঞানস্পৃহা ও স্বভাব অনুসন্ধিৎসাকে স্বর্গ-নরকের লোভ-ভীতি দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। শাশ্বত সত্যকে অস্বীকার করার ফলশ্রুতিতেই রচিত হয়েছে গির্জা ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কলংকময় ইতিহাস। ড্রেপ্যার রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Conflict Between Religon & Science-এর পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে সে যুগের অনেক লোমহর্ষক কাহিনী।

এ সংঘর্ষের পেছনে কি কারণ সক্রিয় ছিল? গির্জার বিশ্বাস ছিল, ধর্ম ততদিনেই টিকে থাকবে, গির্জার প্রভাব ততদিনই অক্ষুণ্ন থাকবে মানুষের বোধ ও উপলব্ধি যতদিন ঘুমিয়ে থাকবে, চেতনা ও অনুসন্ধিৎসা যতদিন ঝিমিয়ে থাকবে। সুতরাং মানুষের জ্ঞানের পরিধি যত সংকীর্ণ হবে এবং মনীষার জগতে মানুষের দৈন্য যতটা প্রকট হবে, খ্রিস্ট ধর্ম ততটাই সজীবতা লাভ করবে এবং বাইবেলের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, মানুষের চিরন্তন অনুসন্ধিৎসার পথে ধর্মের পাঁচিল তুলে দিল। মোটকথা, গির্জা ও বিজ্ঞান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো এবং প্রকৃতির অমোঘ ধারায় মানুষের দুর্দমনীয় জ্ঞানস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসার জয় হলো। বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার সামনে গির্জাকে আত্মসমর্পণ করতে হলো। কেননা জ্ঞান হলো মানুষের স্বভাবধর্ম, হৃদয়ের আবেগ, আত্মার দাবী ও মানব সভ্যতার অপরিহার্য প্রয়োজন। জ্ঞান হলো আল্লাহ্‌র এক মহাদান। ফলে-ফুলে সুশোভিত হওয়ার জন্যই তো জ্ঞানবৃক্ষের জন্ম। এক কথায়, জ্ঞান হলো চিরন্তন সত্য। আর সত্যের কোন মৃত্যু নেই, পরাজয় নেই। এ অভিশপ্ত ঘটনার ক্ষেত্র খ্রিস্টধর্ম অধ্যুষিত ইউরোপ হলেও তার বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিশ্বে। কম-বেশি সব ধর্মের ওপরই পড়ল তার অশুভ প্রভাব। বীতশ্রদ্ধ ও ভাবাবেগ-তাড়িত মানুষ খুব সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, সভ্যতার মহাকাফেলায় জ্ঞান ও ধর্মের সহযাত্রা কিছুতেই সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সহাবস্থান। ইতিহাসের একজন বিশ্বস্ত ছাত্র হিসাবে দুঃখের সাথে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হয়, ইসলামী বিশ্বের কোন কোন দেশেও গির্জা-বিজ্ঞান সংঘর্ষের সে বিষক্রিয়া সাময়িকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু তা খুব বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। খ্রিস্ট জগতের সে অপচ্ছায়া খুব দ্রুতই অপসৃত হয়ে গেছে।

কেননা ইসলাম জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পৃষ্ঠপোষক; জ্ঞান. ও মনীষার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশই বরং ইসলামের দাবী।

### জ্ঞান ও কলম ইসলামের জন্ম সহচর

আমি মনে করি, ইসলামী রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একটি গুরু দায়িত্ব হলো জ্ঞান ও ধর্মের মাঝে এবং বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মাঝে বিরোধ ও ব্যবধান সৃষ্টি হতে না দেয়া। যেসব ধর্মের সাথে জ্ঞান ও মনীষার কোন সংযোগ নেই, মানুষের অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্পর্শ বাঁচিয়ে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চোখে ধুলো দিয়ে যে সব ধর্মের উন্মেষ ও যাত্রা, সেসব ধর্মের ক্ষেত্রে বিরোধ-ব্যবধানের অবকাশ হয়ত আছে। কিন্তু যে ধর্ম মানবতার উদ্দেশে উচ্চারিত তার প্রথম আহ্বানেই 'ইলমের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেছে ঃ পড়ো (হে মুহাম্মাদ!) তোমার প্রতিপালকের নাম নিয়ে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, তোমার প্রতিপালক যিনি খুবই বদান্য, যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান দান করেছেন। মানুষ যা জানত না তা তিনি তাকে জানিয়েছেন।

যে ধর্ম তার ওহীর প্রথম কিস্তিতে ও কল্যাণ ও রহমতের প্রথম পশলা বর্ষণে ও নগণ্য কলমের কথা ভুলে যায়নি কলমের সাথে 'ইল্‌মের ভাগ্যবিজড়িত হওয়ার রহস্য, সে ধর্মের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিরোধ ব্যবধানের অবকাশ কোথায়? ভেবে দেখুন, হেরা গুহার নির্জনতায় মানবতার জন্য কল্যাণ ও হিদায়াতের পয়গাম লাভ করছেন এক উম্মী নবী, কলমের সাথে মুহূর্তের পরিচয়ও যাঁর ঘটেনি কোনদিন। স্তব্ধ বিস্ময়ে পুলক মুগ্ধতায় আকাশ ও পৃথিবী সেদিন প্রত্যক্ষ করল এমন এক দেশে যেখানে বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান চর্চার প্রচলন ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র ছিল না, এমন কি ছিল না বর্ণ পরিচয় লাভের ন্যূনতম ব্যবস্থাও। সেই উম্মী দেশে উম্মী জাতির মাঝে, উম্মী নবীর ওপর অবতীর্ণ হচ্ছে ওয়াহী, প্রথম আসমানী ওয়াহী, কিন্তু সে ওহীর প্রথম শব্দ اعبد। (ইবাদত করো) নয়, صل (নামায পড়ো) নয়,, সে ওয়াহীর প্রথম শব্দ হলো اقراء। (পড়ো)। নিজে যিনি লেখাপড়া জানেন না, তাঁর ওপর অবতীর্ণ প্রথম ওহীতেই তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে, পড়ো। কোথায় এর রহস্য? কি এর তাৎপর্য? কেননা তোমার উম্মত হবে জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানের সেবক, বিজ্ঞানের ধারক-বাহক। তুমি যে যুগের নবী তা অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার যুগ নয়, জ্ঞান বিদ্বেষ ও নাশকতার যুগ নয় –বিজ্ঞানের যুগ, দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির যুগ, অগ্রগতি ও বিনির্মাণের যুগ, তা মানব সাম্য ও সম্প্রীতির যুগ। বস্তুত মানব সভ্যতা ও ধর্মের

সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম অভিজ্ঞতা, উম্মী জাতির মাঝে উম্মী নবীর ওপর অবতীর্ণ ওহীর প্রথম সম্ভাষণ হচ্ছে اقرأ باسم ربك। পড়! তোমার প্রতিপালকের নামে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল, মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সাথে 'ইল্মের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে সঠিক পথ থেকে তা বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। মানব জাতির উদ্দেশে প্রেরিত আল-কুরআনের প্রথম ওহীতে রবের সাথে 'ইল্মের সেই দিন সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলো। ইলমকে দেয়া হলো প্রথম ওহীর মর্যাদা। সেই সাথে সতর্ক করে দেয়া হলো, আল্লাহর নামে ' ইল্মের সূচনা হতে হবে। কেননা 'ইল্ম তাঁরই দান, তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং তাঁরই পথ-নির্দেশনা ও হেদায়াতের আলোকে তা মানবতার জন্য কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে। যে বাণী আজ আমি আপনাদের শোনাচ্ছি তা এমনি এক বিপ্লবাত্মক ও জলদগম্ভীর বাণী যা ইতোপূর্বে পৃথিবী আর কোনদিন শোনেনি, এমন কি কারো পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। এ ছিল সংকীর্ণ মানব কল্পনার বহু ঊর্ধ্বের ব্যাপার। সেদিন যদি পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মহাসম্মেলন ডেকে জিজ্ঞাসা করা হতো ঃ বলুন দেখি, মানব জাতির জন্য প্রথম যে ওহী অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে তার প্রথম শব্দ কি হবে? কোন বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করবে? আমার স্থির বিশ্বাস, সেই উম্মী জাতির স্বভাব-প্রকৃতি ও মন-মানসিকতার প্রেক্ষিতে হয়ত অনেক জ্ঞানগর্ভ জওয়াবই তারা দিতেন। কিন্তু এমন কথা তারা কিছুতেই বলতে পারতেন না, আসন্ন ওহীর প্রথম শব্দ হবে اقرأ। 'পড়'। দেখুন, এখানে শুধু জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়নি, علم শব্দটি প্রয়োগ করা হয়নি। জ্ঞান অর্জনের জন্য কাগজ কলম কালি জরুরী নয়, তা প্রকৃতিপ্রদত্তও হতে পারে। এখানে اقرأ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। পড়ার সম্পর্কে রয়েছে কাগজের সাথে, কলমের সাথে, বই-পুস্তকের সাথে, পাঠাগার ও প্রকাশনা সংস্থার সাথে, শিক্ষাঙ্গন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে, সাধনা ও মেধার সাথে এবং অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সাথে। পড় তোমার প্রতিপালকের নাম নিয়ে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

### এ ধর্ম 'ইল্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না

প্রথম ওহীতেই এ ধর্মের চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, 'ইল্ম থেকে তা কোনদিন বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যাদের প্রতি সর্বপ্রথম আসমানী নির্দেশ হলো 'পড়' তাদের লেখাপড়া না করে উপায় কি? 'ইল্মের সাথে যে মুসলমানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন সে সত্যিকারের মুসলমান হতে পারে না., ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি হওয়ার দাবীদার হতে পারে না।

মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি বিপ্লবী আহ্বান হলো 'পড়' اقرأباسم ربك الذى خلق। আপন প্রতিপালকের নাম নিয়ে পড় এবং তাঁরই হিদায়াত ও পথ-নির্দেশনার আলোকে এ সফর শুরু কর। কেননা এ বড় দীর্ঘ সফর। বড় কঠিন ও দুর্গম সফর। অত্যন্ত বিপদসংকুল এ পথ। এখানে পদে পদে রয়েছে গভীর খাদ। পথের বাঁকে বাঁকে ওঁৎ পেতে আছে তস্কর, যারা সুযোগ পেলে লুট করে নেবে কাফেলার সর্বস্ব। এখানে ঝোঁপে-ঝাড়ে লুকিয়ে আছে বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু। কাজেই এ সফরে চাই একজন সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞানী পথপ্রদর্শকের নির্ভুল পথ-নির্দেশনা। এ পথ-প্রদর্শক হলেন বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্রষ্টা আল্লাহ্ পাক। তাই নির্দেশ হয়েছে ঃ اقرأ باسم ربك الذى خلق। পড়, তবে অন্তঃসারশূন্য 'ইল্‌ম নয়; সে 'ইল্‌ম নয় যা মানুষে মানুষে সৃষ্টি করে সংঘাত-সংঘর্ষ, জাতিতে জাতিতে সৃষ্টি করে হানাহানি। সে 'ইল্‌ম নয় যা মানুষকে করে তোলে স্বার্থপর, উদরসর্বস্ব, বরং

اِقْرَأْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اِقْرَأْوَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

পড় তোমার প্রতিপালকের নাম নিয়ে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়, তোমার প্রতিপালক বড় দয়ালু। তোমাদের প্রয়োজন ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে ভালো কে জানবে? اقرأباسم ربك الذى خلق। বলুন দেখি, কলমকে এত বড় মর্যাদা আর কে দিতে পেরেছে? আমার মনে হয় গোটা আরব তন্নতন্ন করে খুঁজলেও কোন এক ওয়ারাকা বিন নওফেলের ঘরেই হয়ত তার সন্ধান পাওয়া যেত। তৎকালীন আরবী সাহিত্য ও আরবী কবিতার গোটা ভাণ্ডার আপনি খুলে বসুন; এক দু'জায়গাতেই হয়ত আপনি কলমের দেখা পাবেন। কিন্তু হেরা গুহায় প্রথম ওহী সেই অবহেলিত কলমের কথা বিস্মৃত হয়নি।

## আল্লাহ্ মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না

প্রথম ওহীর আরেকটি বিপ্লবী বাণী, 'ইল্‌মের কোন শেষ নেই, জ্ঞানের কোন সীমা-সরহদ নেই। علم الانسان مالم يعلم। বিজ্ঞানের মূল কথা কি? علم الانسان مالم يعلم। প্রযুক্তির শেষ কথা কি? علم الانسان مالم يعلم। মানুষের চন্দ্র বিজয়, মঙ্গল গ্রহের অভিযান, সৌর কিরণ হাতের মুঠোয় এনে তারকালোকের রহস্যদ্বারে প্রয়াস আমাদের সামনে কোন্ সত্য তুলে ধরে? علم الانسان مالم يعلم। মানুষ ক্ষুদ্র, তার জ্ঞান ক্ষুদ্র, আল্লাহই সর্বজ্ঞানী, তিনিই মানুষের শিক্ষক।

আমার বক্তব্যের সারকথা হলো, যে উম্মতের গোড়াপত্তন হয়েছে পড়ার মাধ্যমে, যে আদেশের উদ্বোধন হয়েছে কলমের আলোচনার মাধ্যমে, সে জাতির, সে ধর্মের সম্পর্ক কলম থেকে কোনদিন বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সুতরাং আমাদের করণীয় বিষয় হলো, এ উম্মাহ্‌র জন্য যখনই কোন বিদ্যাপীঠ ও শিক্ষাঙ্গনের প্রতিষ্ঠা করা হবে কিংবা কোন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, তখন তার মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয় হবে, সে শিক্ষা ব্যবস্থা যেন জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি ও জীবন-দর্শনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসকে দৃঢ় ও গভীর করে তোলে। তদুপরি সে বিশ্বাস যেন নিছক হৃদয়নির্ভর না হয়, বরং তা যেন হয় যুগপৎ মন ও মস্তিষ্কনির্ভর। মন ও মস্তিষ্ক উভয়টি যদি আশ্বস্ত না হয় তাহলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে ব্যক্তিজীবনে দেখা দেবে দ্বন্দ্ব, মানসিক সংঘাত ও অস্থিরতা। ক্রমান্বয়ে তা ছড়িয়ে পড়বে জাতীয় জীবনের সর্বত্র। তরুণ বংশধর ও নবীন সম্প্রদায় সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি হয়ে উঠবে বিদ্রোহী।

মোটকথা, বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চতর শিক্ষাঙ্গণের মূল উদ্দেশ্য হবে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় করা এবং মন-মস্তিষ্ক উভয়কে সেগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত করে তোলা। একদিকে সে বিশ্বাস তাদের অন্তরের অন্তস্থলে বদ্ধমূল হবে, অন্যদিকে তাদের মেধা ও মস্তিষ্ক তার সপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ সরবরাহ করবে। কাজেই আমি মনে করি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি নতুন বংশধর, নবীন শিক্ষিত সমাজ, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় করে দেয়ার মাঝেই শিক্ষা ব্যবস্থার সফলতা ও সার্থকতা নিহিত। একটি সফল শিক্ষা ব্যবস্থা তার শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এতটা যোগ্য করে তুলবে যাতে তাদের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সপক্ষে যুক্তি- প্রমাণের যোগান দিতে পারে, পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-ভাণ্ডারকে জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারে।

### চরিত্র গঠন

ইসলামী রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালসমূহের পরবর্তী দায়িত্ব হলো আদর্শ চরিত্র গঠন। জাতিকে বিশ্ববিদ্যালয় এমন আদর্শ নাগরিক উপহার দেবে ইকবালের ভাষায় ঃ এক মুঠো চালের বিনিময়ে যারা বিবেকের বলি দেবে না (কবি নজরুলের ভাষায়ঃ শির দেগা নেহি দেগা আমাম)। আধুনিক বিশ্বের জড়বাদী দর্শন মতে বাজারে মুদ্রার দরে সব কিছুরই বেচা-কেনা সম্ভব। অল্প মূল্যে না হলে অধিক মূল্যে অবশ্যই তা হাতের নাগালে পাওয়া যাবে। মানবতার প্রতি আধুনিক জড়বাদী দর্শনের এ দর্পিত চ্যালেঞ্জের জওয়াব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই

দিতে হবে। এমন উন্নত চরিত্র ও আদর্শ ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার মধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সাফল্য নিহিত, যারা কোন মূল্যেই বিবেকের সওদা করতে রাযী হবে না। পৃথিবীর কোন শক্তি, কোন ধ্বংসাত্মক দর্শন, কোন বাতিল মতবাদ কিংবা কোন স্বৈরাচারী সরকার যাদের ইস্পাতকঠিন ব্যক্তিত্বে সামান্য ফাটলও ধরাতে পারবে না। রঙীন জীবনের হাজারো প্রলোভন জয় করে ও বিলাসী ভবিষ্যতের হাতছানি হেলায় উপেক্ষা করে ইকবালের ভাষায় যারা বলতে পারবে ঃ

اے طائر لا ہو تی اسرزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

"হে শূন্যলোকের বলাকা! যে অনন্ত অসীমের পথে তোমার উড্ডয়নে ব্যাঘাত ঘটায় সে অন্নের তুলনায় মৃত্যুই শ্রেয়।"

চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানব সেবা ও মানবতার প্রতি দরদ ও প্রেমের অনুভূতি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বেরিয়ে আসা তরুণদের হতে হবে মানবতার কল্যাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, আত্মত্যাগের মধ্যে তারা পাবে ভোগের আনন্দ। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে অনাহারে রাত কাটানোতে তারা অনুভব করবে উদর পূর্তির চেয়ে বড় আনন্দ। পাওয়ার আনন্দের চেয়ে হারানোর আনন্দই তাদের কাছে হবে অধিক অর্থময়। তারুণ্যের উদ্যম-উষ্ণতা, মেধা ও প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল ও শিক্ষাঙ্গন থেকে তাদের আঁচল ভরে দেয়া জ্ঞান সম্পদ তারা ব্যয় করবে দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং দ্বীন ও মিল্লাতের সেবায়। তাদের জীবন-যৌবন, সুখ-শান্তি ও যশ প্রতিষ্ঠা সব উৎসর্গীকৃত হবে আদর্শ সমাজ গড়ার কাজে এবং আদর্শবান জাতি গঠনের সাধনায়। এ দুটি গুণ সৃষ্টিই হলো একটি দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র দায়িত্ব অর্থাৎ মন, মেধা, চিন্তা ও মানসকে পরস্পরের সহযোগী করে গড়ে তোলা এবং প্রত্যেক তরুণকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সেবাব্রতী আদর্শ তরুণে পরিণত করা।

আসলে দেখবার বিষয় হলো, আপনাদের শিক্ষাঙ্গনে উচ্চতর যোগ্যতা, প্রতিভা ও আদর্শবান নাগরিক কি হারে তৈরি করছে? আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাধিক্য কিংবা পাসের উচ্চ হার আজকাল কোন দেশের উন্নতি-অগ্রগতির মাপকাঠিরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের সংকীর্ণ চিন্তাধারা আজ বর্জিত। বিজ্ঞান ও সভ্যতার এ অগ্রগতির যুগে কোন জাতির উন্নতির সঠিক মাপকাঠি হচ্ছে, জ্ঞানের সেবায়, অনুসন্ধান ও গবেষণার পথে জীবন উৎসর্গ করার

মত জ্ঞানপাগল লোকের সংখ্যা সেখানে কী পরিমাণে বিদ্যমান? এমন তরুণ বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা সেখানে কত যারা পার্থিব লোভ-লালসা ও বিলাস-সম্পদ দু' পায়ে ঠেলে ব্যক্তি উন্নতি ও ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠার মোহ বর্জন করে নিজেদের উৎসর্গ করবে জাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের মহান কর্মযজ্ঞে।

আসলে মানদণ্ড এটাই, দেখতে হবে তরুণদের মাঝে এমন বিদগ্ধজনের সংখ্যা কত, যারা পার্থিব সুখ-শান্তি ও বিলাস-ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে জ্ঞান সাধনার নির্জন গুহাবাসকেই মনে করবে জীবনের পরম সৌভাগ্য। একেকটি গবেষণা কর্মে ও নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার যাদের কেটে যাবে নিরলস দিন ও বিনিদ্র রাত। একটি শক্তিশালী দেশ ও একটি জাগ্রত জাতি হবে যাদের জীবনের প্রথম ও শেষ স্বপ্ন।

উল্লিখিত দু'টি বিষয়ই হবে কোন শিক্ষাঙ্গনের মূল লক্ষ্য। অন্যথায় শুধু লেখাপড়া শিখিয়ে দেয়া কিংবা বিভিন্ন পেশায় চাকুরীর যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেয়া আমার বিচারে এ যুগের কোন বিদ্যাপীঠের জন্য বিষয় হতে পারে না। পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে আমি বলতে পারি, আমাদের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সলর সাহেব তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এমন ভূমিকা ও অবস্থান কিছুতেই গৌরবজনক মনে করবেন না, যে শিক্ষা জীবন শেষে শিক্ষার্থীরা নিয়োজিত হবে অফিস-আদালত, কলকারখানা, বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন পদে বিভিন্ন চাকুরীতে। এরপর তারা হারিয়ে যাবে পৃথিবীর বিশাল জনসমুদ্রে, ভেসে যাবে ভোগবাদী জীবনের সর্বনাশা স্রোতে। এভাবে অবসান ঘটবে লক্ষ্যহীন কর্মহীন ও আদর্শহীন অসংখ্য জীবনের—যে জীবন দেশ, জাতি ধর্মের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর মহিমায় ভাস্বর নয়, নয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তৃত অঙ্গনে কোন অবদানের গৌরবে মহীয়ান।

### শিক্ষার লক্ষ্য অনন্ত জীবনের আকুতি

এমন এক সন্ধিক্ষণে, এমন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড ও গতিময়তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে ইসলামী বিশ্বের দেশে দেশে শতাব্দীব্যাপী বিরাজমান নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো। বস্তুত পশ্চিমা সভ্যতা ও পশ্চিমা রাজনীতির অনুপ্রবেশের অভিশাপরূপে আমাদের আকীদা-বিশ্বাসে ও ধ্যান-ধারণার বুনিয়াদে নেমে আসে এক প্রলয়ংকরী ধ্বংস; চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে দেখা দেয় চরম নৈরাজ্য ও অস্থিরতা। ফলে সম্পূর্ণ নেতিবাচক কর্মকাণ্ডেই ব্যয়িত হচ্ছে দ্বীন

প্রচারক ও দাওয়াত কর্মীদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও শক্তি। এ অস্বাভাবিক অবস্থার আশু অবসান একান্ত জরুরী। কেননা যাবতীয় প্রচেষ্টা ও উদ্যম এখন নিবেদিত হওয়া উচিত গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে ও নবতর বিনির্মাণ প্রয়াসে। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য, কাব্য, ললিতকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, রচনা, গবেষণা ইত্যাদির মূল হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বিশ্বাসের নবতর ভিত্তি স্থাপন করা, নতুন উদ্যম ও নতুন প্রাণ সঞ্চার করা।

এখন আমি আপনাদের খিদমতে আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা আবৃত্তি করব। এ কবিতা জনৈক সাহিত্যসেবীকে লক্ষ্য করে রচিত হলেও আমাদের অবস্থার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি প্রযোজ্য ঃ

"হে সন্ধানি! তোমার অনুসন্ধিৎসা হয়ত সীমাহীন। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ যে অনুসন্ধিৎসা তার সার্থকতা কোথায়?

কবির কাব্যচর্চা, গায়কের সুর সাধনা আর ভোরের মৃদুমন্দ বায়ু উদ্যানের সজীবতাই যদি না আনল, তবে তার মূল্য কি!

অনন্ত জীবনের জন্য হৃদয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করাই যে জ্ঞান সাধনার লক্ষ্য, ফুলকির ন্যায় ক্ষণিকের জ্বলে ওঠায় কি বা আসে যায়!"

পাকিস্তানের এ পাকভূমিতে বসবাসকারী ইসলামী উম্মাহকে জাগিয়ে তোলার জন্য আজ প্রয়োজন এক প্রচণ্ড আঘাতের। কোন জাতির ভাগ্য কিশ্তি ছাড়া কখনো নাগাল পায় না নিরাপদ সবুজ দ্বীপের। আজ পাকিস্তান যে নাযুক পরিস্থিতির মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে তার সফল মুকাবিলার জন্য প্রয়োজন এক অলৌকিক পরিবর্তনের। জীবন ও ভাগ্যের মোড় পরিবর্তনের সে অলৌকিক শক্তি নিহিত রয়েছে ইসলামের শাশ্বত বিধান ও চিরন্তন পয়গামের মাঝে। কবির ভাষায় ঃ

"অলৌকিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন জাতির উত্থান সম্ভব নয়। মূসা কলীমের ন্যায় প্রচণ্ড আঘাত না হানলে সে কৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য।"

পাকিস্তানের ইসলামী উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আজ প্রয়োজন মূসা কলীমের ন্যায় তেমনি এক প্রচণ্ড আঘাতের। কেননা গোটা আরবসহ ইসলামী উম্মাহর নির্জীব দেহে নতুন প্রাণ সঞ্চারের মহাদায়িত্ব আজ পাকিস্তানের। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা ফিরিয়ে আনা এবং দ্বিধাগ্রস্তদের মনে নতুন উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ততা, নতুন উদ্যম ও সাহসিকতা এবং এক নবতর অন্তঃবাসনা ও মাদকতা সৃষ্টি করার এ পবিত্র জিহাদে আপনাদেরকেই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। এ ঝিমিয়ে পড়া জাতিকে পতনোন্মুখ

উম্মাহকে আপনাদের দিতে হবে নতুন জীবনের সন্ধান ও নতুন মনযিলের ইশারা। এদের টলায়মান পদক্ষেপে আনতে হবে সুদূর মাত্রার নতুন শক্তি ও হিম্মত। দোদুল্যমান চিত্তে বুলাতে হবে আস্থা ও নির্ভরতার জীয়ন কাঠির স্নিগ্ধ পরশ। আপনাদের দায়িত্ব শুধু আপনাদের নিজেদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। সংখ্যার বিচারে উপমহাদেশের মুসলমানগণ গোটা ইসলামী বিশ্বের বৃহত্তম জাতি। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে ইসলামী বিশ্বের নির্ভুল পথ-নির্দেশনায় আপনারা এগিয়ে আসুন। ইসলাম ও ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি উম্মাহর আস্থা ফিরিয়ে আনুন। জ্ঞান ও অন্বেষার জগতে আপনাদের দৃপ্ত পদচারণা প্রমাণ করুক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ চরমোৎকর্ষের যুগেও ইসলাম সমান কার্যকর। পাকিস্তান আজ ইসলামী আদর্শ ও জীবন বিধানের পরীক্ষাগার। তাই গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আজ পাকিস্তানী উম্মাহর প্রতি নিবদ্ধ। এখানেই আমি আমার বক্তব্যের সমাপ্তি টানছি।

ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে আপনারা আমার বক্তব্য শুনেছেন এবং আমাকে মনের ব্যথা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আমি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর আন্তরিক শুকরিয়া আদায় করছি।

# ইসলামী বিশ্বে নৈতিক দ্বন্দ্বের কারণ ও প্রতিকার

[আল্লামা ইকবাল ইউনিভার্সিটি', ইসলামাবাদে ১৮ই জুলাই প্রদত্ত ভাষণ। ভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষকসহ স্থানীয় ও দূর অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে শরীক ছিলেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও আলিমদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখ্যযোগ্য।

পরিচিতিমূলক স্বাগত ভাষাণ দিয়েছেন ডক্টর মুহাম্মদ সিদ্দীক শিবলী এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা আঞ্জাম দিয়েছেন ভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর শের যামান।]

হাম্দ্ ও সালাত!

জনাব ভাই চ্যান্সেলর , সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলি ও প্রিয় সুধীবৃন্দ!

যে মহান ব্যক্তির নাম ধারণ করে এ বিশ্ববিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করেছে, সৌভাগ্যবশত তাঁর সাথে, তাঁর আদর্শ ও চিন্তার সাথে আমার আশৈশব হৃদয়ের সম্পর্ক। আর তাই আপনাদের আমন্ত্রণে এখানে আসতে পেরে যে আনন্দ উদ্বেলতা আমি অনুভব করছি তা খুব কম শিক্ষাঙ্গনেই আমার কিসমতে জুটেছে। আমার ইচ্ছা ছিল পারস্য কবির এই কবিতা পংক্তি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করব ঃ

"শোন ভাই! এ পরদেশীরও কিছু বলার আছে।"

কিন্তু ইকবালের সাথে আমার আশৈশব আত্মীয়তার দাবীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে যথার্থই আমি বলতে পারি ঃ

বিস্তৃত পুষ্পোদ্যানের যেখানেই থাকি না কেন
আমারও দাবী আছে তার সৌরভে,
তার বসন্ত জাগ্রত অপরূপ সৌন্দর্যে।

এ বিশ্ববিদ্যালয় ইকবালের পুষ্পোদ্যান হলে আমি সে উদ্যানের বুলবুল। এর যে কোন গাছে, যে কোন শাখায় গান গাওয়ার আমার অধিকার আছে। এ শহরে আমি পরদেশী নই, নই এ উদ্যানে কোন অতিথি পাখী, আমাকে মনে করুন আপনাদেরই এক সাথী বুলবুল।

সুধীবৃন্দ!

আমার হাতে সময় সংক্ষিপ্ত এবং শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইকবাল যা কিছু লিখেছেন তা আপনাদের সামনেই রয়েছে। সুতরাং ইকবালের শিক্ষা

দর্শন সম্পর্কে আমি মনে করি নতুন করে আলোকপাত করার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু ইকবাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করব, ইকবালের শিক্ষাদর্শনকে এখানে আপনারা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করুন। শিক্ষা সম্পর্কে ইকবালের দৃষ্টিভংগী, সমালোচনা ও মতামতের ওপর যদিও একাধিক স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও মূল্যবান রচনা-কর্ম রয়েছে, তবু আমার মতে একে স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত। ইকবাল সেই স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবানদের অন্যতম, যারা খোদ ইকবালের ভাষায় আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নমরুদী আগুনে বসেও ইবরাহীমী স্বভাব নিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি গর্বের সাথে বলতেন ঃ শিকারীর পাতা জালে আমি প্রবেশ করেছিলাম ঠিকই, তবে ফাঁদে আটকা পড়িনি, শিকারীর সন্ধানী চোখের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে দানা মুখে করে বেরিয়ে এসেছি।

প্রাচ্যের উচ্চাভিলাষী তরুণ শিক্ষার্থীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত ইংল্যান্ডে উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় গমন করত। যে স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবানের কপালে ইউরোপে সফরের দুর্লভ সুযোগ জুটত তারা হতো গোটা দেশের ঈর্ষার পাত্র। এদের নিজেদেরও তখন গর্বে মাটিতে পা রাখার ফুরসত হতো না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ছিল আমার বিচার অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার বয়স। খিলাফত আন্দোলনের উত্থান-পতন খুব নিকট থেকেই আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি। এক হিসাবে এ আন্দোলনের আমি সমবয়সী। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ ও ইংরেজী সভ্যতার জয়জয়কার। কোন সচ্ছল ও অভিজাত পরিবারের জন্য সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় ছিল উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশে সে পরিবারের কোন সন্তানের ইউরোপ গমন। গোটা জেলায় তখন ধুম পড়ে যেত, অমুক জমিদার কিংবা অমুক খান সাহেব ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছেন। সে যুগের মিসর সিরিয়ার তরুণ শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভারতবর্ষীয় তরুণদের মধ্যেই ইউরোপের মোহ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অবিভক্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলোই ইংল্যান্ড পাড়ি জমিয়েছে এবং অক্সফোর্ড-কেমব্রীজে শিক্ষা লাভ করেছে। তবে ভারতবর্ষের মুসলমানগণ গর্বের সাথে এমন দু'জন ব্যক্তির নাম নিতে পারে যাঁরা ইউরোপের ধর্মহীন ও নৈতিকতাবিধ্বংসী পরিবেশের বিষ প্রভাব থেকে নিজেদের শুধু রক্ষাই করেন নি, সেই সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বুকে বিদ্রোহের আগুন নিয়ে ফিরেও এসেছেন। সেই দুই সৌভাগ্য শিজরার একজন হলেন আল্লামা ইকবাল, আরেকজন ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ মাওলানা

মুহাম্মদ আলী। মিসর তথা গোটা মধ্যপ্রাচ্য তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ সৌভাগ্য কখনো অর্জন করতে পারেনি। এমন একজন তরুণ শিক্ষার্থী সভ্যতার অভিশপ্ত পরিবেশ থেকে নিজের স্বকীয় সত্তা বজায় রেখে, স্বকীয়তার কণ্ঠস্বর হয়ে স্বদেশ ভূমিতে ফিরে এসেছেন, ফিরে এসেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আলীর মত পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জ্বলন্ত অঙ্গার বুকে নিয়ে, এটা শুধু এই উপমহাদেশের মুসলমানদের একক গর্ব। অন্তত এ দুটি নামকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়, নইলে আরো অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যারা ইউরোপ গিয়ে নিজেদের স্বকীয় সত্তার সওদা করে ফিরে আসেন নি। প্রকৃত অবস্থার 'ইল্‌ম তো শুধু আল্লাহ্‌রই রয়েছে। আমরা যখন ইকবালের কাব্য পড়ি, কমরেড ও হামদর্দে প্রকাশিত মাওলানা মুহাম্মদ আলীর অনলবর্ষী লেখা পড়ি, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নির্ভীক ভূমিকা ও খিলাফত আন্দোলনের বিপদসংকুল পথে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ইতিহাস পড়ি, তখন একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়, চিন্তার জগতে পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে ইকবালের চেয়ে বড় বিদ্রোহী এবং পশ্চিমা রাজনীতি ও রাষ্ট্রদর্শনের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ আলীর চেয়ে বড় বিদ্রোহী প্রাচ্যের কোন ইসলামী দেশে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এ গর্ব শুধু ইকবালকেই শোভা পায় ঃ

সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য গর্বে গর্বিত ফিরিঙ্গী প্রতিমার<br>
সঙ্গ আমি লাভ করেছি। এর চেয়ে অভিশপ্ত<br>
মুহূর্ত আমার জীবনে কখনো এসেছে বলে মনে পড়ে না।

মোটকথা, পশ্চিমা সভ্যতার ইন্দ্রজালে বন্দী হয়ে তিনি তাঁর স্বকীয় সত্তা বিসর্জন দেন নি, বরং স্বকীয়তার উদাত্ত কণ্ঠ হয়ে স্বদেশভূমে ফিরে এসেছেন। পাশ্চাত্য সমাজ সভ্যতার গভীরে প্রবেশ করে তিনি তার ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। আলো ঝলমল পর্দার পেছনে দেখেছেন অন্ধকার জগত। সেই মহান ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠিত আপনাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়; সুতরাং তার গর্বও যেমন অনেক, দায়িত্বও বিরাট।

সময়ের এই স্বল্প পরিসরে আপনাদের খিদমতে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করতে চাই। আমাদের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষানীতি প্রণয়নকারী দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আজ এ বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে। দু'তিন বছর আগের কথা। আমি শহর ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। তিনি নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করছিলেন, আমি ছিলাম তাঁর পাশে। হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন ঃ মাওলানা! আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করব।

চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী দেশগুলোতে যে ধরনের দ্বন্দ্ব, নৈরাজ্য ও অস্থিরতা দৃষ্টিগোচর হয় তা অনৈসলামী দেশগুলোতে দেখা যায় না কেন? ভারত, জাপান কিংবা ইউরোপ-আমেরিকায় তেমনটি দেখা যায় না কেন? অথচ যে কোন ইসলামী দেশের দিকে তাকালেই দেখা যাবে, সরকার, জনতা দুই বিপক্ষ শিবিরে বিভক্ত। জনতায় জনতায় সংঘর্ষ। ফলে একের পর এক সেখানে অভ্যুত্থান ঘটতে দেখা যায়। বারবার সরকার পরিবর্তিত হয়। নেতা ও শাসকদের প্রতি নেই জনগণের আস্থা। শাসকশ্রেণী জনগণ সম্পর্কে নয় আশ্বস্ত।

সত্য কথা, বন্ধুর এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জওয়াব আমি দিতে পারিনি। বিভিন্ন কথায় তাঁকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছি মাত্র। কিন্তু প্রশ্নটি আমাকে সত্যি সত্যি ভাবিয়ে তুলল। এর আগে সম্ভবত আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়নি। কেন এমনটা হয়? ইসলামী বিশ্বের সমাজ পরিবেশে বিদ্যমান এ অস্থিরতার পেছনে কী কারণ সক্রিয়? এ আদর্শের দ্বন্দ্ব, নীতি ও নৈতিক দর্শনের সংঘাতের উৎস কোথায়? এ সম্পর্কে বিস্তর চিন্তা-ভাবনার পর আমি যে জওযাব পেয়েছি তাই আপনাদের খিদমতে পেশ করছি। কেননা এ গুরুতর সমস্যার আশু সমাধানকল্পে চিন্তা-ভাবনা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণ আমার, আপনার ও আমাদের সকল বিশ্বাবিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের অবশ্য কর্তব্য।

বাস্তব ঘটনা হলো, পাশ্চাত্য থেকে যে শিক্ষা দর্শন অমুসলিম দেশগুলোতে অনুপ্রবেশ করেছে তা সে অঞ্চলের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে সংঘর্ষশীল ছিল না। প্রথমত, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ ছিল প্রাণহীন ও আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব। দ্বিতীয়ত, বাইরে থেকে আগত যে কোন দর্শন ও মতবাদের সাথে সমঝোতা করে নেয়া, এমন কি তাতে বিলীন হয়ে যাওয়ারও অবাধ সুযোগ সেখানে ছিল বিদ্যমান। মোটকথা, এসব বিশ্বাস ও মূল্যবোধ কোন মযবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, আমি আপনাদের জওয়াহের লাল নেহরুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাঁকে একবার জিজ্ঞসা করা হলো ঃ একজন হিন্দুরে পরিচয় কি? অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি বললেন, "নিজেকে যে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় সেই হিন্দু।" জনৈক বন্ধু আমাকে আরো মজাদার এক ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। কলেজের স্টাফ রুমে তারা কয়েক বন্ধু বসে গল্প করছিলেন। কথা প্রসঙ্গে সহকর্মী এক হিন্দু প্রফেসরকে তিনি বললেনঃ প্রফেসর সাহেব! কেউ যদি আমাদের সংক্ষেপে দু' কথায় ইসলামের পরিচয় দিতে বলে তবে আমরা বলব ঃ সংক্ষেপে ইসলামের

পরিচয় হলো, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর প্রেরিত রাসূল"–এ কথায় বিশ্বাস। তদ্রূপ আপনাদের কাছে সংক্ষেপে হিন্দু ধর্মের পরিচয় জানতে চাওয়া হলে আপনারা কী জওয়াব দেবেন? দেখুন, কোন গভীর দর্শন কিংবা জটিল তত্ত্ব বয়ান করার দরকার নেই। এ সম্পর্কিত প্রচুর গ্রন্থ আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে, আমি পড়ে দেখব। আপনি শুধু বলুন, আমাকেই যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "হিন্দু কাকে বলে, হিন্দু ধর্মের পরিচয় কি?" তাহলে আমি তাকে কী জওয়াব দেব? বেশ চিন্তামগ্নতার পর তিনি বললেন, "মি. কিদওয়াই! আসল কথা হচ্ছে, যিনি সব কিছুতেই বিশ্বাস করেন তিনিও হিন্দু।" মোটকথা, তাদের স্বতন্ত্র 'আকীদা ও বিশ্বাসমালা থাকলেও তা এতটা উদার যে, যে কোন দর্শন ও মতবাদের সাথেই তার সমঝোতা ও আপোষ হতে পারে, নির্ঝঞ্ঝাট সহবাস ও মিলন হতে পারে। এজন্যই ভারতের হিন্দু সমাজে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হলো তখন তা হিন্দু সমাজে কোন রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেনি কিংবা সামাজিক অশান্তি ও অস্থিরতারও কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। গুটিকতক রক্ষণশীল লোক ছিল যারা বিশ্বাস করত, সমুদ্র ভ্রমণ কিংবা প্রাতঃস্নান ব্যতিরেকে খাদ্য গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু জীবন যুদ্ধের বিস্তৃত ক্ষেত্রে এগুলোর মূল্য কতটুকু! তাই খুব অল্প দিনেই হিন্দু সমাজের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, এসব 'আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ আধুনিক সমাজ-সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম নয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আমাদের মুসলিম সমাজে। এখানে তওহীদের সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, রয়েছে ঈমান ও কুফরের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা। এখানে একই সাথে একাধিক মতাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রদর্শন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় একই সাথে নিজেকে তাওহীদবাদী ও মুশরিকরূপে পরিচয় দেয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত চিরন্তন পথ-প্রদর্শকরূপে স্বীকার করে নেয়ার পর জীবনের কোন ক্ষেত্রে মানব চিন্তাপ্রসূত কোন আদর্শ ও মতবাদ গ্রহণের আর অবকাশ থাকে না। মোটকথা, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে সমঝোতা ও আপোষের কথা কল্পনা করা সম্ভব নয় মুহূর্তের জন্যও। সুতরাং সেসব দেশে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়ার কথা নয় যেখানে 'আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধর্মের ইতিবাচক ও সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান নেই, নেই সুদৃঢ় অবস্থান। পক্ষান্তরে হিদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে চিরপার্থক্য রেখা টেনে দিয়ে আল-কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ -

"সত্যের (প্রত্যাখ্যানের) পর গোমরাহী ছাড়া আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

ইসলাম বিশ্বাস করে, হিদায়াত বা নূর একটি একক অস্তিত্ব। পক্ষান্তরে গোমরাহী বা অন্ধকার অসংখ্য। আপনি আল-কুরআন আদ্যপান্ত পড়ে দেখুন, কোথাও নূরের বহুবচন ব্যবহার করা হয় নি। আরবীতে কি নূর শব্দের বহুবচন নেই? যে কোন সাধারণ ছাত্রও বলে দিতে পারে, নূরের বহুবচন হচ্ছে 'আনওয়ার'। আপনাদের দেশেও নিশ্চয়ই আনওয়ার নামে অনেক লোক রয়েছে, এ মজলিসেও হয়ত দু'চারজন 'আনওয়ার' খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মোটকথা, নূরের বহুবচন শুধু বিদ্যমানই নয়, উচ্চাংগ সাহিত্যে তার বহুল বিশুদ্ধ ব্যবহার ও রয়েছে। তা সত্ত্বেও আল-কুরআন আলো ও হিদায়াতের ক্ষেত্রে একবচন এবং অন্ধকারও গোমরাহীর ক্ষেত্রে বহুবচন ظلمات ব্যবহার করেছে। কেননা আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আলো ও হিদায়াত একটি একক অস্তিত্ব। পক্ষান্তরে অন্ধকার ও গোমরাহী আসতে পারে হাজারো রূপ ধরে।

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ -

আল্লাহ্ যাকে নূর দান করেন নি তার নূর লাভের কোন উপায় নেই।

এমন যে ধর্মের রূপ, স্বভাব ও প্রকৃতি, সে ধর্মের দ্ব্যর্থহীন ও বলিষ্ঠ ঘোষণা হলো, ইসলামই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম ও জীবন বিধান। নিছক আকীদা-বিশ্বাস, অনুষ্ঠান ও বাহ্যিকতা নিয়েই যে ধর্ম সন্তুষ্ট নয়, যে ধর্মের রয়েছে স্বতন্ত্র তাহযীব-তমদ্দুন, রয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, সেই সমাজে সেই উম্মাহর জীবনে পাশ্চাত্য যখন তার সামগ্রিক রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে, পরিপূর্ণ জীবনবোধ ও দর্শন নিয়ে অনুপ্রবেশ করল, তখন এক অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই দুই আদর্শের মাঝে দেখা দিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত। শুরু হলো অস্তিত্বের জীবন-মরণ লড়াই। সেই সাথে ইসলামী বিশ্বের দুর্ভাগ্য হলো এটাই, একদিকে অভিজাত ও সচ্ছল শ্রেণীর মেধাবী ও প্রতিভাধর তরুণরা মনেপ্রাণে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে নিল এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠল। অন্যদিকে দেশের গরিষ্ঠ অংশ তথা সাধারণ জনতা নিজেদের ঈমান, ঐতিহ্য ও আকীদা-বিশ্বাস আরো মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরল। ফলশ্রুতিতে দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সাধারণ মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে বহু দূরে সরে পড়ল। এভাবে একই দেশে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন দু'টি জাতির জন্ম হলো! তদুপরি অভিজ্ঞতার আলোকে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের পথকে

নিষ্কণ্টক রাখতে হলে যে কোন মূল্যে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এবং আকীদা ও বিশ্বাসের বুনিয়াদ কমজোর করে দিতে হবে যাতে তারা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে কখনো প্রতিবন্ধক না হতে পারে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আধুনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী শিক্ষার মাধ্যমে প্রচার ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে, এমন কি কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমে, নেমে পড়ে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতি ও ইসলাম প্রেম খতম করার এক মহাঅভিযানে। এভাবে গোটা ইসলামী উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে বিবদমান দুই শিবিরে। আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সমাজের মনে এ আশংকা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, জনসাধারণের এ ধর্মীয় অনুভূতি ও ইসলামপ্রীতি অব্যাহত থাকলে যে কোন সময় এরা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে। সুতরাং নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তা সমূলে বিনষ্ট করে দিতে হবে। এসব আমি আপনাদেরকে মিসরের কাহিনী বলছি, সিরিয়ার কাহিনী ও ইরাক-তুরস্কের কাহিনী। আমি একথা বলতে চাই না, এটা সব দেশেরই কাহিনী। আল্লাহ্ করুন, এদেশের মাটিতে যেন এ মর্মান্তিক নাটক কখনো মঞ্চস্থ না হয়। কিন্তু উন্নত মুসলিম দেশগুলোতে এ নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে। এমন একটি শ্রেণীর সেখানে উদ্ভব হয়েছে ইসলামের সাথে যাদের সম্পর্ক অপরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে দূরত্ব ও অস্বস্তির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অন্যদিকে জনসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতি সংকুচিত হতে হতে আজ মৃতপ্রায়। ফলে ধর্মভীরুদের মনেও আজ সমাজে বিদ্যমান পাপাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মনোভাব নেই, নেই কিঞ্চিৎ ঘৃণা পর্যন্ত। তাদের ভাবটা যেন এই : আরে ভাই! কিছু লোক মদ খেলে, আমোদ-প্রমোদে মত্ত হলে তাতে এমন কি ক্ষতি বৃদ্ধি হয়। টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের পর্দায় অশ্লীল ছায়াছবি প্রদর্শিত হলেই বা এমন কি কিয়ামত ঘটে যায়। যুবক-যুবতীদের চরিত্রে ও নৈতিকতায় ধ্বস নামলেই বা আমাদের কি করণীয় থাকতে পারে? মোটকথা, তারা নিজেকে নিয়েই যেন সন্তুষ্ট! মুসলিম সমাজেরও আজ এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে, ধর্ম মানব জীবনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণকারী মুসলিম তরুণদের মন-মগজে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছে, ধর্ম মানুষের নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিজীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। এই নতুন ধ্যান-ধারণা ও মন-মগজ সাথে করে দেশে ফিরে এসে দেখতে পায়, সমাজের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী তাদের এ সবক কিছুতেই মানতে রাযী নয়। সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপেই এরা হস্তক্ষেপ করে, সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে, অসন্তোষ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ক্ষমতাসীন শ্রেণী তখন খোদ জনতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধে

নেমে পড়ে। জনতার ইসলামী জাগরণ রোধ করাই তখন হয়ে পড়ে তার মুখ্য কাজ। জামাল আবদুন নাসেরের আমলে গোটা প্রশাসন ও সরকারী শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল মিসরের জনসাধারণের বিরুদ্ধে। মিসরের যাবতীয় সম্পদ, উপকরণ, গোটা জাতির যোগ্যতা, প্রতিভা, ক্ষমতাসীন দলের সময়, শ্রম ও মেধা ব্যয় হচ্ছিল মিসরবাসীর হৃদয় থেকে ধর্মীয় অনুভূতি তথা ইসলামপ্রীতি নির্মূল করার কাজে। কেননা ক্ষমতাসীনদের মনে পুরো মাত্রায় এ আশংকা বিদ্যমান ছিল, সামান্যতম শিথিলতার ফাঁকে যে কোন মুহূর্তে এ ইসলামী জাগরণ রূপ নিতে পারে লাভা উদ্গিরণকারী আগ্নেয়গিরির। ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ কিংবা কমুনিজম আন্দোলন প্রতিরোধের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট নাসেরের গোটা শাসন যুগ কেটেছে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মিসরী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমন অভিযানে এবং মিসরের মাটি থেকে ইসলামী আন্দোলন ও আন্দোলনকর্মীদের উৎখাতের ঘৃণ্য প্রচেষ্টায়। এর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে এবং নাসের ও তার অনুসারীরা কতটা সফলকাম হয়েছে তা অবশ্য ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, মিসরের মাটিতে সরকার ও জনতার এ লড়াই সংঘটিত হয়েছে। একই লড়াই চলছে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোসহ মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে। সে লড়াই কোথাও চলছে অসির ভাষায়, কোথাও বা মসির ভাষায়। আরব বিশ্বের বাইরে সুনির্দিষ্টভাবে আমি কোন অনারব দেশের নাম নিতে চাই না। বিপরীতধর্মী দুই মতাদর্শ ও বিপরীতমুখী দুই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলেই এ কৃত্রিম রণক্ষেত্রের সৃষ্টি। একদিকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা দেয়া হয় কালাল্লাহ ও কালার-রাসূল। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেয়া হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদ মযবুত করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা যখন প্রবর্তন করা হলো এবং সে শিক্ষার অভিশাপে অত্যল্পকালের মধ্যেই ভারতীয় মুসলিম সমাজে নেমে এলো চরম বিপর্যয় ও প্রলয়করী ধ্বংস, সে সময় কবি আকবর ইলাহাবাদীই বৃটিশ তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। তিনি তাঁর এক অমর কবিতায় আধুনিক ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন যা আজ পর্যন্ত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল সম্পর্কে এত সহজ সরল ভাষায় এমন গভীর ও বাস্তব সত্য প্রকাশ করা। আকবরের ভাষায় ঃ

یوں قتل سے بچوں کے وہ بد نام نہ ہوتا۔
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سو جہی

এভাবে শিশুহত্যার কলংক তাকে বহন করতে হতো না;
বেচারা ফিরআউনের মাথায় কলেজ প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি খেলল না।

বেচারা ফিরাউনের মগজে জন্ম দিল না কলেজ প্রতিষ্ঠার ধূর্ত কৌশল, তাহলে আর ইতিহাসে তার ললাটে এঁকে দিত না শিশু হত্যার কলংক তিলক।

সত্যি তাই! ফিরাউনের নির্বুদ্ধিতাই ইতিহাসের পাতায়, এমন কি আসমানী কিতাবের পাতায়ও এক অভিশপ্ত নরপশুরূপে তাকে চিত্রিত করেছে। পাইকারী শিশুহত্যার কলংক গায়ে না মেখে যদি সে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করত, দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় খুলে দিয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার সরকারী ফরমান জারী করত, তাহলে নিন্দার বদলে বন্দনাই জুটত আজ তার কপালে। মূর্খতার পরিবর্তে তাকে আজ মনে করা হতো জ্ঞান ও সংস্কৃতির মহান পৃষ্ঠপোষক। পৃথিবীর দেশে দেশে তার নামে প্রতিষ্ঠিত হতো কত শত ইউনিভার্সিটি, একাডেমী ও গবেষণাগার!

এমন কি ইসলামের পুণ্য ভূমি সউদী আরবেও আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার বদৌলতে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। যে দেশ ইসলামের সেবাই নিজেকে উৎসর্গ করার ও বিশ্বের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার সংকল্প ঘোষণা করে, সে দেশকে সর্বাগ্রে এ বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব ও সাংস্কৃতিক লড়াই থেকে রক্ষা করতে হবে। কেননা কোন দেশে এ ধরনের দ্বন্দ্ব-লড়াই একবার শুরু হলে জাতির সবটুকু যোগ্যতা, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতাই সে চিতার বহ্নিশিখায় ভস্ম হয়ে যায়। যে শক্তি ব্যয় হওয়া উচিত দেশ গঠনে, সমাজ সংস্কারে, জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে ও দেশরক্ষার মহান কাজে, তাই ব্যয় হতে থাকে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে ও ধ্বংস তৎপরতায়। সবার তখন একমাত্র লক্ষ্য প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে আমাদের বিজয়, আমাদের জীবন-দর্শন ও নীতিবাদের বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে। আমার একান্ত প্রত্যাশা, এ মহান সংস্কারমূলক বিপ্লবী কার্যক্রমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা না করে আপনারাই এগিয়ে আসবেন সবার আগে। কেননা যে মহান ব্যক্তির নামে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের শেষ স্বপ্ন ছিল এটাই। প্রচলিত ঔপেনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন সোচ্চার। কোন ইসলামী দেশের জন্য এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি মনে করতেন বিষতুল্য। তাই বেঁচে থাকলে সম্ভবত সবার আগে তিনিই আজ আওয়াজ তুলতেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেন জাতির 'আকীদা-বিশ্বাস জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের উপযোগী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে।

জর্দানে একবার একটি যৌথ সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছিল। জর্দানের বর্তমান ওয়াক্ফ্ মন্ত্রী উস্তাদ কামিল শরীফ, বিশিষ্ট সউদী বুদ্ধিজীবী শেখ আহমদ জামাল

ও আমি—আমরা এই তিনজন সাক্ষাতকার গ্রহণকারীর বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দিচ্ছিলাম। নিয়মিতভাবে এ সাক্ষাতকার রেডিওতে প্রচারিত হতো। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আজকের যুব সমাজের প্রধান সমস্যা কি? তাদের এ অস্থিরচিত্ততার উৎস কোথায়? সংক্ষেপে আমার বক্তব্য ছিল এই ঃ জীবনের সর্বত্র বিদ্যমান অসংগতি ও বৈপরীত্যই হচ্ছে এর প্রধান কারণ। ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র তারা এ বৈপরীত্যের মুখোমুখী হচ্ছে। ফলে দিন দিন তাদের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হচ্ছে হতাশা ও বিক্ষোভ, আর এ পুঞ্জীভূত হতাশা ও ধূমায়িত বিক্ষোভই তাদের বিদ্রোহী করে তুলছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, নীতিবাদ ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য সম্পর্কে তারা যা শুনেছে, জেনেছে, পারিবারিক জীবনের কোথাও তারা তার ছাপ দেখতে পায় না। মা-বাবা কিংবা অভিভাবকদের মুখে তারা শুনতে পায় এক ধরনের জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের কথা, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে তাদের পড়ানো হয় ভিন্ন কিছু, সাহিত্য ও শিল্পকলার নামে তাদের পরিবেশন করা হয় অন্য কিছু। বিনোদনের নামে রেডিও টেলিভিশন তাদের হাতছানি দেয় অশ্লীলতার, অবাধ যৌনতার ও বল্গাহীন ভোগবাদের। এই জীবন বৈপরীত্য তাদের মধ্যে এমন এক কনফিউশন তথা মানসিক অস্থিরতা জন্ম দিয়েছে যে, পুরোনো মূল্যবোধের প্রতি আস্থা রেখে জীবন পথের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ অস্বস্তিকর অবস্থা যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন ইসলামী উম্মাহ তার যুবশক্তিকে নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না কোন উপায়েই। এক গাড়ীতে দু'টি ঘোড়া যুতে দিলে এবং একটি পূর্বমুখী, আরেকটি পশ্চিমুখী, যে পরিণতি হতে পারে সেই ভয়ংকর পরিণতি থেকে ততদিন আমাদের অব্যাহতি নেই। সম্ভব হলে আজ এই মুহূর্তেই আমাদের সমাজ জীবনে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এ দ্বিমুখী অবস্থার অবসান ঘটানো কর্তব্য।

আপনাদের খিদমতে এই আমার বক্তব্য। মাননীয় ভাইস চ্যান্সলর ও জাস্টিস আফযল চীমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ; তাঁরা আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ করেছেন এবং আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমার কথাগুলো হয়ত আপনাদের স্মরণ থাকবে না, কিন্তু 'আল্লামা ইকবালের এ পয়গাম তো অবশ্যই মনে থাকবে ঃ

اے پیر حرم ! رسم ورہ خل نقھی چھوڑ

مقصود سجی میری نوائے سحری کا

الله رکھے تیرے جوانوں کوسلامت
دے انکو سبق خود شکنی وخود نگری کا
تو انکوسکھا خارہ شگافی کے طریقے
مغرب سکھا یا انہیں فن شیشہ گری کا
دل توڑگئی ان کا دو صدیوں کی غلامی
دارو کوی سوچ ان کی پریشان نظری کا

হরমের হে পীর। খানকাহ্‌র প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা বর্জন কর; আমার শেষ রাতের আহাজারির মর্ম অনুধাবন কর।

তোমাদের তরুণদের আল্লাহ্‌ নিরাপদ রাখুন; তাদের শিখাও আত্মগঠন ও আত্মপীড়নের পাঠ।

পাশ্চাত্য তাদের শিখিয়েছে কাঁচ তৈরির শিল্প; তুমি তাদের শিখিয়ে দাও জীবন জয়ের পন্থা।

দু' শ' বছরের বন্দীদশা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে তাদের মন; তোমাকে আজ খুঁজে পেতে হবে তাদের হৃদয়ের এ রক্তক্ষরণের কোন উপশম।

# উর্বর ভূমি, প্রতিভা-প্রসবিনী দেশ

[২৩শে জুলাই ১৯৭৮, ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আলিম ও বুদ্ধিজীবীদেরও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত আরব ছাত্রদের অনুরোধে একই বিষয়ে আরবীতে তাঁকে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে হয়।]

হাম্দ ও সালাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, মাননীয় 'উলামায়ে কিরাম ও আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

**দেশের মর্যাদার মানদণ্ড**

এক বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আপনাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে এ মুহূর্তে আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। আমাকে এ মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

কোন দেশের উন্নতি, অগ্রগতি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের মাপকাঠি অধিক সংখ্যায় স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা কিংবা কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন নয়, নয় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের সংখ্যাধিক্য কিংবা জীবন যাত্রার উন্নত মান, বরং বিশ্বের দরবারে কোন দেশের মর্যাদা লাভের প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞান-পিপাসা, অজানাকে জানার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা ও মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া ও গবেষণা কর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা। একটি দেশে সব কিছুই আছে, প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে, আছে সম্পদ ও বিলাস প্রাচুর্য, কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞান-পিপাসা নেই, অনুসন্ধিৎসা নেই, নেই এমন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী, গবেষক, আলিম ও বুদ্ধিজীবী যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে উৎসর্গ করে দেবে নিজের গোটা জীবন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিনরাত যারা নিয়োজিত থাকবে মৌলিক গবেষণা কর্মে, প্রশংসা লাভ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন যাদের উদ্দেশ্য নয়, যাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হবে দেশ ও জাতির নিঃস্বার্থ সেবার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, সরকারী পুরস্কার ও স্বীকৃতির জন্য যারা কখনো লালায়িত নয়, কর্ম-ক্লান্তির মাঝে যারা খুঁজে পায় জীবনের প্রশান্তি; পক্ষান্তরে কর্মহীনতা ও অবসর জীবন যাদের জন্য অসহনীয়, অভিশাপ, কর্ম যাদের জীবন, কর্ম যাদের প্রাণ।

### এখানে এসে আনন্দ পেয়েছি

এখানে এসে এই দেখে আমার আনন্দ হয়েছে, এদেশে একটি উন্নত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষত আরব বিশ্বের তরুণ শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন ও গবেষণা কর্মে দলে দলে এখানে আসছে। এ জ্ঞান-প্রেম ও বিদ্যোৎসাহ দেখে একজন মুসলমানের ও এতজন বিদ্যার্থীর অবশ্যই আনন্দ হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র শোকর, আমি একজন মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে একজন বিদ্যার্থীও। তাই স্বাভাবিক কারণেই এখানে এসে আমি গভীর আনন্দ লাভ করেছি।

### দেশ ও জাতির কল্যাণে যোগ্যতা ও প্রতিভা নিয়োজিত করুন

আমি আশা করি, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণরা দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করবে। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য, দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাগুলো সুযোগ পেলেই উচ্চতর বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার মোহে ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি জমায়। গোটা আমেরিকা ঘুরে ঘুরে আমি দেখে এসেছি আমাদের প্রাচ্য দেশগুলোর যে প্রতিভাধর তরুণেরা স্বদেশকে অনেক কিছু দিতে পারত, যাদের সামান্য প্রচেষ্টায় দেশের মাটিতে সোনার ফসল ফলত, প্রাকৃতিক ও ভূগর্ভস্থ সম্পদ আহরিত হতে পারত, যাদের অবদানে দেশ ও জাতি হতে পারত সমৃদ্ধ ও মর্যাদামণ্ডিত, তারাই আজ স্বার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিদেশকেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র ও রঙীন ভবিষ্যত গড়ার ময়দানরূপে বেছে নিয়েছে। এতে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ যতই হাসিল হোক না কেন, দেশ ও জাতি কিন্তু অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আমি মনে করি, স্বদেশ ভূমির স্বজাতির সাথে এটা তাদের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা। লেখাপড়া শিখে কাজের উপযুক্ত হয়েই তারা পাড়ি জমায় বিদেশে, নিজেদের জীবনে সম্পদ ও বিলাস প্রাচুর্য নিশ্চিত করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না! তখন এরা যদি আত্মত্যাগের মহান মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের শ্রম ও মেধা জাতির সেবায় নিয়োজিত করত তাহলে খুব অল্প সময়েই প্রাচ্য দেশগুলোর ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর হতো, জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য আসত। কিন্তু আফ্‌সোস! আমাদের সম্পদ আজ অন্যদের কাজে আসছে আর জাতীয়ভাবে আমরা দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছি। সুতরাং আমি এদেশের ও আরব তরুণদের—আশা করি এখানে থেকে তারা আমার কথা বোঝার মত উর্দু শিখে ফেলেছেন, তাদের প্রতি আমার সকাতর অনুরোধ, নিজেদের মেধা, যোগ্যত্য, জ্ঞান, অধ্যবসায় ও গবেষণা কর্ম আপনারা স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় নিয়োজিত করুন। স্বদেশ ও

স্বজাতিই আপনাদের কর্মজীবনের অবদানের প্রকৃত হকদার। এটা খুবই দুঃখজনক এবং দেশপ্রেম ও ইসলামী অনুভূতিরও বিরোধী, আমাদের মেধা ও যোগ্যতা তাদের সেবায় নিয়োজিত হয়ে যারা গোটা ইসলামী বিশ্বকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। গোটা মুসলিম দুনিয়া আজ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভবে রাজনীতি, অর্থনীতি, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমেরিকা ও রাশিয়ার পদানত, উন্নত বিশ্বের অধীনস্থ। আমাদের প্রতিভাবান তরুণরা যদি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় নিজেদের মেধা, শ্রম ও যোগ্যতা ব্যয় করত তবে দেশ ও জাতি যেমন তাদের অবদানে সমৃদ্ধ হতো, তেমনি তারাও ধন্য হতে পারত আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভে।

### দর্শন, মতবাদ, জ্ঞান, অন্বেষা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রাধান্য

যে সব দেশ আজ দার্শনিক মতবাদ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও জ্ঞান অন্বেষার নামে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও তাহযীব-তমদ্দুনের বিরুদ্ধে জঘন্য হামলা চালাচ্ছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামী উম্মাহর উদ্যমী তরুণরা আজ নবতর দর্শন ও জ্ঞান অন্বেষার মাধ্যমে সেগুলোর দাঁতভাঙা জওয়াব দিতে এগিয়ে আসবে। ভৌগোলিকভাবে কোন দেশকে গোলাম বানিয়ে রাখার দিন এখন ফুরিয়ে গেছে। এটা অবধারিত যে, কোন দেশের কোন উচ্চাভিলাষী একনায়কের মাথায় তেমন পাগলামী খেয়াল চেপে থাকলে সময়ের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে তাকে। কিন্তু দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ এবং সত্য সন্ধান ও জ্ঞান অন্বেষার ছদ্মাবরণে ইসলামের ওপর সূক্ষ্ম কুটিল হামলা সব সময় চলে এসেছে, আজো চলছে এবং ভবিষ্যতেও তা চলতে থাকবে। এক সময় গ্রীক দর্শনের হামলা এসেছিল এবং তা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সে সময় ইসলামের হিফাজত ও খিদমতের জন্য উম্মাহ্ জন্ম দিয়েছিল ইমাম গাযালী, ইমাম বাকিল্লানী, ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্ ও ইমাম রাযীর ন্যায় কালজয়ী প্রতিভার। আধুনিক উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তন হওয়ার পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ইতিহাসের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে নতুন হামলা শুরু করল। তারা বলে বেড়াতে লাগল, হযরত ওমরের নির্দেশে মুসলমানরাই ইসকান্দারিয়া গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছে। পাশ্চত্য পণ্ডিতদের একযোগে পরিচালিত প্রচারণার ধূম্রজালে এ নির্জলা মিথ্যাও এমন অখণ্ডনীয় সত্যে পরিণত হয়েছিল যে, কোন কোন শিক্ষিত লোক এ অপবাদের সামনে মাথা নত করে ফেলত। কেননা তাদের ভয় ছিল, এমন একটা ঐতিহাসিক সত্য মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলে শিক্ষিত ও সুধীজনদের মজলিসে হাস্যাস্পদে পরিণত হতে হবে।

বিভিন্ন পালা-পার্বণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ রসিয়ে রসিয়ে বলে বেড়াতেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা তো দূরের কথা, মুসলিম জাতি তো এমনই জ্ঞান-বিদ্বেষী যে, তাদের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইস্‌কান্দারিয়ার বিশাল গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে ভস্ম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ গ্রন্থগুলো কুরআন-সুন্নাহ্ মুতাবিক হলে তার কোন প্রয়োজন নেই, পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ্‌র বিরোধী হলে তা ভস্ম হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। ইউরোপের খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের লেখনী ও নির্জলা মিথ্যা প্রসব করেছে আর আমাদের সরলমনা শিক্ষিত তরুণরা তা এক ঐতিহাসিক সত্যরূপে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। উপমহাদেশের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক সমালোচক মাওলানা শিবলী নোমানী সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে গাণিতিক সত্যের মত একথা প্রমাণ করেন, হযরত ওমরের খিলাফত লাভ ও মুসলিম বাহিনীর মিসরে প্রবেশের অনেক আগেই ইসকান্দারিয়ার গ্রন্থাগার জ্বলে গিয়েছিল এবং তা ছিল গোড়া খ্রিস্টান পাদ্রীদের কর্ম। আধুনিক খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ নিজেদের সে দোষ আজ নন্দঘোষের ঘাড়ে চাপানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন মাত্র। আর গ্যালিলিওর মত জ্ঞান-তাপসকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারার কথা যারা ভাবতে পারে তাদের পক্ষে সামান্য একটা গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেয়া এমন দোষের কি! তবে সে দায়িত্ব এমন এক উম্মাহর ঘাড়ে চাপানো দোষের বৈকি যাদের প্রথম ঐশী বাণী হলো, اقرا। পড়। অনুরূপভাবে যখন ঐতিহাসিকভাবে একথা প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালানো হলো, মহান আওরংগযীব ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, হিন্দু নিপীড়নকারী সম্রাট, তখনও মাওলানা শিবলী নোমানীর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এসব অপপ্রচারের দাঁত ভাঙা ঐতিহাসিক জওয়াব দিয়েছেন।

### বিজ্ঞানের কোন যাত্রা বিরতি নেই

একইভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে যখন রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ছত্রছায়ায় হামলা শুরু হলো তখন উপমহাদেশের মুসলিম চিন্তানায়ক ও বুদ্ধিজীবিগণ তার সুফল মুকাবিলা করলেন। বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ ও উপস্থাপিত তথ্যের জ্ঞাননির্ভর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সেগুলোর অসারতা প্রমাণ করলেন। তাঁরা আরো প্রমাণ করলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে এক চিরঅভিযাত্রী, তার কোন যাত্রাবিরতি নেই। প্রতিটি আগামী দিন তার জন্য নিয়ে আসছে নতুন তথ্য, নতুন সত্য। সুতরাং কোন বিষয়েই চট করে শেষ কথা বলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞতা।

আমি মনে করি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত মুসলিম তরুণদের দায়িত্ব হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মাধ্যমে যে সব ভ্রান্ত মতবাদ পরিবেশিত হচ্ছে এবং

কুরআনী শিক্ষা ও বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করার যে অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে সেগুলোর সফল মুকাবিলায় এগিয়ে আসা। এখানে থেকে এভাবেই আপনারা দ্বীনের বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিতে পারেন। যেমন ধরুন, কুরআন বলছে, "প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।" উদ্ভিদ জগতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আল-কুরআনের পূর্বে পৃথিবীর কোথাও এ ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এখন আপনারা নিজেদের অধ্যবসায়, গবেষণা ও অন্বেষা নিয়ে এগিয়ে আসুন এবং এ কুরআনী ঘোষণার সত্যতা প্রমাণ করুন। বিশ্বকে আজ আপনাদের বোঝাতে হবে, আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর আগে হিজাযের মরুঅঞ্চলে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কিত এ বিপ্লবী ঘোষণা উম্মী নবীর এক জীবন্ত মু'জিযা ছাড়া আর কিছু নয়, বিশেষ করে উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে তো সূরাতু'র-রা'দে এমন কতগুলো তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর ওপর স্বতন্ত্র গবেষণা পরিচালিত হতে পারে এবং আমি মনে করি, আপনাদের এ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আলোচ্য ক্ষেত্রে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জগতে গোটা বিশ্বের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা কুড়াতে পারে।

## এ দায়িত্ব ছিল ইসলামী বিশ্বের

একথা আজ কারো অজানা নেই, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এক সময় শুধু বিজ্ঞানের জগতেই নয়, বরং আকীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের জগতেও প্রলয়ংকরী ঝড় তুলেছিল। এ ঝড়ের গতি রোধ করা ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় এর অসারতা প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল ইসলামী দুনিয়ার নামী-দামী গবেষক চিন্তাবিদদের। সৌভাগ্যক্রমে খোদ ইউরোপেই এ বিষয় বেশ প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে। ফলে উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিবর্তনবাদের যে অপ্রতিহত প্রভাব ছিল এখন তার অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এক সময় অবস্থা এমন হয়েছিল যে, ডারউনের মতবাদের সমালোচনা করা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। অনেকেই তখন বিবর্তনবাদের অপ্রতিরোধ্য বিজয় যাত্রার সামনে আত্মসমর্পণ করে আল-কুরআনের বিবরণ ও বিবর্তনবাদের মাঝে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চালিয়েছিলেন, এমন কি কেউ কেউ বিবর্তনবাদকে মূল ধরে কুরআনের একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পেশ করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছিলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদের আজ আর সে গুরুত্ব নেই। এখন তা একটি ভ্রান্ত ও পশ্চাৎগামী মতবাদরূপে পরিত্যক্ত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্য, এ মূল্যবান অবদানের সবটুকু প্রশংসাই ইউরোপের প্রাপ্য। হায়! এ বিপ্লবী গবেষণা কর্ম যদি ইসলামী বিশ্বের কোনো দেশে হতো! মিসরে, ইরাকে কিংবা

মুসলিম ভারতে হতো। আফ্‌সোস! তা হয়নি। আরব বিশ্বের পণ্ডিত গবেষকগণ ইতিহাস ও সাহিত্যের ময়দানকেই শুধু গুরুত্ব দিয়েছেন, প্রায়োগিক বিজ্ঞান তথা কেমেস্ট্রি, ফিজিকস ইত্যাদিকে তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। ইসলামী দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত এমন একটি প্রতিভার জন্ম হলো না যিনি কোন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের জগতে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন কিংবা কোন আন্তর্জাতিক সম্মান ছিনিয়ে আনতে পারেন।

### নোবেল পুরস্কার ছিনিয়ে আনুন

আমার প্রিয় মুসলিম তরুণ শিক্ষার্থীবৃন্দ! কৃষিক্ষেত্রে আপনারা নোবেল পুরস্কার লাভ করার মত মৌলিক অবদান রাখুন। কোন মুসলিম বিজ্ঞানী গবেষক বৈজ্ঞানিক অবদান ও গবেষণা কর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলে মুসলিম বিশ্বের তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে তা কী পরিমাণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করবে! আলিম সমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলেও আমি সেই শুভ দিনের অপেক্ষা করছি যেদিন শুনব, কোন ইসলামী দেশের কোন মুসলিম বিজ্ঞানী গবেষক কৃষি বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানে মূল্যবান অবদান ও গবেষণা কর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। আপনাদের পক্ষে হয়ত কল্পনা করাও সম্ভব নয়, মুসলিম বিশ্বের তরুণ শিক্ষার্থীরা এতে কত অনুপ্রাণিত হবে, তাদের কত আনন্দ, কত গর্ব হবে! আর এ আনন্দ এ গর্ব মোটেই দোষের নয়। রাজনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এজন্য কোন সরকারের সমালোচনারও অধিকার নেই। আমি ইসলামী বিশ্বের, বিশেষ করে আরব বিশ্বের তরুণ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, স্ব স্ব ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করুন এবং এমন যুগান্তকারী অবদান রাখুন যেন গোটা বিশ্বের শ্রদ্ধাবিমুগ্ধ দৃষ্টি আপনাদের দিকে নিবদ্ধ হয়। অন্যান্য জাতি যেন একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, অতীতের মত এখনও মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে অতুলনীয় মেধা, দুর্লভ প্রতিভা।

### হৃদয়ের উর্বর পলি মাটিতে

আপনারাই মুসলিম বিশ্বের সম্ভাবনার সোনালী ভবিষ্যত। মুসলিম বিশ্বের কৃষি উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রত্যাশা নিয়ে মুসলিম বিশ্ব তাকিয়ে আছে আপনাদের পানে। ভূমির গুণাগুণ, উৎপাদন ক্ষমতা, উর্বরতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ও পন্থা নিয়ে গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল বাস্তবে প্রয়োগ করাই হবে আপনাদের আগামী দিনের দায়িত্ব। কিন্তু আমি আজ আপনাদেরকে আরেকটি উর্বর মাটির সন্ধান দেব। মুসলিম বিশ্বের কর্ণধাররা সে উর্বর মাটির

দিকে কখনো খুব একটা মনোযোগ দেন নি। আমি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ভূমির কথা বলছি। এ হৃদয়ভূমিতে লুকিয়ে আছে অফুরন্ত সম্পদ-ভাণ্ডার ও সুবিশাল শক্তি-সম্ভাবনা। এ অফুরন্ত সম্পদ-ভাণ্ডার আমাদেরকে আজ আহরণ করতে হবে। কাজে লাগাতে হবে এ বিপুল শক্তি-সম্ভাবনা! আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় কর্ণধাররা এখনো পর্যন্ত এদিকে নজর দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করছেন না, অথচ বৃহত্তম ইসলামী উম্মাহর গণ্ডীতে যে সব জাতি এসেছে, তাদের হৃদয়ে রয়েছে বিশ্বজয়ী ঈমানী শক্তি, রয়েছে আত্মত্যাগ ও কুরবানীর মহান জযবা। মানবতার কল্যাণ কামনায় মানব সেবার মহৎ প্রেরণায় তাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত। প্রেম ও ভালোবাসার স্নিগ্ধতায় কুসুম কোমল এসব হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে চিরপ্রবহমান ফল্গুধারা। মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ভূমির তলদেশে লুকিয়ে থাকা সম্পদ আজ উদ্ধার করতে হবে। এ সুপ্ত সম্ভাবনা এখন জাগিয়ে তুলতে হবে এবং সযত্ন লালন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বিশ্বমানবতার কল্যাণে তা নিয়োজিত করতে হবে। আপনাদের আত্মত্যাগ ও জীবন সাধনার ফলে যদি এটা কোনদিন সম্ভব হয় তাহলে সেদিনই পৃথিবীতে আসবে সত্যিকার বিপ্লব, আসবে নীতি ও চরিত্রের আদর্শ পরিবর্তন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিংবা মৌলিক গবেষণা-কর্মের মাধ্যমে মানবতার অবক্ষয় রোধ এবং নীতি ও নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পথটাই হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধনের প্রকৃত পথ; নীতি, স্বভাব ও চরিত্রে বিপ্লব সাধনের সঠিক উপায়। ইকবালের ভাষা ঃ এ উপমহাদেশসহ গোটা ইসলামী বিশ্বের নামে আমার বেদনাদগ্ধ হৃদয়ের অনুযোগ ঃ

نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں

وہی اب وگل ایران وہی تبریز ہے ساقی

আজমের সবুজ বাগে রূমীর মতো গোলাপ আর ফুটল না, অথচ সাকী! ইরানের সেই জলবায়ু ও তাবরীযের সেই মাটি তো আজো আছে!

তবে ইকবাল নিজেই আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। সে সান্ত্বনা বাণীই আজ আপনাদের শোনব ঃ

نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں

ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

সাকী! এ বিরান উদ্যান সম্পর্কে এখনো আমি নিরাশ নই; (চোখের পানিতে) একটু ভিজিয়ে দেখো, এ মাটি কত উর্বর!

**উর্বর ভূমি, প্রতিভা-প্রসবিনী দেশ**

কাজের ক্ষেত্র হিসাবে আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে পাকিস্তানের পাক ভূমি দান করেছেন। এদেশের মাটি যেমন উর্বর, তেমনি উর্বর এদেশের হৃদয়ভূমিও।

অনুরূপভাবে এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশও সুজলা, সুফলা ও স্বর্ণ-প্রসবা। ইরাক যেমন দজলা-ফুরাত-বিধৌত, মিসর তেমনি নীলনদের অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ আর সুদান সেই নীলনদের উৎসমুখ। এ দেশগুলো যেমন সুজলা-সুফলা, তেমনি তা প্রতিভা-প্রসবিনীও। সুজলা-সুফলা কথাটা আপনাদের বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু প্রতিভা-প্রসবিনী কথাটা মেনে নিতে হয়ত আপনাদের দ্বিধা বোধ হচ্ছে। কেননা ফসল ফলানোর প্রচেষ্টা ও সবুজায়নের সাধনা চলছে সর্বত্র কিন্তু মানুষ গড়ার কাজ ও প্রতিভা জন্মদানের মেহনত শুরু হয়নি এখনো। সেই দুরূহ, অথচ অপরিহার্য কাজটাই আজ আপনাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। এমনো হতে পারে, একদিন আমরা শুনতে পাব, আপনাদেরই কেউ কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার লাভ করেছেন। আমার সামনে রাখা এই আরব তরুণদের অনেকেই হয় নিজের দেশের কৃষিমন্ত্রী হবেন। এটা বিপ্লব অভ্যুত্থানের যুগ, গণতন্ত্রের যুগ। সুতরাং এ সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যায় না, আজ এখানে যারা ছাত্র, স্বদেশে গিয়ে তারাই হবেন সমাজ-সংগঠক, রাষ্ট্র পরিচালক, তারাই হবেন দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। আজ এই সুবর্ণ মুহূর্তে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের পয়গাম দিচ্ছি ঃ স্বদেশের মাটিতে সবুজ ফসল ফলানো মেহনতের পাশাপাশি সবুজ মানুষ গড়ার মেহনতও করে যেতে হবে আপনাদের। আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন, আরব ও ইসলামী উম্মাহকে যে সকল আত্মিক যোগ্যতা আল্লাহ পাক দান করেছেন, ইউরোপ- আমেরিকার জাতিসমূহ সেসব থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। এখনো মুসলমানদের মধ্যে যে পরিমাণ সহজ-সরলতা, ইখলাস ও নিঃস্বার্থপরতা বিদ্যমান রয়েছে তার অযুতাংশও খুঁজে পাওয়া যাবে না ইউরোপ-আমেরিকায় অমুসলিম জাতিবর্গের ব্যক্তি জীবনে, সমাজ পরিমণ্ডলে ও জাতীয় পর্যায়ে। এ সরলতা ও নিঃস্বার্থপরতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সঙ্গে যে উষ্ণ আন্তরিকতা ও অপূর্ব হৃদ্যতা নিয়ে মিলিত হয় তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মাঝে। এমন এক ঈমানী শক্তি এখন ঘুমিয়ে আছে তাদের মধ্যে যা একবার জাগিয়ে

তুলতে পারলে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য, দ্বীন ও শরীয়তের জন্য জানমাল লুটিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না তারা। স্বদেশবাসীর সেই সুপ্ত ঈমানী শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারলে সবুজ বিপ্লবের সাথে সাথে এক সুমহান জীবন বিপ্লবও সাধিত হবে আপনাদের এ পাক ভূমিতে, বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হবে গোটা বিশ্ব, মুক্তির আনন্দে উদ্বেল মানবতা আপনাদের জানাবে স্বকৃত অভিবাদন।

এখানেই আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানছি এবং এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে যাঁরা আমাকে ইসলামী উম্মাহর এই উচ্ছল তারুণ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। সবশেষে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমার আকুল প্রার্থনা, এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আল্লাহ পাকিস্তানসহ গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্য গৌরব, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উৎস করুন!

# ভালোবাসি সেই তরুণদের দূর তারকালোকে যাদের দৃপ্ত পদচারণা

[২৫ শে জুলাই ১৯৭৮ পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি 'ইসলামী ছাত্র সংঘ' শাখার কর্মী শিবিরে প্রদত্ত ভাষণ। কর্মী শিবিরে পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র প্রতিনিধিরূপে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেছিলেন।]

## সেই তরুণদের আমি ভালোবাসি

আমার প্রিয় ছাত্র ভাইগণ! আপনাদের এ কর্মী শিবিরে এসে আমি যে আত্মিক সুখ অনুভব করছি তা নিছক শব্দের মালা গেঁথে আপনাদের বোঝানো সম্ভব নয়। এ সুখ ও আনন্দের গভীরতা তিনিই শুধু অনুভব করতে পারেন যিনি দাওয়াতের মাঠে কিংবা শিক্ষাঙ্গনের চার দেওয়ালের মাঝে অরুণ প্রভাতের এই তরুণ দলের উষ্ণ সান্নিধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন, এই সবুজ চারাগুলোর জীবনে সুরভিত বসন্তের আয়োজনে বুকের রক্ত পানি করেছেন। এমন হৃদয় শুধু এ আনন্দের গভীরতা অনুভব করতে পারে ইকবালের ভাষায় যার আজীবন আকাঙক্ষা ঃ

"সেই সাহসী জওয়ানদের আমি খুঁজে ফিরছি দূর তারকালোকে করে যারা দৃপ্ত বিচরণ।"

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند

আল্লাহ্‌র ঘরের পবিত্র পরিবেশে এতগুলো তরুণ প্রাণের একত্র সমাবেশ সত্যি আমার হৃদয়-প্রাণ জুড়িয়ে দেয়, যারা আল্লাহর সাথে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সিরাতুল মুস্তাকীমে অবিচল থাকার কঠিন সংগ্রামে যারা প্রাণপণ, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আদর্শ চিরসমুন্নত রাখতে যারা বদ্ধপরিকর।

## সিরাতুল মুসতাকীম পুলসিরাতের মতই কঠিন

সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর অবিচল থাকা স্বভাবত সহজ হলেও কখনো কখনো তা হয়ে পড়ে পুলসিরাতের মতই কঠিন, হাতের তালুতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখার অগ্নি-পরীক্ষার মতই ভয়াবহ। তবে আমাদের উচিত কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা। কেননা এ পুলসিরাতের কঠিন

অগ্নি-পরীক্ষার জন্য তিনি আমাদের নির্বাচিত করেছেন এবং এ পথে তিনি আমাদের পুরস্কৃত করতে চান।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ কিয়ামতের দিন দুনিয়ার বিপদাপদের বিনিময়ে যখন বিভিন্ন পুরস্কার দেয়া হবে তখন আল্লাহ্র রাহে অসংখ্য বিপদ-মসিবত বরদাশ্তকারী মুজাহিদরা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবেঃ হায়! যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কেটে কুটে তুলে ফেলা হতো। আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করা উচিত, তিনি আমাদের এ অগ্নি-পরীক্ষার যোগ্য বিবেচনা করেছেন। সারা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠিন অধ্যবসায়ের পর কোন প্রতিভাবান ছাত্র পরীক্ষার হলে বসে সহজ ও সাধারণ প্রশ্নপত্র হাতে পেলে সে অবশ্যই ক্ষোভ প্রকাশ করবেঃ কী জন্য ছিল আমার সারা বছরের এত পরিশ্রম, এত আয়োজন, এত রাত্রি জাগরণ! পক্ষান্তরে কঠিন প্রশ্নপত্র হাতে পেলে এই ভেবে তার তখন আনন্দের সীমা থাকে না, আমার পরিশ্রম তবে সার্থক হলো। এটা মানব চরিত্রের বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

### সব কিছু সহজ হলে জীবন কঠিন হয়ে যেত

"দাওয়াত ও দ্বীনের খিদমতের জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বড় নাযুক ও কঠিন সময় দিয়েছেন এবং চলার জন্য কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম পথ নির্বাচন করেছেন"–এ ধরনের অনুযোগ করা আসলে ভীরুতা ও সাহসহীনতারই পরিচায়ক। দুঃসাহসী অভিযাত্রীকে ঝুঁকিহীন সাধারণ কোন অভিযানে পাঠালে সে উলটো এই বলে অভিযোগ জানাবে, আমার যোগ্যতার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। জীবনের সব কিছু যদি সহজ হতো, চলার পথ যদি হতো কুসুমাস্তীর্ণ তাহলে জীবন এতটা উপভোগ্য, এতটা আনন্দময় হতো না; বিজয়ে, সফলতায় মনে জাগত না কোন শিহরণ। কবি বড় সুন্দর বলেছেন ঃ

چلا جاتاهوں هنستا کهیلتاموج حوادث
اگر اسانیاں هوں زندگی دشوار هو جاتا

প্রতিকূল ঘটনা প্রবাহের ঝাপটা উপেক্ষা করে হেসে খেলে নির্ভয়ে আমি এগিয়ে যাই। জীবন সহজ ও অনুকূল হলে তা দুর্বিষহ হয়ে যেত।

আমি আপনাদের সামনে সূরাতুল-কাহ্ফের যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তা এ মুহূর্তে আমার অবচেতন মন আমার মুখে এনে দিয়েছে।

### আপনাদের প্রতিপালক আপনাদের সম্বোধন করেছেন

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ওরা ছিল এমন ক'জন তরুণ যারা আপন প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছিল। আরবীতে فتى শব্দটি فتية -

এর বহুবচন। অর্থ 'তরুণ'। এখানে অনেক ধরনের শব্দই হতে পারত। কিন্তু فتية শব্দটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই তরুণ ক'জন আপন প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছিল। ঈমানের এই প্রথম মনযিল অতিক্রম করার পর দ্বিতীয় মনযিলে আমি তাদের সাহায্য করেছি। زدناهم هدى তাদের ঈমানের অবিচলতা আমি বৃদ্ধি করেছিলাম। আমার আপনার যা করণীয় সর্বশক্তি দিয়ে তাই আমাদের করে যাওয়া উচিত। তবেই নেমে আসবে আল্লাহ্ পাকের মদদ। আল-কুরআনে আপনারা তিলাওয়াত করে থাকেন ঃ ويزيدكم قوة الى قوتكم তোমাদের শক্তির সাথে তিনি তাঁর শক্তি যোগ করবেন। তোমাদের যা আছে তা তোমরা পেশ করে দাও; আমি তাতে বৃদ্ধি ঘটাব ان تنصرو الله ينصركم তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। বনী ইসরাঈলকে তাই সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

يَابَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ـ

"হে ইয়াকূবের বংশধর! আমি তোমাদের যে নিয়ামত দিয়েছি তা স্মরণ করে দেখ এবং আমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ কর; আমিও তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব।" একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পানির সংকটের কথা জানানো হলো। সেই মুহূর্তে তিনি দো'আর জন্য পবিত্র হাত দুটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারতেন এবং হয়ত আকাশ থেকে অঝোর ধারে পানি বর্ষিতও হতো। কিন্তু তা না করে তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ যতটুকু পানি তোমাদের কাছে আছে তা এখানে নিয়ে এস। পানি হাযির করা হলে তিনি তাতে পবিত্র আঙ্গুল রাখলেন। সাথে সাথে সেখান থেকে উৎসারিত হলো পানির ফোয়ারা। আরেকবার তাঁর খিদমতে আরয করা হলোঃ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তিনি বললেনঃ যার কাছে যা আছে সেগুলো নিয়ে এস। শুকনো খেজুর, শুকনো রুটি এবং অন্যান্য খাবার হাযির করা হলে দেখা গেল, পরিমাণে তা এতই অল্প যে, দু' একজনের জন্যও তা যথেষ্ট হবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম দো'আ করে তাতে পবিত্র হাতের স্পর্শ বুলালেন। সেই সামান্য পরিমাণ খাদ্যে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এমন বরকত নাযিল হলো যে, গোটা লশকরের লোক খেয়েও তা বেঁচে গেল। আল্লাহ্র রাসূল হযরত 'ঈসা 'আলায়হি'স-সালামের মত এ দো'আও তিনি করতে পারতেন ঃ ربنا انزل علينا مائدة من السماء ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আসমান থেকে দস্তরখান নাযিল করুন। কিন্তু এ সহজ পন্থা তিনি গ্রহণ করেন নি। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর উম্মতকে হাজারো চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করতে

হবে, মুকাবিলা করতে হবে প্রতিকূল অনেক যুগ বিবর্তনের আর তা সম্ভব হবে কেবল তখন যখন উম্মত তার অন্তর্নিহিত শক্তি, মনোবল ও সংকল্পের পথে এগিয়ে যাবে। আপন জীবনেও সেই আদর্শই তিনি রেখে গেছেন তাঁর অনাগত উম্মতের জন্য। হাতে হাত রেখে বায়'আতের নিছক আনুষ্ঠানিকতা এখানে অচল। এখানে প্রয়োজন সেই বায়'আতের যা শিক্ষা দেয় কর্মের, মেহনতের আল্লাহ্র পথে জিহাদের। এজন্যই সাহাবাদের তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমাদের কাছে যা আছে সর্বাগ্রে তা পেশ কর। তোমাদের সর্বশেষ করণীয়টুকুও তোমরা করে নাও। তবেই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সাহায্য নেমে আসবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের মু'জিযাগুলোর ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল। নিরস্ত্র তিন শ' তেরজন সাহাবাকে নিয়ে বদরের মাঠে মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল। এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে দিতেও তো তিনি পারতেন, পারতেন শুধু এক মুঠি কংকর নিক্ষেপ করে ময়দান জয় করতে? কিন্তু না, আল্লাহ্র নবীকে মদীনা থেকে বেরিয়ে সত্তর আশি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে বদর যুদ্ধে হাযির হতে হয়েছিল। সেখানে সৈন্য বিন্যাস থেকে শুরু করে প্রচলিত যুদ্ধের সব কৌশলই তিনি গ্রহণ করেছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতির মত। সবশেষে সেনাপতির জন্য নির্মিত খেজুর পাতার ডেরায় ঢুকে সিজদায় গিয়ে দু'চোখের পানিতে তপ্ত বালু ভিজিয়ে তিনি দো'আ করেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ لَمْ تُعْبَدْ হে পরওয়ারদিগার! তোমার বান্দাদের এ ক্ষুদ্র দলটি আজ ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না! মুসলিম জীবনের সকল ক্ষেত্রে, দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে এটাই সঠিক নববী তরীকা।

### সেখানে রবূবিয়াতের প্রশ্ন ছিল

আপনাদের সামনে আমি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ انهم فتية। তারা ছিল হাতে গোণা কয়েকজন তরুণমাত্র। সমসাময়িক সরকার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ কুক্ষিগত করে রেখেছিল। সুতরাং সরকার খাদ্য সরবরাহ্ করলে তবেই ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন জুটত। তেমনি সরকার চাকরী না দিলে মানুষকে ভোগ করতে হতো বেকারত্বের অভিশাপ। মোটকথা, সরকার যেন ছিল সে সমাজের ক্ষুদে 'রব'! امنوا بربهم। কিন্তু তারা তাদের আসল 'রব'-এর ওপর ঈমান এনেছিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল, আমাদের প্রতিপালক, তথা রিযিকদাতা, জীবনের সকল প্রয়োজনের ব্যবস্থাপক এবং সম্মান ও মর্যাদা দানকারী তুমি নও;

অন্য কোন মহান সত্তা। তিনি রাজাধিরাজ, তিনি রাব্বুল-'আলামীন, সারা বিশ্বের তিনি নিয়ামক, প্রতিপালক। এই ক্ষুদ্র বিশ্বাসী তরুণ দলটি যখন তাদের বিশ্বাসের প্রথম মনযিল অতিক্রম করল তখন زدناهم هدى আমি তাদের ঈমানের অবিচলতা বৃদ্ধি করে দিলাম। এখানে একথা প্রমাণিত হলো, আল্লাহ্ পাকের মহান সত্তাই হচ্ছে হিদায়াতের উৎস। এখান থেকেই হয় মানুষের হিদায়াতের ফয়সালা। নিছক মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে কিংবা কুতুবখানার গ্রন্থরাজি অধ্যয়নের মাধ্যমে হিদায়াতের মহাদওলত হাসিল করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। আপন সত্তার সাথেই 'হিদায়াত'-কে তিনি সম্পৃক্ত করে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে বহুবচন প্রয়োগ করে ইরশাদ করেছেন ঃ زدناهم هدى আমরা তাদের হিদায়াত তথা ঈমানের অবিচলতা বৃদ্ধি করে দিয়েছি। ফলে মুহূর্তের মধ্যে একেকটি স্তর অতিক্রম করে হিদায়াতের সুউচ্চ সোপানে তাদের ঘটেছে উত্তরণ। আল্লাহ্র সামনে তারা মস্তকাবনত হয়েছিল, আল্লাহ্র সামনেই প্রার্থনার হাত দুটি প্রসারিত করেছিল, আল্লাহর সুমহান সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় ও মারেফাত লাভের মেহনত করেছিল, সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করেছিল। আর তাই "আমরা তাদের ঈমান ও হিদায়াতের অবিচলতা বৃদ্ধি করে দিয়েছি"।

### তরুণদের ঈমানী উদ্দীপনা

এবার তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো। এ ঘটনা সেই সময়কালের যখন খ্রিস্ট ধর্ম আপন উৎসভূমি সিনাই থেকে ছড়িয়ে পড়ে রোমে নতুন প্রবেশ করেছিল। সেখানে ছিল গোড়া প্রতিমা পূজারীদের অখণ্ড রাজত্ব। খ্রিস্ট ধর্ম-প্রচারকরা সেখানে দাওয়াতের কাজ শুরু করলে তরুণ সমাজে তার শুভ প্রভাব পড়ল। ইতিহাসের বিভিন্ন মোড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তরুণরাই প্রভাবিত হয়েছে সবার আগে। কেননা বুড়োরা আবদ্ধ থাকে অনেক বন্ধনে। সে বন্ধন ছিন্ন করে ইতিহাস ও যুগ-বিপ্লবের ডাকে সাড়া দেয়া সব সময় সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। যেমন ধরুন, সাঁতার কাটার জন্য আপনারা নদীতে গিয়ে থাকেন। হালকা পাতলা ও মেদহীন লোকের পক্ষে যতখানি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে সাঁতার কাটা সম্ভব, মেদবহুল লোকের পক্ষে কিংবা বিরাট কোন বোঝা মাথায় নিয়ে ততটা সহজে সম্ভব নয়। দেখা যাবে মাঝপথে গিয়েই হয়ত সে হাঁপাতে শুরু করেছে কিংবা ডুবে যেতে বসেছে।

পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কিংবা রাজা-বাদশাহদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং শাহী দরবারের ভীতি ও মোহ বুড়োদের পথে যেমন বাধার বিরাট পাহাড় হয়ে দাঁড়ায়, তরুণদের বেলায়

তেমনটি হয় না। কেননা কাঁচা বয়সের উদ্দীপনায় ওরা উদ্দীপ্ত। শিরায় শিরায় ওদের টগবগ করে উষ্ণ রক্ত, মনে থাকে নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন, নতুনের ডাকে সাড়া দেয়ার এক সর্বজয়ী উদ্যম ও স্বভাব প্রেরণা। তাই বাধার বিন্ধ্যাচল ওরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় অবলীলাক্রমে, নতুনের ডাকে সম্মুখ পানে এগিয়ে যায় দৃপ্ত পদক্ষেপে (এই উচ্ছল তারুণ্যেরই জয়গান গেয়ে গেছেন আমাদের বুলবুল কবি নজরুল ঃ ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত, আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল—অনুবাদক)। সে যুগের তরুণদের কানে এলো নতুনের ডাক, চিরন্তন সত্যের সঞ্জীবনী আহ্বান, ওরা শুনতে পেল নবসৃষ্টির জয়গান। দেখুন না! কুরআনুল করীমে তখনকার কী সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন আল্লাহপাকঃ

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ـ

"হে পরওয়ারদিগার। আমাদের সত্য গ্রহণের ইতিবৃত্ত শুধু এইটুকু যে, সত্যের পথে আহ্বানকারী এক 'মুনাদী' আমাদের আহ্বান জানালো ঃ

"আপন প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। মুনাদীর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা ঈমান নিয়ে এলাম।" বুড়োদের মত এই তরুণদের পায়ে কোন শিকল ছিল না, মনে ছিল না সামাজিক সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা খোয়ানোর ভয়। তাই তারা গর্বভরে বলতে পারল, "আমরা ঈমান নিয়ে এলাম।"

## কাঁটাবন ও পুষ্পোদ্যান

ঈমানদার তরুণদের জীবনেও এল অগ্নি পরীক্ষার সেই সব স্তর যা দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে এক মুজাহিদের জীবনে সচরাচর এসে থাকে। এ পরীক্ষাকালে কখনো নিজেকে সে দেখতে পায় ফলে ফুলে সুশোভিত এবং ঝলমল গন্ধে সুরভিত, ছায়াঘেরা এক সবুজ উদ্যান, যেখানে আছে পাখির গান, আছে ফুলপরীদের হাস্য-কলতান, আছে ফুলের পাপড়িতে কোমল পরশ আর আছে জীবন উপভোগের মোহিনী হাতছানি। আবার খানিক নিজেকে সে দেখতে পায় এক বিষাক্ত কাঁটাবনে; পদে পদে বিষকাঁটা সেখানে পায়ে বেঁধে, রক্ত ঝরায়, বিচ্ছু যেখানে কামড়ায়, সর্প যেখানে ছোবল হানে, বিষ ছড়ায়। মোটকথা, একদিকে থাকে বিভিন্ন প্রলোভন, বড় বড় পদের প্রস্তাব, বৈষয়িক উন্নতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার অবারিত সুযোগ ও জীবন উপভোগের সকল আয়োজন-উপকরণ আর অন্যদিকে থাকে লোমহর্ষক শাস্তির হুমকি, থাকে সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা হারানোর ঝুঁকি, এমন কি থাকে জীবন নাশের পাঁয়তারাও।

বিজ্ঞজনদের মতে কাঁটাবনের তুলনায় পুষ্পোদ্যান পেরিয়ে আসাটাই অনেক বেশী কঠিন। ভীতি ও হুমকির তুলনায় প্রলোভন অনেক বেশী কার্যকর। আপনাদের হয়ত জানা থাকবে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.)-কে উভয় পরীক্ষারই সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁর জীবনে। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর যুগে রাষ্ট্রীয় পোষকতায় মু'তাযিলী সম্প্রদায় মুসলিম সমাজে এ বিশ্বাসের প্রসার ঘটাল, কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হয়েও সৃষ্ট। এই ভ্রান্ত আকীদার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন মর্দে মু'মিন, শেরে খোদা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.)। দরস-গাহের মসনদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। তাঁর ঈমান তাঁকে পরিণতির কথা ভাববার অবকাশ দিল না মুহূর্তও। তাই আহত শার্দুলের ন্যায় গর্জে উঠলেন এই নতুন রাষ্ট্রীয় গোমরাহীর বিরুদ্ধে।

সাথে সাথে শুরু হলো পরীক্ষা, সাপ-বিচ্ছুভরা এক সুদীর্ঘ কাঁটাবন পাড়ি দেয়ার অগ্নি পরীক্ষা। দরবারে ডেকে খলীফা মু'তাসিম তাঁকে চাপ দিলেন এতদ্‌সংক্রান্ত শাহী ফতওয়ায় দস্তখত দিতে। অত্যন্ত তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন খলীফার প্রস্তাব। খলীফা তাঁকে শাসালেন, কঠিন শাস্তির হুমকি দিলেন। কিন্তু তিনি মচকালেন না। প্রশান্ত চেহারায় নূরের এক স্বর্গীয় অভিব্যক্তি নিয়ে শুধু বললেন ঃ এটা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধী। সুতরাং আমার পক্ষে কিছুতেই তা মানা সম্ভব নয়। আরেকদিন দরবারে ডেকে খলীফা বললেন ঃ আহমদ! আমার কথা মেনে নিলে আমার যুবরাজ পুত্রের মতই তুমি আমার প্রিয়পাত্র হবে এবং সিংহাসনে আমার পাশে বসার মর্যাদা পাবে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সেই অনমনীয় জওয়াব ঃ কুরআন-সুন্নাহ্‌র কোন দলীল পেশ করুন, নির্দ্বিধায় আমি মেনে নেব। খলীফার চরম কথা ঃ শেষবারের মতো ভেবে দেখার সুযোগ তোমাকে দেয়া হলো। জওয়াবে তাঁর প্রশান্ত মুখে মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল মাত্র। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের এ হাসির সাথে পরিচিত ছিলেন খলীফা মু'তাসিম। তাই ক্রোধে গর্জে উঠে জল্লাদকে নির্দেশ দিলেন ঃ মার কোড়া। প্রচণ্ড শব্দে একেকটি কোড়া এসে আছড়ে পড়তে লাগল ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের খোলা পিঠে। দরদর করে বয়ে চলল লাল তাজা রক্ত। কিন্তু তিনি প্রশান্ত, নির্বিকার! জল্লাদের ভাষ্য ঃ আল্লাহ্‌র কসম! সেই একটি কোড়া হাতির পিঠে পড়লেও তা চিৎকার করে ছুটে পালাত।

এরপর এলো দ্বিতীয় পরীক্ষা। মু'তাসিমের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মুতাওয়াক্কিল মসনদে আরোহণ করলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলকে তিনি খলীফাদের বিনোদন ও বিশ্রামের শহর সামাররায় আমন্ত্রণ জানালেন এবং শাহী

সম্মান ও মর্যাদায় তাঁকে বরণ করলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল পাথেয় হিসাবে সাথে করে গমের ছাতু এনেছিলেন। প্রয়োজনে তাই তিনি খেতেন, শাহী দস্তরখানের খাবার স্পর্শও করতেন না। পরে খলীফা মুতাওয়াক্কিল আশরাফীর তোড়া উপহার পাঠাতে শুরু করলেন। ইমাম সাহেবের পুত্র বর্ণনা করেন, "আব্বা প্রায় বলতেন ঃ মু'তাসিমের কোড়ার চেয়ে মুতাওয়াক্কিলের তোড়া আমাকে অধিক পরীক্ষায় ফেলেছে।"

বাতিল শক্তি যুগে যুগে সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে দু'টো অস্ত্রই সমানভাবে প্রয়োগ করেছে। বাতিল যখন মনে করেছে, কোড়ার আঘাতেই সত্যের কণ্ঠ স্তব্ধ করা সম্ভব, তখন তাই সে করেছে সীমাহীন নিষ্ঠুরতার সাথে। আবার যখন মনে হয়েছে, জল্লাদের কোড়ার চেয়ে আশরাফীর তোড়াই এখানে কাজ হাসিলের জন্য অধিক সহায়ক, বাতিল তখন সেই ফুটপাতেরই আশ্রয় নিয়েছে নির্লজ্জ শঠতার সাথে। আর জল্লাদের কোড়ার তুলনায় আশরাফীর তোড়ার পরীক্ষাই হচ্ছে কঠিন। আবার অনেক সময় কোড়া কিংবা তোড়ায় কাবু না হলেও মা-বাবার ও প্রিয়জনদের চাপ-আবদারের কাছে নতি স্বীকার করতে হয় মানুষকে। পরবর্তী পর্যায়ে এই তৃতীয় পরীক্ষাও এল ঈমানের বলে বলীয়ান সেই তরুণদের জীবনে। তাদের মা-বাবারা আগে থেকেই শাহী দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, ছিল বিভিন্ন পদ ও মর্যাদায় সমাসীন। তাদের বলা হলো ঃ বখে যাওয়া ছেলেদের বুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা কর। ভুল করে ওরা দুষ্ট লোকের ফাঁদে পা দিয়েছে। ওদের বুঝিয়ে বলো আমাদের ধর্ম মতে ফিরে এসে নিজ নিজ ভবিষ্যত গড়ার সুযোগ ওরা গ্রহণ করুক! তোমাদের পরে দরবারে তোমাদের পদ ও মর্যাদাকে সামলাবে তোমাদের ছেলেরাইতো। দেখো, তোমাদের এই বখে যাওয়া ছেলেরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই যেমন কুড়াল মারছে, তেমনি তোমাদের পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। আর তখনই বাতিল তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই ক্ষুদ্র দলটির বিরুদ্ধে। শুরু করল ব্যাপক ধরপাকড়, পাশবিক নিপীড়ন। এ সময় প্রয়োজন ছিল আল্লাহ্র বিশেষ মদদ ও নুসরতের। এ হচ্ছে সেই কঠিন মুহূর্তে যখন পরীক্ষা জর্জরিত মু'মিনদের হৃদয়ের গভীর থেকে বেরিয়ে আসে জিগর ফাটানো, আরশ-কাঁপানো متى نصر الله! কখন! কখন আসবে আল্লাহ্র মদদ?

## মু'মিন চিত্তের স্থিরতা

যথাসময়ে আল্লাহ্র মদদ নেমে এল। وربطنا على قلوبهم আমরা তাদের হৃদয় মযবুত ও মনোবল অটুট করে দিলাম। তাই জালিমের সকল

নিপীড়ন-নির্যাতন উপেক্ষা করে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে তরুণ দল ঘোষণা করল ربنا رب السموات والارض আসমান যমীনের যিনি রব, তিনিই আমাদের রব - لن ندعومن دونه الها لقد قلنا اذا شططا আমরা কখনো তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহের উপাসনা করব না। আমাদের মুখ থেকে এ ধরনের কোন কথা বের হলে সেটা হবে বড় অন্যায় কথা। هولاء قومنا اتخذوا من دونه الهة –আমাদের স্বগোত্রীয় লোকদের দেখলে মনে হয় কত স্থিরমতি বুদ্ধিমান, কত ভাবগম্ভীর, অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান, অথচ তারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে একাধিক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, لولايأتون عليهم بسلطان بين নিজেদের হাতে গড়া এই ইলাহদের সপক্ষে কোন যুক্তি-দলীল তারা পেশ করে না কেন? আল্লাহ্র নামে যারা অপরাধ আরোপ করে তাদের চেয়ে বড় অপরাধী, বড় অবিচারক আর কারা?

তিনটি শিক্ষা

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাসহ সূরাতুল-কাহ্ফের যে কয়টি আয়াত আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করলাম তা থেকে আমরা তিনটি মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

প্রথমত, পর্বতের মত অবিচল ও সুদৃঢ় ঈমান হাসিল করতে হবে আমাদের। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র পবিত্র গুণাবলীর ওপর আমাদের ঈমান হবে অন্তর্দৃষ্টিতে স্নাত এবং আত্মিক শক্তিতে সুসংহত। শিক্ষার্থী, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকদের ঈমান হবে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তির আলোকে উজ্জ্বল, আর সাধারণ জনতার ঈমান হবে ভক্তি, বিশ্বাস ও আস্থানির্ভর।

দ্বিতীয়ত, হিদায়াতের যিনি উৎস, হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য যাঁর করুণা প্রাপ্তি হলো পূর্বশর্ত, সেই মহান সত্তার সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে হবে সুগভীর, সুনিবিড়। কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন, নবী ও সাহাবী চরিতের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ এবং শহীদ ও মুজাহিদদের পূতপবিত্র জীবন থেকে আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত শক্তি ও খাদ্য যোগাতে হবে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে। ব্যাটারী যেমন চার্জ করতে হয়, সেল (Cell) পুরোনো হয়ে গেলে তা যখন বদলে নিতে হয় তেমনি আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসকেও ঝালিয়ে নিতে হবে বারবার। আমরা সবাই আজ জড়বাদী বিশ্বে বাস করছি। যাদের কাছে আমরা লেখাপড়া করছি সেই শিক্ষাগুরুদের অনেকে নিজেরাই ধর্মবর্ণিত অদৃশ্য জগতের মহাসত্যে পূর্ণ বিশ্বাসী নন। পদে পদে আমাদের সমাজে এমন সব অন্তরায় বিদ্যমান যা মানুষকে প্রতি

মুহূর্তে ঠেলে দেয় আল্লাহকে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। আল্লাহ বিস্মৃত করার সাথে সাথে এ পাপী সমাজ আত্মবিস্মৃত হায়েনায় পরিণত করছে আমাদেরকে। টেলিভিশন বলুন, রেডিও বলুন, সংবাদপত্র জগত কিংবা সাহিত্যাঙ্গন বলুন, সর্বত্র আজ একই কলুষিত পরিবেশ। সাহিত্যকে মনে করা হয় নির্মল অনুভূতির পবিত্র বাহন, জাতীয় সত্তার বিকাশ ও লালন ক্ষেত্র। অথচ সেই সাহিত্যই আজ হয়ে পড়েছে নগ্নতা-অশ্লীলতা ও আদিম পাশবিকতায় সমাজ বিষিয়ে তোলার মোক্ষম হাতিয়ার। মোটকথা, মানুষের যে সমাজে আমাদের বাস তা আজ ভেসে গেছে পাপের বন্যায়, ধর্ম বিস্মৃতি ও আল্লাহ গাফিলতির মহাসয়লাবে। আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি, এমন কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের নিক্ষেপ করছে নাফারমানী ও আল্লাহদ্রোহিতার সেই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরে। মজার ব্যাপার এই যে, ডুবিয়ে মারার সব আয়োজন সম্পন্ন করে সমাজপতিরা ভারিক্কি চালে এখন আমাদের নসিহত খয়রাত করে বলেছেন, সাবধান বাছারা! কাপড় ভিজিও না যেন! সমাজ জীবনের এ পাপ কলুষতা থেকে নিজেকে আর সমাজের মানুষকে বাঁচতে হলে আমাদের আজ অনুধাবন করতে হবে আল-কুরআনের চিরন্তন ঘোষণা وزدناهم هدى - এর মর্মবাণী। হৃদয়ের অন্ধকার দেশে আজ জ্বালাতে হবে ঈমানের জ্যোতির্ময় নূরানী প্রদীপ। তখনই কেবল সম্ভব হবে কুপ্রবৃত্তির ছোবল থেকে আত্মরক্ষা করা। শুধু সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক শক্তি বলে বা নৈতিক বিধিমালা দ্বারা সম্ভব নয় আজকের জড়বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা। জীবন ও জগতের পরীক্ষিত সত্য আমি আপনাদের বলছি, সময় এতটা মারমুখী ও সময়ের দাবী ও চাহিদা এমনই সর্বগ্রাসী যে, ঈমানী শক্তি ও নবী জীবনের সুমহান আদর্শ ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার আর কোন উপায় নেই।

## সশস্ত্র বস্তুবাদের সফল মুকাবিলা

ঈমান ও অস্তিত্ব রক্ষাকারী এ মহাসংগ্রামে সশস্ত্র বস্তুবাদের সফল মুকাবিলা করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে গায়বী মদদ লাভ করতে হবে, অর্জন করতে হবে রুহানিয়াতের মহাশক্তি। সেজন্য আমাদের নামায হতে হবে বিশুদ্ধ ইহসান[১] ও আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ। কেননা নামাযই মু'মিনের হৃদয়ের আধ্যাত্মিক শক্তি যোগায়, আর যোগায় নীরব রাতের ইবাদতক্লান্ত দু'হাতের অশ্রুসজল মুনাজাত, ভক্তিআপ্লুত ও ভাবমগ্ন হৃদয়ে আল-কুরআনের তিলাওয়াত। সেই সাথে

১. হাদীসের পরিভাষায় ইহ্সানের দুটি অর্থ ঃ অন্তরে এমন অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, আল্লাহকে আমি দেখতে পাচ্ছি কিংবা নিদেনপক্ষে আল্লাহ আমাকে দেখছেন।

প্রয়োজন আল্লাহ্‌র প্রেমিক বান্দাদের সংস্পর্শ। কেননা আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় এঁরা হলেন পরশ পাথর। এঁদের সান্নিধ্যে আমাদের মন পবিত্র ও বিশুদ্ধ হবে; ইশক ও প্রেমের উত্তাপে হৃদয় দগ্ধ হবে এবং সেখানে জাগ্রত হবে আল্লাহ্‌র দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষা।

ইউরোপ-আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুবাদকে আজ সজ্জিত করে রেখেছে নতুন নতুন অস্ত্রে, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জামে। আমরা যদি মনে করে থাকি, শুধু সাংগঠনিক শক্তি, উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামের বলেই আমরা এর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব তাহলে আমরা মারাত্মক ভুল করব। আর হয়ত আগামী দিনে সে ভুলের ক্ষতিপূরণও সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। এজন্য চাই অসীম ঈমানী শক্তি, চাই আল্লাহ্‌র সাথে প্রগাঢ় সম্পর্ক, আর চাই এমন সিজদার তাওফীক যার প্রচণ্ড চাপ এই জড় পৃথিবীও সইতে না পারে। কবির ভাষায় ঃ

وسجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی

اس کو اج ترستے ہین منبر ومحراب

কোথায় সে সিজদা যা কাঁপিয়ে দিত পৃথিবীর আত্মা। তেমন সিজদার তরে আজ কেঁদে মরে মিম্বর ও মিহরাব।

আমাদের সিজদা অন্তত এমন তো হবে যা প্রাণ কাঁপিয়ে দেয়, হৃদয় উদ্বেলিত করে তোলে এবং চোখে অশ্রু ঝরায়। আমাদের নামাযে, আমাদের সিজদায়, আমাদের তিলাওয়াতে ও আমাদের মুনাজাতে এই প্রাণ ও সজীবতার যখন সঞ্চার হবে তখনই কেবল আমরা সক্ষম হব বস্তুবাদ ও ভোগবাদের সফল মুকাবিলা করতে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে হবে প্রেম ও মুহব্বতের। সেই সাথে আমাদের মনে থাকতে হবে সুন্নতের গুরুত্ব ও নবীর আদর্শের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ। ত্রুটি-বিচ্যুতি সবারই হয়, কিন্তু সাফাই পেশ করার পরিবর্তে ত্রুটিকে ত্রুটি বলে স্বীকার করার প্রশংসনীয় মনোভাব থাকতে হবে। অনুশোচনাদগ্ধ মনে একথা স্বীকার করতে হবে, নবী জীবনই আমাদের আদর্শ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে মহান আদর্শই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। এ ধরনের মনোভাব থাকলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাওফীক দেবেন এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ক্ষমা করবেন। বড় জটিল ও নাযুক সময় আমাদের জন্য আল্লাহ্ পাক নির্বাচন করেছেন। আমরা যদি দ্বীন ও শরীয়তের দাবী পূর্ণ করে ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখার পবিত্র জিহাদে নিজেদের উৎসর্গ করি তাহলে দুনিয়াতে তার

সুফল তো আছেই, পরকালে এমন অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী আমরা হব যা এই জড় পৃথিবীতে বসে আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

## ইসলামের হাতে আগামী দিনের নেতৃত্ব

ইসলামী উম্মাহর জন্য এটা এক বিরাট সৌভাগ্যের ইঙ্গিতবহ, তরুণদের মধ্যে আজ ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। এটা নিছক ঘটনাচক্রের ব্যাপার নয়। লাহোরে এসে আপনাদের দেখছি, ইতিপূর্বে করাচীতেও দেখে এসেছি, আর তারও আগে দেখে এসেছি মিসরে, সিরিয়ায়। সেসব দেশের ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজের তরুণদের মধ্যে এমন ইসলামী জযবা ও উদ্দীপনা দেখে এসেছি যা দুঃখের বিষয়, আমাদের এখানের অনেক দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। সিরিয়ার অবস্থা তো রীতিমত আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে, জানি না সেখানকার কলেজ ভার্সিটির ছাত্রীদের মধ্যেও এ প্রেরণা কোত্থেকে এল যে, প্রকাশ্যেই আজ তারা ইসলামের পক্ষে কথা বলছে এবং ইসলামের নামে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করছে। তাদের মধ্য থেকেই আজ দাবী উঠেছে ইসলামী পর্দার সপক্ষে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ঃ আমাদের ইসলামী পর্দার সাথে লেখাপড়ার সুযোগ না দিলে ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এটা নিছক ঘটনাচক্রের ব্যাপার নয়। পাকিস্তানের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তরুণদের মধ্যে আজ এক মহাপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটাই আল্লাহ্ পাকের মঞ্জুর। মনে হচ্ছে পর্দার আড়ালে এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। নইলে আপনারাই বলুন, ভার্সিটির তরুণদের মনে এ উৎসাহ, এ উদ্দীপনা কে এনে দিল? তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ পাকের এটাই মঞ্জুর, ইসলামী উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনের এ সংগ্রামে তরুণরাই এবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের হাতেই অর্পিত হবে আগামী দিনের গোটা ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বভার। কেননা انهم فتية امنوا بربهم। ওরা সেই তরুণদল যারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছে।

আমি আমার সীমিত অভিজ্ঞতার আলোকে আরো কয়েকটি কথা আপনাদের খিদমতে আরয করতে চাই।

## চরিত্র গঠন করুন

প্রথম কথা, সর্বাগ্রে ব্যক্তি চরিত্র গঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করুন। এ ছাড়া সফলতা লাভের আশা সুদূরপরাহত। আমাদের ইসলামী আন্দোলন-

গুলোর সবচেয়ে বড় ক্রটি ও দুর্বলতা, ব্যক্তি চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। ফলে আন্দোলনের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে তরুণরা হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে কিংবা পরিচালিত হয় ভ্রান্ত পথে। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ ও নববী আদর্শের ছাঁচে তরুণদের জীবন ও চরিত্র গঠিত হলে সে আন্দোলনের সফলতা নিশ্চিত, তা কখনো ঝিমিয়ে পড়ার বা বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে না।

## আত্মসমালোচনা করুন

দ্বিতীয় কথা হলো, আপনাদেরকে আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ যুগের একটি বড় দোষ, অন্যের ছিদ্রান্বেষণে আমাদের আগ্রহের কোন কমতি হয় না, অথচ নিজেকে মনে হয় যেন শিশির ধোয়া দূর্বা ঘাস। বর্তমান সমাজে দর্শন ও রাজনীতি আমাদের মধ্যে এমন এক অসুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, নিজেদের দোষক্রটি সম্পর্কে আমরা থাকি সম্পূর্ণ বেখবর, অথচ অন্যের দোষক্রটির ওপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সর্বদা। "অমুক দল এই করেছে", "অমুক ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে"—এই আমাদের দিন-রাতের জপমালা। ফলে আত্মসমালোচনা করার, সংশোধনের উদ্দেশে নিজের দোষক্রটিগুলো খুঁজে বের করার কারোই ফুরসত হয় না বড় একটা।

## ইতিবাচক কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দান

তৃতীয় কথা, নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের তুলনায় ইতিবাচক কর্মকাণ্ডকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং উভয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে এগুতে হবে। সব কিছুকেই সমালোচনার চোখে দেখার ক্ষতিকর মানসিকতা যেন আপনাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। উম্মতের কোন একটা অংশের কাছে যদি আপনারা দ্বীনের আলো পান, তাদের সান্নিধ্য যদি আপনাদের মধ্যে ঈমানের অনুভূতি জাগ্রত করে, নামাযের প্রতি প্রেম-অনুরাগ বৃদ্ধি করে, তাহলে ততটুকুকেই আল্লাহর নিয়ামত মনে করুন। সেইটুকু নিজেদের মধ্যেও আহরণ করার চেষ্টা করুন। এই বলে তাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়, 'দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি তাদের নেই; সুতরাং তারা দ্বীনের সত্যিকার ধারক ও বাহক নয়, তাদের সংস্পর্শে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।' কারণ একমাত্র নামাযটাই দ্বীনের একটা বিরাট অংশ। হাদীস শরীফে নামাযকে বলা হয়েছে দ্বীনের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। সুতরাং তাদের সান্নিধ্যে এসে যদি প্রাণবন্ত নামায

আপনি শিখে যেতে পারেন, সিয়ামের আত্মিক স্বাদ অনুভব করতে পারেন তাহলে মনে করতে হবে জীবন গঠনের দুঃসাহসী অভিযাত্রায় আপনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। সুতরাং এটা অবজ্ঞার বিষয় নয়।

**ব্যাপক অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করুন**

চতুর্থ কথা, বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়নে এখন থেকে আপনাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। সুগভীর ও সুবিস্তৃত জ্ঞানই দ্বীনের পথে আপনাদের এ বিপদসংকুল অভিযাত্রাকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করবে। আপনাদের সরাসরি পরিচিত হতে হবে ইসলামের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ্‌র সাথে। একটা কথা মনে রাখবেন, আরবী ভাষায় পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা ছাড়া দ্বীনের কোন মৌলিক বিষয়ে আস্থা ও নির্ভরতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। নির্ভরযোগ্য ও ভ্রান্তিমুক্ত সব ধরনের দ্বীনী সাহিত্যই আপনাদের অধ্যয়ন করা উচিত। এক ধরনের কিংবা এক ব্যক্তির রচনাসম্ভারে আপনাদের আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। উম্মাহর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ মডেল। বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়েও অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে দ্বীনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে একক মডেল হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, ইনিই সর্বশেষ মডেল। সুতরাং অন্য কোন মডেলের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই অন্য কোন সাহিত্য বা রচনাসম্ভারের। এ ধরনের সংকীর্ণতা আপনাদের মত তরুণ ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের অন্তত থাকা উচিত নয়।

জীবনের শুরু থেকে আমার ব্যক্তিগত রুচি এটাই এবং অন্যদেরও আমি এই পরামর্শই দিয়ে থাকি। অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যও ও ব্যাপকতা অবশ্যই থাকা উচিত এবং যে কোন ভালো লেখাই পড়ে দেখা উচিত। তবে এতটুকু যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে যাতে পঠিত বিষয়ের ভালোমন্দ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

**আমার হৃদয়ে আপনাদের জন্য স্থান রয়েছে**

পূর্ণ আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনার স্নিগ্ধতা নিয়ে ওপরের কথাগুলো আমি আপনাদের বলেছি। এখানে আপনাদের মাঝে আমার উপস্থিতিই প্রমাণ করে, আপনাদের জন্য আমার হৃদয়ে স্থান রয়েছে, রয়েছে গভীর মর্যাদাবোধ। হযরত ওমর (রা.)-এর একটি আবেগপূর্ণ বক্তব্য সব সময় আমার মনে দোলা দেয়। বিশিষ্ট সাহাবীদের এক মজলিসে হযরত ওমর (রা.) একবার বললেন ঃ আসুন,

আজ আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে যার যার মনের বাসনা পেশ করি। কেউ আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে ব্যয় করার বাসনা প্রকাশ করলেন, কেউবা অধিক ইবাদতের তাওফীক প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হযরত ওমরের পালা এলে তিনি বললেন ঃ আমার স্বপ্ন, মদীনার ঘরে ঘরে খালিদ ও আবূ উবায়দার মত বীর সন্তান জন্ম নেবে। আর গোটা দুনিয়ায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের আমি পাঠিয়ে দেব দিকে দিকে। আজ এ আশা আমরা কাদের কাছে করতে পারি? আপনাদের মত অরুণ প্রাতের তরুণ দলের কাছেই তো।

পরিশেষে আমি আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করি এবং আপনাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের কাছে আসতে পেরে, মনের ব্যথা আপনাদের কাছে খুলে বলতে পেরে আমি আনন্দিত, পরিতৃপ্ত।

বদনজর থেকে আল্লাহ্ আপনাদের হিফাজত করুন। বদনজর শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থবহ, আর সেই ব্যাপক অর্থেই আমি তা ব্যবহার করছি। আল্লাহ্ আপনাদেরকে নিজেদের অন্যদের বদনজর থেকে হিফাজত করুন এবং আপনাদের মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে যথাস্থানে ব্যয় করার তাওফীক দান করুন।

# নববী 'ইলমের তালিবগণের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতামালা

[পাকিস্তানের আরবী মাদ্‌রাসাসমূহ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী ইল্‌ম অধ্যয়নরত ছাত্র-তরুণদের উদ্দেশে যেসব ভাষণ দেয়া হয়েছিল।

ইসলামাবাদে জামিয়াই-ই-তা'লীমা-ই ইসলামিয়ার ছাত্র-শিক্ষক ও শহরের সুধী জনসমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ। ২৩ শে জুলাই ৭৮ ইং তারিখে জামিয়ার প্রশস্ত হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় এ সমাবেশ। পরিচিতি ও স্বাগত ভাষণ দেন জামিয়ার নাজিম মাওলানা হাকীম আবদুর রহীম আশরাফ। সমাপনী ভাষণ ও ধন্যবাদে জ্ঞাপন করেন জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারার অধ্যাপক মাওলানা আবদুল গাফ্‌ফার হাসান।]

## যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় উম্মতে মুহাম্মদীর কর্তব্য

হামদ ও সালাতের পর ঃ

هوالذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة -

মাননীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ ও প্রিয় ছাত্রগণ! এ অনুষ্ঠানে হাযির হয়ে আমি আনন্দিত। কারণ এখানে অপরিচয়ের অস্বস্তি অনুভব করছি না এবং তা করা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা আমরা সকলে অভিন্ন ভাষা ও মনের অধিকারী, একই জাহাজের যাত্রী, একই কাফেলার মুসাফির অর্থাৎ 'ইল্‌মে দ্বীনের কাফেলা, ইসলামের দাওয়াতবাহী মুসলমানদের কাফেলা।

### সময়ের চ্যালেঞ্জ

আমি মনে করি বস্তুবাদ, কামনাবৃত্তি ও সম্পদের আধিক্য হচ্ছে এ যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা ও ভয়ংকর বিপদ তথা আধুনিক ভাষায় বলতে "কঠিনতম চ্যালেঞ্জ"। এ বিপদ বিদ্যমান ছিল সব যুগেই। কিন্তু এ যুগের ন্যায় শক্তিধর, সুপরিকল্পিত ও যুক্তি-দলীলসমৃদ্ধ ছিল না আর কখনও। এটা বাস্তব যে, বিগত বস্তু ও জড়বাদের অগ্রগতির দিনে যারা তার শীর্ষে অবস্থান করছিল, তারাও ছিল হীনমন্যতায় আক্রান্ত। তারা ছিল স্বভাবের দাস এবং ক্ষমতা ও সম্পদের পূজারী। কিন্তু তাতে গর্ব করার দুঃসাহস তাদের ছিল না, বরং

অপরাধবোধ অবনত করে রাখত তাদের মাথা। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করেও তারা মন-মস্তিষ্কের প্রশান্তি আহরণে নিজেদের মনে করত অক্ষম। সে যুগের ইতিহাস পড়ে দেখুন, জড়বাদ পূজারীদের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করুন, আপনি সম্যক অবগত হবেন, সে যুগের উন্নত চরিত্রের অধিকারী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি শ্রদ্ধায় ঐ জড়বাদীরা পর্যন্ত মস্তকাবনত হয়ে থাকত, তাঁদের কাছে আসতে অপ্রস্তুত বোধ করত, তাঁদের সামনে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা পেত। কারণ তখনও পর্যন্ত তাদের অভ্যন্তরে "নফ্‌সে লাওয়ামাহ" (অন্যায় অপরাধবোধ জাগ্রতকারী বিবেক) বেঁচে ছিল। কুকর্ম ও অপকীর্তির পরও তারা অনুভব করত তাদের ভ্রান্তি। জড়বাদের শীর্ষে অবস্থানকারী সেরা ব্যক্তিরাও একাকী নির্জনে অনুশোচনায় কেঁদে ফেলত। বিবেকের দংশনে কখনও বা তারা অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে চিৎকার করে উঠত ঃ আমরা ভ্রান্তিতে ভুগছি, আমরা ফেঁসে গিয়েছি কামনা পূজার ফাঁদে।

## দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিগত যুগের জড়বাদের কথা বললাম। কিন্তু আজকের ভোগবাদী বস্তুবাদ সব সংকোচ ও দুর্বলতার উর্ধ্বে দুঃসাহসী, অকুতোভয়। ভোগবাদকে সভ্যতা ও উন্নতির সর্বোচ্চ শিখর ভাবাই হচ্ছে এ যুগের বৈশিষ্ট্য। জড়বাদে নেই পূর্ব পশ্চিমের বিভেদ মতানৈক্য। মতপার্থক্যের বিষয় হলো, জড়বাদের প্রসার প্রক্রিয়া কিরূপ হবে? কোন্ দল ও মতবাদের নিয়ন্ত্রণে তা পরিচালিত হবে? পশ্চিমের গুরু আমেরিকার দাবী হলো, ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা ও ব্যয় উপার্জনে স্বাধীনতা বনাম যথেচ্ছাচার একটি বৈধ ও নির্ভুল বিধি। পক্ষান্তরে পূর্ব দেশীয় সমাজবাদীদের উস্তাদ রাশিয়ার বিশ্বাস হলো ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা গ্রুপের ইজারাদারী ভ্রান্ত পথ। জীবনোপকরণ হবে সর্বব্যাপক, সর্বসাম্যের অধীন। তা নিয়ন্ত্রণ করবে 'সরকার' নামের একটি যন্ত্র।

কিন্তু জীবন যাপন পদ্ধতি কি হবে? শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়িত হবে কোন্ ধারায়? জীবন সংগঠন, উপকরণ ও উদ্দেশ্য, সদ্ভাব ও সমঝোতা হবে কি করে? উপকরণসমূহ জীবন যাত্রার সহায়ক হতে পারে কেমন ব্যবস্থায়? জীবনের গন্তব্য ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? মানব উন্নতির রহস্য লুক্কায়িত কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত দর্শনদ্বয়ে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। উভয় দর্শনের ঐকমত্যে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, ভোগ, প্রতিপত্তি ও ইচ্ছার নিরংকুশ স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারের মাধ্যমে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা, রক্ত-মাংসের এ দেহের চাহিদা পূরণ করা। মন (প্রবৃত্তি) যা চায় তাই করতে দেয়া, দেহকে

শুইয়ে রাখা বিলাস আবেশে—এসব হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। পেছনে নেই কোন কেন্দ্র, সামনে নেই কোন গন্তব্য, জওয়াবদিহি করতে হবে না কারো সামনে। তাদের মতে নৈতিকতা, অধ্যাত্মবাদ কিংবা আকীদা ও মূল্যেবোধের দাবীদার কোন দর্শনই এর চেয়ে উন্নততর নয়। এ চিন্তাধারার বাইরে নেই কোন বাস্তবতা, কোন জীবন রহস্য। পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সম্পদ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার তথা সর্বসাকুল্যে তা ভোগ করাই হচ্ছে পৃথিবীতে আমাদের জন্মলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কথাই হচ্ছে নিরেট বাস্তব ও নির্ভুল তত্ত্ব-রহস্য। পৃথিবীর ভাণ্ডারগুলো উপভোগে উজাড় করা, নিজেদের মাঝে তা বণ্টন করে নিয়ে জীবনের স্বাদ ভোগ করা, এ পথে কোন অন্তরায় দেখা দিলে তা উৎখাত করাই হচ্ছে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা। উভয় দর্শনের লক্ষ্য অভিন্ন—ভোগ আর ভোগ। অবশ্য তার অন্তরায় কি কি তাতে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, গোষ্ঠীতন্ত্র, একচ্ছত্র আধিপত্য এর অন্তরায়। কারো মতে ব্যক্তিমালিকানা, কারো দর্শনে পুঁজিবাদ ও শোষণবাদী বুর্জোয়াতন্ত্র হচ্ছে প্রতিবন্ধক। কেউ বলেন, মূল বাধা হচ্ছে বণ্টনে অনিয়ম। কারো মতে অশিক্ষাই বিপত্তি। কেউবা বলেন, আদর্শ, শক্তি ও সংগঠনের অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে সমস্যা। মোটকথা, মতভেদ যা তা' রয়েছে শাখা-প্রশাখা ও অন্তরায় চিহ্নিতকরণে; লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে ঐকমত্য। সময়ের বিবর্তনে জড়বাদ যেভাবে সংগঠিত, যেভাবে তা পরিশোধিত হয়েছে, নামের মাহাত্ম্য ও লেবেলের মনোহারিত্বে তা যেভাবে ঝিলমিল করছে, তার 'শোরুমে' যে উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো সাইনবোর্ড ঝোলানো হয়েছে, দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মেধাগুলো যেভাবে তার অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত রয়েছে, জড়বাদ ও বস্তুবাদকে গ্রহণীয় ও ব্যাপকতর করার তৎপরতা চলেছে, তা ইতিহাসের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে ফেলেছে। ভোগবাদ হলো কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ভোগবাদী বস্তুবাদই কঠিনতম চ্যালে। নিরেট বাস্তব এটাই। এর প্রকরণ ও শাখা-প্রশাখা বহুবিধ ও বহুরূপী হতে পারে, কিন্তু মৌলিক সত্তা তার একটাই। তা হলো বস্তুগত ভোগবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সামাজিক সাম্যবাদ কিংবা অন্য যে কোন অর্থ বা দর্শন হোক, সবই হচ্ছে এর শাখা-প্রশাখা। বস্তুবাদ ও প্রবৃত্তি পূজাই হচ্ছে সবটির কেন্দ্রবিন্দু ও অভিন্ন মৌলিক সত্তা (commom factor)।

### বস্তুবাদকে আঘাত হানে যে চিরন্তন সত্য

যুগ যুগ ধরে মানুষ ছিল তার পেটের দাস, জৈবিক চাহিদা ও আদিম প্রবৃত্তির গোলাম। সম্পদ-সম্পত্তি ও নারীই ছিল মানুষের দৃষ্টিতে বাস্তব সত্য।

বিপুল সংখ্যক মানুষ মস্তক ঠেকাত সৃষ্ট জীবের পায়ে, প্রভু স্বীকার করত মাখলুক্‌কে। অন্য দিকে যুগ যুগ ধরে আগমন ঘটেছে আম্বিয়া আলায়হিমু'স-সালাম-এর। তাঁরা পরিচয় দিয়েছেন আর এক অদেখা জগতের যা এ জগতের চেয়ে প্রশস্ততর, মৌলিকত্বে ও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। তাঁরা বলেছেন, সে জগতের দর্শন লাভ করলে এ জগতে অবস্থান হয়ে পড়বে অসহনীয় যাতনায় পরিপূর্ণ, যেমন অবস্থা হয় পানির মাছকে ডাঙ্গায় তুলে ফেললে কিংবা আকাশের পাখীকে সংকীর্ণ খাঁচায় আবদ্ধ করলে যেভাবে তা ছট্‌ফট্‌ করে এবং উড়ে পালাতে চায়। সে জগত একবার অবলোকন করলে তোমাদের চোখ খুলে যাবে, এ পৃথিবী হয়ে যাবে ঘৃণার্হ। এ পৃথিবী, যার পেছনে দৌড়ে তোমরা বিসর্জন দিচ্ছ তোমাদের অমূল্য সম্পদ, তোমাদের জ্ঞান, নৈতিকতা ও তোমাদের আত্মার দাবী—এ পৃথিবী তোমাদের কাছে তখন মনে হবে আবর্জনা আর দুর্গন্ধের ডিপো। দুর্গন্ধের ডিপো কিংবা আবর্জনা স্তূপের মাঝে কাউকে দাঁড় করিয়ে রাখলে যেমন দুর্গন্ধে তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে, মাথা চক্কর দিয়ে বমি আসতে থাকে, তোমাদের অবস্থাও হবে তদ্রূপ। আসমানী ঐশী গ্রন্থমালা এ সত্যটি ঘোষণা করেছে এই ভাষায় ঃ قل متاع الدنيا قليل "এ পৃথিবীর উপকরণসমূহ (নাস্তিতুল্য) তুচ্ছ।" কখনো বলা হয়েছে, 'প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিচূর্ণ শস্যতুল্য', 'কুড়া ভুষিতুল্য', কোথাও বলা হয়েছে ঃ كزرع اعجب الكفار نباته 'ফসল, যা দেখে কৃষকের চোখ জুড়ায়, মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়, মুখ ভরে যায় উপভোগ-স্পৃহার লালায়, আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ওঠে—কী সুন্দর এ ফসল, কত সুন্দর তার রঙ-বৈচিত্র্য!' কিন্তু অতর্কিতে আসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বান, খরা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি। কৃষক তার কাঁচি লাগিয়ে দেখে কিছুই নেই—শুধু পোড়া খড়, বিচূর্ণ ভুসি।

### শিশুর খেলনা জগত আমার নজরে

সর্বাগ্রে এ শাশ্বত, বাস্তব ও চিরন্তন সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পয়গম্বরগণের পবিত্র মুখে ঃ এ দুনিয়া খেলাঘর! ধুলোবালি দিয়ে শিশু নির্মাণ করে তার মনোমত এক প্রাসাদ, সেখানে রচনা করে সংসার। ক্ষণিক পরেই নিজ হাতে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। হয়ত আবার গড়ে, আবার ভাঙে নিজেই। খেলা এমনই হয়। আল্লাহ্‌ পাক এ সত্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন জ্ঞানীজন ও বাস্তবানুসন্ধানী রহস্যবিদদের কাছে। ইতিহাস পড়ুন, আপনার দৃষ্টিও দেখতে পাবে তার সুস্পষ্ট ছবি।

**স্বপ্নই ছিল আমার দেখা সেই জগত**

একবার আমরা বাগদাদ মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। সেখানে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি। ইউফ্রেটিস (ফোরাত নদী) অববাহিকার সভ্যতা, নমরুদ ও কত জানা-অজানা রাজবংশের ঐতিহাসিক স্মৃতি। স্তরক্রমে সাজানো রয়েছে নিকট অতীতের আব্বাসী যুগ, সালজুকী, তাতার, মোগল ও তুর্কী যুগ। একটু পরেই এল ইংরেজ ও ফয়সাল বিন হুসায়নের যুগ। বিশ্বাস করুন, প্রাচীরের পর্দায় এত দ্রুত উত্থান-পতন দেখে আমার মাথা চক্কর খেতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন কোন কড়া ঔষধ কিংবা ঔষধের ওভারডোজ (Over Dose) আমি গলাধঃকরণ করেছি। আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। হাজার কিংবা পাঁচ শ' বছর লেগেছিল তাদের উত্থান-পতনে, আমাদের সামনে তা ঘটতে লাগল মিনিট ও ঘণ্টার হিসাবে। তাহলে সময়ের এ ব্যবধান স্বপ্ন নয় তো কি? ঐসব যুগে যারা বসবাস করেছে, তারা তো ভেবেছিল হাজার বছর! কিন্তু কোথায়? তা যে দু'ঘণ্টা মাত্র। সব ম্যাজিক, সব ভোজবাজি! আমরা দাঁড়িয়ে আছি সভ্যতা ও মানবতার ধ্বংসস্তূপের ওপরে। আমরা আমাদের অতীত দেখে অনুধাবন করছি, আমাদের পরবর্তীরা মিউজিয়ামে আমাদের ইতিহাস দেখে বলে উঠবে قل متاع الدنيا قليل —বলুন পৃথিবীর সব উপকরণ নিতান্তই বাজে, নগণ্য, অস্থায়ী।

**মন লাগিয়ে রাখার ক্ষেত্র নয় এ পৃথিবী**

কিন্তু পৃথিবী সম্পর্কে এ বাস্তব সত্য সকলের দৃষ্টিতে প্রস্ফুটিত নয়। কেননা আল্লাহ্ এ পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাদ রাখতে চান। সেটাই তাঁর হিক্‌মত—সৃষ্টি রহস্য। তাই সাধারণ মানুষের কাছে পৃথিবীর স্বরূপ তিনি খুলে দেন নি যেমন তিনি করেছেন আল্লাহ্-প্রেমিক অধ্যাত্মজ্ঞানীদের জন্য। তাহলে পৃথিবী উজাড় হয়ে যেত। কারো মনে জাগ্রত হতো না বাড়ী তৈরি করার সাধ। কল-কারখানা কিছুই তৈরি হতো না। আল্লাহর হিক্‌মতই পৃথিবীর রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। কেননা বাস্তবতার প্রকাশ ঘটিয়ে দ্বিতীয় জগতে (আখিরাতে) ঘটিতব্য সব কিছু দেখিয়ে দিলে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ত। হয়ত (তীব্র বাসনায়) তার শ্বাস ফুরিয়ে যেত কিংবা সে দু'হাত বন্ধ করে বসে থাকত, তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত অঙ্গুলি হেলানো।

নবীগণ ('আলায়হি'স-সালাম) ও তাঁদের নায়েবগণের অবিচল হৃদয় সব দেখে শুনেও নির্লিপ্তভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। তাঁরা যথাযথভাবে আদায় করেছেন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী ও সকল মানুষের প্রাপ্য হক। পৃথিবীতে

তাঁদের অবস্থান ও জীবন যাপনে কোন ব্যতিক্রম নেই। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মতই যথানিয়মে বাড়ীঘর, ঘর-সংসার করেছেন এবং তাতে সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন প্রশান্ত ও অবিচল, তাঁদের জীবন পরিক্রমা ছিল তাঁদের যোগ্যতার সাক্ষী। যে গ্রামে বা গঞ্জে, যে শহরে ও মহল্লায় তাঁরা বসবাস শুরু করতেন তাঁদের কল্যাণ স্পর্শে তা হয়ে যেত কলুষতা ও কদর্যতা থেকে পবিত্র, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তাঁরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তেন না। আজীবন তাঁদের বক্তব্য ছিল اللهم لا عيش الاعيش الاخرة "ইয়া আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই জীবন।" কেননা তাঁরা ছিলেন পৃথিবীর পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা ঘর-বাড়ীও তৈরি করেছেন, আবার মসজিদও নির্মাণ করেছেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিজয় অভিযানে বেরিয়ে দেশের পর দেশ আল্লাহ্র বিধানের অধীনস্থ্ করেছেন। উদ্ভাবন ও প্রসার ঘটিয়েছেন নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের। সুদৃঢ় ভিত্তি রেখেছেন চিরঅনুসরণীয় ইতিহাসের। মোটকথা, পৃথিবীর সাধারণ বাসিন্দাদের মতই জীবন যাপন করেছেন তাঁরা। কিন্তু ব্যবধান ছিল এখানে, তাঁরা শেষ গন্তব্য মনে করতেন না পৃথিবীকে। পৃথিবী ছিল তাঁদের দৃষ্টিতে পথের প্রথম মন্‌যিল। এটাই আমাদের ও তাঁদের মাঝে ব্যবধান।

### বস্তুবাদ : বাহন না আরোহী

বস্তুবাদের ভেল্কিবাজি যাঁরা ফাঁস করে দিয়েছিলেন, সে সকল মনীষী নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন বস্তুবাদের নাগপাশ থেকে। তাঁরা বস্তুকে বানিয়ে রেখেছিলেন গোলাম, বস্তুর গোলামী করেন নি কখনো। বস্তুর বাহন না হয়ে তাঁরা হয়েছিলেন আরোহী। মূল ব্যবধান ওখানেই। আমরা বাহন হয়েছি কিংবা নিরুপায় আরোহী نہ ہاتھ باگ گھوڑے نہ پاہے رکاب میں হাতে নেই লাগাম, পা পিছলে গেছে পাদানি থেকে। আমাদের অবস্থা বল্গাছেঁড়া ঘোড়ার আরোহীর ন্যায় উপায়হীন। বস্তুবাদ আমাদের দিশেহারা পথিকের ন্যায় ঘুরিয়ে মারছে অন্ধ গলিতে। ঘোড়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করা বা তার পিঠ থেকে নেমে পড়া—এ দুই কাজের কোনটিরই পন্থা আমরা 'রপ্ত' করতে পারছি না। বাহন আমাদের নিয়ে কোন পরিখায় লাফ দিল বা কোন খাদে কিংবা কোন সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিনা তা আমাদের জ্ঞাতব্যের বাইরে। এটা শুধু ব্যক্তির অবস্থা নয়, গোটা সভ্যতা এখন বল্গাহারা, নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত। আর যুগস্রষ্টা মনীষীরা আজীবন বস্তুবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দান করেছিলেন অল্পে তুষ্টির সৌভাগ্য, যাঁরা রাজা-বাদশাহদের পরওয়া করতেন না। তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলতেন,

যেন রোগীর সাথে কথা বলছেন। তাঁরা ছিলেন নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট। তাঁরা রোগীর প্রতি সমবেদনা পোষণ করতেন। বেচারা বাদশাহদের বিপদাক্রান্ত ভেবে তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হতেন। সে বেদনাবোধে কোন ভনিতা ছিল না, তা' ছিল একান্ত আন্তরিক। রুস্তম পাহ্লোয়ান রিব্'ঈ ইবন 'আমেরের কাছে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, পৃথিবীর কাল কুঠরী থেকে প্রশস্ততার জগতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে। আবু ধাবীতে এক বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম ঃ তিনি যদি জওয়াবে বলতেন, দুনিয়ার সংকীর্ণতম কারাগার থেকে আখিরাতের সুপ্রশস্ত জান্নাতে নিয়ে যাবার জন্য, তাতেও আমি মোটেই বিস্মিত হতাম না। কেননা প্রত্যেক মুসলমানই বিশ্বাস করে, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر। দুনিয়া মু'মিনের কারাগার আর কাফিরের জান্নাত (হাদীস)। পৃথিবী তো একটা খাঁচামাত্র। আমার বিস্ময় হলো প্রয়োজনীয় অন্নের অভাবী, ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধা, হাড্ডিসার কংকালে পরিণত আল্লাহ্র সে বান্দারা কী দেখেছিলেন? কী দেখে তারা বলতে পেরেছিলেন, "পৃথিবীর অন্ধকার কারাগার থেকে তোমাদের নিয়ে যেতে চাই উন্মুক্ত প্রান্তরে।" আরবের জীবন-প্রান্তর কি সত্যই উন্মুক্ত ছিল? জীবনোপকরণ কি সেখানে ছিল না সীমিত? বরং সম্পূর্ণ অনুপস্থিত! পেট পুরে একবেলা খাওয়াই তো ছিল তাদের জন্য দুষ্কর। উটের চামড়ার তৈরি তাঁবু কিংবা মাটির তৈরি কুঁড়ে ঘর ছিল তাদের বাসগৃহ। কোন শিকার পেলে কিংবা উট যবাহ্ করলে তা হতো তাদের আনন্দের দিন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কী দেখে তাঁরা প্রতিপক্ষকে বলতে পেরেছিলেন ঃ নিজেদের খবর নাও, তোমরা রয়েছ পিঞ্জরাবদ্ধ, তাতে রেখে দেয়া হয়েছে নগণ্য পরিমাণ খাদ্য। আর তাই খেয়ে তোমরা আনন্দে আত্মহারা! এস, তোমাদের উপভোগ করা আযাদীর স্বাদ।' এই ছিল সে যুগের মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁরাই হলেন 'উলামায়ে রব্বানী। লোকেরা তাঁদের সান্নিধ্যে পেত বস্তুমোহের সুচিকিৎসা। তাঁদের দেখে মনে হতো কত সুখ আনন্দের জীবন যাপন করছেন তাঁরা যেন জান্নাতের অনাবিল অফুরন্ত সুখ! তাই তো শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (র.) বলেছিলেন, الجنة في صدري। "আমার জান্নাত আমার বক্ষ মাঝারে।" এমন নিশ্চিত বলার সাহস তাঁরা পেলেন কোথায়? তাঁদের নির্ভরতা ছিল আল্লাহ্র প্রতি। তাঁরা ছিলেন অকুতোভয়। তাঁদের অন্তরে ছিল সদা আল্লাহ্র শোক্র। সালাত ছিল তাঁদের মনের মাধুরী । দু'আয় তাঁরা পেতেন প্রশান্তি। প্রতি মুহূর্তে যেন তাঁরা জান্নাতে অবগাহন করতেন। সাধারণ দর্শকদের দৃষ্টিতে তাঁরা ছিলেন দুনিয়ার বাসিন্দা, কিন্তু মূলত তাঁরা ছিলেন জান্নাতুল ফেরদাউসে। আবেগাতিশয্যে তিনি একবার বলে ফেললেন ঃ লোকেরা আমার কী চুরি করবে? কী ছিনিয়ে নেবে? আমার শান্তির উপকরণ তো আমার মনের মাঝে। কেউ তা বের করে নিতে পারে কি?

কোনো আল্লাহ্ওয়ালা বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! পৃথিবীর লোকেরা যদি আমাদের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের খোঁজ পেয়ে যায়, তাহলে এক মুহূর্তেও আমাদের সুস্থির থাকতে দেবে না। খোলা তরবারি হাতে রাজা-বাদশাহ্দের ন্যায় আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে এই সংকীর্ণতম পরিমণ্ডল থেকেও আমাদের উৎখাত করে দেবে। নির্জনতায়, মসজিদ ও খানকাহ্র কোণেও আমাদের অবস্থানের সুযোগ দেবে না। তাদের ধারণা হবে, সেখানে লুকানো রয়েছে কোন বহুমূল্য ভাণ্ডার? মুসল্লা বিছিয়ে এত মগ্নতা, একাগ্রতা, ক্ষুধা-পিপাসার নেই কোন অনুভূতি! ব্যাপার কি? নিশ্চয় মুসল্লার নিচে রয়েছে কোন অন্তঃস্রোত, কোন পাইপ লাইন, সেখান থেকে আসছে খাদ্য ও পানীয়, সেখানে থেকে ফুটে বেরুচ্ছে সুখ-আনন্দ। কাজেই তারা আমাদের মুসল্লা থেকে উৎখাত করে নির্বাসিত করবে বনে-জংগলে, আর ঐ স্থান খনন করবে মহাসম্পদ প্রাপ্তির আশায় যেমন খনন করা হয় কালো সোনা পেট্রোলের উদ্দেশে।

### কানা'আত (অল্পে তুষ্টি, লোভহীনতা) এক অমূল্য রতন

সুধীবৃন্দ! মূল সমস্যার মুকাবিলা করতে পারেন শুধু এমন আলিমগণ, যাঁদের মাঝে অল্পে তুষ্টির মৌলিক স্বভাব বিদ্যমান, যাঁরা কোন ফাঁদে ধরা দেন না। কখনো ধরা পড়ে গেলে তাঁদের বক্তব্য হয় ঃ

برو ایں دام بر مرغ دگرنه۔
که عنقارا بلند است آشیانه۔

"হটাও ও ফাঁদ, পেতে দাও অন্য কোন পাখীর তরে। অসীম উচ্চতায় বাসা বাঁধে বলাকারা।" অর্থাৎ হটে যাও, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাও অন্য কোথাও। আমাদের কেনা যায় না পয়সার বিনিময়ে, পদমর্যাদার বিনিময়ে, মসনদের বিনিময়ে। আমরা বেচতে পারি না আমাদের বিবেক, হৃদয়ের প্রশান্তি। সে আশা দুরাশামাত্র। আল্লাহ্ওয়ালাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। দিল্লীর বাদশাহ পয়গাম পাঠালেন মিরযা মাজহার জান-ই জানার খিদমতে, "জনাব, অধমকে কখনো সুযোগ দিচ্ছেন না। দু'একবার সুযোগ দিয়ে কোন কিছু হুকুম করে অধমকে ধন্য হওয়ার অবকাশ দিন।" পয়গামের সাথে হাদিয়া পাঠালেন (সে যুগের সহস্র মুদ্রা)। আল্লাহ্-প্রেমিক জওয়াব দিলেন, "দেখুন, আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ রয়েছে قل متاع الدنيا قليل "বলুন (হে নবী)! পৃথিবীর ভোগ্যপণ্য নগণ্য।' সে পৃথিবীর অন্যতম মহাদেশ এশিয়ার অংশ বিশেষ হচ্ছে হিন্দুস্তান, আর হিন্দুস্তানের

সামান্য অংশ রয়েছে আপনার অধিকারে। তার কিয়দংশ আমি নেয়ার অর্থ হলো আপনার সামান্যতম অংশে ভাগ বসানো। আমি তা করতে পারি না।" এটা ছিল তাঁর মনের কথা আর এ ধরনের ঘটনা বিরল নয়। বোরহানপুরে বাস করতেন জনৈক বুযুর্গ। বাদশাহ আলমগীর তাঁর দরবারে যেতে শুরু করলেন। বুযুর্গ (বিনয়ের সাথে) বললেন ঃ সামান্য একটু জায়গা আমি পছন্দ করছিলাম, তা' যদি জনাবের পসন্দ হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কোথাও চলে যাই। একটি আক্ষেপের বিষয় হলো, বুযুর্গানের জীবনচরিত সংকলিত হয়নি যথাযথভাবে। শরীয়ত পালনে তাঁদের নিষ্ঠা, সুন্নত অনুসরণে তাঁদের উদ্দীপনা, তাঁদের রাত জেগে 'ইবাদত, কুরআন-হাদীসের সাথে তাঁদের গভীর আত্মিক যোগ ও প্রেম, এ সব রয়েছে অনুল্লিখিত। এখানে 'তারীখে গুজরাট'-এর গ্রন্থকারের মন্তব্য উল্লেখ্য, "যে কোন বুযুর্গের জীবনী পড়লে মনে হবে যেন প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙে ফেলাই ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। (মূল) ধাতু চতুষ্টয়—আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসে কারামতি দেখানোই যেন ছিল তাঁদের জীবন সাধনা। কাউকে মেরে ফেলা, জীবিতকে মৃত্যু দান, মৃতকে জীবন দান, নিমজ্জমান নৌকা কিংবা জাহাজকে অঙ্গুলি সংকেতে রক্ষা করা, এ সব তাঁদের জীবনালেখ্য। তাঁদের জীবনেতিহাস সংকলন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। বাস্তবে তাঁরা ছিলেন অনেক 'ইল্ম ও 'আমলের অধিকারী। অবশ্য এমন হতে পারে, যথাযথভাবে হাদীস তাঁদের কাছে না পৌঁছার ফলে কিংবা সরাসরি হাদীসের 'ইল্মের স্বল্পতার কারণে কখনো তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, কিন্তু সাধারণত তাঁরা ছিলেন আহ্লে 'ইল্ম ও 'ইল্মের মানদণ্ডে পরখ না করে কাউকে বুযুর্গের মসনদে তাঁরা আসীন করেন নি।"

আমি আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম هو الذى بعث ..... والحكمة "তিনিই সেই মহান সত্তা (আল্লাহ্) যিনি নিরক্ষর (উম্মীদের) মাঝে পাঠালেন তাদের মধ্যে হতে একজন রাসূল, যিনি তাঁদের (১) তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর বাণীসমূহ, (২) সংশোধন করেন তাদের চরিত্র, (৩) শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও (৪) হিকমত।"

### এ হচ্ছে নবুওতের চার বিভাগ

আল্লাহ্ নায়েবে নবীগণকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন উত্তরসুরি ও প্রতিনিধিরূপে। তিলাওয়াতের নমুনা আজকের মজলিসের শুরুতে আপনারা দেখেছেন। কারী সাহেবান আজও পড়েছেন, প্রতিটি জায়গায় তাঁরা তিলাওয়াত করে থাকেন। মাদরাসাগুলোতে ব্যবস্থা রয়েছে হিফ্জ ও তাজ্বীদের।

ইন্‌শাআল্লাহ্ তা বিদ্যমান থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কারণ আল-কুরআন ঘোষণা করেছে– انا نحن نزلنا لذكروانا له لحافظون "আমিই নাযিল করেছি উপদেশমালা (কুরআন) আর আমিই হচ্ছি অবশ্যই এর সংরক্ষক।" কোন কোন আয়াতে রয়েছে – يتلوا عليهم اياته ويعلمهم الكتاب অর্থাৎ কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দানের কথা আগে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে আয়াতের পূর্বাপর সংযোগ ও বর্ণনাশৈলীর ব্যাপার। তার রহস্য বলতে পারেন কুরআনে সুগভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিদ্বানেরা। কেননা তার সম্পর্ক রয়েছে সূরার মৌলিক আলোচ্য বিষয় ও অবতরণ পটভূমির সাথে। আমাদের কর্তব্য হলো কাজ করে যাওয়া। তা হচ্ছে কিতাবের তা'লীম, দ্বীনী 'ইল্‌মসমূহ ও কুরআন-হাদীস ও তফসীরের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করা।

## হিকমত অর্থ নৈতিকতা

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম নৈতিক গুণ (সমূহ)। আমাদের উস্তাদ ও তাঁর যুগের বিশেষজ্ঞ আলিম মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (র.)-র গবেষণা মতে, পবিত্র কুরআনের যত স্থানে 'হিকমত' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিকতা। ولقد اتينا لقمان الحكمة। "আমি অবশ্যই লুকমানকে হিকমত দান করেছিলাম।" এ আয়াতের পরবর্তীতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ শুধু নৈতিকতা ও চরিত্র বিষয়ক। হিকমত শব্দের উল্লেখের পরে বিবৃত প্রকরণসমূহ চরিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়। অনুরূপ সূরা "ইসরাতে" চারিত্রিক বিষয়সমূহের বিবরণ দেয়ার পর ইরশাদ হয়েছে ঃ ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة "(হে নবী!) এসব হচ্ছে আপনার কাছে ওহীকৃত মহাজ্ঞান।" এখানেও উত্তম চারিত্রিক বিষয়াবলীর পরে 'হিকমত' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই হিকমত মানে আখলাক, চরিত্র, উত্তম নৈতিক গুণাবলী।

## তাযকিয়া ব্যতিরেকে কিতাব ও হিকমতের তা'লীম অসম্পূর্ণ

আয়াতে বর্ণিত পরবর্তী বিষয় হচ্ছে 'তায্‌কিয়া' (পবিত্রকরণ ও সংশোধন)। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুৎসিত অভ্যাস, কলুষতা ও মন্দ চরিত্রগুলো বিদূরিত করা। হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, দুনিয়ার মহব্বত ও মর্যাদার মোহ দূর করে দিয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত, আখিরাত ও জান্নাতের বাসনা অন্তরে বদ্ধমূল করা। যে কোন জামেআ বা দারু'ল-'উলূম হোক, তার লক্ষ্য হবে এমন শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা যাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন তিলাওয়াত, কিতাব ও হিকমতের তা'লীম ও তাযকিয়ার। তাযকিয়া ব্যতীত অন্যগুলো অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। আমাদের 'আলিম সমাজ

প্রবৃত্তির গোলামী থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন তাঁদের কর্তব্য হবে এ দিকে লক্ষ্য রাখা, সম্পদ ও মর্যাদার যে কোন বিশাল ও বিপুল পরিমাণও যেন তাদের বিচ্যুত না করতে পারে তাঁদের নীতিবোধ, তাঁদের জাতীয় কর্তব্য, তাঁদের জীবন মান ও জীবনের বিশেষ লক্ষ্য থেকে। আরব-আজমে অভাব নেই আজ কোন কিছুর। অভাব যদি থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে কৃচ্ছ্রপূর্ণ ও অল্পে তুষ্টির জীবন যাপনের। মানুষ যে জিনিসের অভাবী তা যেখানে পাওয়া যাবে সেদিকে সে আকৃষ্ট হবে–এটাই বিধান। আমি অভাবী হলে অন্যের প্রাচুর্যে প্রভাবিত হব। কিন্তু আমার প্রয়োজনীয় বস্তু যদি আমার হাতে থাকে (তাতে উনিশ-বিশের ব্যবধান থাকুক না কেন), তাহলে আমি মাথা নত করব না কোথাও, মার খাব না কারো হাতে। আজকের বস্তুবাদপীড়িত লোকেরা আলিমদের কাছে আসে, কিন্তু সেখানে তারা হতাশ হয়। কোন ব্যবধান দেখতে পায় না। আলিমদের ব্যক্তি জীবন, ঘর-সংসার, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দেখে, জীবন যাপনের জাঁকজমক দেখে তারা প্রভাবিত হয় না, বরং বেড়ে যায় তাদের কুধারণা।

পাকিস্তানে আজ তৈরি হোক এমন 'আলিম সমাজ যারা বাস্তব বিচারে হবেন ঃ يتلوا اياته - এর বাস্তব দৃষ্টান্ত, নববী সীরাতের বাহক। হাদীস পাকে রয়েছে ঃ ان الا نبياء لم يؤريوا دينارا ولا درهما ঃ নবীগণ দীনার, দিরহাম (স্বর্ণ, মুদ্রা-রৌপ্য-মুদ্রা) মীরাছরূপে রেখে যান নি। তাঁরা রেখে গিয়েছেন দ্বীনের এই মহান 'ইল্ম ভাণ্ডার। এ যুগের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভোগবাদ, বস্তুবাদ আর তার জওয়াব হচ্ছে ভোগ ও বস্তু থেকে ঊর্ধ্বে, উন্নত ক্ষেত্রে অবস্থান করে এ কথার প্রমাণ পেশ করা, বস্তু আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না, আমরা হতে পারি না তার গোলাম। আমি কখনো একথা বলছি না, উত্তম পবিত্র জিনিষগুলো আমরা বর্জন করব, নিজেদের জন্য তা হারাম ঘোষণা করব। কারণ আয়াতে রয়েছে ঃ قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق। "জিজ্ঞাসা করুন কে হারাম করল আল্লাহ্‌র দেয়া সৌন্দর্য (উত্তম পোশাক)-সমূহ, যা তিনি উৎপাদন করেছেন তাঁর বান্দাদের জন্য এবং কে নিষিদ্ধ করল উত্তম খাবারগুলো?" খোদ নবী 'আলায়হি'স-সালামকে সতর্ক করা হচ্ছে ঃ يايها النبى لم تحرم ما احل الله لك " হে নবী! কেন হারাম করছেন তা, যা আল্লাহ্ হালাল করে দিয়েছেন আপনার জন্য?" হযরত (সা.)-কেই যখন এমন বলা হলো তাহলে আমরা কোন্ হিসাবের খাতায় রয়েছি? বৈধ বিষয়বস্তু তথা আল্লাহ্‌র নিয়ামত আমরা পুরোপুরি ভোগ করব। সুস্বাদু খাবারের তাওফীক থাকলে ইচ্ছাকৃতভাবে তা বিস্বাদ করতে যাব কেন? কোন কোন অতি দরবেশ

সম্পর্কে শুনেছি, বিস্বাদ করার জন্য (প্রতিবেশীকে কোন হাদিয়া পাঠাবার জন্য নয়) তরকারিতে পানি ঢেলে দিতেন, কেউবা মোটেই দিতেন না। উদ্দেশ্য, বিস্বাদ করা। এসব ইসলাম নির্দেশিত তায্‌কিয়া' নয়, শরীয়ত দেয়নি এ ধরনের কর্মের প্রেরণা। মধ্যম ধরনের সুস্বাদু খাবার পেলে আপনি অবশ্য আল্লাহ্‌র শোক্‌র আদায় করবেন প্রতি গ্রাসে গ্রাসে। পরিমিত ভোগের অনুমতি রয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, هل من مزيد "আরো চাই, আরো চাই" স্লোগান যেন জঠর থেকে না ওঠে। এমন তীব্র লালসা না হয় যে, সম্পদ ও মর্যাদার কোনও পরিমাণ তা দমাতে পারে না, লালসা ও কামনাকে করতে পারে না শান্ত। আলিম সমাজকে হতে হবে এমন কলুষতা থেকে পবিত্র।

**প্রয়োজন ক'জন দরবেশ প্রকৃতির মনীষীর**

আজ পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য যে সব বিষয়ের প্রয়োজন, যার কথা আমি আলোচনা করে আসছি করাচী ইসলামাবাদ থেকে এই ফয়সালাবাদ পর্যন্ত—সেগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও একটি বড় শক্তি হলো আলিম সমাজের আড়ম্বরবিহীন, অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ জীবন। তাঁরা পেশ করবেন এমন জীবনের দৃষ্টান্ত, যাতে প্রতিবিম্বিত হবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য, প্রমাণিত হবে, তাঁরা "ওয়ারাছাতুল-আম্বিয়া"—নবীগণের উত্তরসুরি ও স্থলাভিষিক্ত। তাঁরা বস্তুবাদের বলি নন, বস্তুবাদ তাঁদের ঘায়েল করতে পারেনি। যাঁদের সান্নিধ্যে প্রকাশ পাবে পৃথিবীর কৃত্রিমতা কিংবা "বস্তু ও সম্পদই সব কিছু নয়" অন্তত এ সত্য তাঁদের নীতি হবে। প্রয়োজন থাকলে কেউ আসতে পারে এখানে শতবার, আমরা যাচ্ছি না কারো দুয়ারে। যদি যাই কখনো তবে তা হবে দ্বীনের দা'ওয়াত, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়-অসত্যের নিষেধাজ্ঞা পৌঁছাবার জন্য, কোন ফরয কিংবা সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন উদ্দেশে, ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধি কিংবা সুপারিশ করার উদ্দেশে নয়। এ শূন্যতা পূরণ করতে পারে না অন্য কিছু। পাকিস্তানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এটাই। কেননা এ শূন্যতা অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করা যাবে না। রচনা ও সংকলন, বক্তৃতা ও ভাষণ তথা লেখনী ও বাগ্মিতা ও গবেষণা ও রাজনীতি কোন কিছুই এর স্থান দখল করতে পারে না। এমন কতক লোক তো থাকা দরকার, যাঁদের কাছে ধরনা দেবে শক্তিধর ও ক্ষমতাসীনরা, রাজনীতিক ও দেশনায়কেরা এবং সেখানে পাবে তাদের বেদনার উপশম, তারা অনুভব করবে আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাদের যথার্থতা এবং নিজেদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা। একবার আমি বলেছিলাম, 'তাযকিয়া' ও 'ইহ্‌সান' (সংশোধন ও সদাচার) আপনাদের দৃষ্টিতে যদি অপ্রয়োজনীয় হয়, তাহলে স্থলবর্তী কার্যক্রম কিছু

আবিষ্কার করুন অর্থাৎ এমন কিছু যেখানে লোকেরা অনুভব করবে তাদের চারিত্রিক দুর্বলতা, মনুষ্যত্বের অবনতি ও আত্মিক রোগ-ব্যাধি। যেখানে উপস্থিত হয়ে মানুষ খুঁজে পাবে এক নতুন শক্তি, নতুন উদ্দীপনা। সে বক্তব্যের সমাপনীতে আমি আবৃত্তি করেছিলাম আরব কবি হুতাইয়ার পংক্তি ঃ

اقلوا عليهم لا ابالا بيكم من النوم

اوسدوا المكان الذى سدوا

"পূর্বসূরীদের ও অনুসরণীয়দের অনেক তিরস্কার ও গালাগালি করেছ। এখন একটু থাম, জিহ্বা নিবৃত্ত কর। যোগ্যতা থাকলে পূর্ণ কর তাদের শূন্য স্থান।"

আপনারা কোন চিকিৎসকের 'আরোগ্য নিকেতন' বন্ধ করে দিচ্ছেন। আল্লাহর দোহাই! তার চেয়ে উন্নত মানের কোন ডাক্তারখানা (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠিত করুন। একটি বন্ধ করে তার স্থলে আর একটি প্রতিষ্ঠিত করবেন না, বরং তার বদলে করবেন মুসাফিরখানা, সরাইখানা কিংবা কুতুবখানা। পাঠাগার প্রতিষ্ঠা উত্তম কাজ, কিন্তু তা স্থলবর্তী হতে পারে না হাসপাতালের। হাসপাতালের বদলে চাই হাসপাতাল, চিকিৎসকের স্থানে চাই অন্য চিকিৎসকই। যুগের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে 'বস্তুবাদ', তার জওয়াব হচ্ছে বাস্তবসম্মত, বিশুদ্ধ সুন্নাহ্সমর্থিত অধ্যাত্মবাদ, তায্কিয়া (সংস্কার), যা হবে শরীয়ত পরিপন্থী কর্ম ও পন্থা থেকে পবিত্র। তাতে এমন কোন কিছু থাকবে না, যার সমর্থন করে না কুরআন ও সুন্নাহ্, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না নববী ও সাহাবী যুগে। এ কাজের বাহকগণ হবেন একদিকে গভীর 'ইল্মসম্পন্ন, অপরদিকে দ্বীনদারিতে অবিচল ও নিষ্ঠাবান। আজ এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের ও আপনাদের এ পথে চলার তৌফিক দিন—ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা 'আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বি'ল-'আলামীন!

الحمد لله نحمده ونستعينه.................. الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب -

# কুরআন অধ্যয়ন ও এর আদবসমূহ

[২৬ শে জুলাই ৭৮ ইং মডেল টাউন, লাহোরের কুরআন একাডেমীর এক বিশেষ জলসায় এ বক্তৃতা দেয়া হয়েছিল। এ জলসায় দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এসেছিলেন চিন্তাশীল কুরআন অধ্যেতাগণ। বিশেষ বক্তব্য ও কুরআন একাডেমীর পরিচিতি পেশ করেন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডক্টর আসরার আহ্‌মদ।]

## পবিত্র কুরআন সর্বক্ষেত্রেই সহায়ক ও সমাধান

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! কিয়ামত পর্যন্ত চলমান আল-কুরআনের মু'জিযাসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সর্বক্ষেত্রে তার সহায়তা ও সমাধান প্রদানের উপযোগিতা। আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে, বক্তৃতার প্রারম্ভে আমি বিষয় নির্ধারণের অস্থিরতা এবং কথা শুরু করার অনিশ্চয়তায় ভুগছিলাম। ইতোমধ্যে কারী সাহেব কোনো আয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন এবং আমার মনে হতে লাগল, শ্রোতাদের শোনার আগে আমারই জন্য এ আয়াতসমূহ চয়ন করা হয়েছে। বিদেশ ভ্রমণেও আমার অভিজ্ঞতা অনুরূপ। সারা দিনের ব্যস্ততা ও বিভিন্ন প্রোগ্রামের কারণে বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবনা করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। অনুষ্ঠানে পৌঁছে কোথাও নির্ধারিত বিষয়ের ওপরে আলোচনা করতে হতো, কোথাও বা অনির্ধারিত (মুক্ত) বিষয়ে। আমি বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে রাখতাম এই ভরসায়, তিনি যথাসময়ে উপায় করে দেবেন। যেহেতু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের ভাষায় তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিষয়কে বলা হয় 'ওয়ারিদ'–(আগন্তুক বা স্বাগত) সম্মানিত মেহমান যিনি নিজের ইচ্ছায় এসেছেন, মেযবানের ইচ্ছা বা নির্বাচন যেখানে কার্যকরী নয়। আজকের ব্যাপারও ছিল অভিন্ন। আল্লাহ্‌ পাক আজকের মজলিসের কারী সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, যিনি এ আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন। আমি পথ পেয়ে গেলাম। আয়াতসমূহের তাফসীর সম্পর্কে ও আমার আসল শ্রোতা কুরআন পাকের তালিব 'ইল্‌মদের কাছে কিছু অভিজ্ঞতা ও পরামর্শের কথা পেশ করার আগে আমি আমার নগণ্য ব্যক্তিপরিচিতি ও আমার ইল্‌মী সফর সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করতে চাই।

পবিত্র কুরআনে দাওয়াতের হিকমত

ডক্টর সাহেব বেশ আড়ম্বরের সাথে আমার পরিচিতি পেশ করেছেন। কিন্তু আরো কিছুটা পরিচয় পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করছি এবং হযরত ইউসুফ 'আলায়হি'স-সালামের সুন্নত অনুসরণ করে নিজেই আনজাম দিচ্ছি সে কর্তব্য। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে আসা লোকদের হযরত ইউসূফ (আ.) বলেছিলেন, ذالكما مما علمني "স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাকে শেখানো বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত।" তাঁর এ আত্মপরিচিতি প্রদানের কারণ কি ছিল? শ্রোতা কিংবা প্রশ্নকর্তার মনে সর্বাগ্রে এ নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে হবে, তাদের সম্মুখস্থ ব্যক্তি দ্বারা সহায়তা লাভ করা যেতে পারে। ব্যক্তি নির্বাচনে তারা ভ্রান্তির শিকার হয়নি। তাই তিনি বলেছিলেন, স্বপ্ন ব্যাখ্যা আমার প্রতিপালক প্রদত্ত জ্ঞান। কেননা

اِنِّیْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ ۔

"আমি বর্জন করেছি এমন সব লোকের মাযহাব যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ্‌র একত্ববাদে এবং অস্বীকার করে আখিরাতকে।" [সূরা ইউসূফ]

এ ছিল একজন নবীর কথা, "তোমাদের পরবর্তী খাদ্য গ্রহণ সময়ের আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেশ করছি।" এতে ছিল কিঞ্চিত আত্মস্তুতির প্রকাশ। সম্ভাব্য সে ধারণা খণ্ডন করার উদ্দেশে সাথে সাথে তিনি বললেন ঃ ذالكما مما علمني ربي "ঐ বিষয়টি আমার জন্য আমার প্রতিপালকপ্রদত্ত 'ইল্‌ম।" অর্থাৎ তোমাদের সমস্যা সমাধানে আমি তোমাদের সহায়তা করতে পারছি। কেননা আল্লাহ্ আমাকে সে 'ইল্‌ম দান করেছেন। কিন্তু কেন দান করলেন তিনি? কেননা انى تركت ملة قوم আমি বর্জন করেছি অর্থাৎ তা আমার মেধা কিংবা অভিজ্ঞতার ফসল নয় (অথচ তাঁর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল এ উভয় গুণ), বরং এ "ইল্‌ম লব্ধ হয়েছে এ কারণে, আমি বর্জন করেছি আল্লাহ্ ও আখিরাতে অবিশ্বাসী জাতিকে" আর সেই সাথে واتبعت ملة ابائى ابراهيم واسحاق ويعقوب "আমি অনুসরণ করেছি আমার পূর্বসূরী ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের মাযহাব।" এভাবে তিনি অবকাশ সৃষ্টি করেছিলেন তওহীদের ওযর পেশ করার। প্রিয় ভাইয়েরা! যে বিষয়টি তোমাদের কাছে সুকঠিন এবং যে ভারি বিষয়টি নিয়ে তোমাদের আগমন, আমাদের সবার সামনে রয়েছে তার তুলনায় কঠিনতর সমস্যা। তা হচ্ছে আকীদা ও মৌল বিশ্বাসের সমস্যা। তোমরা যে স্বপ্ন দেখেছ (আর স্বপ্ন অবশেষে স্বপ্নই) সে তো ঘুমের জগতের ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সজাগ পৃথিবীর, সমস্যা হচ্ছে ভবিষ্যত জীবন, স্থায়ী ও চিরন্তন জীবনের।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারে এমন একটি লোক যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে তা কোন মারাত্মক ক্ষতির কারণ নয়। কিন্তু এ বাস্তব স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারে এমন কাউকে পাওয়া গেল না, হদিস দিতে পারল না কেউ, পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি? পরিচয় দিল না কেউ বিশ্বস্রষ্টার। মূল বিপদাশংকা রয়েছে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ না করার ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি এই সংক্ষিপ্ত ডোজ (Dose) দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন। কেননা তিনি বুঝতেন, আগন্তুকরা এসেছে পেরেশান হয়ে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, দু'চার ঘন্টার লম্বা ওয়াজ শোনার ধৈর্য তাদের হবে না। তাই তিনি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্মপ্রচারক ও সংস্কারকের ন্যায় যথার্থ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়ে ডোজ ততটুকই দিয়েছেন যা ছিল তাদের সহনশীলতার পরিধিভুক্ত।

### কখনো কখনো মনের দুয়ার খুলে যায়

লক্ষ্য করুন পরিমিতি বোধের দিকে, তাতে পরিপূর্ণ পরিস্ফুটিত রয়েছে 'ইউসুফী সৌন্দর্যবোধ'। অল্প ও অধিকের মাঝে পরিমাপ ঠিক রেখে তিনি যথাস্থানে থেমে গিয়েছেন অর্থাৎ তাওহীদের মূল কথাটি বলে দিলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ করলেন না যাতে লোকেরা বিরক্ত হয়ে বলে ফেলে, "জনাব! আপনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন তো দিন, অন্যথায় আমরা অবসর সময়ে আসব।" হযরত ইউসুফ (আ.) দেখলেন, তাদের মন ও মস্তিষ্কের দরজা খোলা রয়েছে আর মনের দুয়ার খুলে মাঝে মধ্যে, যখন ভাগ্য হয় সুপ্রসন্ন, মনের দরজা উন্মুক্ত হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে, কোন দুশ্চিন্তার সময়ে, এমন সুবর্ণ সুযোগে উন্মুক্ত দরজা পথে পৌঁছে দিতে হয় মূল পয়গাম। তবে তা করতে হবে দ্রুততর কৌশলের সাথে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই এবং 'প্রত্যাখ্যানে' বন্ধ হওয়ার পূর্বেই। বিষয়টি উপলব্ধি করে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই। সেই সাথে আমার আক্ষেপ যে, বাইবেলে এ অংশটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। আর এতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, বাইবেল কার রচনা আর কুরআন কে অবতীর্ণ করেছেন?

হযরত ইউসুফ (আ.) ভালভাবেই জানতেন, তাঁর শ্রোতারা কতটুকু সহ্য করতে পারবে? তিনি ততটুকুই বলেছিলেন। রোগী চায় দ্রুত তার রোগের প্রতিকার। এজন্যই তিনি আশ্বাস-বাণী শোনালেন ঃ قبل ان يأتيكما অর্থাৎ তোমাদের দু'জনের বরাদ্দ রেশন পাওয়ার সময়ের পূর্বেই ব্যাখ্যা দিচ্ছি। চিকিৎসকের কাছে আগন্তক রোগী নিশ্চয়তা চায় দু'টি বিষয়ে–ওষুধ পাওয়া যাবে কিনা এবং তা দ্রুত পাওয়া যাবে কি না? মাঝে তিনি পেশ করলেন তওহীদের পয়গাম।

**কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে 'ইল্‌মী জীবনের সূচনা**

এখন আমি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় পেশ করা উপযোগী মনে করছি। আমি পবিত্র কুরআনের একজন অতি নগণ্য ও তুচ্ছ তালিব 'ইল্‌ম। আমার 'ইল্‌মী জীবন শুরু হয়েছে কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে। আমি কয়েক স্থানে লিখেছি, আল্লাহ্ আমাকে তাওফীক দিয়েছিলেন এমন একজন উস্‌তাদের সান্নিধ্যে আসার, যিনি ঈমানী ও কুরআনী রুচির অধিকারী।[১] তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর কাঁদতে থাকতেন। আমার মনে প্রথম রেখা অংকিত হয়েছিল তাঁর বেদনাভরা উচ্চারণের। তাই ছিল আমার সৌভাগ্য, এটাই পবিত্র কুরআনের মূল স্বভাব।

**পবিত্র কুরআনের স্বভাব হচ্ছে 'সিদ্দীকী'**

কুরআন শরীফ 'সিদ্দীকী' স্বভাবের বিষয়।[২] হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পূর্বে তাঁর মুসল্লায় দাঁড়িয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) সিদ্দীক (রা.)-কে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দেয়া হলো। হযরত 'আয়েশা (রা.) 'আরয করলেন, আবূ বকরকে রেহাই দেয়া হোক। তিনি 'অতি ক্রন্দনশীল' মানুষ। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করলে প্রবল কান্না তাঁর তিলাওয়াত থামিয়ে দেবে। মুক্তাদীরা শুনতে পাবে না। মুশরিকদেরও অভিযোগ ছিল অভিন্ন। হযরত আবূ বকর (রা.)-কে তাঁর বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হলে তিনি তাঁর বাড়ীর সম্মুখভাগে একখানা মসজিদ বানালেন। নীরবে নামায পড়া পর্যন্ত কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু শব্দ করে তিলাওয়াত শুরু করলে সেখানে ভিড় জমে যেত শিশু ও নারী-পুরুষের। তাঁর মর্মবেদনাপূর্ণ তিলাওয়াতে পাথরও গলে যেত। শ্রোতাদের মনে তা এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত যার ফলে কুরায়শদের দুশ্চিন্তা হলো মক্কায় কোন বিপ্লব ঘটে যাওয়ার। তারা ভাবনায় পড়ল পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়!

মূলত কুরআনের স্বভাবই হচ্ছে দিলের দরদ লাগিয়ে ঈমানী আস্বাদনের সাথে তিলাওয়াত করা। হাদীস শরীফে রয়েছে ঃ

الايمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانيه ـ

ঈমান হচ্ছে য়ামানের, ফিকাহ্ য়ামানের আর হিকমতও য়ামানী।

---

১. শায়খ খলীল ইবন মুহাম্মদ ইয়ামানী (র.)।

২. দ্বিধাহীন ও প্রশ্নবিহীন চিত্তে যাঁরা নবীকে সত্যবাদী মেনে নেন তাঁদের বলা হয় 'সিদ্দীক' অর্থাৎ নির্দ্বিধ সত্যগ্রাহী। এঁদের স্বভাব হলো সিদ্দীকী স্বভাব।

আমার সৌভাগ্য, আমার প্রথম মু'আল্লিম ছিলেন কোমল হৃদয়, দরদে ভরা মনের অধিকারী। আমাদের আক্ষেপ হতো যখন তিনি তিলাওয়াত করতেন, তিনি তিলাওয়াত করতে থাকুন আর আমরা শুনতে থাকি। তিনি আমাদের মহল্লার মসজিদে ফজরের নামাযে ইমামতি করতেন। খুব কমই তিনি পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করতে পারতেন। তিলাওয়াত শুরু করার পরই প্রবল বেগে কান্না চেপে আসত, আওয়াজ ডুবে যেত। রোজই এমন হতো। তিনিই আমাকে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি সূরা পড়িয়েছেন। শুরু করেছিলেন তওহীদের আলোচনাসম্বলিত সূরাসমূহ দিয়ে। প্রথম সূরা ছিল 'যুমার'। পরবর্তী সময়ে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়ার চাপ সৃষ্টি হলে তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু পবিত্র কুরআনের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। এর রুচিবোধ আমাকে প্রভাবিত করত।

শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হলে আমার কুরআন অধ্যয়নের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেল। মাদ্রাসা নিসাবের তালিকাবহির্ভূত অনেক কিতাব পড়লাম। এই লাহোরে এসে পুরো কুরআন পড়লাম মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র.)-এর কাছে। এখানেও পেলাম তাঁর কুরআনী জীবন তাঁকে বলা হতো "চলমান কুরআন"। অন্তরে অনুভূত হতো তাতে এই অনাবিল পরিচ্ছন্নতা। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাঁর আড়ম্বরহীনতা, দরবেশসুলভ জীবন যাপন এবং তাঁর সুন্নতের আমল আমাকে এমন প্রভাবিত করেছে যাকে ব্যক্ত করা হয় 'বরকত' শব্দ দিয়ে। কিছুদিন দারু'ল-'উলুম দেওবন্দেও কুরআন শেখার সুযোগ হয়েছে। মাওলানা সাইয়েদ হুসায়ন আহমদ মাদানী (র.)-র খেদমতে আরয করলাম, আমাকে একটু সময় দিন যাতে পবিত্র কুরআনের কঠিন আয়াতসমূহ যা প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থে আমি আত্মস্থ করতে পারিনি তা আপনার খেদমতে পেশ করে বুঝে নিতে পারি। মাওলানা ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলিমগণের অন্যতম। বিভিন্ন বিষয় ও হাদীস (তিনি ছিলেন যার স্বীকৃত উস্তাদ ও শায়খুল হাদীস) ছাড়াও কুরআন শরীফে তাঁর ছিল গভীর প্রজ্ঞা। তাঁর জীবন ও স্বভাব ছিল কুরআনী রঙে রঙিন। তিনি আমাকে সময় দিয়েছিলেন শুক্রবারে। আমার মনে পড়ে, কঠিন আয়াতগুলো আগে থেকে খুঁজে বের করে যথাসময়ে তাঁর সামনে পেশ করতাম। তাঁকে খুব বেশী সফর করতে হতো। সময়টি ছিল খিলাফত আন্দোলনের। তবুও আমি সুযোগ পেয়েছিলাম তাঁর নিকট থেকে কিছু 'ইলম হাসিল করার।

### মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর কুরআন প্রজ্ঞা

নিকট অতীতের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (র.)-এর তাফসীর ও বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে তাঁর সারগর্ভ আলোচনা শোনার

অবকাশ আমার হয়েছে। আমি তো কুরআন অনুধাবনে কারো জ্ঞান, গভীরতা তাঁর সাথে তুলনীয় পাইনি। আমার এ দাবী একটা ঐতিহাসিক সত্য। কেননা লোকেরা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীকে মনে করে ইতিহাসবেত্তা কিংবা চরিত-রচয়িতা কিংবা কালামশাস্ত্রবিদ।[১] কিন্তু আমার মতে কুরআনের উপলব্ধিতে তাঁর স্তর এত উঁচুতে যে, কুরআন অধ্যয়নের প্রসারতা ও গভীরতায় গোটা উপমহাদেশে কেউ তাঁর স্তরে উপনীত হতে পারেন নি। তাঁর এ সুগভীর প্রজ্ঞার মূলে ছিল আরবী ভাষা, সাহিত্য, বালাগাত ও ই'জায (অলংকরণ ও বর্ণনাশৈলীতে কুরআনের সর্বকালীন চ্যালেঞ্জের উর্ধ্বে অবস্থান ও সর্বব্যাপী শ্রেষ্ঠত্ব) বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। তা ছাড়া তিনি মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী (র.) যিনি ছিলেন এ বিষয়ে ইমাম ও বিশেষজ্ঞের সান্নিধ্যে, তাঁর আলাপচারিতা তাঁর গবেষণা ও কুরআন অধ্যয়নের নির্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আমার আজও মনে পড়ে, একবার দারু'ল-মুসান্নিফীনে (আজমগড়) আমরা সূরা জুমু'আর ওপর তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। এমন পাণ্ডিত্যসুলভ গবেষণা ও সূক্ষ্ম আলোচনাসমৃদ্ধ বক্তৃতা আর কখনো শুনিনি। হায়, তা যদি সংরক্ষিত হয়ে থাকত! মোটকথা, এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আমি কুরআন অধ্যয়নে উপকৃত হয়েছি।

তারপর আসে দারুল-উলুম নাদওয়াতুল-উলামায় (শিক্ষাঙ্গনে) আমার উস্তাদরূপে কুরআন অধ্যয়নের পালা। সেখানে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল আমাকে। প্রসংগত উল্লেখ্য, নদওয়াতু'ল-উলামা'য় কুরআন শিক্ষা দু'টি স্তরে বিভক্ত। প্রথমত, তাফসীরবিহীন মূল কুরআনের ভাষ্য পড়ানো হয় (সম্ভবত এ পদ্ধতির উদ্ভাবক নদওয়াতু'ল-উলামা'ই, অন্যরা পরে এর অনুসরণ করেছেন)। তাফসীরবিহীন আল-কুরআন ছাত্র-শিক্ষকের সামনে থাকে। শিক্ষক তাঁর অধ্যয়নের আলোকে ভাবার্থ পেশ করেন (এতে সরাসরি কুরআনী মহাজ্ঞান আহরণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়)। অনেক বছর এ পদ্ধতিতে কুরআনের খেদমত করার তওফীক আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছিলেন। তাফসীর পড়াবার অবকাশও হয়েছে। তবে মূল কুরআনই আমার দায়িত্বে ছিল অধিক সময় আর আমার দায়িত্বে অর্পিত অংশ ছিল অধিক তাফসীরসম্বলিত। এসব কথার অবতারণা করে আত্মপরিচয় দানের উদ্দেশ্য মাত্র একটাই আর তা হলো, অধম পবিত্র কুরআনের এক নগণ্য খাদিম, একথা আপনাদের অন্তর্লোকে গেঁথে দেয়া। আমার পরবর্তী জীবনে যা কিছু (ভাঙা-চোরা) কাজ করেছি তার সবই মহান আল-কুরআনের অবদান।

১. ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের আলোচক শাস্ত্র হলো ইলমু'ল-কালাম'।

(কবিতা) যা কিছু করেছ তা আল-কুরআনেরই দান।

আমার লেখা নগণ্য নিবন্ধাদি ও বই-পুস্তক যাঁরা পড়ে দেখেছেন তাঁরা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন, আমার লেখার মাল-মসলা, তত্ত্ব ও বুনন সবই আল-কুরআন থেকে আহরিত। সর্বাধিক ধার করেছি আমি আল-কুরআন থেকে, অতঃপর সাহায্য নিয়েছি ইতিহাসের। অবশ্য আমি ইতিহাসকে মনে করি আল-কুরআনের বিশ্বজোড়া ব্যাখ্যা।

**'ইজতিবা' সীমিত, হিদায়াত ব্যাপক**

পঠিত আয়াতে দু'টি বিষয় বিবৃত হয়েছে ঃ 'ইজতিবা' স্তর, দুই ঃ হিদায়াত স্তর। 'ইজতিবা' অর্থ মনোনয়ন, নির্বাচন ও বাছাইকরণ। এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাকের বিধান হলো নিযুক্তকরণ।

الله يجتبي اليه من يشاء। "আল্লাহ্ যাকে মর্যী করেন তাকেই বাছাই করে নেন।" এটা আল্লাহ্র একান্ত অধিকার, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বেছে নিয়ে মনোনীত করে 'ইজতিবা' মর্যাদায় ভূষিত করেন।

কিন্তু হিদায়াত সার্বজনীন প্রয়োজনীয় বিষয়, তাই তা ব্যাপকতর এবং তাই তার বিধান হলো ويهدى اليه من ينيب 'যারাই ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়, হিদায়াত অন্বেষী হয়, নিজেকে অক্ষম, নগণ্য ভেবে বিনয় ও আগ্রহের সাথে যারা অগ্রগামী হয় আর আপনাকে করে দেয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আল্লাহ্ পাক তাদের লাগিয়ে দেন পথ-পরিক্রমায়, পৌঁছে দেন শেষ মনযিলে। কিন্তু তাঁর জন্যে মূল শর্ত থাকে 'ইনাবাত' গুণে গুণান্বিত হয়ে আপনাকে নীচু করে মহান সত্তার পানে ধাবিত হওয়া। এ কথাটিই বিবৃত হয়েছে আয়াতে, যারা আকৃষ্ট ও ধাবিত হয় তাদের তিনি হিদায়াত দেন, পথ দেখান আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার। আমার আলোচনাও আজ এ বিষয়ে।

পবিত্র কুরআনের রয়েছে দুটি সম্পূরক ধারা ঃ প্রথমটি হলো তার তা'লীম ও তাবলীগ অর্থাৎ সে সব আকীদা ও মৌল বিশ্বাসের আলোচনা যা অনুধাবন করা ও যার প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। আর তা আহরণ করতে হবে সরাসরি আল-কুরআন থেকে। কেননা এ বিষয়ে আল-কুরআনের দাবী হলো– بلسان عربى مبين (সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়), বরং আরও সুস্পষ্ট দাবী করে ঘোষিত হয়েছে ঃ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر "কুরআনকে অবশ্যই আমি সহজ ও প্রাঞ্জল করে দিয়েছি অধ্যয়ন-উপদেশ আহরণে; কেউ কি আছে উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী?"

## আল-কুরআন পাঠ করে কোন মানুষ মুশরিক হতে পারে না

কারো যদি একথা জানার আগ্রহ হয়, তার স্রষ্টা আল্লাহ্ তার কাছে কী দাবী করেন? তাঁর হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বশর্ত কী কী? কুরআনে বিবৃত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের রূপরেখা কী কী? পৃথিবীতে হিদায়াত ও আখিরাতে নাজাত লাভের রহস্য কিসে নিহিত? এসব প্রশ্নের সমাধানে আল-কুরআনের বর্ণনা সাবলীল ও প্রাঞ্জল। 'কুরআন থেকে এ বিষয়গুলো বুঝতে পারছি না, কাজেই কুরআন আমাদের জন্য দলীল নয়।' এ অভিযোগ উত্থাপনের কিংবা অপারকতা প্রকাশের অবকাশ দেয়া হবে না কাউকে।

তাওহীদ ও একত্ববাদ বিবৃত হয়েছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতম, সবলতম ও উজ্জ্বলতম ভাষ্যে। দু'কথায় কোন বিষয় বুঝিয়ে দেয়ার মতই বিষয়টি আল-কুরআনে বিদ্যমান। কাজেই কুরআন পড়ে আর যা-ই হোক, কেউ মুশরিক থেকে যাবে—এমন হতে পারে না। আমি সর্বজনীন ঘোষণা দিচ্ছি, কুরআন অধ্যয়নকারীরা ঠোকর খেতে পারে, বে'আমল হতে পারে, ফাসিক ফাজির হতে পারে, কিন্তু একত্ববাদ ও অংশীবাদ, তাওহীদ ও শিরক্ বিষয়ে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তাওহীদ বর্ণনায় তো আল্-কুরআন দিবা সূর্য, না, বরং তার চাইতে সমধিক উজ্জ্বল। অনুরূপ রিসালাতের 'আকীদা। নবুওয়ত কিসের নাম? নবীগণের পরিচয় কী? তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ছিল? কী করার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হতেন? তাঁদের দেয়া শিক্ষা কী ছিল? তাঁদের জীবন-চরিত কেমন সুমহান ও সুপবিত্র হতো? এসবের বর্ণনায়ও আল-কুরআন উজ্জ্বলতম গ্রন্থ। সুস্পষ্ট বর্ণনায় রয়েছে নবীগণের আত্মপরিচিতি এবং সাথে সাথে উত্থাপিত ও উত্থাপনকৃত মন্তব্য ও প্রশ্নসমূহের জওয়াব। পড়ুন সূরা আ'রাফ, সূরা হুদ, সূরা শু'আরা'। এসব সূরার নাম নিয়ে নিয়ে নবীদের পরিচিতি ও তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

আল-কুরআনে রিসালাত ও নবী-রাসূলগণের আলোচনায় কোন ভ্রান্ত উপলব্ধির অবকাশ নেই। তবে একথা স্বতন্ত্র, কেউ যদি গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির জোরে কত কিছুই না করা যায়! উপস্থিত সুধীবৃন্দের মাঝে এমন কোন তীক্ষ্ণধী বাকপটু থাকতে পারেন, যিনি এই রাতের বেলা দাঁড়িয়ে জোর গলায় দাবী করবেন, এখন তো রাত নয়, দিন চলছে এবং তা রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর, এই তো সূর্য কিরণের তাপ ও দাহ অনুভূত হচ্ছে! হতে পারে, তিনি ক্ষুরধার যুক্তি ও গলার জোরে তার দাবী প্রমাণ করে দেবেন, আমাদের সবাইকে করে দেবেন বোকা ও লা-জওয়াব। এটা

হচ্ছে গলাবাজি ও বুদ্ধির খেলা। আদালতগুলোতে মামলা-মোকদ্দমায় এই ঘটে থাকে। দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানিয়ে উকীলরা মামলায় জিতে যান। আমাদের উস্‌তাদ মাওলানা 'আবদুল বারী নদভী বলতেন, "বুদ্ধি বিচারক (জজ) নয়, তা উকীল মাত্র, ফিস্‌ পেয়ে গেলে সে দাবী প্রমাণ করে, যে কোন মামলা জিতিয়ে দিতে পারে। এজন্য পৃথিবীতে উদ্ভাবিত নতুন নতুন দর্শনকে—বুদ্ধি তার ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে এমনভাবে পেশ করেছে যে, যেন তা সর্বজনস্বীকৃত নিরেট বাস্তব! কাজেই কেউ যদি স্থির করে বসে, কুরআন থেকে ভ্রান্ত দাবী প্রমাণিত করবে, তাহলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। একটা দৃষ্টান্ত নিন, ইসলামিক স্টাডিজ কনফারেন্স হচ্ছিল। স্থান ও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করছি না। জনৈক প্রবন্ধ পাঠক তার প্রবন্ধে একথা দাবী করলেন, পবিত্র কুরআনে যতবার 'সালাত' (নামায) শব্দ উল্লিখিত হয়েছে তার অভিন্ন অর্থ হলো 'আঞ্চলিক সরকার'। 'আর আস্‌-সালাতুল-উস্‌তা' (আসরের নামায) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি যুক্তি দ্বারা তার দাবী প্রমাণে সচেষ্ট হলেন। অবশেষে কঠোর ভাষায় আমাকে তা খণ্ডন করতে হলো।

মহাজ্ঞানের চিরন্তন ভাণ্ডার; হিদায়াত প্রদানে সহজ আল-কুরআন

হিদায়াত লাভ ও পথ প্রদর্শনে আল্‌-কুরআনের সহজ হওয়া সন্দেহাতীত, কিন্তু তার অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার, তার সমুন্নত ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়মালা, সে সম্পর্কে কারো দাবী, সব কিছু বুঝেছি কিংবা এ অহমিকা, 'আমি যা বুঝেছি তাই ঠিক আর সব বাতিল'—এ দাবী অশ্রাব্য ও বাতুলতামাত্র। পবিত্র কুরআনের কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র, একাকী ভিন্নমত পোষণ করা ভয়াবহ ব্যাপার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বাণী ঃ

ای سماء تظلنی وای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم۔

"ইয়া আল্লাহ্‌! পবিত্র কুরআনের কোন বিষয় সম্পর্কে ভিত্তিহীন কোন বাজে উক্তি করলে আমাকে ছায়া দেবে কোন্‌ আসমান? বহন করবে কোন্‌ যমীন?"

কুরআন বিষয়ে সাহাবীগণের মন্তব্য ও আচরণ ছিল অনুরূপই। হযরত ওমর (রা.) কোন শব্দ সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসা করতেন ঃ এ শব্দের অর্থ কি? আবার নিজেই থমকে গিয়ে বলতেন ঃ ثكلتك امك ياعمر ওমর! মরে যাও! তোমার মায়ের পুত্রশোক হোক! একটা শব্দের অর্থ না জানা থাকলে তোমার বয়ে গেল কি? সাহাবায়ে কিরামের ভাবনা পদ্ধতি থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয়,

তাঁরা সঠিকভাবে কুরআনের মহাজ্ঞান আত্মস্থ করা 'সম্ভব' মনে করতেন না এবং তা জরুরীও ভাবতেন না। মহাত্মাদের ও আল-কুরআন সম্পর্কে আমার এ মন্তব্য ও দুঃসাহস ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করবেন। আমি বলতে চাই, আল-কুরআনের যা আত্মা, যা তার মূল সূর, মূল দাবী ও মুখ্য উদ্দেশ্য তা হাসিল করা অপরিহার্য, আর কুরআনের সাথে আচরণ হতে হবে আদব ও বিনয়ের।

অনেক বিষয় এমন রয়েছে যার তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু তা ঐ সব বিষয় থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভের ব্যাপারে আমাদের জন্য অন্তরায় হয়নি। তাই কেউ যদি কুরআনের হাকীকত, মূল তত্ত্ব, সুনিবিড় ও সুগভীর ভাবার্থ আহরণে অপারক হয়, এমন কি যদি শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থও অজানা থাকে, কিন্তু তার অন্তরে থাকে আল্লাহ্‌র ভয় আর তার আযাব-ভীতি, তার অবস্থা যদি এমন হয় যে, কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায তাকে করে সন্ত্রস্ত ও উদ্বেলিত যার বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক—

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

"পর্বতশৃঙ্গে নাযিল করা হলে এ কুরআন, দেখতে পেতে বিনীত বিচূর্ণ তাঁর (আল্লাহ্‌র) ভয়ে" অর্থাৎ কুরআন শুনে তার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে হয় কম্পিত, তার রন্ধ্রে জাগে স্পন্দন ও প্রকম্পন আর সে বলতে থাকে, এ যে আমার মহান রবের (প্রতিপালকের) কালাম! এ যে আল্লাহ্‌র বাণী! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রায় সুনিশ্চিত এ আশা করা যায়, সে উপনীত হবে হিদায়াতের সর্বশেষ মনযিলে আর সে পেয়ে যাবে কুরআনের সান্নিধ্য। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"এমন কতেক লোকও হবে যারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে এবং তা করবে চরম ভনিতার সাথে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করবে না।" আগে উল্লিখিত হৃদয়বানেরা হবেন এদের থেকে স্বতন্ত্র।

মোটকথা, আল-কুরআনের বিষয়বস্তু ও অর্থ-ভাণ্ডার সম্পর্কে একজন ছাত্র হিসাবে আমি আরয করতে চাই, তা এক অকূল সাগর যার বিশালতা ও প্রসারতা দেখে সকল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বরেণ্য মনীষীই প্রকম্পিত হয়ে উঠেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত হিদায়াত ও তওফীক ব্যতিরেকে কেউ এ পথে এক পা-ও অগ্রগামী হতে পারে না।

সুবুদ্ধি ও জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে

প্রথম কথা ঃ কোন কিছু বুঝে ফেলা ও অনুধাবন করার শক্তি আসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে এ উপলব্ধি হাসিল হয় সে সব বিশিষ্ট বান্দাদের, যাঁদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে আল্লাহ্‌র ভয় ও রব্বানী কালামের প্রভাব, অন্তর সজীব ও পরিপূর্ণ থাকে আল্লাহ্‌র বাণীর প্রভাব মাহাত্ম্যে। এসব অন্তরেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে 'ইল্‌ম ও মহাজ্ঞান।

দ্বিতীয় কথা ঃ নফল নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস করুন। কল্পনা করতে থাকুন যেন হৃদয় মাঝে তা সেই মুহূর্তে অবতীর্ণ হচ্ছে। তার স্বাদ আস্বাদন করতে থাকুন। তাতে বিলীন হয়ে যাওয়ার সাধনা করুন। কুরআন শরীফ মস্তিষ্ক চর্চার ক্ষেত্র নয়, নয় কোন বুদ্ধির ব্যায়ামাগার। তাই সেখান থেকে কসরত করে নিজের পছন্দসই মতলব বের করার অপপ্রয়াস চালানো যেতে পারে না।

তৃতীয় কথা ঃ অধ্যয়নকালে কুরআনের কোন অর্থ বা ভাবার্থ উপলব্ধিতে আসলে তা এভাবে প্রকাশ করুন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ও নগণ্য বুদ্ধিতে এ অর্থ উপলব্ধি আসে। এমন দাবী কক্ষনো করবেন না, আজ পর্যন্ত কুরআন বুঝতে সক্ষম হয়নি কেউ, আজই আমি তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করলাম। এমন দাবী বাগাড়ম্বরমাত্র। একথা আমি বারবার বলেছি। এটা লিখেছি, বিগত তের শত বছর কেউ কুরআন বোঝেনি—এ দাবী পবিত্র কুরআনের বিপক্ষে বিরাট অভিযোগ। কেননা কুরআন তো দাবী করছে ঃ

انا انزلناه قرانا عربيا। প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় بلسان عربى مبين আর আমি নাযিল করেছি সাবলীল আরবী কুরআন যাতে তোমরা لعلكم تعقلون তা হৃদয়ংগম করতে পার। পক্ষান্তরে আপনার দাবী হচ্ছে, হাজার বছর বিগত শতাব্দীগুলোতে কুরআন পাকের অমুক শব্দটির রহস্য কেউ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি (আমিই তা করেছি)। এ দাবীর স্পষ্ট অর্থ হলো এই, যুগ-যুগান্তর ধরে কুরআনের অর্থ অনুধাবনের দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল।

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির এক সেমিনারের সমাপনী (সভাপতির) বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, জ্ঞানসেবী ও গবেষকগণ তাঁদের গবেষণা এ ভূমিকাসহই পেশ করে থাকেন, আমাদের অধ্যয়ন ও গবেষণালব্ধ ফল এই হলো, আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। যে কেউ তার গবেষণার ফলাফল শতকরা এক শ' ভাগ নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে জিদ করে বসবে কিংবা সব ভিন্ন মতকে বাতিল ঘোষণা করে দেবে—এ পদ্ধতি যথার্থ ও স্বীকৃতিযোগ্য নয়।

আল-কুরআন হচ্ছে নিত্য-নতুন ও অক্ষয় সজীবতার অধিকারী। তার অভিনবত্বের কোন সীমা-সরহদ নেই। হযরত নূহ (আ.)-এর মত জীবন লাভ করে তা কুরআন অধ্যয়ন ও তার মর্ম অনুধাবনে ব্যয় করতে থাকলে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অর্থ উদ্‌ঘটিত হবে। আমাদের জীবনের সীমিত সময় ও সীমিত শক্তি ও যোগ্যতা সত্ত্বেও এ দাবী করা যে, ইতোপূর্বে কেউই কুরআন বুঝতে পারি নি—বাতুলতামাত্র।

## আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থ

শেষ ও মৌলিক কথাটি হলো–পবিত্র কুরআনকে একান্ত নিজস্ব কিতাব মনে করতে হবে। এ হচ্ছে চিরন্তন গ্রন্থ, আস্‌মানী কিতাব, কিন্তু সেই সাথে আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থ, হিদায়াতনামা ও পথ-প্রদর্শক। এতে দিক নির্দেশিত হয়েছে আমার দুর্বলতাগুলো, চিহ্নিত হয়েছে আমার রোগসমূহ।

যে কোন মানুষ আল-কুরআনের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিতে পারে আর এ কাজটি করার জন্য পূর্বশর্ত হলো, একে জীবন্ত গ্রন্থ ও একান্ত আপন কিতাব মনে করা। নিজের ভেতরে আত্মশুদ্ধির উদ্দীপনা থাকতে হবে। অপরকে শোধরাবার কাজ পরে করা যাবে; প্রথমে নিজেকে শুধরে নিই। নবীগণের পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে আত্মশুদ্ধি, পরে অন্যদের কিছু বলা। আমরা অনেকে কুরআন অধ্যয়ন করি অপরের সাথে হুজ্জতকারীর হীন উদ্দেশ্য নিয়ে, অন্যকে লজ্জিত করার মনোবৃত্তিতে, অথচ সাহাবায়ে কিরাম কুরআন তিলাওয়াত করতেন আত্মশুদ্ধির নিয়তে। মাত্র এক আয়াত তিলাওয়াত করেই তার ওপর আমল শুরু করে দিতেন। আর এজন্যই শুধু সূরা বাকারা সমাপ্ত করতেও অনেক সাহাবীর কয়েক মাস লেগেছিল।

একজন তালিব 'ইলম হিসাবে মনের কথাগুলো আপনাদের সামনে রেখে দিলাম يهدى اليه من ينيب (যারা আগ্রহ নিয়ে ধাবিত হয় তাদেরই তিনি হিদায়াত দেন)। এ ময়দানে যথাসাধ্য সাধনা করতে থাকি। আল্লাহ্ তাঁর মর্জি মুতাবিক কাউকে ইজতিবা' (মনোনয়ন) স্তরে উপনীত করবেন। সে স্তরের বাধ্যবাধকতা আমাদের জন্য নয়। আমরা যদি শিখতে চাই, হিদায়াত হাসিল করতে আগ্রহী হই, আত্মগঠনে উদ্‌গ্রীব হই, জীবন বিপ্লব সাধন করতে চাই, তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে পবিত্র কুরআন। যা আমাদের পথ দেখাবে এবং

অবশেষে অভীষ্ট লক্ষ্যে (মনযিলে মকসূদে) পৌঁছে দেবে। আমাদের মাঝে থাকতে হবে হিদায়াতের চাহিদা, অভাবের অনুভূতি ও অসহায়ত্বের স্বীকৃতি ও আকুতি, আর এ সবের সমষ্টির নামই হচ্ছে ইবাদত, আল্লাহর প্রতি ঝোঁক, আল্লাহ্‌তে আগ্রহ। আমি দু'আ করছি, আপনারাও দু'আয় স্মরণ রাখুন ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ط صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ - اٰمِيْنَ

সরল সঠিক পুণ্য পন্থা মোদের দাও গো বলি,
চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি
যে পথে তোমার চিরঅভিশাপ,
যে পথে ভ্রান্তি চিরপরিতাপ;
মোদের কখনো করো না সে পথগামী
হে অন্তর্যামী।

# দ্বীনী 'ইলম-এর তালিব 'ইলম ও আলিমগণের জন্য তিনটি চিরন্তন শর্ত

তাং ১২ জুলাই, ১৯৭৮ ইং।

[স্থান ঃ দারু'ল-'উলূম, কোরঙ্গী, করাচী, পাকিস্তান।

শ্রোতা ঃ দারু'ল-'উলূমের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ।

পরিচিতি পেশ ঃ দারু'ল-'উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (র.)-এর সুযোগ্য সন্তান পাকিস্তান ইসলামী গবেষণা পরিষদের সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ তকী 'উছমানী।

মুফ্তী মুহাম্মদ শফী সাহেব (র.) ও শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের স্মরণে হাম্‌দ ও সালাতের পর।]

দারূল-'উলূমের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ!

এ যুগের আলিম সমাজের মাঝে আমার মন যাঁদের গভীর পাণ্ডিত্য ও 'ইল্‌ম-এর দৃঢ়তায় বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবনত, তাঁদের মাঝে বিশিষ্ট মর্যাদায় আসীন রয়েছেন এ দারু'ল-'উলূমের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী শফী (র.)। জ্ঞানের গভীরতা, ফিক্‌হ ও ফতওয়ায় প্রসারিত সুগভীর দৃষ্টি, শিক্ষকসুলভ দক্ষতা—এসব গুণই মর্যাদা ও ইহতিরামের দাবীদার। কিন্তু এ সব ভিন্ন আরও একটি বিষয় রয়েছে যার কারণে কোন ফকীহ ও মুফতীকে ফাকীহু'ন-নাফ্‌স (জাত ফিকহ্‌বিদ) নামে আখ্যায়িত করা হয়। সমকালীন আলিম সমাজের মাঝে এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র)। তিনি ছিলেন আমার উস্তাদগণের বয়স ও সারির বুযুর্গ। আমার দুর্ভাগ্য, সরাসরি তাঁর পাঠকক্ষে বসে তাঁর শিষ্যত্ব অর্জনের সুযোগ আমার হয়নি। আমি দেওবন্দের ছাত্র থাকাকালীন যখন তিনি সেখানকার মুদাররিস ছিলেন, তখনও যেহেতু আমি শুধু দাওরায়ে হাদীসের সবকে শরীক হতাম, তাই তাঁর শাগরিদ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বাইশ বছর পরে আজ এ মাটিতে পা রাখার সুযোগ হলো, অথচ আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। ১৯৫৬-তে একবার বিদেশ থেকে ফেরার পথে

দু'তিন দিনের জন্য করাচীতে অবস্থানের সুযোগ হয়েছিল। আল্লাহ্ পাকের শোক্‌র, তিনি আজ আমাকে মরহুম মনীষীর শ্রেষ্ঠ স্মারক দারু'ল-'উলূমে পৌঁছে দিয়েছেন।

আজ পাকিস্তান অভাববোধ করছে হযরত মাওলানা মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র.), মাওলানা জাফর আহমদ উছমানী (র.) ও ইউসুফ বিন্নুরী (র.)–এর ন্যায় সুগভীর 'ইল্‌মের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের। পরিস্থিতি ও সমস্যাসংকুলতার বিচারে প্রকট বাস্তব আজ এটাই। এ যুগের প্রয়োজন ছিল হুজ্জাতু'ল-ইসলাম ইমাম গাযালী, শায়খুল ইসলাম ইব্‌নে তায়মিয়া ও হাকীমু'ল-ইসলাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর ন্যায় মহান মনীষীবর্গের। আর ঐ ত্রয় জ্ঞানবীর ও দ্বীনী রাহবারদের অনুপস্থিতিতে অন্তত নিকটঅতীতের মনীষীত্রয়ের সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা তো অবধারিত। কিন্তু আফসোস! আজ বিদায় নিয়েছেন তাঁরাও।

### সময়ের বিবর্তনের অভিযোগ

প্রিয় ছাত্রসমাজ! আমি এখন কথা বলছি দারু'ল-'উলূমে বসে। কাজেই আমার বক্তব্য হবে 'ইল্‌ম সম্পর্কিত। ছাত্র-শিক্ষকগণের ভবিষ্যাত, তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, সময়ের সংকট ও যুগের সমস্যা সম্পর্কিত। একথা আপনারা বারবার শুনে থাকবেন, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, পৃথিবী বদলে গেছে, বদলে গেছে আসমান-যমীন, পরিবর্তিত হয়েছে চিন্তা করার প্রকৃতি ও ধরন। এমন একটি যুগে দ্বীনী 'ইল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশে সময় ক্ষেপণ, তাতে অভিজ্ঞতা অর্জন, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবনে মস্তিষ্ক উত্তপ্তকরণ হচ্ছে শীতকালে বাসন্তী সুরে বাঁশী বাজানো কিংবা পাহাড় খুঁড়ে কুটা সংগ্রহের তুল্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, শুধু বর্তমান যুগেই নয়, বিগত সব যুগেই সময়ের বিবর্তনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। যে কোন যুগের সাহিত্য ও কাব্য চর্চার ইতিহাস পড়ে দেখুন, সর্বত্রই শ্রুতিগোচর হবে একই কান্নার সুর ঃ যুগ নষ্ট হয়ে গেছে, 'ইল্‌মের কদর নেই, জ্ঞানী-দ্বীনী জনের মর্যাদা নেই, সর্বত্রই চলছে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার জয়জয়কার। আরবী কাব্য ও সাহিত্য অধ্যয়ন করুন। শুনতে পাবেন কবি আবুল 'আলা' মা'আররীর ফরিয়াদ ঃ

تطاولت الارض السماء سفاهة

وفاخرت الشهب الحصا والجنادل

وقال السهالشمس انت ضئيلة

وقال الدجى للصبح لو نك حائل
واذانسب انطائى باليخل مادر
وعبر قسابالفها هة باقل

শেষে বলেন ঃ

باموت زران الحياة ذميمة
ويانفس جدى ان دهرك هازل

নির্বোধ ধরণী অহংকার ভরা চোখে তাকায় আকাশ পানে,
কাঁকর বালুকণা কটাক্ষ হানে তারকার পানে;
ক্ষুদ্র নিষ্প্রভ তারকা কয়, সুর্যি! তুমি অনুজ্জ্বল।
আঁধার রাত ডাকে অরুণ প্রভাতে, তোমার রং নিকষ কালো
ইতর বংশীয় বেটা অপবাদ ঝাড়ে হাতিম তাঈ! তুমি কনজুস
ক্ষেতুয়া (ক্ষেত চাষী) হাঁকে জ্ঞানবীরে, লজ্জা পাও হে অকাট নির্বোধ!
অবশেষে তাঁকে বলতে শুনি,
"মরণ! এসো হে তুমি, জীবন বড় বিষাদ পংকিল,
"আত্মা! সমঝে চল, কালের চোখে তুমি 'এক পাত্র' উপহাসের
অর্থাৎ এ জীবন বিস্বাদ, এখানে মৃত্যুই শ্রেয়, আমার আত্মা!

আত্মমর্যাদা রক্ষা করে বাকী জীবন কাটাও, কারণ জ্ঞানীজনের অবমাননার এ যুগে তুমি একটা উপহাসের পাত্রমাত্র। শুধু আরব কবিরই দোষ দিই কেন? ফার্সীর হাফিজ সিরাজীও তো ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ঃ

این چه شوریست که در دور قمر می بینم
همه أفاق ریزفتنه وشرمی بینم

কালের বিবর্তনে দেখছি এ কোন উৎকট ফ্যাসাদ!
দিগদিগন্তে জয়জয়কার হাঙ্গামা আর অপকীর্তির।

আহম্মকদের মর্যাদা প্রাপ্তি ও জ্ঞানী সমাজের অমর্যাদার ছবি এঁকেছেন কবি সিরাজী তার পরের পংক্তিতে ঃ

اسپ تازی شده مجروح بزریر پالاں
طوق زریں همسه در گردن خرمی بینم

শক্ত গদীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আরবী তাযী
গাধার গলায় ঝুল্‌ছে মণি-মুক্তা স্বর্ণহার।

এ তো গেল আরবী ও ফার্সীর কথা। আমাদের উর্দু জগতে আসুন। 'আবে হায়াত' ও অপরাপর কাব্যগ্রন্থে পাবেন অভিন্ন সোচ্চার প্রতিবাদ। কবি অশ্রু ঝরাচ্ছেন দেশ, কাল ও বিবর্তনের অভিযোগে। উস্তাদ 'যওক'-এর একটি পংক্তিই এ বিষয়ে যথেষ্ট মনে করি ঃ

پهرتے هيں اهل كمال اشفته حال افسوس هے

اے كمال افسوس هے تجهپر كمال افسوس هے

অভিজ্ঞরা ঘুরে মরে দিশেহারা, দিগ্‌ভ্রান্ত,
নির্বোধেরা বাসা বাঁধে সুখের স্বর্গে
আফ্‌সোস! হায় আক্ষেপ রাখি কোথা? আফ্‌সোস!

এ কয়েক লাইনে উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত করলাম। অন্যথায় যুগের নামে অভিযোগ ও ফরিয়াদ করে রচিত কবিতায় ভরে রয়েছে কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা। যে কোন কিতাব উল্টিয়ে দেখুন, তাতে রয়েছে সময়ের অবিচারের আহাজারী, অভিযোগের স্তূপ। আর সে সবের মূল সুর একটাই। কার সামনে উপস্থিত করব জ্ঞান-ভাণ্ডার ? উজাড় করব অমূল্য বাণী? কে বুঝবে রত্নের কদর? কে দেবে অমূল্য সম্পদের যথার্থ মূল্য? অপগণ্ড আর অযোগ্যদের প্রবল প্রতিপত্তির যুগে মানুষ কার জন্য করবে শ্রম সাধনা? কেন পানি করে দেবে পিত্ত? কলিজার খুন ঝরাবে কার স্বার্থে? কিন্তু মনে রাখবেন, এসব অভিযোগ যদি আপনার মনে দাগ কেটে রাখে তাহলে আপনার রুচি হবে না মাদরাসায় অবস্থানের, ইচ্ছা হবে না মেহনত করে কিছু শিখতে।

## আল্লাহ্‌র বিধান অপরিবর্তনীয়

আমি যা নিবেদন করতে চাই তা হলো, কালের বিবর্তন একটি বাস্তব ও অনস্বীকার্য সত্য। এক শতাব্দী পেছনে তাকিয়ে দেখুন, কত খায়র ও বরকতে (মঙ্গল ও কল্যাণ) পরিপূর্ণ ছিল সে যুগ। সে যুগের (বুযুর্গদের) বিশিষ্টদের কথা তো স্বতন্ত্র; সাধারণ লোকেরাও ছিল এ যুগের বিশিষ্টদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাঁদের ঈমানী তেজ. ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ছিল কত অধিক! দ্বীনের 'ইল্‌ম হাসিল করা, নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের হাফিজ-ই কুরআন হওয়ার প্রচলন কত ব্যাপক ছিল! আজ প্রভাব বিস্তার করেছে উদাসীনতা ও বস্তুবাদ। ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে গেছে দ্বীনী 'ইল্‌ম-এর অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা। কিন্তু অতীতে সংঘটিত, বর্তমানে ঘটমান ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য এ বিবর্তন, যার গতি-প্রকৃতি আল্লাহ পাকই সমধিক অবগত-এর আবহমান ধারা সত্ত্বেও আমি বলতে

চাই আল্লাহ্‌র বিধান অপরিবর্তনীয়। যুগের বিবর্তন সে বিধানের কোন রদবদল ঘটাতে পারে না। আল-কুরআন যে আয়াতে এ বিধানের ঘোষণা দিয়েছে তাতে পবিত্র কুরআনের অনুসৃত সাধারণ বর্ণনাশৈলীর ব্যতিক্রম করে বিষয়টির পুনরুল্লেখ ও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ঃ

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا وَّلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ـ

আল্লাহ্‌র বিধানে তুমি কখনো রদবদল দেখতে পাবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানে তুমি কস্মিনকালেও বিবর্তন প্রত্যক্ষ করবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কামিল কুদরত ও পরিপূর্ণ বিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্বজগত ও মানব 'ফিত্‌রাত' (স্বভাববিধি)-এর জন্য যে বিধিমালা নির্ণীত করেছেন, যে নীতি স্থির করে রেখেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাতে কোন রদবদল হবে না। আল্-কুরআনের পূর্বাপর অনুসন্ধানী ও হাদীসসমূহের সুগভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে অবগতি লাভ করা যেতে পারে সেসব মৌলিক বিধানের। সে বিধিমালার তালিকা সুদীর্ঘ। আমার মত নগণ্য তালিব-ই 'ইল্‌মের পক্ষে সে তালিকা প্রদান সাধ্যাতীত আর সময়ও সে উদ্দেশ্য সাধনে সংকীর্ণতর। তবুও আমার অসম্পূর্ণ বিদ্যার পরিসর হতে এমন তিনটি বিধানের উল্লেখ করছি যা আমাদের জীবন ও আমাদের মাদরাসাগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

### উপকারীর মর্যাদার স্বীকৃতি

আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের একটি হলো কল্যাণকর ও লাভজনক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, তার মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া। উপকারী বিষয়, তার ক্ষেত্র ও কেন্দ্রের প্রতি আসক্তি, উপকারীর খোঁজে লেগে থাকা, তার দিকে ধাবিত হওয়া ও তা পেয়ে গেলে তার কদর করা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ্ পাক লাভজনক বিষয়ের স্থায়িত্ব, তার জীবন্ত থাকা ও সজীব থাকার গ্যারান্টি দিয়েছেন। লাভশূন্য বিষয়ের জন্য নেই এমন কোন গ্যারান্টি। সূরা আর রা'দ-এ এসেছে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ভাষ্য ঃ

فَامَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ـ

(বান বন্যায় ভেসে আসা) আবর্জনাগুলো বিলীন হয়ে যায় শুকিয়ে আর যা উপকারী (পানি) তা সঞ্চিত হয় ভূ-গর্ভে। আল্লাহ্ এভাবে দৃষ্টান্ত পেশ করেন লাভ-অলাভ ও কল্যাণ-অকল্যাণের যাতে তোমরা তা অনুধাবন করতে পার।

একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। 'অধিক উপযোগী' বলা হয়নি, বরং আল-কুরআনের পরিভাষা হলো 'উপকারী'। এ উপকারীর স্থায়িত্বের বিধান চলে

আসছে লাখ লাখ বছর ধরে এবং হাজারো রকমের বিবর্তন সত্ত্বেও তা থাকবে অপরিবর্তনীয়। উন্নতি, অগ্রগতি, গুরুত্ব ও মূল্যমানের স্বীকৃতি লিখে দেয়া হয়েছে উপকারীর ললাটে। সুতরাং উপকারী সত্তারূপে গড়ে ওঠা নিশ্চয়তা দান করে অগণিত বিরুদ্ধাচরণ ও অসংখ্য বিপদ মুকাবিলায় হেফাজতের। তার প্রয়োজন পড়ে না প্রচার-পাব্লিসিটির। কেননা খোদ উপকারী সত্তায় বিদ্যমান থাকে প্রেমাস্পদ হওয়ার গুণ এবং তাতে থাকে না স্থান-কাল পাত্র ও দেশ-জাতির ব্যবধান। উপকারী যদি আত্মগোপন করে থাকে পাহাড় চূড়ায়, তবুও পৃথিবী তার সন্ধান পৌঁছে যাবে সে দুর্গম মন্‌যিলে আর তাকে সম্মানের সাথে তুলে নেবে মাথার ওপর, বরং সাগ্রহে সাদরে অধিষ্ঠিত করবে চোখের মণিতে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান এবং হাজারো লাখো বছরের অলংঘনীয় অপরিবর্তনীয় বিধান।

### উপকারীর চাহিদা ও সন্ধান

প্রিয় ছাত্রগণ! নিজেদের উপকার ও কল্যাণকররূপে গড়ে তোলার সাধনা করুন। জীবন চলার পথে আঁধার রাতের পথিকবৃন্দ! আপনাদের অস্তিত্ব লাভ করুক পথের দিশা ও আলোকবর্তিকা, আপনাদের সহায়তায় খুলে যাক 'ইল্‌ম জগতের জটিল গিঁট, সমাধান মিলুক দুর্লংঘ সমস্যার, আপনাদের সান্নিধ্য সজীব ও প্রাণবন্ত হোক ঈমানী শক্তি।' আপনাদের সান্নিধ্যে এসে মানুষ আহরণ করে নিয়ে যাক একটা কিছু। এভাবে আত্মগঠনের পর আপনি যদি আপনার ও লোকদের মাঝে দেয়ালও তুলে দেন কিংবা দরওয়াজা বন্ধ করে বসে থাকেন, তবুও এখানে একজন উপকারী ব্যক্তি থাকেন, তাঁর দ্বারা অমুক বিষয়ে লাভবান হওয়া যায় (ঈমান ও আত্মার লাভ যা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।) এ তথ্য লোকজনের অবগত হওয়ার পর তারা দেয়াল টপ্‌কে কিংবা দরওয়াজা ভেঙে উপস্থিত হবে আপনার সমীপে।

এ বিষয়ে হযরত শাহ মুহাম্মদ ইয়া'কুব মুজাদ্দিদী ভূপালী (র.)- এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছিলেন জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সহজ ও সর্বজনবোধ্য উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার বিস্ময়কর কুশলতা। একবার ফারওয়াহ'-এর নওয়াব সাহেব তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে এলেন, "হযরত! অনেক আগ্রহে অনেক শখ করে বহু টাকা খরচ করে মসজিদ বানালাম, কিন্তু সেখানে নামায পড়তে আসে না কেউ!" হযরতের সমাধান পদ্ধতি ছিল অভিনব। অনেক সময় তা রীতিমত পরীক্ষার বিষয় হয়ে যেত। তিনি জওয়াব দিলেন, "নওয়াব সাহেব! দেয়াল তুলে মসজিদের দরজা বন্ধ

করে দিন। একেবারে বন্ধ ঘর বানিয়ে ফেলুন।" এতটুকু শুনতেই সাহেবের বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটতে লাগল। তিনি ভাবলেন, এ যে উল্টো চিকিৎসা! বলতে লাগলেন, "হযরত! আমি মসজিদ বানিয়েছি লোকেরা তা আবাদ করবে ভেবে, অথচ আপনি বলছেন দরজা বন্ধ করে দিতে!" হযরত বললেন, "আমার পুরো কথা শুনে নিন। দরজা বন্ধ করে ভেতরে একজনকে বসিয়ে দিন পঞ্চাশ টাকার কিছু নোট হাতে দিয়ে, পঞ্চাশ না হয়ে দশ-পাঁচ টাকার নোট হলেও চলবে। বাইরে ঘোষণা করে দিনঃ মসজিদে নোট বণ্টন করা হচ্ছে। আপনি মসজিদ নির্মাণ করেছেন, কিন্তু লোকেরা জানে না নামাযের সওয়াব ও উপকারিতা। কাজেই তাদের মসজিদে আসার আশা করা যায় কি করে? নোটের অর্থ ও উপকারিতা তাদের জানা। তারা জানে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে কত কত জিনিস সংগ্রহ করা যায়, কত কত কার্যোদ্ধার হয়! নামায দিয়ে কি কি কেনা যায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে উপকৃত হওয়া যায়, তা তাদের অবগতির বাইরে। আর আপনি বসে আছেন শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট উপেক্ষা করে, নিজেদের কাজের ক্ষতি করে দূর-দূরান্ত থেকে লোক মসজিদে উপস্থিত হবে সেই আশায়। এভাবে লোক বসিয়ে দেয়ার পরে আর ঢোল পিটিয়ে প্রচার করার দরকার হবে না। অবিলম্বেই এ কথা (বাতাসে) ছড়িয়ে পড়বে, নওয়াব সাহেব কেন জানি মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, আর ভেতরে লোক বসিয়ে রেখেছেন টাকার নোটসহ। মনে হয় তা বাঁটা হচ্ছে। ফল দাঁড়াবে, লোকেরা দৌড়ে এসে দরওয়াজা ভেঙে মসজিদে ঢুকে পড়বে, শত বাধা দিয়েও কেউ তাদের রুখতে পারবে না।"

মোটকথা, উপকারী হওয়াই মুখ্য বিষয় যার ফলে লোকেরা ভিড় করতে থাকে পতংগের ন্যায়। পতঙ্গদের এই কথা বলে দিতে হয় না, মোম বাতি জ্বালানো হয়েছে। কেউ কি কোনদিন এমন ঘোষণা দিয়েছে, পতংগকুল! বাতির ওপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়। পতংগ ও বাতির মাঝে সংযোগ কিসের? যেখানে পানির আভাস পাওয়া যায়, সেখানেই সমবেত হয় পাখী ও পতঙ্গ, ভিড় জমায় প্রাণী ও মানুষ। সুতরাং বিবর্তনের অভিযোগ প্রমাণ বহন করে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও সাহসহীনতার।

## 'উপকারী'র যাদুকরী ক্ষমতা

আপনাদের একটি মজাদার ঘটনা শোনাচ্ছি। আমাদের লাখনৌ শহরে ডাক্তার আবদুল হামীদ (মরহুম) নামে একজন উচ্চ শ্রেণীর ডাক্তার ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার স্বীকৃতি দিত হিন্দু-মুসলমান সব ডাক্তারই। তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন এ রসপূর্ণ ঘটনাটি।

বারাহ্‌বাংকীর এক অমুসলিম ধনাঢ্য ব্যবসায়ী দেশ বিভাগের পর কটাক্ষ করে তাঁকে বলেছিল ঃ ডাক্তার সাব! পাকিস্তানে পাড়ি জমাচ্ছেন না কেন? ডাক্তার সাহেব স্বাভাবিক স্বরে জওয়াব দিলেন ঃ জী হ্যাঁ, আমি তো ভারতে থেকে যাওয়ার মনস্থ করেছি। আল্লাহ্‌র কী মর্জী! ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। বড় বড় ডাক্তার থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার চিকিৎসা চালানো হলো। কিন্তু উপকার হলো না কিছুই। ভদ্রলোক হার স্বীকার করে ডাক্তার হামীদ সাহেবকে অনুরোধ করে পাঠালেন। ডাক্তার সাহেব গিয়ে যখন চিকিৎসা শুরু করলেন তখন বললেন ঃ আমি পাকিস্তানে পাড়ি জমালে কি করে আজ আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমিই বা কিভাবে আপনাকে সেবা করার সুযোগ পেতাম? আল্লাহর মর্জী, এ চিকিৎসায় তার রোগ মুক্তি ঘটল এবং তাকে লজ্জিত হতে হলো।

আপনি যুগের কাছ থেকে আপনার কল্যাণকর ও উপকারী হওয়ার স্বীকৃতি আদায় করুন, সমকালীনদের এ কথা মেনে নিতে বাধ্য করুন, আপনার সঞ্চয় বিদ্যমান 'ইল্‌ম দুনিয়ার হাতে নেই। আমি মনে করি, এ পন্থা আপনার হাজারো সমস্যার সমাধান। যে দোকানে যে সওদা পাওয়া যায় তা কেনার জন্য সেখানে যাওয়াই পৃথিবীর নিয়ম। কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও এমন অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে যাতায়াত করে যার কাছে মনের খোরাক ও রোগের ওষুধ পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ছিলেন হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর যুগের ইমাম ও বাগদাদে জনতার লক্ষ্যবিন্দু। কিন্তু মনের খোরাক ও আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য তিনি যাতায়াত করতেন শহরের এমন এক বুযুর্গের সোহবতে, যিনি ইল্‌মের মানদণ্ডে ইমাম সাহেবের ধারে-কাছেও ছিলেন না। একবার ইমাম সাহেবের এক ছেলে পিতাকে বলল ঃ আব্বাজান! আপনি ওখানে যাতায়াত করলে সমাজে আমাদের মাথা নত হয়ে যায়। ইমাম সাহেব জওয়াব দিলেন ঃ বৎস! সেখানে আমি প্রত্যক্ষ করি আমার অন্তর-জগতের কল্যাণ।

এই দরসে নিজামী যাঁর প্রভাব আজ বিশ্বব্যাপী, এর বিন্যাস করেছিলেন মোল্লা নিজাম উদ্দীন ফিরিংগী মহল্লী (লাখনবী)। তিনি ছিলেন গোটা ভারতের আলিম সমাজের উস্তাদ। এত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অযোধ্যার বাঁসা এলাকার বুযুর্গ হযরত সাইয়েদ আবদুর রায্‌যাক বাঁসাবী কাদিরী (র.)-এর মুরীদ। উক্ত বুযুর্গের শিক্ষার পরিধি ছিল প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত, কথা বলতেন আঞ্চলিক 'পূরাবিয়া' ভাষায়। মোল্লা সাহেব ঐ বুযুর্গের মালফূযাতও ( বাণীমালা) সংকলন করেছেন। তাতে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন ভক্তি ও শ্রদ্ধাপুত ভংগীতে।

এর কারণ হলো, তিনি নিজের মাঝে অনুভব করতেন এক শূন্যতা যা পূর্ণ হবে ঐ দরবারে গেলে। সবার উস্তাদ হয়ে তিনি খুঁজে ফিরছিলেন এমন এক ব্যক্তিকে যাঁর সান্নিধ্যে নিজের অযোগ্যতা ও "কিছু না হওয়ার" উপলব্ধি জাগে এবং আরো পড়বার, আরো শিখ্বার উদগ্র বাসনা সৃষ্টি হয়। দিল্লীর শাহ্ 'আবদুল 'আযীয (র.)–এর পক্ষ থেকে শায়খুল-ইসলাম খেতাবে ভূষিত হযরত মাওলানা আবদুল হাই বুঢ়ানভী ও হুজ্জাতুল ইসলাম খেতাবে ভূষিত হযরত মাওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদ (র.) সম্পর্ক জুড়েছিলেন হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র.)–এর সাথে, অথচ সাইয়েদ সাহেবের শ্রেণীকক্ষের পাঠ সমাপ্ত হয়নি। দেওবন্দ-এর মুরুব্বীদের বর্ণনায় সাইয়েদ সাহেব যখন এ এলাকায় শুভাগমন করলেন, তখন ঐ মহান দুই ব্যক্তির অবস্থা ছিল, সাইয়েদ সাহেব খাটে শুয়ে আরাম করতেন, আর তাঁরা দু'জন খাটের দু'ধারে বসে থাকতেন। সাইয়েদ সাহেব চোখ খুলে কিছু বললে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ সে বাণী চর্চা করে তার স্বাদ আস্বাদন করতেন।

## স্বনির্ভরতা ও নিস্বার্থপরতার শক্তি অপরিসীম

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো আত্মনির্ভরতা ও স্বার্থত্যাগ। এটাও আল্লাহ্র অপরিবর্তনীয় বিধান, যারা হাত পাতে, মানুষ তাদের থেকে দূরে সরে যায়। যারা আঁচল পেতে ধরে, তাদের দেখলে মানুষ পালিয়ে যায়, আর যারা নিজের মুষ্টি বন্ধ করে রাখে, আঁচল গুটিয়ে রাখে, লোকেরা তাদের পদচুম্বন করে এবং খোশামোদ করে কিছু গ্রহণ করাতে পারলে ধন্য হয়ে যায়! অনাদিকাল থেকে আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতায় নিহিত রয়েছে আকর্ষণ ও জনপ্রিয়তা আর হাত পাতায় রয়েছে অপমান ও বেইয্যতি। যে স্বনির্ভর, সকলে তার মুখাপেক্ষী আর যে পরনির্ভর, সকলে তার প্রতি তোয়াক্কাবিহীন। আল্লাহ্র এ বিধানও চিরন্তন। সময়ের বিবর্তন তাতে আনে নি কোন পরিবর্তন। চতুর্থ শতকের ইতিহাস পড়ুন, সেখানে একই অবস্থা, ইতিহাস পড়ুন অষ্টম শতকের, সেখানেও বিরাজমান একই অবস্থা, আর আজকে এ চতুর্দশ শতকেও সে বিধান অপরিবর্তিত। সব যুগেই আপনি পাবেন অভিন্ন ধারার ঘটনাপঞ্জী। অধিক ঘটনা বা বিশদ বর্ণনার অবতারণা করতে চাই না। বুযুর্গানে দ্বীনের জীবন-চরিত ও তাসাওউফের ইতিহাস ভরা রয়েছে এসব ঘটনায়। এ বিষয়ে আপনাদের সম্ভবত রয়েছে নিজস্ব অভিজ্ঞতা কিংবা আপনারা উস্তাদ ও মুরুব্বীদের কাছে শুনে থাকবেন তাঁদের উস্তাদ বুযুর্গানে দীনের ঘটনাবলী।

## পরিপূর্ণতা অর্জন মর্যাদার চাবিকাঠি

তৃতীয় ও শেষ বিষয় হলো, সম্পূর্ণতা, অনন্যতা, পারদর্শিতা ও কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা লাভ। ঊর্ধ্ব জাগতিক মহাজ্ঞান তো বটেই, জাগতিক শাস্ত্রীয় বিদ্যায়ও যদি কেউ পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে, বরং আরো নিম্নমানের ব্যবহারিক কোন বিষয়ে, যথা ঃ হস্তাক্ষর শিল্প, বাইন্ডিং শিল্পে দক্ষতা অর্জন করে তাহলে কত কত নামকরা বিদ্বানকে তাদের পেছনে ঘুরতে দেখা যায়। অনেক জ্ঞানী-গুণী-গ্রন্থকার, নামী-দামী পাবলিশার, কাতিব (হস্তাক্ষরশিল্পী) ও কম্পোজিটরদের অন্যায় আবদার ও মান-অভিমান সয়ে যায়। তদুপরি তাদের অনুনয় ও খোশামোদ করতে থাকে। উদ্দেশ্য, যথাসময়ে লেখাটি শেষ করে দেয়া কিংবা অন্তত ব্লক তৈরির উদ্দেশে গ্রন্থের নামটা আর্ট করে দেয়া। কোন বিষয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ কিংবা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী কোন ব্যক্তিকে যদি আপনি দেখেন কিংবা তার বিষয়ে শুনতে পান, বেকারত্ব ও অসচ্ছলতার অভিশাপে ভুগছে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে মনে করতে হবে, সে গুণবান ব্যক্তির মাঝে রয়েছে এমন কোন দুর্বলতা কিংবা স্বভাব দোষ যা তার যাবতীয় গুণ ও যোগ্যতাকে পর্দাবৃত করে রেখেছে, তাতে পানি ঢেলে দিয়েছে। যেমন অতিশয় ক্রোধ, মেযাজের অস্থিরতা, অলসতা, পাঠ দানে অমনোযোগিতা, কর্মবিমুখতা, নিয়ম ভঙ্গের অভ্যাস, পরমতে অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি কিংবা আরও অধিকতর মারাত্মকরূপে সে কিছুটা উন্মাদ বা আধা-পাগলা অথবা উত্তপ্ত স্বভাবের। তাই সে স্থির হতে পারে না কোথাও, ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয় মুহূর্তে। নিশ্চিতই তার মাঝে বিদ্যমান থাকবে এ ধরনের কোন উপকরণ যার পরিণতিস্বরূপ জগত তার কল্যাণ থেকে মাহরূম আর সে নিজে পরিত্যক্ত হয়েছে অবহেলা ও বিস্মৃতির অজ্ঞাত কোণে। এই হলো সেই তিনটি চিরন্তন শর্ত ও গুণ, যার ব্যাপারে বিধান হলো, যুগ যুগের বাসিন্দারা যতই বিগড়ে যাক, এ তিন গুণের যাদুকরিতা ও লোকপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং থাকবে। আমাদের মাদ্রাসাসমূহের ফারেগীন ও নববী 'ইলমের তালিব (ছাত্র)-গণকে পূরণ করতে হবে এ তিনটি শর্ত, তাদের হতে হবে এ গুণাবলীতে গুণান্বিত।

# এ দ্বীন চিরজীবন্ত, জীবন্তরাই এর ধারক ও বাহক

[এ বক্তৃতা দেয়া হয়েছিল করাচী দারুল-'উলুমের ছাত্রদের উদ্দেশে ১৯৭৮ ইং-এর জুলাই ১৩ তারিখে। সমাবেশে উপস্থিতদের মাঝে ছিলেন দারুল-'উলুমের শিক্ষকবৃন্দ, ইনতেজামিয়ার সদস্যবৃন্দ ও দেশের বিভিন্ন এলাকার আলিমগণ ও শিক্ষিত সমাজ, আর ছিলেন এশীয় ইসলামী কন্‌ফারেন্‌স-এ আগত প্রতিনিধি দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য।]

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

প্রিয় ছাত্র ও সুধীবৃন্দ!

**দ্বীনের জন্য প্রয়োজন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব**

আমাদের এ দ্বীনের জন্য আল্লাহ্ পাকের নির্ণীত, নির্ধারিত বিধি হলো, এর জন্য অব্যাহতভাবে জীবন্ত ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করতে থাকবে। কোন গাছ সুফলা না হলে, তাতে নতুন নতুন পাতা-পল্লব অংকুরিত না হলে আর ফুল-কলি না ফুটলে তাকে জীবন্ত ও সজীব শ্যামল মনে করা হয় না। আমাদের এ দ্বীনও জীবন্ত! জীবন্তদের জন্যই তা মনোনীত এবং জীবন্তদের অস্তিত্ব তার জন্য অপরিহার্য। আধ্যাত্মিকতার ময়দানে, 'ইল্‌ম ও চিন্তার জগতে, পরিচালনা ও নেতৃত্বের প্লাটফর্মে যারা জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি, তাদের ধর্ম বিলীন হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষের স্বভাব জীবিতদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। বাতি প্রজ্জ্বলিত হয় বাতি থেকেই। অতীতেও তাই হয়েছে, আজও তাই হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাই হবে। সুতরাং এ উম্মতকে বাঁচতে হলে তার কর্তব্য জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃজন করা, যেন তার 'ইলমের গাছ, চিন্তাবৃক্ষ, সংস্কারবৃক্ষ ও আধ্যাত্মিকতার মহীরুহ সবুজ কিশলয়ে পল্লবিত হয়, নতুন ফুল প্রস্ফুটিত করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ আমার উম্মত বৃষ্টিধারা তুল্য; কেউ বলতে পারে না তার প্রথম ফোঁটাগুলো মৃত ভূমির জন্য অধিকতর জীবনদায়ক কিংবা শেষের বিন্দুগুলো।

আমি একজন ইতিহাস লেখক। আমার অনুভূতি, রচনা ও সংকলন জীবনের অধিকতর অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে ইতিহাসের অংগনেই। তাই আমি বলতে পারি, "এ মরু পরিক্রমায় কেটেছে আমার জীবন।" আমি বিশ্বাস করি, পূর্ববর্তিগণের অবদান, তাঁদের নিষ্ঠা ও সততা, পূর্বসূরিগণের 'আল্লাহ্‌র সাথে

সম্পর্ক', তাঁদের অবিচলতা, তাঁদের কুরবানী ও আত্মত্যাগ উত্তরসূরিদের জন্য অমূল্য পুঁজি এবং জীবন ও জীবন-স্রোতের পয়গাম বাহক। 'আমাদের পূর্বসূরিগণ এমন বড় বড় বুযুর্গ ছিলেন', 'এত প্রখর ছিল তাঁদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি', 'এত অধিক বিস্তৃত ছিল তাঁদের জ্ঞান-পরিধি', 'তাঁরা এহেন সুবিশাল, সুগভীর 'ইল্‌মের অধিকারী', এসব কথা আমরা দাবী করে আসছি, স্বীকৃতিও দিয়ে আসছি। এসব সর্বান্তকরণে স্বীকার্য, কিন্তু তা যথেষ্ট নয় কখনো।

### মৃতদের বদৌলতে 'ফয়েয' হাসিল হতে পারে, কিন্তু পথের দিশা পাওয়া যায় জীবিতদের কাছেই

আপনারা এমন ধারণা করবেন না, আমি বিগতদের সাথে অবিচার করছি। কেননা আমার সম্পর্ক সেই প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাধারার সাথে যাঁরা এ (ভারত) উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসকে বিন্যাস দিয়েছেন এবং উর্দু ভাষায় ইসলামের ইতিহাস সংকলনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন অর্থাৎ দারু'ল-'উলুম নদওয়াতু'ল-'উলামা ও দারু'ল-মুসান্নিফীন (লেখক সংঘ)। কথাটি অন্য কেউ বললে আপনাদের এ মন্তব্য যথার্থ হতো, বক্তা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, তাই ইতিহাসের প্রতি তিনি অবিচার করছেন। শুনুন! আমি বলছি, আমাদের পূর্বসূরীদের যাবতীয় কর্ম ও অবদান সংরক্ষিত থাকা এবং সমুজ্জ্বলভাবে থাকা অপরিহার্য। আমাদের কর্তব্য বিগতদের অবদানের সাথে নতুন বংশধরদের পরিচিত করানো এবং খুঁজে খুঁজে পূর্বসূরীদের কীর্তি ও অবদান সংগ্রহ করা। কিন্তু (আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো) কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হওয়াই এ দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত। সুতরাং তার জন্য অপরিহার্য জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিক কার্যক্রমও সমাধা হয় জীবন্ত বুযুর্গদের দ্বারাই। তাযকিয়া, আত্মশুদ্ধি ও অধ্যাত্ম জ্ঞান আহরিত হয় জীবন্ত ব্যক্তিত্বের শিক্ষা-দীক্ষায়। তা পরিপূর্ণতায় উপনীত হয় তাঁদের সান্নিধ্যেই—এটাই মুহাক্কিক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের, সূফী-মাশায়েখদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত। অন্যথায় বিগতদের মাঝে তো এমন শীর্ষস্থানীয় বুযর্গও ছিলেন যাঁদের একজনই গোটা সমাজ ও উম্মতের জন্য যথেষ্ট হতেন। (কিন্তু তা হয় না। কেননা) মুহাক্কিকগণ বলেছেন ঃ জীবনে রয়েছে নিত্য রূপান্তর ও পরিবৃদ্ধি, জীবন সদা দোদুল্যমান ও পরিবর্তনশীল। এখানে আনাগোনা চলে বিভিন্ন রঙ ও রূপের, পরিবেশ ও পরিস্থিতির। এখন রয়েছে এক বর্ণ, মুহূর্তে তা পরিবর্তিত হয়ে ধারণ করল নতুন বর্ণ। একটি ব্যাধির উপশমের সাথে সাথেই হয়ত দেখা দিল নতুন ব্যাধি। জীবনসমৃদ্ধ বিশ্বের স্বভাব জগতের সাথে যাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তারা পথ দেখাতে পারেন না। এ দোদুল্যমান জীবন্ত মানব সমাজের ওঁদের কাছ থেকে ফয়েয (আধ্যাত্মিক সুষমা) লাভ করা যেতে

পারে মাত্র (অবশ্য ফয়েয হাসিলের নির্ধারিত পন্থায়; কাজেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান কাম্য)। কিন্তু পথের সন্ধান লাভ জীবন্তদের হাতেই সীমিত। কোন বংশধরদের কাছে যদি থাকে সব ধরনের সম্পদ, বড় বড় পাঠাগার, ইতিহাসের বিশাল সংগ্রহ, কিন্তু তাদের না থাকে এমন জীবন্ত ব্যক্তিত্ব যাঁদের অন্তর-চিন্তা, যাদের অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন, যাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তা দ্বারা আলো লাভ করতে পারে শুধু জীবিতরাই, তাহলে সে গোষ্ঠীর বিলীন হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান।

**দীন সজীব হয়ে থাকবে**

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد الهذه الامة امر دينها ـ

"আল্লাহ্ পাক প্রতি শতাব্দীর সূচনায় উত্থিত করতে থাকবেন একজন 'মুজাদ্দিদ' যিনি এ দ্বীনকে রাখবেন তরতাজা ও সজীব, সংস্কার সাধনে সঞ্চার করবেন নতুন জীবনী শক্তি।" এ হাদীসের অর্থ এমন নয় যে, মুজাদ্দিদের আগমন মুহূর্তে তো দ্বীনের দেহে নতুন প্রাণ এল কিন্তু বিশেষ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হবে তার অস্তিত্ব।

من يجدد لهذه الامة امر دينها ـ

(যিনি উম্মতের দ্বীনী ব্যাপারে সংস্কার সাধন করবেন) বাক্যাংশের অর্থ এমন নয়, তাঁর আগমনে দু'এক সপ্তাহ, দু' দশ দিন দ্বীনের চর্চা হলো, তারপর তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

এ পর্যন্ত আগতদের জীবনী পড়ে দেখুন। কারো সংস্কার প্রভাব বিদ্যমান ছিল শতাব্দীব্যাপী আর কারো কারো তো কয়েক শতাব্দীব্যাপী।

আপনারা দেখে থাকবেন, রেললাইনে মাঝে মাঝে একটি ছোট আকারের গাড়ী চলাচল করে। ওটার নাম 'ট্রলী' (লাইন চেকিং গাড়ী)। তার চলার নিয়ম হলো, মানুষ তাকে ধাক্কা লাগিয়ে তাতে চড়ে বসে, তখন সে পিচ্ছিল লাইনের ওপর আপন গতিতে চলতে থাকে। থেমে যাওয়ার উপক্রম করলে লোকেরা নেমে আবার ধাক্কা দিয়ে উঠে বসে। গাড়ী আবার চলতে শুরু করে। এ গাড়ী লাইন পর্যবেক্ষণের জন্য। উম্মতের গাড়ীও অনুরূপ মনে করুন। এ গাড়ীতে ধাক্কাদাতারা হলেন এ উম্মতের 'উলামা, মাশায়েখ ও মুজাদ্দিদগণ। তাঁরা ঠেলে দিলে গাড়ী চলবে নিজের চাকায় গড়িয়ে, অনবরত চালাতে থাকে না কেউ, গাড়ী

চলবে তার চাকার যোগ্যতায়। কিন্তু ঠেলে দেয়া ও চালু করে দেয়ার জন্য প্রয়োজন জীবনধারী মানুষ। কেননা ওটা কোন টেক্‌নিক্যাল মেশিনারী বস্তু নয়, বরং জীবন্তরা ধাক্কা দিয়ে তা চালু করে দিলে সে নিজের চাকার ঘূর্ণনে চলতে থাকে। ট্রলীতে জরুরী বিষয় দুটি ঃ ১। বিছানো লাইনের মসৃণতা, চাকার ঘূর্ণন ও গতি এবং এগিয়ে চলার যোগ্যতা; ২। মানুষের কব্‌জিতে ঠেলতে পারার মত দৈহিক শক্তি। গাড়ীর যাত্রীরা থাকবে স্থির, অনড়। আমাদের এ উম্মতের ঐতিহ্যও অনুরূপ। যখন উম্মত শিকার হতে শুরু করে কার্যহীনতা ও বেকারত্বের, তখন আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এসে তাকে ধাক্কা দেয়। সে তখন চলতে শুরু করে স্বকীয় গতিতে, আর এভাবে চলে যায় বেশ কিছু দূর।

হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেছানী (র.) ও হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র.), উভয়কে আমি মনে করি এ যুগের মুজাদ্দিদ। আমি এ-ও মনে করি, আজ উপমহাদেশের যত স্থানে দ্বীনী ‘ইল্‌ম-এর চর্চা হচ্ছে, যত জায়গায় সুন্নতের দা‘ওয়াত চলছে, শিরক ও বিদ‘আতের প্রতি ঘৃণা এবং তা বর্জন ও উৎখাতের অভিযান চলছে, সে সবই ঐ দুই মনীষীর সাধনার ফল। দেখুন তো, এমন একজন মনীষী এলেন, যাঁর সজোর ধাক্কায় উম্মতের গাড়ীতে গতি সঞ্চারিত হয়ে তা অবিরত চলছে বিগত সাড়ে তিনটি শতাব্দী ধরে। আল্লাহই ভাল জানেন, আর চলবে কতদিন! অতঃপর আল্লাহ্‌র আর কোন বান্দা এসে ফের ধাক্কা লাগাবেন, তাতে চলবে আবার কতদিন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.)-এর তিরোধানের দেড় শতাব্দী পরে আগমন ঘটেছিল হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) ও শাহানে দেহ্‌লী (দিল্লীর শাহ্) খান্দানের। তাঁদের কীর্তি ও অবদানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে শুরু করেছে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো একথা বলা, জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিই হচ্ছে মাদরাসাসমূহের ও আলিমগণের পবিত্র কর্তব্য।

### পাকিস্তানের জন্য যা সর্বাধিক প্রয়োজনীয়

দারু’ল-‘উলুম কোরংগীতে গতকাল আমি বলেছিলাম, পাকিস্তানের এখন সর্বাধিক প্রয়োজন এমন একটি আলিম সমাজ যাঁরা সক্ষম হবেন আধুনিক সমস্যাগুলো অনুধাবন করে তার সমাধান পেশ করতে এবং কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের সহায়তায়, ফিকহ্-এর আলোকে পথ প্রদর্শন করতে। অতএব, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হচ্ছে হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা জাফর আহমদ উছমানী, মওলানা ইউসুফ বিন্নুরী (র.) প্রমুখের ন্যায় গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির। তারপরে আমি বলেছিলাম,

যুগ এত অগ্রগতি সাধন করেছে, বিপদ এত ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে এবং চ্যালেঞ্জ এত সুকঠিন হয়েছে যে, তার মুকাবিলার জন্য প্রয়োজন ছিল ইমাম গাযালী (র.), ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.) ও হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর ন্যায় যুগস্রষ্টা মনীষীর। আর যদি হুজ্জাতুল ইসলাম গাযালী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া ও হাকীমুল ইসলাম শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (র.)-এর সমপর্যায়ের লোক এ যুগে জন্মলাভ নাও করেন, তাহলে অন্তত গড়ে উঠুক ওপরে নামোল্লিখিত (নিকট অতীতের) মনীষীবর্গের সমতুল্য ব্যক্তিত্ব। সুতরাং মাদ্‌রাসাসমূহের দায়িত্ব হলো, তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে বিশালতা, উদার ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারার প্রসারতা ও ব্যাপকতা সৃষ্টির সাধনায়, অক্লান্ত সাধনা করবে কুরআন-সুন্নাহ্‌র রূহ ও আত্মার উপলব্ধি ও তার সাথে নিবিড় পরিচয় লাভের মানসে এবং শরীয়তের যথার্থ লক্ষ্যসমূহের অবগতি লাভের উদ্দেশ্য যাতে জাতির নবাগত কর্ণধারগণ জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন যুগের বিবর্তন সত্ত্বেও। সমস্যার সমাধানে "কিতাবে দেখে নিন" বলা যথেষ্ট নয়। কেননা কিতাবগুলো তো লিখিত ও সংকলিত হয় যুগ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। لاتبلى حدته ولا تنتهى عجائبه "তার নতুনত্ব ফুরিয়ে যাবে না, তার অভিনবত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে না" এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম আল্-কুরআনের। তার বাইরে মানব রচিত গ্রন্থমালায় মুদ্রিত থাকে রচনা-যুগের সুস্পষ্ট রূপ ও বৈশিষ্ট্য, সে যুগের ঘনীভূত প্রতিবিম্ব। যে কোন মহান গ্রন্থকারের গ্রন্থ খুলে দেখুন, আল্লাহ্ যদি আপনাকে দান করে থাকেন 'ইল্‌ম-এর রুচি, প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, তাহলে রচনাশৈলী দেখেই আপনি সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন তা কোন্ যুগের রচনা। আপনি অনায়াসে বলে দেবেন, "এ কিতাব তাতারী ফিৎনার পূর্ব যুগের, এটি তার পরবর্তী যুগের, আর এটি মনে হচ্ছে অষ্টম শতাব্দীর রচনা।' কেননা প্রতিটি যুগ, প্রতিটি শতাব্দীর বর্ণনাভঙ্গি, চিন্তাধারা ও স্তর বিভক্তি হয়ে থাকে স্বতন্ত্র।

আমি বলছি না, এসব মাদ্‌রাসা অহেতুক, অপ্রয়োজনীয়, বরং আমি বলছি, মাদ্‌রাসাগুলো একান্ত জরুরী ও যথেষ্ট বরকতময়। আমরা সবাই নিয়ামত ভাণ্ডারের মুক্তা-কণা সন্ধানী। আমিও এই যে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তা মাদ্‌রাসারই ফয়েয, অবদান। আমার শিক্ষার আগা-গোড়া পরিসমাপ্ত হয়েছে এ পদ্ধতিতেই। কিন্তু তবুও আমি বলতে চাই (এবং আশা করি গুরুত্ব ও পরিমাণে বাড়াবাড়ি না করে যতটুকু বলতে চাই, আমার কথার ততটুকু অর্থ করা হবে) এই দ্বীন জীবন্ত ধর্ম, তার জন্য চাই জীবন্ত মানুষ, জীবন্ত মানুষের স্পন্দনেই তার জীবনী শক্তি উজ্জীবিত হবে। পূর্বসূরী (বুযুর্গ)-গণের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব বিন্দু

পরিমাণ কমিয়ে দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে একথাটা বলে দেয়া, "বিগত মনীষিগণ একথা বলে গেছেন" এতটুকুতেই পরিতুষ্ট না হওয়া চাই।

ধরুন, কেউ যদি আপনার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসে আপনার এ ওয়াজ শোনে, "আমাদের মাঝে জন্মেছিলেন এত বড় মহান এক আলিম, যিনি ছিলেন 'ইল্‌মের আকাশ, ইল্‌মের পাহাড়", তাহলে বিরক্ত হয়ে প্রশ্নকর্তা বলে বসবেন ঃ জনাব! কূপে ইঁদুর পড়ে মরে রয়েছে, মহল্লার লোকেরা পেরেশান, শুধু বলুন কী করতে হবে? কত বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে? আপনি যদি শুরু করেন, আমাদের মাঝে জন্মেছেন জগৎ-বরেণ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.) প্রমুখ আর বলতে বলতে দম নেন আলবাহ্‌রু'র-রাইক, বাদাই 'উ'স-সানাই', ফাতাওয়া-ই-'আলিমগীরীর মুসান্নিফদের জন্ম লাভের কাহিনী বলে, তাহলে অধিকতর বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক বলে উঠবেন, জনাব! সব সহীহ্‌, সব ঠিক হ্যায়। কিন্তু দয়া করে মাসআলাটি বলে দিন। নামাযের সময় হয়ে গেল, কূপ পবিত্র করার উপায়টা কি তাই বলুন। কোন উস্তাদ আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এলেন, এবারতটি (লাইনটি) একটু বুঝিয়ে দিন, পংক্তিটির অর্থ করে দিন, আমি তা বুঝে উঠতে পারছি না। তখন যদি আপনি বক্তৃতা আরম্ভ করেন, "আমাদের পূর্বসূরীদের মাঝে জন্মেছিলেন অমুক অমুক সেরা সাহিত্যিক, যাঁরা সর্বযুগে অতুলনীয় ছিলেন। আবদুল কাহির জুরজানী, আবূ আলী আল-ফারেসী, ইমাম আল্লামা যামাখ্‌শারী, আল্লামা হারীরী, অমুক অমুক কারী ও অগণিত জ্ঞানবীর মনীষী, (তখনো আপনার বক্তৃতা শেষ হয় নি, তাই বলতে থাকলেন) আর নিকট অতীতে এই ভারতের বুকে জন্মেছেন এমন এমন মনীষী যাঁদের কেউ পিছিয়ে নন অন্যের তুলনায়।" উস্‌তাদজী সবিনয়ে আরয করবেন, "জনাব! সবই ঠিক বলেছেন, কিন্তু এ মুহূর্তে সমস্যা হলো, ঘণ্টা হয়ে গেছে, ছেলেরা অপেক্ষা করছে, আমি যাচ্ছি সবক পড়াতে। তাই মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি কবিতা পংক্তির মতলবটা (ভাবার্থ) যদি বুঝিয়ে দেন।" অনুরূপ অবস্থা যদি হয় প্রতিটি বিষয়ের যে বিষয়ের প্রশ্নকর্তা অমুক, আপনি তখন অনর্গল বক্তৃতা ঝেড়ে চলেছেন, "আমাদের শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন অমুক", তাতে সমস্যার সমাধান আশা করা যায় কি?

### গভীর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব চাই প্রতিটি শহরে

সব দেশে বরং সব শহরে এমন সব গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন আলিম থাকা প্রয়োজন যাঁরা যথাসময়ে সহায়তা দিতে পারেন, পথ দেখাতে পারেন কিংবা অন্তত অন্য কোন অধিকতর যোগ্য আলিমের সন্ধান দিতে পারেন। আমিও

অনুরূপ করে থাকি। কেউ কোন জটিল, গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এলে তাঁকে বলে দিই, আমাদের মাদ্‌রাসার মুফ্‌তী সাহেব রয়েছেন, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করুন। لكل فن رجال প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি শাস্ত্রে স্বতন্ত্র প্রজ্ঞাবান রয়েছেন। মুফ্‌তী সাহেব ফিক্‌হ বিষয়ের লোক, মাসআলার জওয়াব তিনিই দেবেন নির্ভুল, পরিতৃপ্তিকর। (অবশ্য শাস্ত্রীয় ব্যক্তিরও কখনো কখনো বিচ্যুতি হতে পারে।) ইমাম ইবনে তায়মিয়া 'আল্লামা ইবনে হায্‌ম সম্পর্কে এক স্থানে লিখেছেন, তিনি তাঁর কিতাবে (হজ্জের) "সা'ঈ" (সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো) আদায়কালেও 'রাম্‌ল' ও 'ইসতিবাগ'[১] বিধানের কথা লিখে দিয়েছেন (অথচ তা তাওয়াফের বিধান)। ইবনে তায়মিয়া (র.) পরিপূর্ণ আদব ও বিনয়ের সাথে মন্তব্য করেছেন ঃ হযরত ইবনে হায্‌ম (র.) যেহেতু হজ্জ পালনের সুযোগ পান নি, তাই তাওয়াফ ও সা'ঈ তাঁর কাছে ঘুলিয়ে গিয়েছে। এ ধরনের বিচ্যুতি স্বতন্ত্র ব্যাপার (তা দু'একবার ঘটে যেতে পারে)। মোটকথা, যে কোন বিষয়ে প্রজ্ঞাবান হতে হবে কিংবা তা প্রজ্ঞাবান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। তা না করে যদি আপনি বিগত মনীষীদের তালিকা পেশ করতে শুরু করেন, তাহলে তার দৃষ্টান্ত হবে এমন, পিপাসায় কাতর কোন ব্যক্তি আপনার কাছে এসে পানি পান করতে চাইল। আপনি বলতে শুরু করলেন, "মিয়া! পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে আছে কত পানগৃহ, সরাইখানা, আবিষ্কৃত হয়েছে কত কল্‌জে জুড়ানো সুস্বাদু ইগ্‌লু, আইসক্রীম, আর মনমাতানো মজাদার স্কোয়াশ, শরবত ও পানীয়।" আমার কথা হলো, পানীয় ও মিষ্টি শরবতে তালিকা পেশ করলে এবং তাকে পূর্বসূরীদের অগ্রগতির খবর পরিবেশন করলে তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাওয়া লোকটির কী উপকার হবে? তার দরকার একটু সাদা পানি, তা আপনি লোটায় করে দিন কিংবা মাটির পেয়ালায় ভরে দিন (তাতে কিছু যায় আসে না)। এতেই কেবল নিভবে তার তৃষ্ণার আগুন।

### শূন্য স্থান পূরণে প্রয়োজন জীবনপণ সাধনা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবনতি ও জাতির অধঃপতন সংঘটিত হয় এভাবেই, বিদায়ী ব্যক্তির শূন্য স্থান পূরণ হয় না পরবর্তীদের দ্বারা। যিনি চলে যাচ্ছেন তিনি আসন শূন্য করে যাচ্ছেন, এটাই আজকের মহাবিপদ। ভারতে আমরা আজ যে শূন্যতার শিকার, তার কথা আপনাদের কি আর বলব। (কারণ তা বলা

১. হজ্জের জন্য তাওয়াফ করা কালে বিশেষ ভংগীতে (সামরিক বাহিনীর গতিভঙ্গী) হাঁটা ও বিশেষ ধরনে চাদর পরার বিধান রয়েছে, এ ভঙ্গী ও ধরনকে 'রামল' ও ইসতিবাগ' বলা হয়। এটি তাওয়াফকালে—বিধিবদ্ধ সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করার সময় নয়।

আত্মঅবমাননার শামিল) কোন মাদ্‌রাসার শায়খু'ল-হাদীসের পদ খালি হলো, কিন্তু আর তো শায়খু'ল-হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও-বা উস্‌লে 'ফিকহ' কিংবা অন্য কোন বিষয় পড়াবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। একটা কারণ অবশ্য বলতে পারি। আল্লাহ্‌র কতক বান্দা তো চলে এসেছেন এখানে (পাকিস্তানে) আর কতক গিয়েছেন আল্লাহ্‌র দরবারে। একদল ইনতেকাল করেছেন, অপর দল 'মুন্‌তাকিল' (স্থানান্তরিত) হয়েছেন। আমাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ফলাফল অভিন্নই হয়েছে। তাহলে আমার কথার উদ্দেশ্য ছিল, শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে, আর সেজন্য প্রয়োজন অবিরাম ও অক্লান্ত সাধনা। হাদীসের শ্রেষ্ঠ আলিম তৈরি করা কিংবা শ্রেষ্ঠ ফিক্‌হবিদ গড়ে তোলা যদি আপনার লক্ষ্য হয় তাহলে আপনাকে বুকের রক্ত পানি করতে হবে। কিন্তু আক্ষেপ! আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমাদের মাদ্‌রাসাগুলির ঐতিহ্য। এখানে আছে সব কিছুই, নেই শুধু মেহনত ও অখণ্ড শ্রমের বিগত ধারা। আমার মতে বাড়াবাড়ি হোক, সীমালংঘন হোক, তবুও বেখবর হয়ে, আত্মহারা হয়ে, ঘণ্টা মিনিটের হিসাব ভুলে গিয়ে অধ্যয়নে ডুবে থাকার ঐতিহ্য হোক পুনরুজ্জীবিত। য়ূরোপের উন্নতির পেছনেও লুকিয়ে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও অখণ্ড মনোযোগে লিপ্ত থাকার রহস্য। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমি শুনেছি, গবেষণায় লিপ্ত ব্যক্তির সকাল-সন্ধ্যা, উদয়-অস্তের খবর পর্যন্ত থাকে না। আমার পরিচিত একজন ভদ্রলোক জার্মানী গিয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, সেখানকার কর্মজীবী একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপা "দিনের কাজ কখন আরম্ভ করেন এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠান ক'টায় খোলে? "এই এক্ষুণি বলছি" বলে ভদ্রলোক ভেতরে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন "ভাই আমার সেকশন কখন খোলে?" ঐ লোক বলল : ... টায়। তখন লোকটি ফিরে এসে বললেন, ...টায় আমাদের সেকশন খুলে থাকে। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি নিজেই বলে দিলেন না কেন?" তিনি জওয়াব দিলেন, "আমার তা জানা ছিল না। আমি তো খুব ভোরে আসি, তাই আমার সময় জ্ঞান থাকে না। তা ছাড়া ঘড়ি দেখার ফুরসত পাই না।" কর্ম-পাগলের কর্ম-প্রেরণা এমনই প্রবল হয়ে থাকে!

এখন যুগ চলছে বিশৃঙ্খলার, চারদিকে মনোযোগ বিনষ্টকারী হৈ চৈ। বর্তমানে এটা হচ্ছে মহাবিপদ। যেদিকে তাকাবেন, যেদিকেই থাকেন, দশ-বিশ-পঞ্চাশটি ব্যাপার এমন দেখতে পাবেন যা অহরহ সৃষ্টি করে চলছে বিশৃঙ্খলা; দেখতে পাবেন এমন অবস্থা যা বিষাক্ত করছে পরিবেশকে। দেখতে পাবেন এমন এমন ছবি ও দৃশ্য যা ছিনিয়ে নেয় মনের সব একাগ্রতা। আর টেলিভিশনের প্রোগ্রাম চলতে থাকলে তো কি আর বলব, "সুব্‌হানাল্লাহ্।" না বরং বলুন, "ইন্নালিল্লাহ!"

অতীতে সুবিধা ছিল এটাই, তখন মনোযোগ বিনষ্টকারী বিষয়ের আধিক্য ছিল না, আর মানুষের মাঝে ছিল আত্মনিমগ্ন হওয়ার অভ্যাস। আমার একজন মরক্কোবাসী উস্তাদ একবার একটা ঘটনা শুনিয়েছিলেন। মরক্কোর জনৈক আলিম মালিকী মাযহাবের কোন গ্রন্থ সংকলন করছিলেন। দৈনিক দুপুরে বাড়িতে গিয়ে তিনি দুপুরের খাবার খেয়ে আসতেন। একদিন তিনি বাড়ীতে না যাওয়ায় বাড়ির লোকেরা তার কারণ জিজ্ঞেস করল। অবাক হয়ে তিনি বললেন ঃ কেন, আমি তো এসেছিলাম, খানাও খেয়েছিলাম! পরে তার চিন্তা হলো, ব্যাপারটা কি হয়েছিল? পরে জানা গেল, তিনি কোন মাসআলার বিষয় চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন পথে কোন বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে সে বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। বাড়ির লোকেরা ছিলেন অত্যন্ত সভ্য ও ভদ্র। তারা তাকে খাইয়ে দিয়েছেন একথা টের পাওয়ার অবকাশ না দিয়ে, সেটা তাঁর নিজের বাড়ী নয়। বস্তুত সে যুগে আলিমদের মর্যাদা ছিল। ঐ বাড়ীর লোকদের সম্ভবত জানা ছিল, ইনি রোজ এ সময়ে বাড়ীতে গিয়ে খাবার খেয়ে আসেন। তারা চুপচাপ দস্তরখান বিছিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন ইনিও খানা খেয়ে রুমালে হাত মুখ মুছে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। তিনি এত নিমগ্ন ছিলেন যে, সেটা যে তাঁর বাড়ি ছিল না, তেমন ভাববার কোন কারণ তাঁর নজরে পড়েনি।

ইমাম গাযালী (র.) এ ধরনের আর একটি ঘটনা লিখেছেন সম্ভবত তাঁর 'ইহ্য়াউ'ল-'উলুম গ্রন্থে। ইমাম শফি'ঈ (র.) একবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। বাড়ির ছেলেরা ভাবল, আমাদের আব্বাকে তো প্রতি নামাযের পরে এ দু'আ করতে শুনেছি, "ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস (ইমাম শাফি'ঈর নাম)-কে বাঁচিয়ে রাখ, তাঁকে সুস্থ রাখ এবং তাঁর হায়াত দারায করে দাও।" ছেলেরা ভাবত, আমাদের পিতা হলেন এ যুগের ইমাম, তাহলে তাঁর উস্তাদ–যাঁর জন্য এত দু'আ, তিনি যেন কত বড় বুযূর্গ হবেন! কৌতূহলী ছেলেরা একবার জিজ্ঞেস করে বসল ঃ আব্বাজান! আপনি কার জন্য দু'আ করেন। পিতা জওয়াব দিলেন,

انه كالشمس للدنيا والعافية للبدن -

তিনি পৃথিবীর জন্য সূর্যতুল্য (আলো দানকারী) এবং (পৃথিবীর মানুষদের) দেহের জন্য সুস্থতাস্বরূপ।

আজ সেই ইমাম শাফি'ঈ (র.) বেড়াতে এসেছেন তাদের বাড়িতে। এরপর এক মজার ঘটনা ঘটল। বাড়ির লোকেরা ভাবল, ঘরে বসেই অমূল্য রত্ন পাওয়া গেল। খুব আদর-আপ্যায়ন হলো। রাতের খাবারের পর কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। ছেলেরা ভাবল, আব্বা দীর্ঘ সময় ইবাদতে অতিবাহিত করেন, ইনি তো আব্বার উস্তাদ! তাঁর তো চোখই বন্ধ

হবে না সারা রাত। সারা রাত কাটিয়ে দেবেন 'ইবাদত-বন্দেগীতে। ছেলেরা ঐ সব ভেবে বদনা ভরে পানি রেখে দিল যাতে তিনি উঠে ওযু করে 'ইবাদতে মশ্গুল হতে পারেন। কিন্তু হলো কি! ভোর পর্যন্ত তিনি শুয়েই থাকলেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডেকে তুললেন। তিনি উঠে ওযু না করেই নামায পড়তে চলে গেলেন। এসব দেখে তো ছেলেরা হতবাক! তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগল, ইয়া আল্লাহ্! এসব কি হলো? বদনা পরখ করে দেখা গেল, যেমন ছিল তেমনি পানি ভর্তি রয়েছে। বেশি হতভম্ব হলো এ কারণে যে, ওযূ না করেই তিনি নামায পড়ে ফেললেন! কিন্তু সে যুগে যেহেতু প্রতিবাদ-প্রশ্ন উত্থাপনের প্রথা ছিল না, তাই কেউ কোন প্রশ্ন করল না। মজলিসে বসে ইমাম সাহেব ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.)-কে বললেন : আবূ আবদুল্লাহ্! (ইমাম আহমদের কুনিয়াত) আজ রাতে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে! তুমি আমাকে শুইয়ে দিয়ে চলে যাবার পর আমার মন চলে গেল অমুক হাদীসের দিকে। আমি হাদীস থেকে মাসআলা উদ্ঘাটন করতে শুরু করলাম। সারা রাত মাসআলা বের করতে থাকলাম (মাসআলার একটি বিরাট সংখ্যাও তিনি উল্লেখ করলেন)। এসব মাসআলা উদ্ঘাটন করতে করতে ভোর হয়ে গেল, ঘুমানো আর হলো না।

کار پاک اں را قیاس از خود مگیر ۔
گرچه باشد در نوشتن شیرو شیر ۔

"পূত-পবিত্রদের কাজের তুলনা করো না নিজের সাথে, অভিন্নরূপেই লেখা হয়ে থাকে শের (সিংহ) ও শীর (দুধ)।" অর্থাৎ আকৃতি ও ধরন-ধারণ এক হলেই দু'টি বিষয় সমতুল্য হয়ে যায় না। ফারসী ভাষায় সিংহ ও দুধ—এ দুই শব্দ অভিন্ন আকৃতিতেই (شیر) লেখা হয়ে থাকে, অথচ (شیر) [শের] অর্থ সিংহ আর (شیر) [শীর] অর্থ দুধ (সকাল বেলা অপরের নিদ্রালু চোখ দেখে চোর ভাবে লোকটা তারই মত আর একটা চোর। আর রাত জেগে ইবাদতকারী ভাবেন, ইনি একজন 'আবিদ। —অনুবাদক)।

বর্তমানের কুধরণা পোষণের যুগ হলে তো পত্রিকায় হেডিং হতো, "ওযু বাদে নামায পড়ে যে আলিম, আর মজা করে প্রচার করা হতো, এমন আলিমও রয়েছে যারা ওযু ছাড়াই নামায পড়েন। শুধু তাই নয়, ইমামতিও করে (কারণ সেদিন ইমাম সাহেবের ইমামতি করারই অধিকতর সম্ভাবনা, তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কে আর নামায পড়াতে যাবে?)। আল্লাহ আমাদেরকে কুধারণা পোষণ থেকে রক্ষা করুন!

আল্লাহ্ পূরণ করে দিন আমাদের শূন্য স্থানগুলো। আমীন!

# আকুড়া খটকে শহীদী খুনের বর্ণাঢ্য রূপ

[এ বক্তৃতা দেয়া হয়েছিল আকুড়া খটকে অবস্থিত দারু'ল-'উলুম হাক্কানিয়ায় ১৯৭৮ ইং জুলাইয়ের ১৯ তারিখে। শ্রোতা ছিলেন 'উলামা, উস্তাদগণ, ছাত্ররা ও সুধীবৃন্দ। বিশেষ মেহমানের পরিচিতি পেশ করেছিলেন দারুল-উলূমের মুখপত্র মাসিক "আল- হক"-এর সম্পাদক মাওলানা সামীউল হক।]

হাম্‌দ ও সালাতের পর–

**'ইবাদতের জন্য কষ্ট স্বীকার করা**

সম্মানিত সুধীবৃন্দ, বন্ধুগণ ও প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ একদিন 'ইশার নামায়ের সময় হয়ে গেলেও হযরত নবী সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম হুজরা থেকে যথানিয়মে মসজিদে তশরীফ আনলেন না, বরং নিয়মের ব্যতিক্রম করে অনেক দীর্ঘ সময় হুজরায় অবস্থান করতে থাকলেন। মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীগণ অপেক্ষা করছিলেন প্রবল আগ্রহে, যাঁর শিক্ষা ও বরকতে নামায চিনতে পেরেছি, তাঁরই পেছনের 'তাকওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে' ইশার নামায আদায় করে বাড়িতে গিয়ে আরাম করব। মুসল্লীরা ছিলেন শ্রমজীবী, মেহনতী মানুষের দল যারা পায়ের ওপর পা রেখে বসে থাকতে অভ্যস্ত নন। ক্ষেতে বাগানে কিংবা বাজারে দোকানে সারা দিন মেহনত করাই তাঁদের দৈনন্দিনের রুটিন—মওসুম গরমের হোক কিংবা শীতের। গরমের হলে মদীনার গরমের কথা কোন জানে? কেমন ভাপের ত্বক পোড়ানো শরীর জ্বালানোর সে গরম! সেই গরমে সারা দিন মেহনত করার পর এসেছিলেন জামা'আতে নামায আদায় করে বাড়িতে গিয়ে আরামে ঘুমাবেন বলে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তখনও তাঁর হুজরায়। লোকেরা কেউ ঝিমুতে লাগলেন, কেউ শুয়ে পড়লেন। শ্রান্তি ও তন্দ্রাকাতর তখন সকলেই। হযরত 'ওমর (রা.), যিনি ছিলেন উম্মতের মুখপাত্র এবং অতি দয়াপ্রবণ ও স্নেহশীল, সকলের কষ্ট অনুভব করে তিনি হুজরার কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিশু ও মালীরা ঘুমিয়ে পড়ছে।" নবীজী বাইরে তাশরীফ এনে সকলের ওপর রহমের দৃষ্টি বুলালেন। ইরশাদ করলেন ঃ নামাযের অপেক্ষায় জেগে থাকা লোক আজকের এ দিনে তোমরা ব্যতীত অন্য কোথায়ও কেউ নেই অর্থাৎ জাগ্রত তো কত লোকই রয়েছে! বসে বসে মজলিস গুলযার করা, গল্প-গুজব করে আড্ডা

জমানো কিংবা অন্য কোন কাজে-অকাজে কাটাবার জন্য অনেকে জেগে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে নামায আদায়ের জন্য জেগে নেই আর কেউ।

## ভারতবর্ষে ইসলাম

ওপরের ঘটনাটি হিজরতের পর পরই ঘটেছিল কিংবা আরও পরবর্তী কোন সময়। তা যে সময়ই হোক এবং ঘটনার শরীকদের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, মূল্য ও মর্যাদা নির্ণীত হবে ধরন ও প্রকৃতি বিচারে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মানদণ্ডে-সংখ্যা বা ভিড়ের পরিমাপে নয়।

অনুরূপভাবে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন কাল থেকে বিরামহীন ধারায় চলছে লড়াই এবং এ যুদ্ধে অর্জিত হয়েছে বিজয়ের পর বিজয় আর ঘটনাচক্রে বিজয়ীরা প্রায় সকলে প্রবেশ করেছেন আপনাদের এ এলাকা দিয়ে। এ বোলান আর খাইবার গিরিপথ ধরেই অগ্রগামী হয়েছে একের পর এক সেনাদল। আল্লাহ্ তাদের দান করুন উত্তম প্রতিদান! আমরা তাদের জন্য সদা দু'আ প্রার্থী। কেননা তাঁদেরই বদৌলতে ভারতভূমিতে উড্ডীন হয়েছে ইসলামের (কালেমাখচিত) পতাকা।

সিন্ধুর মুলতান পর্যন্ত আরবদের মাধ্যমেই ইসলামের অধিকতর প্রসার ঘটে ছিল। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামের প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম্য। এমন অনেক লোকও তখন ইসলাম গ্রহণ করেছে, যারা বস্তুজগতের স্বার্থ ও নতুন আহ্বানের লাভ না দেখে এক কদম এগুতে রাযী হয় না। পরবর্তীকালে তাদেরই বংশধরদের মাঝে জন্ম নিয়েছেন অনেক ওলী-দরবেশ ও আল্লাহ্ওয়ালা আলিম। সুতরাং আমরা বিজয়ী সেনানী ও রাজা-বাদশাহদের অবদান ও অনুগ্রহের কথা ভুলে যেতে পারি না। কেননা আমরা তো হতে চাই সে জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত যাঁদের পরিচিতি বিধৃত হয়েছে এ আয়াতে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْمِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَاغِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থাৎ (মদীনার) মুহাজির আনসারদের পরে যাদের আগমন হবে, যারা (তাদের দু'আয়) বলবে, "হে প্রতিপালক! আমাদের মাগফিরাতে করুন এবং আমাদের সেই (দ্বীনী) ভাইদেরও, যারা ঈমান সহকারে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছেন (ঈমান সহকারে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন) আর ( হে

প্রতিপালক!) আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ স্থাপন করবেন না ঈমানদারদের প্রতি। ইয়া রব! আপনি স্নেহশীল, দয়াবান।"

সুতরাং সুলতান মাহমূদ গযনভী (কিংবা তাঁর আগেও যদি কোন সুলতান এদেশে অভিযান পরিচালনা করে থাকেন তাঁদের) থেকে শুরু করে এ পথে সর্বশেষ অভিযান পরিচালনাকারী আহমদ শাহ দুররানী (আবদালী) পর্যন্ত যিনি ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের পরিচালিত সম্মিলিত শক্তির কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন এবং মোগল রাজত্ব বরং মুসলমানদের প্রতিপত্তি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নিভুপ্রায় কুপিতে সামান্য সল্‌তে ও তেল ঢেলে দিয়েছিলেন যার ফলে আরো সত্তর-পঁচাত্তর বছর মুসলমানরা এদেশে নিরাপত্তার শ্বাস নিতে পেরেছিলেন এবং ইসলামী প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোটকথা, আমরা তাঁদের সকলের জন্যই কল্যাণের, কামিয়াবীর দু'আ করি এবং ইনশাআল্লাহ্ করতে থাকব ভবিষ্যতেও। যে পথে আগমন ঘটেছিল সেই দিগ্বিজয়ী বীরদের সে পথও আমাদের প্রিয়। কিন্তু যে কথা একটু আগেই বলেছেন সামী'উল হক সাহেব এবং যথার্থই বলেছেন, আল্লাহ্র কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশে, শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধান , সুন্নত পুনরুজ্জীবিতকরণ ও মুসলমানদের জীবনধারাকে শরীয়তসম্মত ধারায় ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে ادخلو فى السلم كافة 'ইসলামে প্রবিষ্ট হোন পূর্ণাঙ্গরূপে' এ পয়গাম পৌঁছে দিয়ে তা বাস্তবে রূপায়ণ, শরীয়তের গণ্ডি সংরক্ষণ ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ব্রত সাধনে, বহু শতাব্দীর পর ভারতের বুকে, বরং গোটা ইসলামী বিশ্বে (ইতিহাস অধ্যয়নের আলোকে গোটা ইসলামী বিশ্বে হওয়ার দাবী অসংগত নয়), পূত পবিত্র নির্ভেজাল টক্‌টকে্ তাজা খুন যে মাটিকে নিষিক্ত করেছিল, তা আপনাদের এ এলাকার মাটি, আকুড়া খটকের মাটি। মিয়া মাজহার জানিজানা-র কবিতা তার যথার্থ চিত্র অংকন করেছে ঃ

بنا کردند خوش رسمے خاك و وخون غلطیدن ۔
خدا رحمت کنند ایں عاشقان پاك طینت را

"রক্ত ধুলায় লুটোপুটি করার এ মহান চিরঅম্লান রাজপথ রচেছিল যাঁরা, পূত-পবিত্র সত্তা তাঁদের অবগাহন করুক আল্লাহর করুণা সাগরে।"

### জিহাদের শর্ত তিনটি

এখানে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সে জিহাদের যার প্রচলন বিশ্বে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো রাজা-বাদশাহ্, কোনো বিজয়ী বীর, কোনো গাযী সেনানীর অভিযান সম্বন্ধে ইতিহাস এ কথার প্রমাণ দেয় না, যুদ্ধ শুরুর আগে

প্রতিপক্ষের কাছে এ ঘোষণাপত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে যা জিহাদের তিনটি শর্ত হিসাবে স্বীকৃত। ইসলাম বিঘোষিত জিহাদের তিনটি পূর্ব শর্ত হলো–প্রথমত, প্রতিপক্ষকে এ ঘোষণা দেয়া, "আমাদের ডাকে সাড়া দাও, ইসলাম কবুল করে নাও, তাহলে তোমরা হয়ে যাবে আমাদের ভাই; রক্ত সম্বন্ধের চেয়েও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ অন্তর-সম্বন্ধের ভাই। এদেশ সমর্পিত হবে তোমাদের হাতে। কারো অধিকার থাকবে না তোমাদের সাজানো-গোছানো বসতি, সুখের সংসার থেকে তোমাদের উৎখাত করার। কারণ আমাদের জিহাদের লক্ষ্য "মনিব বদল" বা "ক্ষমতার হাত বদল" নয়, বরং তা হচ্ছে দ্বীন ও জীবনের, বিশ্বাস ও কর্মের ধারা বদল অর্থাৎ বান্দা হওয়ার স্বীকৃতিতে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে তোমরাই হবে এদেশের অধিকতর অধিকারী। দ্বিতীয়ত, প্রথম প্রস্তাব তোমাদের কাছে মনঃপূত না হলে "জিযিয়া" প্রদানে স্বীকৃত হও, আমাদের করদ রাজ্যরূপে টিকে থাক। তখন আমরা তোমাদের হিফাজত করব। তোমরা থাকতে পারবে অপরিবর্তিত অবস্থায়। তৃতীয়ত, দ্বিতীয়টি পছন্দ না হলে প্রস্তুতি নাও ময়দানে শক্তি পরীক্ষার"। এ হলো জিহাদের তিন শর্ত।

জিহাদের এ তিন শর্ত এতই সর্বজনবিদিত হয়ে গিয়েছিল যে, এর ব্যতিক্রম করার প্রেক্ষিতে সংঘটিত একটি অভিনব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে 'বালাযুরী' লিখিত 'ফুতুহু'ল-বুলদান' গ্রন্থে। সমরকন্দ বিজয়ের সময় সেখানকার বাসিন্দারা অবগত হলো যে, ইসলামের নিয়ম হলো, প্রথমে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা, অতঃপর জিযিয়ার প্রস্তাব দেয়া এবং তা গৃহীত না হলে অবশেষে যুদ্ধ করা। সমরকন্দবাসীরা দেখল, ইসলামের দা'ওয়াত বা জিযিয়ার প্রস্তাব না দিয়েই ইসলামী বাহিনী সমরকন্দে প্রবেশ করেছিল। ততদিন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, মুসলমানরা ঘর-বাড়ি বানিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেছে।

তখন খেলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবন আবদুল 'আযীয—ন্যায়পরায়ণতা ও ইসলামী বিধান পুনঃবাস্তবায়নের মানদণ্ডে যাঁকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে পঞ্চম খলীফা-ই- রাশিদ-এর এবং তাঁর খিলাফত কালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণ যুগের। বিজিত সমরকান্দবাসীরা ইসলামী জিহাদ-বিধি সম্পর্কে অবগতি লাভ করে এতদিন পরে খলীফার ন্যায়পরায়ণতা ও শরীয়তের প্রতি তাঁর আনুগত্যের ওপর ভরসা করে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে দিল। প্রতিনিধি দল দরবারে খিলাফতে এসে খলীফার সমীপে অভিযোগ পেশ করলঃ সমরকন্দ জয় করা হয়েছে ইসলামের জিহাদ বিধান ও নববী সুন্নাত লংঘন করে: আমরা এর প্রতিকার চাই।

খলীফা সেই মুহূর্তে চিঠি লিখলেন সমরকন্দের কাযীকে সম্বোধন করে, "এ চিঠি পাওয়া মাত্র আদালতের এজলাস্ কায়েম করবে। এজলাসে এ বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে, মুসলিম বাহিনী ও তাদের সমরনায়ক সমরকন্দ জয় করার সময় জিহাদ বিধান পালন করেছিল কিনা! যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায়, "প্রথমে ইসলামের দা'ওয়াত, অতঃপর জিযিয়ার প্রস্তাব এবং তা অগ্রাহ্য হওয়ার ক্ষেত্রে লড়াই.-এর ধারা প্রতিপালিত হয়নি, তাহলে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করেই মুসলিম বাহিনীর সব সৈন্য সমরকন্দ ছেড়ে তার সীমানার বাইরে অবস্থান নেবে। অতঃপর ঐ সুন্নাত ও আদর্শ বিধি পালন করে প্রথমত, সমরকন্দবাসীদের ইসলামের দা'ওয়াত দেবে, তারা তা গ্রহণ করলে তো উত্তম, অন্যথায় জিযিয়ার প্রস্তাব দেবে, তাও অগ্রাহ্য হলে তখন জিহাদ করতে পারবে।"

কাযী সাহেব দারুল খিলাফতের আদেশপত্র পাওয়া মাত্র আদালতের এজলাস ডাকলেন এবং বিবাদীকে তলব পাঠালেন। মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ বিজয়ী সেনানায়ক আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত এ ঘটনারও দ্বিতীয় কোন নজীর নেই। তরবারির আঘাতে যিনি পদানত করলেন এত বড় দেশ, তুর্কিস্তানের রাজধানী শহর, সেই দুর্ধর্ষ সেনাপতি কিনা আসামীর কাঠগড়ায় একজন সাধারণ মুসলমানের বেশে দাঁড়িয়ে! মসজিদে এজলাস বসেছে কাযীর আদালতের। বাদীপক্ষ বিজিত অমুসলিম। আসামীকে অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কোন ভণিতা না করে তিনি স্বীকার করে নিলেন তাঁর ভুল ও অন্যায়। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, মাননীয় আদালত! আমা দ্বারা এ ভুল সংঘটিত হয়েছে। বিজয়ের ধারাবাহিকতায়, অগ্রাভিযানের দ্রুত গতির ফলে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের ক্রমবিধান পালিত হয়নি।"

অভিযোগ প্রমাণিত হলো। কাযীর নির্দেশ ঘোষিত হলো, "মুসলমানরা শহর ছেড়ে চলে যাবে। শহরের অধিকার অর্পিত হবে মূল বাসিন্দাদের হাতে।" পরিস্থিতি কী হয়েছিল? অবস্থাটা কেমন ছিল? মুসলমানরা এখানে তৈরি করেছে তাদের বাড়ি-ঘর, ফসল ফলিয়েছে কৃষি ভূমিতে, অনেকে এখন এ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু সব ছেড়ে হাত ঝেড়ে শহর ত্যাগ করতে হলো সবাইকে। অবস্থান নিতে হলো শহর এলাকার বাইরে। শহরের বাসিন্দারা ছিল মূর্তিপূজারী, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর মুশরিক। তারা দেখল এ অভাবনীয় দৃশ্য! বিস্মিত হলো আইনের শাসন দেখে, মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল শরীয়তের বিধানের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য, আর অভিভূত হলো ইসলামের আদ্‌ল ও ইন্‌সাফ দেখে, সামরিক বাহিনী প্রধানের বিপক্ষে শরীয়তের বিধান প্রয়োগ হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখে।

ফলে তারা সম্মিলিতভাবে জানাল, যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই কোন হানাহানি কিংবা অস্ত্র প্রতিযোগিতার। আমরা গ্রহণ করছি এ মহান ধর্ম ইসলাম। আমরাও ঘোষণা করছি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। এই একটি ঘটনা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় স্থান দিল সমরকন্দবাসী সকলকেই।

আমি বলতে চাইছিলাম, সে যুগেও মাঝে মাঝে জিহাদের সুন্নত পদ্ধতি অনুসরণে বিচ্যুতি দেখা দিত। আর পরবর্তী যুগে এ বিধান পালিত হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। কারণ তখন তো সূচিত হচ্ছিল বিজয়ের পর বিজয়, বাহিনী এগিয়ে চলছিল অপ্রতিরোধ্য গতিতে। গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর যা কিছু অগ্রাভিযানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত, সামরিক বাহিনী নির্দ্বিধায় পদানত করে এগিয়ে চলত। কিন্তু সুদীর্ঘ ব্যবধানের পরে এই নিকট অতীতে এসে পুনঃবাস্তবায়িত হলো সে বিধান মুজাহিদদের হাতে। উপমহাদেশের জিহাদী আন্দোলনের নেতা সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র.) ও তাঁর সহকর্মী মাওলানা শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (র.) যাঁকে বলতে পারেন প্রথমোক্ত জনের উযীরে আজম, প্রধান মন্ত্রী কিংবা ডান হাত কিংবা হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুজাহিদ বাহিনীর কাযী, মুফ্তী ও শায়খুল ইসলাম যা-ই বলুন। এ দুই মনীষী সে সুন্নত পুনঃরুজ্জীবিত করে জিহাদের ঘোষণাসম্বলিত চিঠি পাঠালেন লাহোরে (শিখদের কাছে)। সে চিঠির অনুলিপি আজও হুবহু উদ্ধৃত আছে বিভিন্ন গ্রন্থে। সেই মুজাহিদদের রক্তে স্নাত হয়েই আজও এ যমীন হয়েছে সুসজ্জিত ফুল বাগিচা।

### শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না

শহীদের রক্ত বৃথা যায় না, তা প্রস্ফুটিত করে মনোহর ফল-ফুলের সমারোহে সুদৃশ্য বাগান। শুধু বাগানই কেন, শহীদের রক্তে জন্ম নেয় মাদ্রাসা, মসজিদ, অস্তিত্ব লাভ করে খানকাহ ও আরো অগণিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। শহীদের রক্ত ঝরানো মাটি হয়ে যায় অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ। কারণ তা যে শহীদের রক্তস্নাত, মুজাহিদের তাজা খুননিষিক্ত। আপনাদের এ দেশ, এ মাটি গর্ব করতে পারে এ কারণে যে, এখানেই প্রথম ঝরেছিল সে লাল লোহু, এখান থেকে শুরু হয়েছিল নবতর জিহাদের পথ-পরিক্রমা। আসার পথে আমি বন্ধুদের সাথে মুজাহিদ বাহিনীর প্রথম অভিযানের কাহিনী আলোচনা করছিলাম। আবদুল হামীদ খান নামে আমাদের রায়বেরেলীর এক খান সাহেব তালিকাভুক্ত ছিলেন আকুড়া খটকের নৈশ অভিযান পরিচালনাকারী মুজাহিদ দলে। ক্ষুদ্র দলকে নৈশ আক্রমণ চালিয়ে ছয় কিংবা দশ ক্রোশ (১২-২০ মাইল) পথ অতিক্রম করে রাতে রাতেই ফিরে যেতে হবে মুজাহিদদের আস্তানায়।

সাইয়েদ আহমদ শহীদের সামনে তালিকা পেশ করা হলে তিনি আবদুল হামীদ খান নামের সামনে নিশান লাগিয়ে দিলেন। তাঁর জানা ছিল, খান সাহেব অসুস্থ ও দুর্বল। তাই তাকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বললেন, "আজই তো জিহাদ শেষ হয়ে যাচ্ছে না, সামনে রয়েছে জিহাদের বাসনা পূরণের অগণিত অবকাশ। এ পরিস্থিতিতে কোন সাধারণ লোক হলে মনে করত, জোর কপাল! নাম বাদ হয়েছে, আমাকে কিছু বলতে হলো না, অথচ রেহাই পেয়ে গেলাম, বিপদে টলে গেল, আল্লাহ্ বাঁচায়। দশ হাজারের বিরুদ্ধে এ নগণ্য সংখ্যক মুজাহিদ যাচ্ছে অভিযান চালাতে। পথের চড়াই-উৎরাই জানা নেই। অভিজ্ঞতাবিহীন প্রথমবারের অভিযান। আল্লাহই জানেন কি কি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো! যাক! আমীরুল মু'মিনীন প্রধান সেনাপতি নিজেই যেন রেহাই দিলেন! ভাগ্য ভাল। কিন্তু না, খান সাহেবের মন তখন বিভোর জিহাদের মাঠে অগ্রযাত্রার স্বপ্নে! তিনি হাতছানি দেখতে পাচ্ছেন শাহাদতের অবর্ণনীয় সফলতার। অসুস্থ অবস্থায় দৌড়ে এসে তালিকা থেকে বাদ পড়ার অভিযোগ জানালেন, জানতে চাইলেন, তা কোন্ অপরাধের শাস্তি? সাইয়েদ সাহেব জওয়াব দিলেন, "ভাই! আমি শুনতে পেলাম, আপনি অসুস্থ ও দুর্বল। আপনার জ্বর হচ্ছে ক'দিন, আর অভিযানটিও সুকঠিন। এজন্য প্রয়োজন অতি সহনশীল, অক্লান্ত সুস্থ সবল লোক।" খান সাহেব আরয করলেন, "হযরত! নতুন ভিত্তি রচিত হতে চলেছে জিহাদ ফী- সাবীলিল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র রাহে জীবন দানের। আজই তার প্রথম পদক্ষেপ। আমি কি মাহরুম থেকে যাব এ ভিত্তি রচনায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার নাম তালিকাভুক্ত করার অনুমতি দিন।" অবশেষে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হলো। আল্লাহ্ পাক কবুল করে নিলেন তাঁকে। মুজাহিদের তালিকা থেকে তাঁর নাম স্থানান্তরিত হলো শহীদানের তালিকায়।

**দারুল উলূম হাক্কানিয়ার কথা**

এ মাটিতে রচিত হয়েছিল উল্লিখিত কাহিনী, পরবর্তী ক্ষেত্র ছিল সাইদু (স্থানের নাম)। আপনাদের কাছেই অবস্থিত সে স্থান। ক্রমান্বয়ে মুজাহিদ বাহিনীর তৎপরতা বিস্তৃত হলো হিণ্ড, জাহাংগীরাহ প্রভৃতি স্থানে। এ সব নাম আমার স্মৃতিতে পরিচিত ও উজ্জ্বল। এ পথে আজ আমি প্রথম এলাম; এর আগে পেশাওয়ার ও মর্দানের পথে আসার সুযোগ হয়েছিল আজ থেকে ৩৪-৩৫ বছর আগে। তখন এ দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেবার এসে ঘুরে ফিরে চলে গিয়েছিলাম! কে জানত সেদিন আবার আসা হবে এ পথে এখানে? আমার

জীবন সে সুযোগ দেবে। এসে দেখব এক সুশোভিত বাগান দারুল উলুম হাক্‌কানিয়াহ, যেখানে জ্বলজ্বল করছে শহীদী ফুলের লাল আভা। "হাক্-কানিয়াহ'- হক ও ন্যায় পথের পথিক। কী বাস্তব, কী সুন্দর সম্বন্ধ! কত মহান "নিসবত'। এ সম্বন্ধ বর্ণাঢ্য হবেই ইনশাআল্লাহ্। শহীদানের খুন ধারণ করেছে মনোহর রংয়ের সম্বন্ধ ও রঙীন হয়ে নয়ন জুড়ানো বর্ণে। নাম দেয়া হয়েছে 'হাক্কানিয়াহ'-হক্ক ও সত্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। ইন্‌শাআল্লাহ্ এখানে সত্য ও ন্যায় বাস্তাবয়িত হবে। এ কেন্দ্রে থেকে সূচিত হবে সত্যের অভিযাত্রা। এখানে শিক্ষা সমাপনকারিগণ হবেন সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী।

আল্লহ্ পাক হায়াত দারায করুন এবং জীবনে বরকত দিন শায়খু'ল-হাদীস ও শায়খূ'ল-উলামা' হযরত মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী সাহেবের। তাঁর চোখও জুড়াক এবং মন আনন্দে ভরে উঠুক এ মাদ্‌রাসার উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে। আল্লাহ্ সজীব ও শ্যামল রাখুন তাঁর লাগানো এ বাগানকে, একে করুন ফলে ফুলে সুশোভিত।

এখানে এ মাটিতে প্রয়োজন ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠানের, এমন একটি মাদ্‌রাসার, যেখানে গুঞ্জরিত হবে 'কালাল্লাহ্' ও 'কালা'র- রাসূল'-আল্লাহ্‌র ইরশাদ ও রাসূলের বাণীর সুমধুর আওয়াজ। কেননা হিন্দুস্তান ও আরো দূর-দূরান্ত থেকে হাতের মুঠোয় জীবন রেখে ধন-জন-সম্পদের মোহ কুরবানী করে সুদূর জিহাদ ভূমিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরাও ছিলেন মূলত এ 'কালামুল্লাহ্' ও 'কালামু'র- রাসূলের' সূদল, আর তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত ছিল এ কালামুল্লাহ ও কালামু'র- রাসূলই। এ মহান বাণী আর তার মহান লক্ষ্য তাঁদের করেছিল ঘরছাড়া, দেশহারা। ইন্‌শাআল্লাহ! যতদিন এখানে এ মহান লক্ষ্যে মেহনত ও সাধনা অব্যাহত থাকবে, ততদিন বর্ষিত হবে আল্লাহর রহমত! কবির ভাষায় ঃ

هنوز آں ابر رحمت درفشاں است ۔
خم وخمخانه با مهرونشاں است ۔

আজিও মুক্তা ঝরায় 'রহমতে' মেঘমালা, মদিরা ও আস্তানা বিদ্যমান আজিও সগৌরবে।

আস্তানা এখনো খালি হয়ে যায় নি, এখনো চলছে সেখানে রস-পিয়াসীদের আনাগোনা। শেষ ভাগে বলতে চাই কবি হাফিজের পংক্তি ঃ

ازصد سخنے پیرم یك نکته مرایا داست ۔

عالم نه شود ویران تا مکیده ابادست

মুরশিদের শত বাণীর মাঝে একটি বাণী গেঁথে রয়েছে আজো মনের কোণে। ক্ষয় ও লয় হবে না জগত, যাবত রয়েছে আস্তানা মদিরার।

অর্থাৎ মা'রিফাত ও আল্লাহ্ প্রেমের শরাবখানা তথা বান্দার মনে মা'বুদের প্রতি প্রেম-আসক্তি সৃষ্টিকারী আস্তানাসমূহ, মাদ্‌রাসা-মসজিদ ও খানকাহসমূহ যতদিন তাদের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে, 'কালামুল্লাহ' ও কালামুর-রাসূলের ধ্বনি গুঞ্জন তুলতে থাকবে, ততদিন প্রলয় ঘটবে না এ পৃথিবীর। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ পৃথিবীর বুকে যতদিন পর্যন্ত এমন একটি প্রাণীও বিদ্যমান থাকবে, যার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে আল্লাহ্, ততদিন পর্যন্ত মহাপ্রলয় তথা কেয়ামত সংঘটিত হবে না।

আপনাদের জানাই মুবারকবাদ, মুবারকবাদ জানাই এ পবিত্র ভূমিকে। আমি এখন আবেগাপ্লুত। কেননা এটা আবেগের সময়। কবির ভাষয় ঃ

تازه خواهی داشتن گر داغهائے سینه را ۔

گاهے گاهے بازخواں ایں قصه ها دینه را ۔

"বুকের রক্ত ঝরানো ক্ষতগুলো, যদি রাখতে চাও তাজা রক্ত ভেজা ঃ রগড়াতে হবে, তবে সে ক্ষত কভু, বিগত দিনের ইতিহাসে আঁচড়ে।"

এ দারু'ল-উলুম আপনাদের কাছে মর্যাদা প্রাপ্তির দাবীদার। তার কদর করুন, গুণগ্রাহী হোন শিক্ষকবৃন্দ ও আলিমগণের। এখানে পাঠিয়ে দিন মেধাবী ছাত্রদের। কেননা আজ যা প্রয়োজনীয়, যেমন মাওলানা সামী'উল হক সাহেব ইঙ্গিত করেছেন, পাশ্চাত্যের ভয়াবহ ফিৎনা, ভোগবাদ ও জড়বাদের ফিৎনার মুকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে মেধাবীদের, যারা হবে উদ্যমী ও প্রেরণায় উজ্জীবিত, তারুণ্যে উচ্ছল, বংশধারায় শ্রেষ্ঠ। যাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান রয়েছে মুজাহিদের শোণিত ধারা, শহীদের লোহু, আমানতদারের খুন, বিশ্বস্তদের রক্ত। এ বংশধরেরা অগ্রবর্তী হয়ে কুরআন ও হাদীসের , কিতাব ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান আহরণ করে ছড়িয়ে পড়বে দু' পথের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা এ দেশটির বুকে, যেখানে আজ চলছে হক-বাতিলের সংঘাত, সংগ্রাম চলছে ইসলামী বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার যুগোপযোগিতার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ফলাফল। তাঁরা ছড়িয়ে পড়বেন, আর পথ দেখাবেন পথ সন্ধানী জাতিকে।

এখানেই সমাপ্ত করছি। এখানে এসে আমি কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি, কারো প্রতি করিনি কোন ইহ্সান, বরং আমি ইহ্সান করছি নিজের আত্মার ওপর আর অনুগ্রহ লাভ করছি উদ্যোক্তাদের আমি ও আমার সফর-সঙ্গিগণ। কারণ উদ্যোক্তারাই ব্যবস্থা করেছেন স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল এ প্রিয় ভূমি আর একবার দেখবার।

যে মহান লক্ষ্যে এ প্রিয় ভূমি রক্তরঞ্জিত হয়েছিল, আল্লাহ তা ব্যাপক ও বিস্তৃত করুন। ইসলামের কালেমা বুলন্দ হোক! ইসলাম বিজয়ী হোক! ইসলাম বাস্তবায়িত হোক আমাদের ঘরে , আমাদের পরিবারে, আমাদের অফিসে, আদালতে, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে—সর্বত্র। দু'আ করুন যেন আল্লাহ পাক ফযল ও মেহেরবানী করেন।

اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولاتجعلنا منهم -

"ইয়া আল্লাহ! মদদ কর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লামের দ্বীনের সাহায্যকারীদের আর আমাদের করো তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ মদদ তুলে নাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের সহায়তা বর্জনকারীদের থেকে আর আমাদের করো না তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের সকল বন্ধু ও প্রিয়জনকে সব রকমের দৈহিক ও আত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে সার্বিক শিফা দান করুন, সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা দান করুন! আল্লাহ আমাদের ইসলাম ও লিল্লাহিয়্যাত (নিষ্ঠা ও আল্লাহ্তে নিবেদিত হওয়ার তওফীক) দান করুন! আমাদের কল্বগুলোকে নূরানী ও জ্যোতির্ময় করুন! দেমাগ ও মস্তিষ্ককে প্রখর ও উজ্জ্বল করুন! আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শক্তি-সামর্থ্য দান করুন! আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ইসলামের ওপর কায়েম রাখুন। আমীন! ইয়া রাব্বা'ল-আলামীন!